অত্তানভীর

[তাফসীরে কুরআন]

১ম পারা

আল্লামা ফুলতলী ছাহেব কিবলাহ

Scanned with CamScanner

আত তানভীর [তাফসীরে কুরআন]
আল্লামা মোহাম্মদ আবদুল লতিফ চৌধুরী
ফুলতলী ছাহেব কিবলাহ

অনুবাদ ও সম্পাদনা ঃ মুহাম্মদ হুছামুদ্দীন চৌধুরী

প্রকাশনায়
পরওয়ানা পাবলিকেশন্স
ফুলতলী ভবন
১৯/এ, নয়াপল্টন, ঢাকা-১০০০
ফোন ঃ ৮৩১৮৯১৭, ৮৩১৪১৬৮

প্রকাশকাল
ফেব্রুয়ারী ঃ ২০০৫ইং
যিলহজ্জ ঃ ১৪২৫ হিজরী
মাঘ ঃ ১৪১১

কম্পোজ ও ডিজাইন
পরওয়ানা গ্রাফিক্স
ফুলতলী ভবন
১৯/এ, নয়াপল্টন, ঢাকা-১০০০
ফোন ঃ ৮৩১৪১৬৮

নির্ধারিত মূল্য ঃ ৮০/= (আশি টাকা মাত্র)

মুদ্রণ
দিওভলাক প্রিন্টার্স
১৩ নয়াপল্টন, ঢাকা-১০০০।

প্রথম সংস্করণ সুলভ মূল্যে বিক্রির জন্য আর্থিক সহযোগিতা করেন ইংল্যান্ড প্রবাসী কাউন্সিলর আলহাজ্ব আহমাদুল হক (টিপটন, মিডল্যান্ড, ইউ.কে)।

AT-TANVIR [TAFSIR-E-QURAN] Written by Allamah Abdul Latif Chowdhury. Translated and Editted by Muhammad Husmuddin Chowdhury. Published by Parwana Publication Fultoli Bhaban, 19/A, Nayapaltan, Dhaka-1000.
1st Addition-February 2005
Price : 80 Taka.

অনুবাদকের কথা

আল্লামা ফুলতলী ছাহেব কিবলাহ সংকলিত তাফসীর বিষয়ক গ্রন্থ 'আত্-তানভীর আলাত তাফসীর'। সত্তর দশকের প্রথম দিকে নিরাপত্তাজনিত কারনে কারাগারে অবস্থান কালে তিনি সীরাত, তাসাউফ, হামদ, না'ত এর পাশাপাশি আলোচ্য তাফসীরখানা রচনার কাজ শুরু করেন। উর্দূ ভাষায় রচিত এ তাফসীর দু'পারা সমাপ্ত করার পর তিনি কারাগার থেকে বের হন। কর্মব্যস্ত জীবনে এ কাজটি আর এগিয়ে নেয়া সম্ভব হয়নি। দীর্ঘদিন পর গত ২০০১ সালে উর্দূ সংস্করণ ছাপা হওয়ার সাথে সাথে এর বঙ্গানুবাদের তাকীদ আসতে থাকে বিভিন্ন মহল থেকে। আল্লাহর অশেষ শুকরিয়া যে, তিনি এর বঙ্গানুবাদের কাজটি শেষ করার তাওফীক দিয়েছেন। মূল উর্দূ সংস্করণটি এক খন্ডে হলেও পাঠকের সুবিধার্থে আমরা বাংলা সংস্করণ দু'খন্ডে প্রকাশ করছি।

অনুবাদকে পাঠকের কাছে সহজতর করে তোলার আপ্রাণ চেষ্টা করেছি। আয়াতগুলোর বঙ্গানুবাদের ক্ষেত্রে আমরা ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ কর্তৃক প্রকাশিত 'আল কুরআনুল কারীম'-এর সাহায্য নিয়েছি। এ কাজে অনেকের সহযোগিতা আমরা পেয়েছি। বিশেষ করে আমার স্নেহাস্পদ ভাতিজা মাওলানা আহমদ হাসান চৌধুরী অনুবাদের কাজে বিশেষ সহযোগিতা করেছেন। সকলের জন্য আল্লাহর কাছে দু'আ করছি।

প্রথম সংস্করণ সুলভে প্রকাশের জন্য যুক্তরাষ্ট্র প্রবাসী কাউন্সিলর জনাব আহমদুল হক আর্থিক সহায়তা দিয়েছেন। আল্লাহ্ তার নেক ইরাদা পূরণ করুন।

কুরআনুল কারীম গবেষণাকারীদের জন্য এ কিতাবখানা সহায়ক ভূমিকা পালন করলে আমাদের শ্রম স্বার্থক হয়েছে বলে মনে করব।

মুহাম্মদ হুছামুদ্দীন চৌধুরী
সম্পাদক
মাসিক পরওয়ানা

AMRAN HOSAN
Gobindopur, Juri, Moulvibazar
Mobile : 01783587480
01850054403

Scanned with CamScanner

সূচীপত্র

কুরআনে পাকের প্রয়োজনীয় বিষয়াদি	৮
কুরআনের আলোকে তাফসীর	৮
হাদীসের আলোকে তাফসীর	৮
সাহাবায়ে কিরামের অনুসরণে তাফসীর	৯
আহলে কিতাবের অনুসরণ	১১
তাবেয়ীগণের অনুসরণে তাফসীর	১২
নিজস্ব মতামতে তাফসীর	১৩
তাফসীরের প্রকারভেদ	১৬
আহলে কুরআন এবং তিলাওয়াতের ফযীলত	১৭
কুরআন পাকের ফযীলত	২০
ইবনে আব্বাস (রা.) কর্তৃক ২০ বছর বলার কারণ	২০
মক্কী মাদানীর পরিচয়	২১
কুরআন শরীফ ফিতনা হতে পরিত্রাণের মাধ্যম	২৩
কুরআনের ভাষা	২৫
কুরআন সংকলন	২৬
হযরত উসমানের (রা.) কুরআন লিপিবদ্ধ করণ	৩০
কুরআনের সংকলক সাহাবীগণ	৩২
সাত হরফ (سبعة احرف) সম্পর্কে আলোচনা	৩৫
সাত হরফ সম্পর্কে উলামায়ে কিরামদের বক্তব্য	৩৮
সূরার ধারাবাহিকতা	৪০
মাসহাফ এ নুকতার প্রচলন	৪১
সাহাবীদের মধ্যে যারা কারী ছিলেন	৪১
কুরআন পাঠে প্রশান্তি এবং ফিরিশতার অবতরণ	৪১
রাসূলুল্লাহ (সা.) কুরআন এবং সুন্নাহ ছাড়া অন্য কিছু রেখে যাননি	৪২
সুললিত ও বিশুদ্ধভাবে কুরআন তিলাওয়াত করা	৪২
তারতীলের সাথে কুরআন তিলাওয়াত	৪৩
সাত কারীর পরিচয়	৪৪
কিরাত দীর্ঘ করা	৪৫
কিরাত পাঠে তারজী' প্রসংগে	৪৫
সুললিত কণ্ঠে কিরাত পড়া	৪৫
আউযুবিল্লাহ পাঠ	৪৫
বিসমিল্লাহর তাফসীর	৪৭
বিসমিল্লাহর ফযীলত	৪৭

সূরা ফাতিহা [৫১-৬৯]

সূরা ফাতিহা	৫১
সূরা ফাতিহার নাম	৫২
সূরা ফাতিহার ফযীলত	৫৩
আল হামদুলিল্লাহর কারামত	৫৭
نعبد শব্দের মধ্যে বহুবচন ব্যবহারের হিকমত	৬২
সূরায়ে ফাতিহার মাহাত্ম্য	৬৭

সূরা বাকারাহ [৭০-২৪৮]

১-৭ নং আয়াতের তাফসীর	৭০-৭৮
৮-১৬ নং আয়াতের তাফসীর	৭৮-৮৪
১৭-২০ নং আয়াতের তাফসীর	৮৪-৮৯
২১-২৫ নং আয়াতের তাফসীর	৮৯-৯২
২৬-২৯ নং আয়াতের তাফসীর	৯৩-৯৮
৩০-৩৩ নং আয়াতের তাফসীর	৯৮-১০৭
৩৪-৩৯ নং আয়াতের তাফসীর	১০৭-১১৯
৪০-৪৬ নং আয়াতের তাফসীর	১১৯-১২৪
৪৭-৫৩ নং আয়াতের তাফসীর	১২৪-১৩৬
৫৪-৫৯ নং আয়াতের তাফসীর	১৩৬-১৪৪
৬০-৬১ নং আয়াতের তাফসীর	১৪৫-১৪৯
৬২-৬৬ নং আয়াতের তাফসীর	১৪৯-১৬০
৬৭-৭১ নং আয়াতের তাফসীর	১৬০-১৬৫
৭২-৭৭ নং আয়াতের তাফসীর	১৬৫-১৭১
৭৮-৮২ নং আয়াতের তাফসীর	১৭২-১৭৪
৮৩-৮৬ নং আয়াতের তাফসীর	১৭৪-১৭৯
৮৭-৯২ নং আয়াতের তাফসীর	১৭৯-১৮৪
৯৩-৯৬ নং আয়াতের তাফসীর	১৮৫-১৮৭
৯৭-১০১ নং আয়াতের তাফসীর	১৮৭-১৯১
১০২-১০৩ নং আয়াতের তাফসীর	১৯১-২০০
১০৪-১০৮ নং আয়াতের তাফসীর	২০০-২০৫
১০৯-১১২ নং আয়াতের তাফসীর	২০৬-২০৮
১১৩-১১৭ নং আয়াতের তাফসীর	২০৯-২১৫
১১৮-১২১ নং আয়াতের তাফসীর	২১৫-২১৯
১২২-১২৬ নং আয়াতের তাফসীর	২১৯-২২৯
১২৭-১২৯ নং আয়াতের তাফসীর	২২৯-২৩৭
১৩০-১৩৪ নং আয়াতের তাফসীর	২৩৭-২৪০
১৩৫-১৪১ নং আয়াতের তাফসীর	২৪০-২৪৮

Scanned with CamScanner

প্র স ঙ্গ ক থা

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

আল্লাহ তা'লার হামদ এবং দয়াল নবীর প্রতি দরূদ ও সালামের পর আরম্ভ করছি

কুরআনে পাকের ছন্দ এবং অর্থ জীবিত রাখার উপযুক্ত আমি নই। তবে যেহেতু বর্তমানে কুরআন পাঠে পরিবর্তন শুরু হয়েছে। এ যামানায় আমাদের কর্তব্য হচ্ছে কিরআতে মনকুল এবং বিশুদ্ধ ও শ্রুতিমধুর পাঠ প্রচলন রাখার জন্যে যতদূর সম্ভব চেষ্টা করা। আল্লাহ তা'লার ইরশাদ হচ্ছে- وَرَتِّلِ الْقُرْاٰنَ تَرْتِيْلًا 'শুদ্ধ ও শ্রুতিমধুর করে কুরআন পাঠ কর।' রাসূল (সা.) খারিজীদের পরিচয় প্রসঙ্গে বলেন- يتلون كتاب الله ويشربونه نشر الدقل الخ খারিজী সম্প্রদায় আল্লাহ তালার কিতাব 'কুরআনে পাক' কে এতো নিম্নমানের গদ্য আকারে পাঠ করবে যেন নিম্নমানের খেজুর এবং তারা এর আসল ব্যাখ্যার বিপরীত ব্যাখ্যা প্রদান করবে। তারা দীন হতে এতো দ্রুত বের হয়ে যাবে, যেন ধনুক হতে চলে যায় তীর। এদের অধিকাংশই মাথা মুন্ডনকারী হিসেবে পরিচিত হবে। (ইবনে মাজাহ)

যেহেতু কুরআনে পাকের ছন্দ এবং অর্থ দুটোই একই সাথে রাসূলুল্লাহ (সা.)হতে মুতাওয়াতির (নিরবিচ্ছিন্ন) বর্ণনার মাধ্যমে এসেছে এবং এটাই কুরআনে পাকের যথার্থ পরিচয়। বর্তমান কালে বিভিন্ন তাফসীরকারীদের নিজস্ব মতামতের সন্নিবেশন পরিলক্ষিত হচ্ছে। আমার বিশ্বাস- স্বীকৃত ও সনদযুক্ত তাফসীর হতে কিছু কিছু সংকলন করলে সত্য অন্বেষণকারী মানুষ মনগড়া তাফসীর তথা تفسير بالراى হতে রক্ষা পাবেন।

প্রাথমিক পর্যায়ে কুরআনে পাকের এক আয়াত অন্য আয়াতের তাফসীর। পরবর্তীতে হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর জীবনই হচ্ছে কুরআনে পাকের তাফসীর। যেমন সাহাবায়ে কিরাম (রা.) উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়িশা সিদ্দীকা (রা.)-এর খিদমতে আরজ করলেন, হে উম্মুল মু'মিনীন! আপনি আমাদেরকে হুযুর আকরাম (সা.)-এর চরিত্র বর্ণনা করুন। উম্মুল মু'মিনীন (রা.) সাহাবায়ে কিরাম (রা.)-কে প্রশ্ন করলেন- আপনারা কুরআন শরীফ পাঠ করেন না? উত্তরে তাঁরা বললেন- হ্যাঁ, আমরা কুরআন পাঠ করি। উম্মুল মু'মিনীন বললেন- কুরআনে পাকই হচ্ছে তাঁর চরিত্র।

এ সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা কুরআনে পাকে বলেন-

هُوَ الَّذِيْ بَعَثَ فِي الْاُمِّيّٖنَ رَسُوْلًا مِّنْهُمْ الخ-

"তিনিই মহান আল্লাহ, যিনি উম্মীদের নিকট তাদেরই মধ্য হতে রাসূল পাঠিয়েছেন। তিনি তাদের নিকট তাঁর আয়াতসমূহ তিলাওয়াত করেন, আত্মাকে নির্মল ও পবিত্র করেন। তাদেরকে কুরআন ও হিকমত অর্থাৎ দ্বীনের বিশেষ জ্ঞান শিক্ষা দেন।' (সূরা ঃ জুমআ-২) উপরোক্ত বর্ণনা হতে বুঝা যায় যে, হযরত মুহাম্মদ (সা.) হচ্ছেন কুরআন পাকের বাস্তব নমুনা।

তাই এই ফিৎনার যুগে আমার একান্ত প্রয়াস, যতদিন জেল খানায় আমার সুযোগ হয় এবং যতটুকু সম্ভব কিছু সংখ্যক আয়াতে কারীমার তাফসীর স্বীকৃত সনদপ্রাপ্ত তাফসীর হতে সংগৃহীত করে রাখার। যাতে মানুষ বিভিন্ন ধরনের তাফসীর অধ্যয়ন করে স্বীয় ধ্যান-ধারণা বিক্ষিপ্ত না করে এবং কুরআন পাকের সঠিক তাফসীর এবং সঠিক উদ্দেশ্য অর্জন করতে সক্ষম হয়। এ মহৎ উদ্দেশ্যে মহান আল্লাহর উপর ভরসা করেই কলম ধরলাম। কিন্তু দু'পারা শেষ হতে না হতেই জেলখানা হতে মুক্তি পেলাম এবং অবশিষ্ট পারাসমূহ লেখার আর সুযোগ হলো না। আল্লাহ! এ দু'পারা কবুল করুন এবং অবশিষ্ট পারাসমূহ সম্পন্ন করার তওফীক দান করুন!

অধিকন্তু, পাঠকবৃন্দের নিকট এটাই চাওয়া, যদি কোন ভুল-ত্রুটি পরিলক্ষিত হয়- আমাকে অবহিত করবেন এবং কৃতজ্ঞতা প্রকাশের সুযোগদানে বাধিত করবেন।

মুহাম্মদ আবদুল লতিফ চৌধুরী
ফুলতলী

Scanned with CamScanner

কুরআনে পাকের প্রয়োজনীয় বিষয়াদি

আল্লাহ তায়ালা সকল কিছুর শুরু তাঁর প্রশংসা দিয়ে করেছেন। যেমন- কুরআনে পাকের শুরু اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ "সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ তায়ালার জন্য, যিনি সমস্ত সৃষ্টির পালন কর্তা।" কুরআনুল কারীমের অন্য জায়গায় এসেছে-

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ اَنْزَلَ عَلٰى عَبْدِهِ الْكِتٰبَ الخ

"সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ তায়ালারই জন্য, যিনি তাঁর বান্দার উপর কুরআন অবতীর্ণ করেছেন...।"(সূরা ঃ কাহফ-১)

এমনকি সৃষ্টির হিদায়তের শুরুও হামদ দ্বারা করেছেন যেমন -

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَجَعَلَ الظُّلُمٰتِ وَالنُّوْرَ ـ ثُمَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُوْنَ ـ

"সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ তায়ালাই জন্যে, যিনি আসমানসমূহ ও যমীন সৃষ্টি করেছেন, আঁধার ও আলো সৃষ্টি করেছেন। অথচ কাফিররা অন্যকে তাদের পরওয়ারদিগারের সমান মনে করে।" (সূরা ঃ আনআ'ম-১)

এ পার্থিব জগতের শেষও হামদ দ্বারা হবে। যেমন-وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ وَقِيْلَ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ "তাদের মধ্যে সত্যকে প্রতিষ্ঠা করা হবে এবং বলা হবে, সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্যেই, যিনি সমুদয় সৃষ্টির পালনকর্তা।" (সূরা ঃ যুমার-৭৫) এ দৃষ্টিকোণ থেকেই সমস্ত জিনিসের শুরুতে সূচিত হয়েছে আহমদ এবং মুহাম্মদ নাম।

কুরআনের আলোকে তাফসীর

শরীয়ত বুঝার জন্যে তাফসীরের প্রয়োজন হয়। সহীহ এবং সর্বোত্তম তাফসীর হলো তা, যা এক আয়াত অন্য আয়াতের তাফসীর করে। যখন এক আয়াত এক জায়গায় মুজমল বা অর্থ অস্পষ্ট পাওয়া যায়, তখন উহার তাফসীর বা ব্যাখ্যা অন্য জায়গায় অবশ্যই পাওয়া যায়। যেমন صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ আয়াত খানি মুজমল। এ আয়াতের তাফসীর হচ্ছে কুরআন শরীফের নিম্নোক্ত আয়াত اُولٰئِكَ الَّذِيْنَ اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ مِّنَ النَّبِيّٖنَ وَالصِّدِّيْقِيْنَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصّٰلِحِيْنَ

কোন সমাধান কুরআনে পাকে পাওয়া না গেলে, তা হাদীস শরীফে খোঁজ করে দেখতে হবে। পর সর্বোত্তম তাফসীর

হাদীসের আলোকে তাফসীর

হাদীস শরীফই হচ্ছে কুরআনে পাকের ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ। এ প্রসঙ্গে আবূ আবদুল্লাহ মুহাম্মদ বিন ইদ্রিস আল-শাফিয়ী (র.) বলেন-

كل ما حكم به رسول الله صلي الله عليه وسلم فهو مما فهمه من القران ـ

অর্থাৎ রাসূল (সা.) যাই নির্দেশ করেছেন, সবই কুরআনের নির্যাস, যা তিনি কুরআন হতে বুঝেছেন। আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন -

اِنَّا اَنْزَلْنَا اِلَيْكَ الْكِتٰبَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا اَرٰكَ اللّٰهُ وَلَا تَكُنْ لِّلْخَآئِنِيْنَ خَصِيْمًا ـ

"অবশ্যই আমি এ কিতাব আপনার নিকট অবতীর্ণ করেছি, যা দ্বারা বাস্তব ঘটনা

জানা যাবে, যেন আপনি মানুষের মধ্যে তদানুযায়ী মীমাংসা করতে পারেন। যা আল্লাহ তায়ালা অহীর মাধ্যমে আপনাকে অবহিত করেছেন। আপনি বিশ্বাস ঘাতকদের অনুকূলে কথা বলবেন না।" (সূরা ঃ নিসা-১০৫) আল্লাহ তায়ালা আরো বলেন-

وَاَنْزَلْنَا اِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ اِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُوْنَ ـ

"হে মুহাম্মদ (সা.)! আমি আপনার নিকট এ কিতাব বা কুরআন এ জন্যে অবতীর্ণ করেছি যেন মানুষের কল্যাণে উপদেশ প্রদান করতে পারেন, যা কিছু তাদের নিকট নাযিল করা হয় তা নিয়ে তারা যেন চিন্তা-ভাবনা করে।" (সূরা ঃ নাহল-৪৪) আল্লাহ তায়ালা আরো ইরশাদ করেন-

وَمَا اَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتٰبَ اِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوْا فِيْهِ وَهُدًى وَّرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُّؤْمِنُوْنَ ـ

"আমি আপনার প্রতি এ কিতাব শুধু এ উদ্দেশ্যে নাযিল করেছি, যে সব বিষয়ে লোকেরা তর্ক-বিতর্ক করছে এবং যে সব বিষয়ে মতবিরোধ রয়েছে, আপনি যেন তাদেরকে তা প্রকাশ করে দেন; আর তা নাযিল করেছি মু'মিনদের হিদায়ত ও রহমতের উদ্দেশ্যে।" (সূরা ঃ নহল-৬৪) এমনকি রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন-

الا انبي او تيت القران ومثله معه ـ يعني السنة ـ والسنة ايضا تنزل عليه بالوحي كما ينزل القران الا انها لاتتلي كما يتلي القران ـ

অর্থাৎ, জেনে রাখ! আমাকে কুরআন দেয়া হয়েছে এবং অনুরূপ উহার সাথে দেয়া হয়েছে অর্থাৎ সুন্নত (হাদীস)-আর সুন্নতও অহীর মাধ্যমে অবতীর্ণ করা হয়েছে যেভাবে কুরআন নাযিল করা হয়েছে। তবে ইহা (সুন্নাত) তিলাওয়াত করা হয়না, যেমনিভাবে কুরআন তিলাওয়াত করা হয়।

মোট কথা কুরআনের তাফসীর কুরআনের মধ্যেই খোঁজ করুন। যদি কুরআনে পাওয়া না যায়, তখন হাদীসে খোঁজ করুন। কারণ রাসূলুল্লাহ (সা.) হযরত মু'আজ বিন জাবালকে ইয়ামন পাঠানোর সময় ইরশাদ করেছিলেন- মু'আজ! কীভাবে তুমি নির্দেশ দেবে ও ফায়সালা করবে? উত্তরে হযরত মু'আজ (রা.) বলেন- আল্লাহর কিতাব অনুযায়ী। রাসূলুল্লাহ (সা.) আবার বলেন- যদি কুরআনে পাওয়া না যায়? উত্তরে হযরত মু'আজ (রা.) বলেন- সুন্নাত অনুযায়ী। রাসূলুল্লাহ পুনরায় বলেন- যদি সুন্নাতেও পাওয়া না যায়? উত্তরে হযরত মু'আজ (রা.) বলেন- সে ক্ষেত্রে আমি নিজে ইজতিহাদ বা গবেষণা করে রায় দেব। এতে রাসূলুল্লাহ (সা.) সন্তুষ্ট হয়ে হযরত মু'আজ (রা.)-এর বক্ষে হাত রেখে আল্লাহ তায়ালার শুকরিয়া আদায় করে বলেন, সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ তায়ালার জন্যেই, যিনি আল্লাহর রাসূলের রাসূলকে (দূতকে) তাওফীক দিয়েছেন আল্লাহর রাসূলকে সন্তুষ্ট করার। এ হাদীসটি সনদ অনুযায়ী جيد বা উত্তম। এ হাদীসে কোন ত্রুটি নেই।

সাহাবায়ে কিরামের অনুসরণে তাফসীর

সুতরাং কোন আয়াতের তাফসীর কুরআন এবং হাদীসে পাওয়া না গেলে সাহবায়ে কিরাম (রা.) এর বাণী সমূহের প্রতি দৃষ্টি দেয়া হবে; কারণ তাঁরা অত্যন্ত অভিজ্ঞতা সম্পন্ন ছিলেন। অধিকন্তু, তাঁরা আয়াত সমূহের বিশেষ অবস্থা এবং ইঙ্গিত সমূহের প্রত্যক্ষদর্শী। তাঁদের মধ্যে পূর্ণ প্রজ্ঞাও বিদ্যা বিদ্যমান ছিল। তাঁরা সৎকর্মশীল ছিলেন। বিশেষ করে, তাঁদের সময় প্রখ্যাত ও বড় বড় আলিমগণ যেমন- খোলাফায়ে রাশেদীন, হিদায়তপ্রাপ্ত ঈমামগণ এবং হযরত আবদুল্লাহ বিন মাসউদ (রা.) ছিলেন।

Scanned with CamScanner

যিনি নিজের সম্পর্কে বলেন-

হযরত ইবনে জরীর (র.) হযরত মসরুক (র.) হতে বর্ণনা করেন-

والذي لا اله غيره ما نزلت اية من كتاب الله الا وانا اعلم فيمن نزلت واين نزلت الخ-

আবদুল্লাহ অর্থাৎ ইবনে মাসউদ (রা.) বলেন- ঐ সত্তার কসম, যিনি ব্যতীত দ্বিতীয় কোন মা'বুদ নেই, আল্লাহ তায়ালার কিতাবের যে আয়াতই নাযিল হয়েছে, সে সম্পর্কে আমি সবচেয়ে বেশী অবগত- কাকে উদ্দেশ্য করে, কী জন্য এবং কোন জায়গায় তা নাযিল হয়েছে। আমি যদি এমন কোন ব্যক্তির সংবাদ জানি, যিনি আল্লাহ তায়ালার কিতাব সম্পর্কে আমার চেয়ে বেশী জানেন যেখানে সওয়ারী দিয়ে যাওয়া যাবে, তা হলে অবশ্যই আমি সেখানে তা আনতে যাব। হযরত আ'মাশ (রা.) হযরত আবূ ওয়াইল (রা.) হতে আরও বলেন, তিনি হযরত ইবনে মাসউদ (রা.) হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন আমাদের মধ্যে একজন লোক যখন পবিত্র কুরআনের দশটি আয়াত শিখতেন, এগুলোর অর্থ শিখে নেয়া এবং সে অনুযায়ী আমল করার পূর্ব পর্যন্ত নতুন কোন আয়াত শিখতেন না। হযরত আবূ আবদুর রহমান সুলামী (রা.) বলেন, যাঁরা আমাদেরকে পাঠ দান করতেন, তাঁরা বলেন- তাঁরা নবী করীম (সা.) হতে পাঠ গ্রহণ করেছেন এবং তাঁরা এমন ছিলেন- তারা যদি দশটি আয়াতও শিখতেন তা তারা আমলের মাধ্যমে শিখে নিতেন। এভাবে আমরা একই সাথে পাঠ ও আমল শিখে নিতাম।

সাহাবীদের মধ্য হতে হিবরুল বাহার বা বিদ্যার সাগর হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) কে কুরআনের অনুবাদকারী (ترجمان القرآن) মেনে নেয়া হয়েছিল। আর এ অমূল্য খেতাব তিনি পেয়েছিলেন রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর দু'আর বদৌলতে। রাসূলুল্লাহ (সা.) তাঁর জন্য এভাবে দু'আ করেছিলেন- اللهم فقهه في الدين وعلمه التاويل হে আল্লাহ! তাঁকে দ্বীনের যথার্থ বুঝার এবং বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যা করার শিক্ষা দান করুন। এমন কি, হযরত আবদুল্লাহ বিন মাসউদ (রা.) ও হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) কে কুরআনের অনুবাদক হিসেবে গ্রহণ করে নিয়েছিলেন। অথচ হযরত আবদুল্লাহ বিন মাসউদ (রা.) ৩২ হিজরীতে এবং হযরত আবদুল্লাহ বিন আব্বাস (রা.) ৬৮ হিজরী সনে ইন্তিকাল করেন। এজন্যে হযরত আবদুল্লাহ বিন মাসউদ (রা.) ইনতিকাল করার পর বাকী ৩৬ বছর পর্যন্ত যে বিদ্যা অর্জন করা হয়, তা কিয়াস এবং ধারণা বহির্ভূত। কারণ হযরত আ'মশ (রা.) হযরত আবূ ওয়ায়িল (রা.) হতে বর্ণনা করেন-

استخلف علي عبد الله بن عباس علي الموسم فخطب الناس فقرء في خطبته سورة الخ

হযরত আলী (রা.) আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) কে মাওসিম এর খলিফা নিযুক্ত করে পাঠালেন। অতঃপর মানুষকে সম্বোধন করে খুতবা প্রদান করলেন। তিনি খুতবায় সূরা বাকারা পাঠ করলেন। কোন কোন বর্ণনায় সূরা নূরের কথা উল্লেখ রয়েছে। এরপর এ সূরার তফসীর করেন। যদি রোম, তুরস্ক এবং দাইলম এর লোকেরা তা শুনত, তাহলে অবশ্যই তারা মুসলমান হয়ে যেত।

এ কারণেই হযরত ইসমাঈল বিন আবদুর রহমান আল মাহদী আল কবীর (র.) তাঁর তাফসীরে অধিকাংশ রিওয়ায়ত এ দু'জন অর্থাৎ হযরত আবদুল্লাহ বিন মাসউদ (রা.) এবং হযরত আবদুল্লাহ বিন আব্বাস (রা.) হতে বর্ণনা করতেন। কিন্তু কখনো কখনো তাঁদের থেকে আহলে কিতাবের কথাও বর্ণনা করতেন। যেহেতু রাসূলুল্লাহ (সা.) আহলে কিতাব হতে নকল করা মুবাহ রেখেছেন। রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর

ইরশাদ "তোমরা আমার থেকে যা পেয়েছ তা এক আয়াত হলেও অপরজনের নিকট পৌছাও। তোমরা বনী ইসরাঈল হতে হাদীস বর্ণনা কর এবং তাতে কোন দোষ নেই। যে ইচ্ছাকৃতভাবে আমার উপর মিথ্যা বলল, সে নিজের ঠিকানা জাহান্নামে ঠিক করে নিল।" (হযরত ইমাম বুখারী (রা.) হযরত আবদুল্লাহ বিন উমর (রা.) হতে বর্ণনা করেন।) এজন্যে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা.) আহলে কিতাবের কিতাব হতে বর্ণনা করতেন। কারণ তিনি ইয়ারমুকের দিন আহলে কিতাবের দুই ঝুড়ি কিতাব পেয়েছিলেন। উপরোক্ত হাদীস হতে অনুমতি পাওয়ার পর তাদের কিতাব হতে বর্ণনা করতেন।

আহলে কিতাবের অনুসরণ

ইসরাইলী হাদীসসমূহ সাক্ষ্য ও প্রমাণ হিসেবে বর্ণনা করা যায়, তবে ইতিকাদ হিসেবে বর্ণনা করা যায়না। এগুলোকে তিনভাগে বিভক্ত করা হয়েছে-

১. আমাদের দলীল দ্বারা যে বর্ণনা সমূহের সত্যতা প্রকাশ হয়, এ ধরনের হাদীস হলে তা সত্য ও সঠিক।

২. যেগুলো আমাদের দলীল এর বিরোধী এবং আমাদের দলীল দ্বারা উহা মিথ্যা প্রমাণ হয়।

৩. যার উপর আমাদের দলীল নীরব, মিথ্যাও প্রমাণ করে না, সত্যও প্রমাণ করেনা। তবে এক্ষেত্রে উল্লেখিত দলীলের আলোকে উপদেশ গ্রহণ করা মুবাহ অর্থাৎ কোন গুনাহ নেই। তবে, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই কল্যাণ শূন্য। কারণ এ ব্যাপারে আহলে কিতাবের আলিমদের মধ্যে মত বিরোধ রয়েছে। মুফাস্সিরগণ তাদের এ মত বিরোধ উদ্ধৃতি হিসেবে উল্লেখ করেন। যেমন- আসহাবে কাহফের নাম সম্পর্কে, তাদের কুকুরের রঙ সম্পর্কে, তাদের সংখ্যা সম্পর্কে মতানৈক্য রয়েছে। হযরত মূসা (আ.)-এর লাঠি কোন বৃক্ষের ছিল, আল্লাহ তায়ালা হযরত ইব্রাহীম (আ.)-এর জন্যে যে পাখীগুলোকে জীবিত করেছিলেন, সে পাখীগুলোর নাম কী ছিল? গাভীর কিছু অংশ নির্দিষ্ট করণ, যা দ্বারা বনী ইসরাঈলের নিহত ব্যক্তিকে মারা হয়েছিল। যে বৃক্ষ হতে আল্লাহ তায়ালা মূসা (আ.)-এর সাথে কথা বলেছিলেন, উহা কোন বৃক্ষ ছিল? ঐ সমস্ত বিষয়াদি নিয়ে মত বিরোধ রয়েছে, যা আল্লাহ তায়ালা কুরআনে পাকে অস্পষ্ট রেখেছেন। যা নির্দিষ্ট করণে দুনিয়ার কল্যাণও নিহিত নেই, আখিরাতের কল্যাণও নিহিত নেই। কিন্তু এর মধ্যে যে বিরোধ রয়েছে, তা নকল করাটাই জায়িয রাখা হয়েছে।

যেমন আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন-

سَيَقُولُونَ ثَلٰثَةٌ رَّابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ وَّسَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ رَجْمًا بِالْغَيْبِ وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَّثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ ۚ قُلْ رَّبِّيْ اَعْلَمُ بِعِدَّتِهِمْ مَا يَعْلَمُهُمْ اِلَّا قَلِيْلٌ ۗ فَلَا تُمَارِ فِيْهِمْ اِلَّا مِرَآءً ظَاهِرًا وَّلَا تَسْتَفْتِ فِيْهِمْ مِّنْهُمْ اَحَدًا ۔

"খুব শীঘ্রই লোকেরা বলবে, তারা তিনজন ছিল। তাদের মধ্যে চতুর্থ তাদের কুকুর ছিল, আর কতেক লোক বলবে, তারা পাঁচজন ছিল এবং ষষ্ঠ ছিল তাদের কুকুর। এ অদৃশ্য ঘটনা তারা অনুমান করেই বলে। আর কতেক লোক বলে তারা সাত জন ছিল অষ্টম ছিল তাদের কুকুর। আপনি বলে দিন, আমার পরওয়ারদিগার তাদের সংখ্যা সম্পর্কে অবগত। এ সম্পর্কে সামান্য লোকই জানে।আপনি এ ব্যাপারে তাদের সাথে তর্ক করবেন না- আলোচনা ব্যতীত। এ সম্পর্কে তাদের মধ্য হতে কাউকে জিজ্ঞেসও করবেন না।" (সূরা ঃ কাহফ-২২)

Scanned with CamScanner

এ ধরনের আয়াতের মাধ্যমে শিক্ষা দেয়া হয়েছে কী করা এবং কিভাবে আদব ও শিষ্টাচারিতা অবলম্বন করা যায়। আল্লাহ তায়ালা তাদের তিন ধরনের মন্তব্যই উল্লেখ করেছেন এবং প্রথম দু'ধরনের মন্তব্যকে দুর্বল সাব্যস্ত করেছেন এবং তৃতীয় মন্তব্য উল্লেখ করেই শেষ করেছেন। সুতরাং এ সমাপ্তি তৃতীয় মন্তব্য সঠিক হওয়ার প্রতি ইংগিত বহন করে। কারণ এ মন্তব্য সঠিক না হলে অবশ্যই তা প্রত্যাখান করা হত, যেমন প্রথম মন্তব্য দুটি প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে। তারপর এ বলে হিদায়ত করা হয়েছে যে, তাদের সংখ্যা জানার মধ্যে কোন কল্যাণ নিহিত নেই এবং এ ধরনের মাসায়িল জানার মধ্যেও কোন কল্যাণ নিহিত নেই। এ জন্যে বলেছেন-

قُلْ رَّبِّيْ اَعْلَمُ بِعِدَّتِهِمْ مَا يَعْلَمُهُمْ اِلَّا قَلِيْلٌ"

"আপনি বলে দিন- আমার পরওয়ারদিগার তাদের সংখ্যা সম্পর্কে অধিক জ্ঞাত। খুব কম সংখ্যকই তা জানে।" (সূরা ঃ কাহফ-২২)

এ ধরনের মসায়িলের অনুসন্ধানে চিন্তায় বিভোর না হওয়াটাই বাঞ্ছনীয়, কারণ এ সবকিছুর মধ্যে কোন মঙ্গল নিহিত নেই। আল্লাহ তায়ালা বলেছেন- فَلَا تُمَارِ فِيْهِمْ اِلَّا مِرَاءً ظَاهِرًا وَّلَا تَسْتَفْتِ فِيْهِمْ مِّنْهُمْ اَحَدًا অর্থাৎ কোন আলোচনা ব্যতীত আপনি তাদের সাথে তর্ক করবেন না এবং এ সম্পর্কে তাদের মধ্য হতে কাউকে কোন কিছু জিজ্ঞেসও করবেন না। কারণ যেই বলুক না কেন- সে শুধু অদৃশ্যকে অনুমান করেই বলে সুতরাং এটুকু ছাড়া তাদের অন্য কিছু জানা নেই। এ কারণে বিরোধমূলক বর্ণনার ক্ষেত্রে ইহাই সর্বোত্তম পন্থা। যেহেতু সাহাবা (রা.) রাসূলুল্লাহ (সা.) হতে শিখার সময়ে যখন কুরআনে পাকের সঠিক অর্থ উপলব্ধি করা ছাড়া দশ আয়াতের চেয়ে বেশী পড়তেন না (অর্থাৎ তাঁরা রাসূলুল্লাহ (সা.) যা হতে শিখতেন উহার সঠিক ও যথাযথ অর্থ বুঝে নিতেন) সে ক্ষেত্রে কুরআনের যথার্থ অর্থ উপলব্ধিতে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এরপরে সাহাবায়ে কিরাম (রা.)-এর অবস্থান। কারণ তাঁরা রাসূলুল্লাহ (সা.) হতে শিখার সময় যা বুঝা প্রয়োজন তার এক আয়াতও না বুঝে ক্ষান্ত হননি। তাই রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর পরে তাফসীরের মধ্যে সাহাবায়ে কিরামদের উক্তি নির্ভরযোগ্য।

তাবেয়ীগণের অনুসরণে তাফসীর

যখন কোন আয়াতের তাফসীর কুরআন এবং হাদীসেও পাওয়া না যায়, সাহাবায়ে কিরামদের (রা.) থেকেও যদি বর্ণিত না হয়, সেই সময় অধিকাংশ ইমামগণ তাবেয়ীগণের উক্তিসমূহ গ্রহণ করতেন। যেমন- খাইবারের মুজাহিদগণ। তাঁরা ছিলেন তাফসীর জানার একটি নির্দিষ্ট ও চিহ্নিত ক্ষেত্র বিশেষ। যেমন- হযরত মুহাম্মদ বিন ইসহাক (রহ.) আবান বিন সালেহ (রহ.)-এর মাধ্যমে মুজাহিদ (রা.) হতে বর্ণনা করতেন। হযরত মুযাহির বলেন- আমি ইবনে আব্বাস (রা.) হতে কুরআন শরীফ তিনবার সূরা ফাতিহা হতে শেষ পর্যন্ত শুনেছি। আমি প্রত্যেক আয়াত পাঠ করার পর উহার অর্থ জেনে নিতাম। হযরত ইবনে জরীর (র.)ও সনদসহ ইবনে আবী মুলাইকা হতে বর্ণনা করেন। ইবনে আবী মুলাইকা বলেন- আমি মুজাহিদকে দেখলাম, তিনি হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতে কুরআনে পাকের তাফসীর জিজ্ঞেস করতেন এবং তখন তাঁর সাথে ফলক থাকত, হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) তাঁকে বলতেন- লিখে নাও এবং তিনি লিখে নিতেন, এভাবে সম্পূর্ণ কুরআনের তাফসীর লিখেছেন। এ কারণে হযরত সুফিয়ান সওরী বলেন- اذا جائك التفسير عن مجاهد فحسبك به অর্থাৎ মুজাহিদের তাফসীরই তোমার জন্য যথেষ্ট। এভাবে অন্যান্য তাবেয়ীন (র.) যেমন হযরত সাঈদ বিন জুবাইর, হযরত ইকরামা মওলা ইবনে

আব্বাস, হযরত আতা বিন আবূ রাবাহ, হযরত হাসান বসরী, হযরত মসরুক বিন আল আজদা, সাঈদ বিন আল মুসায়্যিব, আবূল আলীয়া, রবী বিন আনাস, কাতাদাহ, হযরত দ্বিহাক বিন মযাহিম, এবং অন্যান্য তাবেয়ীন হতে এবং তাবে-তাবেয়ীন ও তাদের পরবর্তীদের হতে কোন আয়াত সম্পর্কে তাদের বক্তব্য সমূহ উল্লেখ করা হলে দেখা যায়, তাদের প্রকাশ ভঙ্গিতে শাব্দিক পার্থক্য রয়েছে। যার কারণে অজ্ঞ লোকেরা খারাপ ধারণা করে থাকে। প্রকৃত পক্ষে এ রকম নয়। কারণ যাঁরা তাফসীর করেন তাঁরা দু'ভাবে তাফসীর করেন। তাঁদের মধ্যে একদল কোন বিষয় সম্পর্কে লাযিম অথবা 'নজির' অর্থাৎ প্রয়োজনীয়তা বা সাদৃশ্যতার ভিত্তিতে প্রকাশ করেন। তাঁদের মধ্যে আর এক দল মূল বিষয় হতে তাফসীর করেন। অধিকাংশ ক্ষেত্রে উভয় দল থেকে একই অর্থ পাওয়া যায়।

হযরত শো'বা বিন আল- হুজ্জাজ ও অন্যরা বলেন, তাবিয়ীনদের বক্তব্য যেখানে ফরুয়াত এর ক্ষেত্রে দলিল হতে পারে না, সে ক্ষেত্রে তাফসীরের ক্ষেত্রে কীভাবে তা গ্রহণ করা যাবে অর্থাৎ তাবিয়ীর বক্তব্যের বিপক্ষে অন্য কোন বক্তব্য পাওয়া গেলে- তাবিয়ীর বক্তব্য দলীল হিসেবে উল্লেখ করা যায় না। ইহাই সঠিক ও যথার্থ। তবে যদি কোন বিষয়ে সকলেই ঐকমত্য পোষণ করেন, সে ক্ষেত্রে তাদের বক্তব্য দলিল হিসেবে উল্লেখ করা যায়। এ ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই। আর যদি তবেয়ীদের বক্তব্য সমূহে মতানৈক্য হয়, সে ক্ষেত্রে একজনের বক্তব্যের উপর অন্য জনের বক্তব্যকে দলিল হিসেবে সাব্যস্ত করা যাবেনা, এমনকি তাঁদের পরবর্তীদের কথার উপরও। সে সময় প্রত্যাবর্তন করা হবে কুরআনের আভিধানিক ও পরিভাষাগত অর্থের দিকে অথবা সুন্নাতের দিকে, সাধারণ আরবী পরিভাষার দিকে অথবা সাহাবায়ে কিরাম (রা.)-এর বক্তব্যের দিকে, তাতে যেভাবে সমাধান প্রদান করা হয়েছে, তাই গ্রহণ করা হবে।

নিজস্ব মতামতে তাফসীর

কুরআনে পাকের তাফসীর শুধু নিজস্ব মতামতের ভিত্তিতে করা হারাম; কারণ মুহাম্মদ বিন জরীর (র.) সনদসহ হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর মাধ্যমে রাসূলুল্লাহ (সা.) হতে বর্ণনা করেন-

من قال في القران برائه بما لا يعلم فليتبوء مقعده من النار وهكذا اخرجه الترمذي والنسائي من طرق عن سفيان الثوري و به رواه ابو داود ـ

وعن مسدد عن ابي عوانة عن عبد الا علي به مرفوعا و قال الترمذي هذا حديث حسن

অর্থাৎ যে কেউ কুরআনের অর্থ নিজস্ব মতামতের ভিত্তিতে করল বা কুরআনের বিষয় নিয়ে এমন কিছু বলল, যা সম্পর্কে আদৌ জ্ঞান বা ইলম নেই, সে যেন তার ঠিকানা জাহান্নামে তালাশ করে। এভাবে তিরমিযী, নাসায়ী সুফিয়ান সাওরীর মাধ্যমে রিওয়ায়েত করেন। আবূ দাউদ হতে অনুরূপ বর্ণিত। তিরমিযী বলেন- এ হাদীসখানা হাসান।

হযরত ইবনে জরীর (র.) হযরত জুনদুব (র.)-এর মাধ্যমে রাসূলুল্লাহ (সা.) হতে বর্ণনা করেন- যে কেউ কুরআনে পাকের অর্থ নিজস্ব মতামত অনুযায়ী করল, সে যেন গুনাহ করল। এ হাদীসটি আবূ দাউদ, তিরমিযী এবং নাসায়ী বর্ণনা করেন।

তাঁদের বর্ণনায় রয়েছে, যে ব্যক্তি কুরআন পাকের অর্থ নিজস্ব মত ও ধারণা অনুযায়ী করল এবং তা ঠিকও হল, তথাপি তা ত্রুটি এবং দোষ হতে খালি নয়। কারণ সে

Scanned with CamScanner

এমন এক কাজ করল, যার সম্পর্কে তার কোন জ্ঞান বা ইলম নেই। এমন একটি পথ দিয়ে সে চলল, যার সম্পর্কে তাকে নির্দেশ দেয়া হয়নি। যদিও বা তার দেয়া ব্যাখ্যা ও অর্থ সঠিক হল, তবুও সে দোষ করে বসল, কারণ সে কাজটি সঠিক পদ্ধতিতে করেনি, যেমনিভাবে কোন মানুষ না জেনে ফয়সালা প্রদান করল। সে জাহান্নামে যাবে যদি ফয়সালাটি সঠিকও হয়, তবে ভুল ফয়সালার চেয়ে গুনাহ একটু কম হবে- এই যা। আল্লাহই সর্বোত্তম জ্ঞানের অধিকারী।

এমনিভাবে অপবাদ আরোপকারীদেরকে আল্লাহ তায়ালা মিথ্যাবাদী বলেছেন। তিনি বলেন, যদি তারা সাক্ষী প্রদর্শন করতে না পারে, তবে আল্লাহর নিকট তারা মিথ্যাবাদী সুতরাং অপবাদ আরোপকারী মিথ্যাবাদী।

এ জন্যে পূর্ববর্তীদের এক জামাত যে ব্যাপারে যার ইলম বা জ্ঞান নেই, সে ব্যাপারে তাফসীর করাটাকে ত্রুটিমুক্ত নয় বলে উল্লেখ করেছেন। যেমন- হযরত শো'বা (রা.) সনদসহ হযরত আবূ মা'মর (রা.) হতে বর্ণনা করেন- হযরত আবূ বকর (রা.) বলতেন- اي ارض تقلني واي سماء تظلني اذا قلت في كتاب الخ

কোন জমিন আমাকে উদ্ভিদ প্রদান করবে, আর কোন আসমান আমাকে ছায়া প্রদান করবে, যখন আমি না জেনে আল্লাহর কিতাবের বিশ্লেষণ করব?

আরও এক রিওয়ায়তে আছে- হযরত আবূ বকর (রা.) থেকে জানতে চাওয়া হল- فَاكِهَةً وَّاَبًّا এর অর্থ কী? এর উত্তরে তিনি বলেন- কোন আসমান আমাকে ছায়া প্রদান করবে, আর কোন জমিন আমাকে শষ্য দিবে, যদি আল্লাহর বাণী নিয়ে এমন কথা বলি যা আমি জানিনা। আমি আল্লাহ তায়ালার কিতাবের কোন বিষয়ে বলতে চাইনা, যে ব্যাপারে আমার জ্ঞান নেই। ইহা হাদীসে منقطع অর্থাৎ হাদীসের সনদ বর্ণনা করার সময় মধ্যখানে কতেক বর্ণনাকারীর নাম পড়ে গেছে বা উহ্য রয়ে গেছে।

অপর এক বর্ণনায় আছে- হযরত আনাস (রা.) বলেন- হযরত উমর ইবনে খাত্তাব (রা.) মিম্বরে দাঁড়িয়ে পাঠ করলেন- فَاكِهَةً وَّاَبًّا তার পর বলেন- فاكهة তথা শষ্যাদি সম্পর্কে আমরা অবগত আছি কিন্তু "اب" ইহা কী? তারপর নিজেকে উদ্দেশ্য করে বললেন, এটা নিয়ে চিন্তা করা নিজের উপর বোঝা চাপানোর নামান্তর। হযরত আনাস (রা.) হতে আরও একটি রিওয়ায়ত আছে। তিনি বলেন, আমরা হযরত উমর বিন আল খাত্তাব (রা.)-এর সামনে ছিলাম। সে অবস্থায় তাঁর কামিসে বা জামায় চারটি সেলাই ছিল। এ অবস্থায় তিনি পাঠ করলেন- فَاكِهَةً وَّاَبًّا তারপর বলেন "اب" কী? অতঃপর তিনি বলেন- এ সম্পর্কে জানা আবশ্যক নয়, যেহেতু এ সম্পর্কে তোমার জ্ঞান নেই; এ সব কিছু জানার পিছনে দৌড়ানো অনর্থক বোঝা উঠানোর নামান্তর। উল্লেখ্য যে, তাঁরা দু'জনই ا এর স্বরূপ উদঘাটন করতে চেয়েছেন।তা'না হলে اب হচ্ছে যেসমস্ত উদ্ভিদ জমিন হতে উৎপন্ন হয় তাই, যা অতীব স্পষ্ট। কারো অজানা নয়।

হযরত ইবনে জরীর ইবনে আবূ মুলাইকা হতে বর্ণনা করেন। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-কে একটি আয়াত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হল। যদি তোমাদের মধ্যে যে কাউকে এই প্রশ্ন করা হত, অবশ্যই যে- "فيها" শব্দ দ্বারা জবাব দিত। কিন্তু হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) এ সম্পর্কে কিছু বলতে অস্বীকার করলেন। এ হাদীসের সনদ সহীহ।

অপর এক রিওয়ায়তে ইবনে আবূ মুলাইকা হতে বর্ণিত আছে। এক ব্যক্তি হযরত

ইবনে আব্বাস (রা.) এর কাছে كَانَ مِقْدَارُهٗ اَلْفَ سَنَةٍ আয়াতে উল্লেখিত দিন সম্পর্কে প্রশ্ন করলেন। ইবনে আব্বাস (রা.) উল্টো প্রশ্ন করলেন- কোন দিনের মেয়াদ পঞ্চাশ হাজার বৎসর হবে? তখন ঐ লোক বললেন, আপনাকে প্রশ্ন করলাম, আপনি বলার জন্যে। এর উরে হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন "এদিন যার কথা আল্লাহ তায়ালা কুরআনে পাকে উল্লেখ করেছেন, আল্লাহ তায়ালাই দিনের বাস্তব অবস্থা সম্পর্কে জানেন। এতে বুঝা যায়, তিনি আল্লাহ তায়ালার কিতাবের অর্থাৎ কুরআনের যে সম্পর্কে জানেন না, সে সম্পর্কে কিছু বলা অপছন্দ করেন।

হযরত ইবনে জরীর মাহদী বিন মাইমুনের মাধ্যমে হযরত ওলীদ ইবনে মুসলিম হতে বর্ণনা করেন- হযরত তলক বিন হাবীব হযরত জুনদুব বিন আবদুল্লাহর কাছে আসলেন এবং তাঁর কাছে কুরআনে পাকের একটি আয়াত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন- হযরত জুনদুব (রহ.) রাগান্বিত হয়ে বললেন- তুমি এক্ষুনি বের হয়ে যাও, যদি তুমি মুসলমান হয়ে থাক, অথবা তিনি বলেন- তুমি কী আমার সাথে বসতে চাও? হযরত জুনদুব (রহ.) রাগের মাধ্যমে বুঝাতে চেয়েছেন- কুরআন শরীফের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান না থাকলে তা থেকে বিরত থাকাই শ্রেয়।

হযরত ইয়াহাইয়া বিন সাইদ, সাঈদ বিন মুসায়্যিবের স্বভাব বর্ণনা করেন যে, যখনই তাঁর কাছে কেউ কুরআনে পাকের তাফসীর জিজ্ঞেস করত, তিনি স্বভাবগতভাবে জওয়াব দিতেন- انا لانقول في القران شيئا অর্থাৎ আমার কুরআনে পাকের কোন বিষয়ে ব্যাখ্যা দেইনা।

হযরত লাইস হযরত ইহাইয়া বিন সাঈদের (র.) এর মাধ্যমে হযরত সাঈদ বিন আল-মুসায়্যিব থেকে উল্লেখ করেন- তিনি কুরআনে পাকের যে বিষয়ে জানেন তা বলতেন, যে বিষয়ে জানেন না তা বলতেন না। হযরত শো'বা আমর বিন উরওয়া হতে বর্ণনা করেন- এক ব্যক্তি কুরআনের একটি আয়াত সম্পর্কে হযরত সাঈদ বিন আল- মুসায়্যিবকে প্রশ্ন করেন। তিনি উত্তর দিলেন, কুরআন সম্পর্কে আমাকে জিজ্ঞেস করবেন না। বরং ঐ সব ব্যক্তিকে জিজ্ঞেস কর, যারা মনে করেন কুরআনে পাকের কোন বিষয় তাদের অজানা নেই। হযরত ইকরামা হযরত ইয়াযিদ বিন আবু ইয়াযিদ বলেন- আমরা হযরত সাঈদ বিন আল-মুসায়্যিব কে হারাম-হালাল সম্পর্কে জিজ্ঞেস করতাম। তিনি অন্যান্য লোকদের চেয়ে বেশী জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন। যখনই আমরা তাঁর কাছে কুরআনের তফসীর জিজ্ঞেস করতাম- তিনি চুপ থাকতেন, যেন শুনতে পাননি। কোন জওয়াব দিতেন না।

হযরত ইবনে জরীর আবদুল্লাহ বিন উমর (রা.) হতে সনদসহ উল্লেখ করেন, তিনি বলেন- আমি মদীনার ফকীহদের সাহচর্য পেয়েছিলাম। তাঁরা তাফসীর সম্পর্কে কথা-বার্তা বলাকে খুব বড় বিষয় মনে করতেন। ঐ ফকীহগণের মধ্যে হযরত সালিম বিন আবদুল্লাহ, হযরত কাসিম বিন মুহাম্মদ, হযরত সাঈদ বিন আল-মুসায়্যিব এবং হযরত নাফে' (র.) ছিলেন। হযরত হিশাম বিন উরওয়াহ বলেন- আমি কখনো আমার আব্বাকে কুরআনে পাকের কোন আয়াতের ব্যাখ্যা বা অর্থ করতে শুনি নাই। হযরত আইয়ূব, ইবনে আওয়ান, হিশাম আল দিসতিওয়ায়ী হযরত মুহাম্মদ বিন সীরীন হতে বর্ণনা করেন- হযরত মুহাম্মদ বিন সীরীন বলেন- আমি হযরত উবাইদা আল সুলমানীকে কুরআন শরীফের একটি আয়াত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি আমাকে বলেন- কুরআনের বিধি-নিষেধ অনুযায়ী যারা আমল করতেন তাঁরা (এ পৃথিবী হতে) চলে গেছেন। তুমি আল্লাহ তায়ালাকে ভয় কর এবং তোমার উচিত এ

Scanned with CamScanner

কাজ হতে বিরত থাকা।

হযরত আবদুল্লাহ বিন মুসলিম ইয়াসার তাঁর পিতা হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলতেন- যখনই আল্লাহ তায়ালা সম্পর্কে কোন কথা বলা হয় বা আলোচনা করা হয়, তখন অপেক্ষা কর এবং পূর্ববর্তী এবং পরবর্তীরা কী বলেছেন তা দেখ। হযরত মুগীরা বিন ইবরাহীম বর্ণনা করেন, তিনি বলেন- আমার বন্ধু-বান্ধবরা তফসীর করা থেকে বিরত থাকতেন এবং ইতস্তত করতেন। হযরত শাবী (রা.) বলেন- খোদার কসম! কুরআনের এমন কোন আয়াত নেই, যার সম্পর্কে আমি জিজ্ঞেস করিনি। হযরত আবূ সাঈদ বলেন- আমাকে হাশিম হাদীস বর্ণনা করেন। তাকে উমর বিন আবূ যায়েদা হাদীস বর্ণনা করেন। তিনি হযরত শাবী হতে রিওয়ায়ত করেন। তিনি হযরত মসরুক হতে রিওয়ায়ত করেন। তিনি বলেন- তোমরা তাফসীর করার সময় সতর্কতা অবলম্বন কর, যেহেতু উহা আল্লাহ তায়ালার বাণী।

সুতরাং এ সমস্ত সহীহ হাদীসসমূহ এবং ইমামদের বাণীসমূহ না জেনে, না শিখে কুরআন পাকের তাফসীর করা থেকে বিরত থাকার জন্যে উৎসাহিত করে। তবে হ্যাঁ, যিনি আরবী পরিভাষা ও শরীয়ত সম্পর্কে জেনে তাফসীর করেন তাঁর জন্য নিষেধ নয়।

এ নির্দেশ পালন করা প্রত্যেকের উপর ওয়াজিব। অজ্ঞ তার কারণে যেমন চুপ থাকা ওয়াজিব, অনুরূপ কোন জানা জিনিষ সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হলে তা বলে দেয়াও ওয়াজিব। এ ব্যাপারে আল্লাহ তায়ালা বলেন- لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ

অর্থ- অবশ্যই আপনি এ (কুরআন) সম্পর্কে মানব সমাজকে বলে দেবেন এবং ইহা আপনি গোপন করবেন না।

তাছাড়া নিম্নের হাদীসখানা বিভিন্ন সনদে বর্ণিত আছে-

من سئل عن علم فكتمه الجم يوم القيامة بلجام من النار۔

অর্থাৎ যে ব্যক্তি কোন ইলমের (জ্ঞানের) ব্যাপারে জিজ্ঞাসিত হল অতঃপর তার জানা থাকা সত্ত্বেও সে তা গোপন করল তাকে- কিয়ামতের দিন আগুনের লাগাম লাগিয়ে জাহান্নামে নিয়ে যাওয়া হবে। হযরত ইমাম জা'ফর সাদিক (রা.) এ সম্পর্কে যা বলেছেন তার মর্মকথা হচ্ছে, কুরআন পাকের সঠিক অর্থ ও ব্যাখ্যা অনুধাবন করা আল্লাহ তায়ালার তওফীক ছাড়া শুধু জিবরাঈল (আ.)-এর সাহায্যে সম্ভব নয়; কারণ কুরআনের ইলম ততটুকুই অর্জন করা সম্ভব যতটুকু পর্যন্ত আল্লাহ তায়ালা তাওফীক দান করেন।

তাফসীরের প্রকাভেদ

হযরত ইবনে জরীর হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণনা করেন- তিনি বলেন তাফসীর চার প্রকার।

১. এক প্রকার, যা আরব লোক তাদের পরিভাষার মাধ্যমে বুঝতে পারেন।

২. দ্বিতীয় প্রকার হচ্ছে, যা না শিখলে তাকে অপারগতা বলে সাব্যস্ত করা যাবেনা। যেমন- হালাল-হারামের মাসায়েল সমূহ। (কারণ এসব জানা প্রত্যেকের জন্য ফরজ এবং না জেনে থাকলে তা জানার জন্য চেষ্টা অব্যাহত রাখতে হবে)।

৩. আর এক ধরনের তাফসীর, যা আলিমগণ জানেন।

৪. আর এক ধরনের তাফসীর, যা আল্লাহ তায়ালা ছাড়া অন্য কেউ জানেন না।

আরো একটি হাদীস হযরত ইবনে জরীর হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণনা

করেন। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন-

انزل القران علي اربعة احرف حلال وحرام الاخ ۔

অর্থ হচ্ছে- আল্লাহ তায়ালা কুরআনে পাক চারটি হারফের উপর অবতীর্ণ করেছেন। তা হল-

১. হালাল এবং হারাম ঃ এ বিষয়ে কারো অজ্ঞতাকে অপারগতা হিসেবে গ্রহণ করা হবেনা।

২. এক তফসীর হচ্ছে আরবদের তাফসীর।

৩. আর এক তফসীর হচ্ছে আলিমদের তাফসীর।

৪. মুতাশাবিহ- যা আল্লাহ তায়ালা ছাড়া অন্য কেউ জানেনা। যদি কেউ এ কথা দাবী করে, আল্লাহ তায়ালা ছাড়া সেও জানে- তা হলে সে মিথ্যুক।

হযরত ইবনে জরীর হযরত আয়শা (রা.) হতে আরো বর্ণনা করেন-

قالت كان النبي صلي الله عليه وسلم يفسر شيأ من القران الايات بعدد علمهن اياه جبريل عليه السلام

অর্থ- তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) কুরআনের আয়াত তাফসীর করতেন এতটুকু, যতটুকু আয়াত সম্পর্কে হযরত জিবরাঈল (আ.) তাঁকে শিখিয়েছেন।

আহলে কুরআন এবং তিলাওয়াতের ফযীলত

হযরত সাঈদ (রা.) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন- বেহেশতে প্রবেশের পর যারা (পৃথিবীতে) কুরআন পড়ত, তাদেরকে বলা হবে- কুরআন পাঠ কর এবং কুরআন পাঠ করতে করতে উপরের দিকে উঠতে থাক। তারা প্রত্যেক আয়াতের বিনিময়ে এক একটি সিড়ি অতিক্রম করতে থাকবে। এভাবে কুরআন পাঠ শেষ হওয়া পর্যন্ত চলতে থাকবে।

আহমদ আবূ সাঈদ আল খুদরী (রা.)-এর সূত্রে বর্ণনা করেন যে, তিনি রাসূলুল্লাহ (সা.)-কে বলতে শুনেছেন, কিছু দিন পর এমন এক জামাত আসবে, যারা নামায নষ্ট করে ফেলবে, নিজ কুপ্রবৃত্তির অনুসরণ করবে, তারা ধ্বংসে পতিত হবে। অতঃপর এক জামাত আসবে যারা কুরআন পাঠ করবে, কিন্তু তাদের ভিতর তা পৌছবে না। তিন ধরনের লোকেরা কুরআন পাঠ করবে। মুমিন, মুনাফিক এবং ফাজির। বশীর বলেন আমি ওয়ালীদাকে জিজ্ঞেস করলাম, এই তিন দলের অবস্থা কি? তিনি বলেন মুনাফিক তিলাওয়াত করবে কিন্তু এর প্রতি সে অবিশ্বাসী হবে, আর ফাজিকে বা পাপাচারী এর প্রতি আমল করবে না এবং মুমিন এবং প্রতি পূর্ণ বিশ্বাসী হবে।

অপর এক রিওয়ায়তে হযরত আবূ সাঈদ (রা.) বলেন- রাসূলুল্লাহ (সা.) তাবুকের দিন একটি খুরমা বৃক্ষে হেলান দিয়ে খোৎবা দিলেন এবং সে খোৎবায় বলেন- আমি কী তোমাদেরকে ভাল লোক এবং খারাপ লোক সম্পর্কে অবহিত করবনা? মানুষের মধ্যে সবচেয়ে ভাল মানুষ ঐ ব্যক্তি, যে মৃত্যু মুখে পতিত হওয়ার আগ পর্যন্ত আল্লাহ প্রদত্ত নীতিমালা অনুযায়ী আমল করতে থাকে। সে ঘোড়ার পিঠে হোক, উটের পিঠে হোক বা পায়ে হেটে হোক। এবং মানুষের মধ্যে সবচেয়ে খারাপ ঐ ব্যক্তি, যে ফাজির। সে কুরআন পাঠ করে কিন্তু শরীয়তের ধার ধারেনা।

হযরত হাফিজ আবূ বকর আল বাযাজ আবূ সাঈদ (রা.) হতে বর্ণনা করেন- রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেন-

يقول الله تعالي من شغله قرأة القران عن دعائي اعطيته افضل ثواب الشاكرين وقال رسول

Scanned with CamScanner

الله ﷺ ان فضل كلام الله تعالي علي سائر الكلام كفضل الله على سائر خلقه ـ

অর্থ- আল্লাহ তায়ালা বলেন- যে ব্যক্তিকে কুরআন পাঠের কাজ আমার কাছে দু'আ করা থেকে বিরত রাখবে আমি তাকে শুকরিয়া জ্ঞাপনকারী (شـــاكـــريـــن) এর প্রতিদানের চেয়ে উত্তম প্রতিদান দেই, তাকে সর্বোত্তম সওয়াবে পুরস্কৃত করা হবে। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন- সমস্ত কথার মধ্যে আল্লাহ তায়ালার কথা তথা কুরআন এমন মর্যাদাপূর্ণ যেমন সমস্ত সৃষ্টির উপর আল্লাহ তায়ালার শ্রেষ্ঠত্ব। আনাস বিন মালিক (রা.) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন- মানুষের মধ্যে আল্লাহর পরিবারভুক্ত লোক রয়েছে। প্রশ্ন করা হল এরা কারা? রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন- আহলে কুরআন। তাঁরাই আল্লাহর আহাল এবং খাস বান্দাহ।

হযরত আনাস বিন মালিক (রা.) যখন কুরআন তিলাওয়াত শেষ করতেন, তখন সন্তান-সন্ততি একত্রিত করে আল্লাহ তায়ালার দরবারে দু'আ করতেন। হাফিজ আবুল কাসিম তাবরানী হযরত আনাস (রা.) হতে বর্ণনা করেন- রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন-

القران غني لا فقر بعده ولا غني دونه ـ

অর্থ- কুরআনই সম্পদ, যে কুরআন ধরে আছে, সে ফকীর নয় এবং কুরআন ছাড়া কেউ ধনী নয়।

হযরত আবূ বকর বাযযার হযরত আনাস (রা.) হতে বর্ণনা করেন- রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন- لكل شي حلية وحلية القران الصوت الحسن ـ

অর্থঃ প্রত্যেক জিনিষের অলংকার আছে, আর কুরআনের অলংকার হল শ্রুতিমধুর আওয়াজ। অর্থাৎ বিশুদ্ধভাবে ও শ্রুতিমধুর কণ্ঠে কুরআন পাঠ করা উচিত।

ইমাম আহমদ (র.) হযরত আনাস বিন মালিক (রা.) হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন- আমরা আরবী, আজমী, কালো ও শ্বেত বর্ণের একদল লোক বসা ছিলেন। হঠাৎ রাসূলুল্লাহ (সা.) আমাদের এখানে তশরীফ আনলেন এবং বললেন-

انتم في خير تقرءون كتاب الله وفيكم رسول الله الخ ـ

অর্থ- তোমরা এমন এক ভাল ক্ষণে আছ- আল্লাহ তায়ালার কুরআন পাঠ করছ এবং তোমাদের মাঝে আল্লাহর রাসূল (সা.) বিদ্যমান ও বিরাজমান। কিন্তু মানুষের মাঝে এমন এক সময় আসবে- তারা তাদের বিনিময় খুব তাড়াতাড়ি চাইবে, বিলম্ব করবেনা।

হযরত আনাস (রা.) বলেন- রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন- যে ঘরে বেশী বেশী কুরআন পাঠ হয়, সে ঘরে বেশী কল্যাণ হয়। পক্ষান্তরে যে ঘরে কুরআন পাঠ করা হয় না, সে ঘরের বরকত কমে যায়। হযরত হাফিয আবূ ইয়ালা হযরত আনাস (রা.) হতে বর্ণনা করেন। হযরত আবূ মূসা (রা.) একটি ঘরে বসা ছিলেন, তখন তাঁর কাছে অনেক লোকের সমাবেশ হল। আবূ মূসা কুরআন পাঠ আরম্ভ করলেন, তখন এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর দরবারে উপস্থিত হয়ে আরয করলেন- ইয়া রাসূলুল্লাহ! (সা.) আপনার এ কথা পছন্দ হবে কী যে হযরত আবূ মূসা (রা.) একটি ঘরে বসে আছেন এবং তাঁর কাছে অনেক লোকের সমাবেশ হল এবং আবূ মূসা কুরআন পাঠ করে শুনাচ্ছেন। রাসূলুল্লাহ (রা.) বললেন তুমি কী আমাকে এমন জায়গায় বসাতে পার যেখানে তাদের মধ্য হতে কেউ আমাকে দেখবেনা? তিনি উত্তরে বলেন- হ্যাঁ। তারপর রাসূলুল্লাহ (সা.) বের হলেন- তখন ঐ ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (সা.) কে এমন এক জায়গায় বসালেন যেখানে কেউ তাঁকে দেখতে না পারে। রাসূলুল্লাহ (সা.) আবূ মূসা (রা.)-এর কিরাত শ্রবণ করলেন, তারপর ফরমালেন-

انه ليقرأ علي مزمار من مزامير داود عليه السلام ـ

অর্থঃ আবূ মূসা (আ.) এমন সুরে কুরআন পাঠ করছেন, যেন দাউদ (আ.)-এর বাঁশি (এ হাদীস গরীব)।

হযরত ইমাম আহমদ (র.) হযরত জাবির বিন আবদুল্লাহ (রা.) হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন- রাসূলুল্লাহ (সা.) আমাদের উদ্দেশ্যে খুতবা দিলেন। তিনি আল্লাহ তায়ালার প্রশংসা করার পর বলেন- فان اصدق الحديث كتاب الله وان افضل الهدي هدي محمد ﷺ وشر الامور محدثاتها وكل بدعة ضلالة (الحديث) অর্থাৎ সবচেয়ে সত্য কথা হচ্ছে আল্লাহ তায়ালার কিতাব এবং সবচেয়ে উত্তম পথ নির্দেশিকা হচ্ছে হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর পথ নির্দেশনা এবং সবচেয়ে নিকৃষ্ট কাজ হচ্ছে দ্বীনের ব্যাপারে নতুন নতুন জিনিসের উদ্ভাবন এবং প্রত্যেক বিদআত গোমরাহী (আল-হাদীস)

হযরত জাবির বিন আব্দুল্লাহ বলেন- রাসূলুল্লাহ (সা.) মসজিদে প্রবেশ করলেন। তখন লোকেরা কুরআন পাক পাঠ করছিলেন। রাসূলুল্লাহ (সা.) বললেন- পাঠ কর এবং কুরআনের মাধ্যমে আল্লাহ তাআলাকে তালাশ কর।

অন্য এক হাদীসে হযরত জাবির বিন আবদুল্লাহ (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন- আমরা আরবী এবং আজমী (আরব দেশের বাইরের লোককে আজমী বলা হয়) এক জায়গায় বসে কুরআন পাঠ করছিলাম। তখন রাসূলুল্লাহ (সা.) আমাদের কাছে তশরীফ আনলেন এবং কুরআন পাঠ শুনে বললেন-

اقراء فكل حسن وسيأتي قوم يقيمونه كما يقام القدح يتعلجونه ولا يتأجلونه ـ

অর্থঃ কুরআন পাঠ কর পূর্ণ শুদ্ধভাবে এবং সুললিত কণ্ঠে। এমন এক সম্প্রদায় অতিসত্বর আসবে, যারা কুরআন পাঠ করবে এবং বিনিময় চাইবে। যেমনিভাবে কোন পাত্রের দাম চাওয়া হয়। তা তারা নগদ চাইবে, বাকী রাখবেনা।

হযরত আবদুল্লাহ বিন মাসউদ (রা.) বলেন-.

ان هذا القران شافع ومشفع من اتبعه قاده الي الجنة ومن تركه او اعرض عنه او كلمة نحوها رح في قفاه الي النار ـ

অর্থাৎ অবশ্যই এ কুরআন সুপারিশকারী এবং সুপারিশ করার জন্য অনুমোদন প্রাপ্ত। যে এ কুরআন পাকের আনুগত্য করবে, কুরআন তাকে জান্নাতের দিকে পরিচালিত করবে।যে কুরআন ত্যাগ করবে বা কুরআন হতে মুখ ফিরিয়ে থাকবে, তাকে জাহান্নামের দিকে নিয়ে যাওয়া হবে।

হযরত জাবির (রা.) বিন আবদুল্লাহ হতে বর্ণিত- রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন- যে ব্যক্তি এক হাজার আয়াত পাঠ করবে, তাকে আল্লাহ তায়ালা এক কিনতার মালের অধিকারী করবেন। আর কিনতার হল এক শত রতল (প্রায় ৪০ তোলা) আর رطل হল বার আওকীয়া। আওকীয়া হল ছয় দিনার-এর সমান। এক দিনার সমান চব্বিশ কিরাত এবং এক কিরাত উহুদ পাহাড়ের মত। যে ব্যক্তি কুরআনের তিনশত আয়াত পাঠ করবে, আল্লাহ তায়ালা তাঁর সম্পর্কে ফিরেশতাদেরকে বলেন- আমার বান্দাহকে দেখ। আমি তোমাদেরকে সাক্ষী করছি। হে আমার ফেরেশতাগণ! আমি আমার এ বান্দাহর গুনাহ মাফ করে দিয়েছি। যে উহার ফযীলত সম্পর্কে অবগত হবে এবং ইহার প্রতি বিশ্বাস করতঃ এবং আল্লাহ তায়ালার পক্ষ হতে সওয়াবের আশা নিয়ে তদনুযায়ী আমল করবে আল্লাহ তায়ালা তাঁকে এ সমুদয় কাঙ্খিত বস্তু দান করেন।

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত- তিনি বলেন- রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন- যার

Scanned with CamScanner

মুখে কুরআন পাকের কিছুই নেই, সে যেন ধ্বংসপ্রাপ্ত একটি গৃহের ন্যায়।
হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন- রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন- যে ব্যক্তি আল্লাহ তায়ালার কিতাবের অনুসরণ করে, তাকে আল্লাহ তায়ালা গোমরাহী হতে রক্ষা করে হিদায়ত করেন। কিয়ামতের দিন মন্দ হিসাব নিকাশ হতে রক্ষা করেন। এজন্যে আল্লাহ তায়ালা বলেন- যে আমার হিদায়ত অনুসরণ করে সে গোমরাহও হয়না এবং দুর্ভাগাও হবেনা। তিবরানী হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণনা করেন- রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন, সর্বোত্তম পাঠক ব্যক্তি সেই, যে কুরআন পাঠ করে এবং তদানুযায়ী আমল করে। একই সনদ হতে আরও একটি রিওয়ায়ত আছে- রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন- احسنو الاصوات بالقران ـ অর্থাৎ তোমরা কুরআন শ্রুতিমধুর ও বিশুদ্ধভাবে পাঠ কর।

কুরআন পাকের ফযীলত

হযরত ইমাম বুখারী (র.) (অহী কিভাবে নাযিল হয়েছে এবং সর্ব প্রথম যা অবতীর্ণ হয়েছে সে অধ্যায়ে) বলেন- হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন- المهيمن শব্দের অর্থ الامين পূর্ববর্তী সমস্ত আসমানী কিতাবের তত্ত্বাবধায়ক হল কুরআন পাক। مهيمن শব্দের তফসীর ইমাম বুখারী (র.) হযরত ইবনে আব্বাসের (রা.) বক্তব্য অনুযায়ী 'তত্ত্বাবধায়ক' করেছেন। যেমন সূরা মায়িদার আয়াত-

وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ ـ

"আমি তোমার নিকট সত্যসহ কুরআন নাযিল করেছি, যা আগের সমস্ত কিতাবসমূহকে সত্যায়িত করে এবং তত্ত্বাবধান করে।" (সূরা ঃ মায়িদা-৪৮)

হযরত আবূ জাফর, ইবনে জরীর (র.) হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতে مهيمن (মুহাইমীন)-এর অর্থ امين উল্লেখ করেন এবং অন্য বর্ণনায় شهيدا عليه অর্থ সাক্ষী এবং অন্য বর্ণনায় مؤتمنا অর্থাৎ হিফাযতকারী উল্লেখ করেন। এভাবে হযরত মুজাহিদ, সুদ্দী, কাতাদাহ, ইবনে জুরাইজ, হাসান বসরী (র.) এবং সমস্ত পূর্বের ইমামগণ বলেন- المهيمنة واصل المهيمنة الحفظ والارتقاب অর্থাৎ শব্দের প্রকৃত অর্থ হচ্ছে রক্ষা করা এবং নিয়ন্ত্রণ করা। যেভাবে পরিভাষায় বলা যায়। যখন কেউ কোন বস্তুকে নিয়ন্ত্রন করে বা সংরক্ষণ করে তখন বলা হয়, هيمنه ও هو عليه مهيمن আল্লাহ তায়ালার নাম সমূহের মধ্যে একটি মুহাইমিন, কেননা তিনি প্রত্যেক জিনিষের উপর সাক্ষী ও সবকিছু নিয়ন্ত্রণকারী এবং রক্ষাকারী।

হযরত ইমাম বুখারী (র.) হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণনা করেন-

قال انزل القران جملة واحدة الى سماء الدنيا في ليلة القدر ثم نزل بعد ذالك في عشرين سنة ثم قرأ وَقُرْاٰنًا فَرَقْنٰهُ لِتَقْرَاَهٗ عَلَى النَّاسِ عَلٰى مُكْثٍ وَّنَزَّلْنٰهُ تَنْزِيْلًا ـ

অর্থাৎ তিনি বলেন- পূর্ণ কুরআনকে একসাথে পৃথিবীর আসমানে অবতীর্ণ করা হয়। তা ছিল কদরের রাত। তারপর বিশ বৎসর সময়ে প্রয়োজন অনুসারে নাযিল করা হয়। তারপর তিনি এ আয়াতটি পাঠ করেন, "আমি কুরআনকে পৃথককারী বানিয়েছি। যেন প্রয়োজন অনুসারে আপনি মানুষের কাছে পাঠ করতে পারেন এবং ইহা যেভাবে অবতীর্ণ করা প্রয়োজন সেভাবে অবতীর্ণ করেছি।" (সূরা ঃ বনী ইসরাঈল-১০৬) আলোচ্য হাদীসের সনদ সহীহ।

ইবনে আব্বাস (রা.) কর্তৃক ২০ বছর বলার কারণ

এ ব্যাপারে কোন মতবিরোধ নেই যে, রাসূলুল্লাহ (সা.) মদীনায় দশ বৎসর অবস্থান

করেন। কিন্তু নবুয়ত প্রকাশিত হওয়ার পর তের বৎসর পর্যন্ত মক্কা শরীফ ছিলেন। কারণ তাঁর চল্লিশ বৎসর বয়সে তিনি নবুয়ত প্রাপ্ত হন। সহীহ রিওয়ায়াত হতে প্রকাশ আছে যে, তিনি ৬৩ বৎসর বয়সে ইহধাম ত্যাগ করেন। এতে বুঝা যায় কুরআন শরীফ ২৩ বৎসরে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর অবতীর্ণ হয়েছে। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) ২০ বছর বলার ব্যাখ্যা হচ্ছে- তিনি ২০ বৎসরের বেশী সময়কে উল্লেখ করেননি। আরবরা সাধারণতঃ এরকম করে থাকেন। অথবা হযরত জিবরাইল (আ.)-অহীর সাথে সম্পৃক্ত হওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে তা বলা হয়েছে। যেহেতু এ ব্যাপারে বর্ণনা রয়েছে যে, অহী নাযিল হওয়ার শুরুতে হযরত মিকাঈল (আ.) ৩ বছর কুরআন পাকের শব্দাবলী ও ঘটনাবলী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর অন্তরে পরিবেশন ও উদয় করতেন। অতঃপর হযরত জিবরাঈল (আ.) সম্পৃক্ত হলেন।

মক্কী মাদানীর পরিচয়

হাদীস শরীফে আছে, কুরআন শরীফের কিছু অংশ মক্কা শরীফে অবতীর্ণ হয় এবং কিছু অংশ মদীনা মুনাওয়ারায় অবতীর্ণ হয়। মক্কী ঐ সকল আয়াত, যা হিজরতের আগে মক্কা শরীফে অবতীর্ণ হয় এবং মাদানী ঐ সব আয়াত, যা হিজরতের পরে নাযিল হয়। মদীনার মধ্যে হউক বা মদীনা ব্যতীত অন্য জায়গায় হউক- যে শহরেই হউক না কেন যেমন- মক্কা, আরাফাত এবং এ ছাড়া অন্য জায়গায়। কিন্তু তার মধ্যেও কিছু সূরা মক্কী হওয়ার উপর আলিমদের ঐকমত্য রয়েছে। আর কিছু সূরা মক্কী বা মদনী হওয়ার ব্যাপারে আলিমদের মতানৈক্য রয়েছে। কেউ কেউ এ বিরোধকে একটি নিয়মের ভিতর সীমিত করতে চেয়েছেন। আবার কেউ কেউ বলেন- সূরা বাকারা এবং আল ইমরান ছাড়া যে সমস্ত সূরার শুরুতে حروف مقطعات (ছিন্ন ছিন্ন বর্ণ) রয়েছে এ ধরনের সমুদয় সূরা মক্কী। এবং যে সমস্ত সূরার মধ্যে يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا রয়েছে এ সব সূরা মাদানী এবং যে সমস্ত সূরায় يَا أَيُّهَا النَّاسُ রয়েছে, এ ধরনের সূরা মক্কী এবং মাদানী হওয়ার ব্যাপারে সন্দেহ রয়েছে। কিন্তু এর মধ্যে অধিকাংশ মক্কী সূরা। কখনো কখনো মাদানীও হয়। যেমন সূরা বাকারার আয়াত-

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوْا رَبَّكُمُ الَّذِيْ خَلَقَكُمْ وَالَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ ـ
يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوْا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَّلَا تَتَّبِعُوْا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهٗ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ ـ

এখানে يَا أَيُّهَا النَّاس আছে তবুও এ সূরা মাদানী। হযরত মায়মুন বিন মেহরান বলেন- কুরআনের যতগুলো আয়াতে يَا أَيُّهَا النَّاس এবং يَا بَنِيْ اٰدَم আছে এ ধরনের সব আয়াত মক্কী। যে সমস্ত আয়াতে يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا আছে এগুলো হল মাদানী। কিছু সংখ্যক আলিম কিছু কিছু সূরা দু'বার নাযিল হয়েছে, এ রকম বলেন। একবার মক্কায় নাযিল হয়েছে, আরেকবার মদীনায় নাযিল হয়। কেউ কেউ মক্কী সূরাসমূহ হতে মাদানী আয়াতগুলো পৃথক করেন। যেমন- সূরা হজ্জ এবং অন্যান্য সূরার মধ্যে। এ সব ব্যাপারে যথার্থ নিষ্পত্তি হচ্ছে যা সঠিক ও তত্ত্বগত দলীল দ্বারা প্রকাশ ও প্রমাণ হয়।

হযরত আলী বিন আবূ তালহা (রা.) বলেন- সূরা বাকারা, আল ইমরান, আন নিসা, আল মায়িদা, আল আনফাল, আত তাওবা, আল হজ্জ, আন নূর, আল আহযাব, মুহাম্মদ, আল ফাতহ, আল হাদীদ, আল মুজাদালাহ, আল হাশর, আলমুমতাহানা, আসসফ, আততাগাবুন, আত্তালাক, আত্তাহরীম, আল-ফাজর, আল-লাইল,

Scanned with CamScanner

আল-কদর, আল-বায়্যিনাহ, আয্যিলাল, আন্নসর।
মদীনা মুনাওয়ারায় নাযিল হয় এবং অন্যান্য সব মক্কা শরীফে নাযিল হয়। এ হাদীসের সনদ সহীহ। কারণ হযরত ইবনে আবূ তালহার রিওয়ায়ত প্রসিদ্ধ ও সর্বজন বিদিত। তিনি হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণনাকারী ব্যক্তিবর্গের মধ্য হতে একজন।
মাদানী সূরা সমূহের মধ্যে এমন সূরাও রয়েছে যে সমস্ত সূরা মাদানী হওয়ার ব্যাপারে বিতর্ক রয়েছে।
আল্লাহ তায়ালা এবং হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর মধ্যে দূত হলেন হযরত জিবরাঈল (আ.)। তাঁর পরিচয় হল- তিনি সম্মানিত ও মর্যাদাবান দয়াবান ফিরিশতা। যেভাবে আল্লাহ তায়ালা বলেন- হে মুহাম্মদ! জিব্রাঈল (আ.) কুরআন আপনার অন্তরে নাযিল করেন, যাতে আপনি ভয় প্রদর্শন করেন। আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন, এটা রাসূলে কারীমের (আনিত) বাণী। তিনি শক্তিশালী, আরশের মালিকের কাছে মর্যাদাশীল। যাঁর আনুগত্য করা হয়। যিনি সেখানকার বিশ্বাসভাজন। তোমাদের সঙ্গী মহানবী (সা.) পাগল নন। (শেষ পর্যন্ত)। তারপর আল্লাহ তায়ালা তাঁর দুই বান্দাহ এবং দুই রাসূলের প্রশংসা করেন, যারা হচ্ছেন জিব্রাইল (আ.) এবং মুহাম্মদ (সা.)।
عن ابي هريرة قال قال النبي ﷺ ما من الانبياء نبي الااعطي ما مثله امن عليه البشر وانما كان الذي او تيت وحيا او حاه الله الي فارجوا أن اكون اكثرهم تابعا يوم القيامة ـ
অর্থাৎঃ হযরত আবূ হুরাইরা (রা.) থেকে বর্ণিত ঃ তিনি বলেন, নবী করীম (সা.) ইরশাদ করেন। নবীগণের মধ্যে এমন কোন নবী নেই, যাঁকে তার প্রয়োজন অনুসারে সব কিছু দেয়া হয়নি অর্থাৎ - যে সময় যতটুকু তাঁর প্রয়োজন হয়েছে, ততটুকু তাঁকে দেয়া হয়েছে। আমাকে আল্লাহর পক্ষ হতে অহী প্রদান করা হয়েছে। কাজেই আমি আশাবাদী যে, তাদের মধ্য থেকে কিয়ামতের দিন আমার অনুসারীর সংখ্যা বেশী হবেন। এ হাদীসটি হযরত কুতাইবা (রা.) থেকে মুসলিম ও নাসায়ী রিওয়ায়ত করেন।
এই হাদীসে কুরআনে পাকের অসংখ্য অগণিত ফজীলত সম্পর্কে বলা হয়। (মানবকুলকে অন্ধকার থেকে আলোর পথে আনার লক্ষ্যে) আগেকার নবী ও রাসূলদেরকে যে মো'জিযা বা অলৌকিক শক্তি এবং কিতাব প্রদান করা হয়েছিল মুহাম্মদ (সা.)-কে তার চেয়ে বেশি প্রদান করা হয়েছিল, যেন মানুষ ঐ নবীর উপর ঈমান আনে। অর্থাৎ তিনি যে নবী হয়ে আবির্ভূত হয়েছেন, তা যেন মানুষ বিশ্বাস করে। অনুসারীরা যেন তাঁর আনুগত্য করে। অতপর নবী ওফাত পেলেন, কোন মো'জিযা বাকী রইল না। কিন্ত অনুসারীরা যা অবলোকন করেছিল তা তারা যত দিন বেঁচে ছিল, ততদিন উল্লেখ ও বর্ণনা করেছিল।
অপরপক্ষে রাসূলদের শেষ রাসূল হযরত মুহাম্মদ (সা.) কে যে অহী প্রদান করা হয়েছে, তা যেন এক শ্বাশত ও চলমান এবং চির অবধারিত অহী। যা অবিরাম মানব সমাজে আলোচিত হয়। তাই রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেন-
فارجوان اكون اكثرهم تابعا ـ
অর্থাৎ ঃ আমি আশা করি সকল নবী রাসূলগণের চেয়ে আমার অনুসারীর সংখ্যা বেশি হবে। বাস্তবেও তা হল।
তিনি সমস্ত জগতবাসীর রাসূল হয়ে প্রেরিত হওয়ার কারণে তাঁর অনুসারী সমস্ত নবীগণের চেয়ে বেশী। কিয়ামত পর্যন্ত তাঁর রিসালত এবং মো'জেযাগুলো সদা

বিরাজমান ও বিদ্যমান থাকবে। এ জন্য আল্লাহ তায়ালা বলেন-
تَبَارَكَ الَّذِيْ نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلٰى عَبْدِهٖ لِيَكُوْنَ لِلْعٰلَمِيْنَ نَذِيْرًا
"বরকতময় সে আল্লাহ তায়ালা, যিনি তাঁর বান্দাহর উপর অবতীর্ণ করেন ফুরকান, বিশ্ববাসীকে ভীতি প্রদর্শনের জন্যে (শুধু এক বিশেষ সম্প্রদায়ের কথা এখানে বলা হয়নি)।" (সূরা ঃ ফুরকান-১)
এবং আরো বলেন-
قُلْ لَّئِنِ اجْتَمَعَتِ الْاِنْسُ وَالْجِنُّ عَلٰٓى اَنْ يَّاْتُوْا بِمِثْلِ هٰذَا الْقُرْاٰنِ لَا يَاْتُوْنَ بِمِثْلِهٖ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيْرًا ـ
"আপনি বলুন যদি কুরআনের অনুরূপ কুরআন নিয়ে আসার জন্য মানুষ ও জীন একত্রিত হয় এবং যদিও তারা পরস্পরকে যাহায্য করে তবুও তারা ইহার অনুরূপ আনতে পারবেনা।" (সূরা ঃ বনী ইসরাঈল-৮৮)
অতঃপর এ দুনিয়াবাসীকে এ মহাগ্রন্থ কুরআনের মতো দশটি সূরা উপস্থাপন করতে বলা হয়, তাতেও তারা অপরাগতা প্রকাশ করে, এরপর মাত্র একটি সূরা উপস্থাপন করতে বলা হয়, তাতেও তাদের দুর্বলতা ও অপারগতা প্রকাশ পায়। শুধু তাই নয় ভবিষ্যতেও পারবেনা তার নিশ্চয়তা প্রদান করত ঃ ঘোষণা করা হয় এভাবে-
وَاِنْ كُنْتُمْ فِيْ رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلٰى عَبْدِنَا فَاْتُوْا بِسُوْرَةٍ مِّنْ مِّثْلِهٖ وَادْعُوْا شُهَدَآءَكُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ـ فَاِنْ لَّمْ تَفْعَلُوْا وَلَنْ تَفْعَلُوْا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِيْ وَقُوْدُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ اُعِدَّتْ لِلْكٰفِرِيْنَ ـ
"হে মানব সমাজ! আমি আমার বান্দাহর উপর যা কিছু অবতীর্ণ করেছি, তার সত্যতা সম্পর্কে যদি তোমাদের বিন্দুমাত্রও সন্দেহ থাকে, তা হলে দেখি, তোমরা এর মতো একটি সূরা উপস্থাপন কর, শুধু তাই নয়- তোমরা আল্লাহ তায়ালকে বাদ দিয়ে যাদের উপাসনা বা ইবাদত করছ তাদেরকেও বল- তোমাদেরকে এ চ্যালেঞ্জ মুকাবিলায় সহায়তা প্রদানের জন্যে- যদি তোমরা তোমাদের কথায় সত্যবাদী হও। তবে একথা দৃঢ়ভাবে জেনে রাখ- তোমরা অতীতেও অনুরূপ কোন সূরা উপস্থাপন করতে পারনি এবং ভবিষ্যতেও কখনো পারবেনা। তোমাদের মধ্যে শুভ বুদ্ধির উদয় হউক, জাহান্নামের অগ্নিদাহকে ভয় কর যার ইন্ধন হবে মানুষ এবং পাথর, যা কাফিরদের জন্যে প্রস্তুত করে রাখা হয়েছে।" (সূরা ঃ বাকারাহ-২৩-২৪)
অথচ (ঐতিহাসিকভাবে সত্য যে) এ লোকগুলো (আরবী) বিশ্বের অন্যান্য ভাষাভাষি মানুষের মধ্যে সবচেয়ে বেশী বিশুদ্ধ ভাষাবিদ, ভাষার অলংকারে সমৃদ্ধ এবং কাব্যিক গুণে গুণান্বিত, তা সত্ত্বেও তারা আল্লাহ তায়ালার কালামের মতো একটি আয়াতও প্রণয়ন করতে পারেনি।
কারণ আল্লাহ তায়ালার বাণী হচ্ছে বিশুদ্ধতা, ভাষা অলংকার, কাব্যিক ছন্দ, এবং সমৃদ্ধশীল বিশুদ্ধ বিদ্যা ও জ্ঞানের সম্ভার। যা অদৃশ্য অতীত এবং বর্তমান সম্পর্কে সত্য সংবাদ পরিবেশন করেছে এবং ন্যায় ও ইনসাফ ভিত্তিক বিধান রচনা করেছে। এর প্রতি ইংগিত প্রদান করত ঃ আল্লাহ তায়ালা বলেন- وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَّعَدْلًا ـ 'হে মুহাম্মদ! আপনার পালন কর্তার কথা সত্যভাবে ও ন্যায়ভাবে পূর্ণ হয়েছে। (সূরা ঃ আনআ'ম-১১৫)

কুরআন শরীফ ফিতনা হতে পরিত্রাণের মাধ্যম

হযরত হারিস বিন আবদুল্লাহ্ আল-আওয়ার বলেন- আমি ইশার নামায শেষে আমীরুল

Scanned with CamScanner

মু'মিনীন হযরত উমর (রা.)-এর নিকট এসে হাদীস বর্ণনা করতে বললাম। তিনি (রা.) ইরশাদ করেন-

"আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-কে বলতে শুনেছি- আমার নিকট জিবরাইল (আ.) এসে বলেন, হে মুহাম্মদ (সা.)! আপনার পরে আপনার উম্মতরা বিভিন্ন পথে পরিচালিত হবে। তখন আমি জিবরাইল (আ.)-কে জিজ্ঞেস করলাম, এ থেকে পরিত্রাণের পথ কি? হে জিবরাইল (আ.)! উত্তরে জিবরাইল (আ.) বলেন, এ থেকে পরিত্রানের পথ পবিত্র কুরআনে রয়েছে। এর দ্বারা আল্লাহ্ তায়ালা প্রত্যেক অকৃতজ্ঞ ও অন্যায়কারীকে ধ্বংস করবেন। যে ব্যক্তি আল্লাহ তায়ালার কুরআন অনুসারে চলবে, সে কৃতকার্য হবে। যে কুরআন মেনে চলবে না, সে ধ্বংস হবে।" এভাবে দু'বার বলেন।

মোট কথা কুরআন নিয়ে ঠাট্টা করার অবকাশ নেই এবং তা ভিন্নরূপে পাঠ করবে না।

কুরআনের প্রয়োজনীয়তা অত্যাবশ্যক। কুরআন তোমাদের অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যত সম্পর্কে অবহিত করেছে। এভাবে ইমাম আহাম্মদ (রহ.) বর্ণনা করেন।

وقد قال ابو عيسي الترمذي ثنا عبد بن حميد ثنا حسين بن علي الجعفي ثنا حمزة الزيات عن ابي مختار الطائي عن ابن اخي الحارث الاعور عن الحارث الاعور قال مررت في المسجد فاذا الناس في احاديث فدخلت علي علي فقلت يا امير المؤمنين الخ ـ

অর্থাৎ হযরত হারিস আল-আওয়ার থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন- আমি মসজিদের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলাম। তখন কতেক লোক মসজিদের ভিতর হাদীস নিয়ে আলোচনা করছিলেন। আমি হযরত আলী (রা.)-এর নিকট গিয়ে বললাম, হে আমীরুল মো'মিনীন। আপনি কী দেখেননি কতেক লোক হাদীস নিয়ে আলোচনা করছে? তিনি বললেন, তারা কি তাই করছে? উত্তরে আমি বললাম হ্যাঁ! তখন হযরত আলী (রা.) বলেন- রাসূলুল্লাহ (সা.)-কে বলতে শুনেছি অতিসত্বর তোমাদের মধ্যে ফিতনা অর্থাৎ অন্যায় ও অবিচার শুরু হবে। আমি বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ (সা.)-এ অবস্থায় পরিত্রাণের পথ কী? তিনি উত্তরে বলেন- আল্লাহ তায়ালার কিতাবের অনুসরণ করে চললে পরিত্রাণ পাবে। আল্লাহ তায়ালার কিতাবের ভিতর তোমাদের অতীত, ভবিষ্যৎ এবং বর্তমান সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা রয়েছে। এটিই হচ্ছে পরিত্রাণ। এ নিয়ে ঠাট্টা করবে না। যে লোক পাশবিক শক্তি দেখিয়ে কুরআন পাকের বিধান অনুযায়ী চলবে না, কুরআন ছেড়ে দেবে- আল্লাহ্ তায়ালা তাকে ধ্বংস করবেন। যে ব্যক্তি কুরআন ছাড়া অন্য কিছুতে হিদায়াত পেতে চেষ্টা করবে, আল্লাহ তায়ালা তাকে গোমরাহ করবেন- এ কুরআন আল্লাহ্ তায়ালা প্রদত্ত দৃঢ় ও শক্ত রশি, এ কুরআন হচ্ছে প্রজ্ঞাময় উপদেশ বাণী, এ কুরআন হচ্ছে সঠিক পথ, যার মধ্যে কু-প্রবৃত্তির কোন অবকাশ নেই, এর ভাষায় কোন সন্দেহ নেই, যার খনি থেকে আলিম সমাজ যতই আহরণ করেন না কেন, তাদের তৃপ্তি মিটবে না এবং কুরআনের নতুন নতুন তত্ত্ব ও তথ্য শেষ হবে না। কুরআন থেকে জ্বীনরাও মুখ ফিরিয়ে থাকতে পারেনি যখন তারা তা শ্রবণ করেছিল। এমন কী জ্বীনেরা বলেন-

إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ فَآمَنَّا بِهِ

জীনেরা বলে- আমরা কুরআন শ্রবন করেছি, সত্যিই এ কুরআন আশ্চর্য ও আকর্ষণকারী, যা হিদায়াতের পথ প্রদর্শন করে। এর ফলে আমরা এ কুরআনের উপর ঈমান আনলাম।" (সূরা ঃ জীন-১)

যে কুরআনের কথা বলল, সে সত্য বলল এবং যে এ কুরআনের বিধান অনুযায়ী জীবন পরিচালিত করবে সে পুরস্কৃত হবে। যে এ কুরআন অনুসারে রায় প্রদান করে, সে ন্যায়

ভিত্তিক কাজ করে, যে এ কুরআন-এর প্রতি আহ্বান করল, সে সঠিক পথের সন্ধান দিল। হে আওয়ার! তুমি এ কুরআন পাককে আঁকড়ে ধর। তিরমিজী (র.) বলেন, এ হাদীস গরীব।

কিন্তু এ বিষয় নিয়ে হযরত আবদুল্লাহ বিন মাসউদ (রা.) থেকে যে হাদীস বর্ণিত হয়েছে, তা হাসান সহীহ বলছেন। সেই হাদীসের শেষে এ ইবারত বা বর্ণনাটুকু বেশী আছে-

فاتلوه فان الله يأجركم علي تلاوته بكل حرف عشر حسنات ـ اما اني لا اقول الم ـ حرف ـ ولكن الف عشر ولام عشر وميم عشر ـ

অর্থাৎ তুমি এ কুরআন পাঠ কর, এতে তোমাকে প্রত্যেক হরফ বা বর্ণের জন্যে দশটি নেকী দেয়া হবে। তবে, আমি একথা বলছিনা যে, الـم একটি বর্ণ; বরং 'আলিফ' একটি হরফ, যার জন্যে দশটি নেকী দেয়া হবে, 'লাম' একটি হরফ, যার জন্যে দশটি নেকী এবং 'মিম' একটি হরফ, যার জন্যে দশটি নেকী দেয়া হবে।

হযরত ইবনে মাসউদ (রা.) থেকে আর এক বর্ণনা এ রকম আছে-

لا يسأل عبد عن نفسه الا القران فان كان يحب القران فانه يحب الله ورسوله ـ

অর্থাৎ বান্দাহকে তার নিজের সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হবে না বরং কুরআন সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হবে। যদি সে কুরআন পাককে মুহব্বত করে থাকে, সে আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলকে মুহব্বত করেছিল।

হযরত ইবনে শিহাব হযরত আনাস (রা.) থেকে বর্ণনা করেন- রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর নিকট অন্যান্য নবী বা রাসূলের চেয়ে বেশী ওহী নাযিল হয়েছিল এবং এরপর তাঁর ইন্তিকাল হয়। অর্থাৎ একের পর এক রাসূলুল্লাহ (স.)-এর কাছে প্রয়োজন অনুযায়ী ওহী আসত।

ثنا ابو نعيم ثنا سفيان عن الاسود بن قيس قال سمعت جندبا يقول اشتكي رسول ﷺ فلم يقم ليلة او ليلتين فاتته امراة فقالت يا محمد ما اري شيطانك الا تركك فانزل الله تعالي والضحي والليل اذا سجي ما ودعك ربك وما قلي ـ

হযরত আসওয়াদ বিন কাইস থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি জুনদুব থেকে শ্রবণ করেছি, তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ (সা.)অসুস্থ হয়ে পড়লেন। এক রাত বা দু'রাত তাহাজ্জুদ পড়তে উঠেননি। তাঁর কাছে এক মহিলা এসে বলল, হে মুহাম্মদ! তোমার শয়তানকে তো দেখা যাচ্ছে না- সে তোমাকে ছেড়ে যায়নি তো? তক্ষুনি আল্লাহ তায়ালা এ আয়াত নাযিল করেন-

"দ্বি-প্রহর এবং রাতের শপথ, যখন তা অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়। আল্লাহ তায়ালা আপনাকে ত্যাগ করেননি এবং শত্রুতাও করেননি।" হযরত ইমাম বুখারী (র.) মুসলিম (র.), তিরমিযী এবং নাসায়ী (র.) ভিন্ন ভিন্ন সনদে এ হাদীসখানা বর্ণনা করেন।

কুরআনের ফযীলত বর্ণনায় এ ধরনের হাদীসের উদ্ধৃতি প্রদান এ জন্যে যে, আল্লাহ্ তায়ালা তাঁর রাসূলের কাছে বিরতিহীনভাবে, ধারাবাহিকভাবে অহী নাযিল করা এবং কুরআন পাককে পৃথকভাবে অবতীর্ণ করার অর্থ তার রাসূলের প্রতি অত্যধিক আন্তরিকতা এবং ভালবাসার নিদর্শনের বহিঃপ্রকাশ।

কুরআনের ভাষা

وفي البخاري ـ نزل القران بلسان قريش والعرب ـ قرانا عربيا بلسان عربي مبين

বুখারী শরীফে উল্লেখ করা হয় যে, কুরআন কুরাইশ এবং আরবদের ভাষায় অবতীর্ণ হয়েছে- যেভাবে কুরআনে আছে স্বচ্ছ ও বিশুদ্ধ আরবী ভাষায় কুরআন অবতীর্ন হয়েছে।

Scanned with CamScanner

হযরত ইমাম জুহরী হযরত আনাস বিন মালিক (রা.) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন- হযরত উসমান বিন আফফান (রা.), যায়িদ বিন সাবিত (রা.) সা'দ বিন আল আস, আবদুল্লাহ বিন জুবাইর, আবদুল্লাহ্ বিন হারিস বিন হিশামকে কুরআন শরীফ পুস্তিকা আকারে প্রণীত করার জন্য নির্দেশ দিয়েছিলেন। সংগে সংগে এ কথাও বলেছিলেন, যায়িদ এবং তোমাদের মধ্যে কুরআনের আরবী নিয়ে কোন বিরোধ দেখা দিলে- তখন তা কুরাইশদের ভাষায় লেখ। কারণ কুরআন তাদের ভাষায় অবতীর্ণ হয়েছে।

হযরত ইমাম বুখারী (রা.) এ কথা উল্লেখ করার উদ্দেশ্য হল- এ কথা বুঝানোর জন্য যে, কুরআন পাক কুরাইশদের পরিভাষায় নাযিল হয়েছে, হযরত আবূ বকর বিন আবূ দাউদ হযরত জাবির বিন সামুরা থেকে হাদীস বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, আমি উমর বিন খাত্তাব (রা.) থেকে শুনেছি তিনি বলেছিলেন-

لا يملين في مصاحفنا هذه الاغلمان قريش او غلمان ثقيف

অর্থাৎ এ কিতাব পুস্তিকা আকারে প্রকাশনার কাজ সম্পন্ন করা সম্ভবপর হতনা- যদি কুরাইশের বালকগণ না হতেন অথবা সকীফ সম্প্রদায়ের বালকেরা না হত। এ হাদীসের সনদ সঠিক। আবদুল্লাহ্ বিন ফুদ্বালা বলেন, যখনই হযরত উসমান (রা.) মসাহাফ আকারে কুরআন লিপিবদ্ধ করতে ইচ্ছে পোষণ করেন, তখন কয়েকজন আপন লোক নিয়ে বসেন এবং তাদেরকে বলেন, যদি তোমাদের মধ্যে কোন পরিভাষা নিয়ে মতানৈক্য দেখা দেয়, তখন তা মুদার এর পরিভাষা অনুযায়ী লেখ। কারণ কুরআন মুদারের এক মহান ব্যক্তির অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর ভাষায় অবতীর্ণ হয়।

নিম্ন লিখিত আয়াতসমূহ- এ কথার ইংগিত বহন করে যে, কুরআন পাক আরবী ভাষায় নাযিল হয়েছে।

١. قُرْاٰنًا عَرَبِيًّا غَيْرَ ذِيْ عِوَجٍ لَّعَلَّهُمْ يَتَّقُوْنَ ـ(سورة-زمر-٢٨)

٢. وَاِنَّهٗ لَتَنْزِيْلُ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ـ نَزَلَ بِهِ الرُّوْحُ الْاَمِيْنُ عَلٰى قَلْبِكَ لِتَكُوْنَ مِنَ الْمُنْذِرِيْنَ ـ (سورة-شعراء-١٩٥)

٣. وَهٰذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُّبِيْنٌ ـ (سورة-نحل ١٠٣)

٤. وَلَوْ جَعَلْنٰهُ قُرْاٰنًا اَعْجَمِيًّا لَّقَالُوْا لَوْلَا فُصِّلَتْ اٰيٰتُهٗ ءَاَعْجَمِيٌّ وَّعَرَبِيٌّ الاية وغيره ـ(سورة-فصلت-٤٤)

কুরআন সংকলন

ইমাম বুখারী (র.) বলেন, আমাকে মূসা ইবনে ইসমাঈল বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, আমাকে হাদীস বর্ণনা করেন, ইবরাহীম ইবনে সা'দ। তিনি বলেন, আমাদেরকে হাদীস বর্ণনা করেন ইবনে শিহাব, তিনি বর্ণনা করেন হযরত যায়িদ বিন সাবাক হতে, তিনি হযরত যায়িদ বিন সাবিত হতে, তিনি বলেন- হযরত আবু বকর (রা.) আমার কাছে ইয়ামামার যুদ্ধক্ষেত্রের বর্ণনা দিয়ে লোক প্রেরণ করেন, সে মুহূর্তে তাঁর কাছে হযরত উমর বিন আল-খাত্তাব (রা.)ও ছিলেন। অতঃপর আবূ বকর (রা.) বলেন, হযরত উমর বিন আল-খাত্তাব (রা.) আমার কাছে আসলেন এবং বলেন- নিশ্চয় পবিত্র কুরআনের পাঠকদের সাথে অর্থাৎ সাহাবীদের সাথে যাদের অনেকেই হাফিযে কুরআন ছিলেন যুদ্ধ ভীষণ রূপ লাভ করেছে। আমি আশাঙ্কা করছি এমনিভাবে বিভিন্ন স্থানে ভীষন যুদ্ধ হবে। কুররায়ে কুরআনের শাহাতাদের মাধ্যমে

কুরআন শরীফের অনেকাংশ বিলুপ্ত হয়ে যাবে। তার চেয়ে কুরআন সংকলনের নির্দেশ দেয়াটা ভাল হবে। আমি উমর (রা.)-কে বললাম, আমার দ্বারা সে কাজ কি করে সম্ভব, যা রাসূলুল্লাহ (সা.) করেননি? হযরত উমর (রা.) বলেন- আল্লাহর কসম এটি একটি উত্তম কাজ। হযরত আবূ বকর (রা.) বলেন, উমর (রা.) বারবার আমাকে চাপ দিতে থাকলেন। শেষ পর্যন্ত আল্লাহ তায়ালা আমার অন্তর সম্প্রসারিত করে দিলেন। আমি এ সম্পর্কে বুঝতে পারলাম যা হযরত উমর (রা.) অনুধাবন করেছিলেন। হযরত যায়িদ (রা.) বলেন, হযরত আবূ বকর (রা.) আমাকে বলেন। আপনি জ্ঞানী ও বুদ্ধিমান যুবক এবং আপনি রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর ওহী লিখতেন। আপনাকেই ধারাবাহিকভাবে কুরআন সংকলনের কাজ সম্পন্ন করতে হবে। যায়িদ বলেন আপনি আমাকে এমন এক দায়িত্ব সম্পন্ন করার জন্যে নির্দেশ দিলেন, যা আমার কাছে এতো কঠিন ও ভারী মনে হচ্ছে, একটি পাহাড়কে অন্য জায়গায় স্থানান্তর করতে বললেও তত ভারী মনে হত না। আমি (যায়িদ) বললাম- আপনি এ কাজ কীভাবে করবেন, যা রাসূলুল্লাহ (সা.) করেননি? হযরত আবূ বকর (রা.) বলেন- অবশ্যই এটি একটি উত্তম কাজ। এরপর থেকে আবূ বকর (রা.) আমাকে এ কাজে জোর দিতেই থাকলেন। আল্লাহ তায়ালা আমার অন্তর প্রসারিত করলেন, যেভাবে হযরত আবূ বকর (রা.) এবং হযরত উমর (রা.) এর অন্তর প্রসারিত করেছিলেন। তারপর আমি ধারাবাহিকভাবে বিভিন্ন জায়গা থেকে, পাথরের টুকরো এবং মানুষের অন্তর থেকে সংকলন করতে আরম্ভ করলাম।

অবশেষে হযরত আবূ খুযাইমা আল আনসারীর নিকট সূরা তওবার শেষাংশ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُوْلٌ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ الخ ـ পেলাম, যা আর কারো কাছে পাই নাই।

এ পুস্তিকাগুলো হযরত আবূ বকর (রা.) এর নিকট তাঁর ইন্তিকাল পর্যন্ত ছিল। তাঁর পরে হযরত উমর (রা.) যতদিন বেঁচে ছিলেন, ততদিন তাঁর কাছে ছিল। এরপর হযরত উম্মুল মুমিনীন হাফসা বিনত উমর (রা.)-এর নিকট ছিল। হযরত ইমাম বুখারী (রাহ.) এ হাদীসটি বিভিন্ন জায়গায় বর্ণনা করেন।

হযরত ইমাম আহমদ, তিরমিযী এবং নাসায়ী (রা.) বিভিন্নভাবে এ হাদীস হযরত জুহরী (রহ.) থেকে বর্ণনা করেন। এ কাজটি হযরত আবূ বকর (রহ.)-এর জীবদ্দশায় যে সব গুরুত্বপূর্ণ ও সর্বোত্তম কাজ হয়েছে তন্মধ্যে অন্যতম। যেহেতু আল্লাহ তায়ালা তাঁর রাসূলের পর হযরত আবূ বকর (রা.)-কে এমন এক পদে অধিষ্ঠিত করেছিলেন, যা তিনি ছাড়া অন্য কারো জন্য উপযুক্ত ছিল না। হযরত আবূ বকর (রা.) যাকাত অস্বীকার মুরতাদদেরকে এবং পারস্য ও রোমের বাসিন্দাদেরকে পরাজিত করেছিলেন। এ সকল দুর্ভাগাদের বিরুদ্ধে তিনি অভিযান প্রেরণ করেছিলেন। বিভিন্ন জায়গা থেকে কুরআন সংকলন করেছিলেন যাতে ক্বারীগণ সম্পূর্ণ কুরআন হিফজ করার সুবর্ণ সুযোগ পেয়েছিলেন। এটাই ছিল- اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَاِنَّا لَهٗ لَحٰفِظُوْنَ নিশ্চয়ই আমি উপদেশ অবতীর্ণ করেছি এবং অবশ্যই আমি এর রক্ষণাবেক্ষণকারী। (সূরা ঃ হিযর-৯) আয়াতের রহস্য।

হযরত সিদ্দীকে আকবর (রা.) ও কল্যাণমূলক কাজের প্রতিভূ ছিলেন এবং অন্যায় প্রতিহত ও দমনে তাঁর ভূমিকা ছিল অগ্রগণ্য। এ জন্যে হাদীসের অনেক ইমাম হযরত আলী বিন আবূ তালিব (রা.) থেকে বর্ণনা করেন-

انه قال اعظم الناس اجرا في المصاحف ابو بكر ـ ان ابا بكر كان اول من جمع القران بين

Scanned with CamScanner

اللوحين -

হযরত আলী বিন আবুতালিব (রা.) বলেন, হযরত আবুবকর (রা.) মানুষের মধ্যে কুরআনের কারনে সর্বাধিক পূণ্যবান ব্যক্তি। তিনিই প্রথম ব্যক্তি, যিনি কুরআন পাক দুটি পুস্তিকায় সংকলন করেন। এ হাদীসের সনদ সহীহ।

হযরত আবু বকর বিন আবু দাউদ আল-মসহাফ কিতাবে লিখেন, হযরত হিশাম তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন-

অর্থাৎ হযরত আবূ বকর (রা.) এমন ব্যক্তি, যিনি নবী করীম (সা.)-এর পরে কুরআন সংকলন করেন। তাঁর এ সংকলণ সঠিক বলে স্বীকৃত হয়। হযরত উমর বিন খাত্তাব (রা.) যিনি এ কুরআন সংকলণ কাজ করার প্রতি তাঁকে তাকীদ দিয়েছিলেন। যখন যুদ্ধ ভীষণ রূপ ধারণ করেছিলো। ইহা ছিল ইয়ামামার যুদ্ধ। কুররায়ে কুরআন শহীদ হওয়ার যুদ্ধ। যে যুদ্ধে মুসাইলামা এবং তার সাথীদের অর্থাৎ বনী হানিফাকে হত্যা করা হয়েছিল।

ইয়ামামার যুদ্ধ এ জন্য সংঘঠিত হয়েছিল যে, প্রায় এক লাখ ধর্মত্যাগী মুসাইলামাতুল কাজ্জাবের সংগ দিয়েছিল। হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা.) তের হাজার সৈন্যসহ হযরত খালিদ বিন ওলীদকে তাদের সাথে মুকাবিলা করার জন্য প্রেরণ করেছিলেন। পরস্পর মুকাবিলা হল; কিন্তু মুসলমানদের অধিকাংশ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত না হওয়ার কারণে মুসলিম বাহিনী পিছু হটল। সম্মানিত সাহাবায়ে কিরামদের মধ্য থেকে বয়ঃজ্যেষ্ঠেরা উচ্চ স্বরে বলেন, হে খালিদ- আমাদের বিশুদ্ধ বানিয়ে দিন অর্থাৎ এ নিরক্ষরদের থেকে পৃথক করে দিন। তারপর পৃথক করা হল। তারা প্রায় তিন হাজার ছিলেন। এরা শক্তভাবে আন্তরিকতার সাথে আক্রমণ করলেন। পরস্পর উচ্চ কণ্ঠে বলতে লাগলেন- হে সূরা বাকারার সাথীরা এবং আক্রমণ করতে লাগলেন। তাদের এ প্রচন্ড আক্রমণের মুখে কাফির দল পলায়ন করল এবং মুসলমানদের বিজয় হল।

মুসলমানরা বন্দী এবং হত্যা করে তাদের থেকে বদলা নিলেন। আল্লাহ তায়ালা মুসাইলমা কাযযাবকে নিহত করলেন, তার সাথীদের মধ্যে বিচ্ছিন্নতা দিখা দিল এবং তারা পুনরায় ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে আশ্রয় গ্রহণ করল।

কিন্তু সেদিন ইয়ামামায় প্রায় পাঁচশ কারী শহাদাত বরণ করেছিলেন। এ কারণেই হযরত উমর (রা.) কুরআন সংকলনের জন্যে হযরত আবূ বকরকে (রা.)-কে পরামর্শ দিয়েছিলেন যেন সাহাবায়ে কিরাম (রা.) থেকে যাদেরকে কুরআন সংরক্ষিত আছে, তাঁরা জিহাদে শাহাদত বরণ করার কারণে কুরআনের বিলুপ্তি না ঘটে। যখনই তা পুস্তিকা আকারে লিপিবদ্ধ করা হবে, তখন কুরআনের সংরক্ষণ নিশ্চিত হয়ে যাবে। হযরত আবু বকর (রা.) একটু চিন্তা ভাবনা করেই সম্মতি প্রকাশ করেন। এমনিভাবে হযরত যায়িদ বিন সাবিত (রা.) ও ইতস্তত করেছিলেন। অতপর দুজন একমত হলেন। সত্যিই যায়িদ বিন সাবেত আনসারীর জন্যে এ কাজটি সম্মানজনক কাজ ছিল।

যেহেতু হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা.) হযরত উমর বিন আল খত্তাব (রা.) এবং যায়েদ বিন সাবিত (রা.)-কে নির্দেশ দিয়েছিলেন যে, কুরআন পাকের যে কোন কিছু তোমাদের নিকট দু'জন সাক্ষী সহ উপস্থিত হলে তা থেকে লিখে নিও। এ জন্য যায়িদ বিন সাবিত বলেন, আমি সূরা তওবার শেষ দু'টি আয়াত অর্থাৎ - لَقَدْ جَاءَكُمْ

رَسُوْلٌ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ থেকে শেষ পর্যন্ত আবু খুজাইমা আল আনসারী থেকে এবং অন্য বর্ণনায় খুজাইমা বিন সাবিত এর কাছে পেয়ে তাঁর থেকে লিখে নিই।

কারণ রাসূলুল্লাহ (সা.) ঘোড়ার ঘটনার পর হতে তাঁর সাক্ষীকে দু'জন সাক্ষীর বরাবর করেছিলেন। আবূ জাফর রাযী রবী আবুল আলিয়ার মাধ্যমে বর্ণনা করেন, উবাই বিন কা'আব হযরত খুজাইমার সাথে সাক্ষ্য দিয়েছিলেন। অন্য বর্ণনায় আছে হযরত উসমান (রা.) তার সাথে সাক্ষ্য দিয়েছিলেন।

যায়েদ বিন সাবিতের বর্ণনা করেন-

فتتبعت القران اجمعه من العسب واللخاف وصدور الرجال وفي روايته من العسب والرقاع والاضلاع وفي روايته من الاكتاف والاقتاب وصدور الرجال - اما العسب فجمع عسيب قال ابو نصر اسماعيل بن حماد الجوهري وهو من العسف فويق الكتاب لم ينسب عليه الخوص وما نبت عليه الخوص فهو العسف واللخاف لخفة وهي القطعة من الحجارة مستدقة - كانو ايكتبون عليها و علي العسب وغير ذالك مما يمكنهم الكتابة عليه بماياناسب ما يسمونه من القران من رسول الله صلي الله عليه وسلم ومنهم من لم يكن يحسن الكتابة اويثق بحفظه فكان يحفظه فتلقاه زيد هذا من عسبه وهذا من لخافه- ومن صدر هذا اي من لفظه كانوا احرص شيئ علي اداء الامانات هذا من اعظم الامانات لان رسول الله صـ او دعهم ذالك ليبلغو الي من بعدده كما قال تعالي ياايها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك - ففعل صلوات الله وسلامه عليه-

এর সারমর্ম হচ্ছে হযরত যায়েদ বিন সাবিত (রা.) যেখান থেকেই সম্ভব হয়েছে সেখান থেকে কুরআন সংকলন করেছেন, যা রাসূলুল্লাহ (সা.) থেকে প্রকাশ পেয়েছে। খেজুরের ডাল, চিরকুট, হাড় পাথরের টুকরা, মানুষের বক্ষ অর্থাৎ হাফিজে কুরআন থেকে সংগ্রহ করেছেন। যেহেতু আল্লাহ তায়ালা বলেন, হে মুহাম্মদ (সা.), আপনার কাছে যা নাযিল করা হয়েছে তা পৌছিয়ে দাও। নবী করীম (সা.)-তাই করেছেন।

এ উদ্দেশ্যে রাসূলাহ (সা.) বিদায় হজ্জের দিন জন-সমাবেশে আরাফাতের ময়দানে সাহাবায়ে কিরাম (সা.)-কে জিজ্ঞেস করেছিলেন। হে আমার উম্মতগণ তোমাদেরকে আমার সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হবে। তখন তোমরা কী উত্তর দেবে? তাঁরা উত্তর দিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ (সা.)! আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আপনি ইসলামের দাওয়াত পৌছিয়েছেন, হক আদায় করেছেন এবং মানুষকে নসীহত করেছেন। তারপর রাসূলুল্লাহ (সা.) আঙ্গুল দিয়ে আসমানের দিকে ইশারা করত ঃ বলেন اللهم اشهد اللهم اشهد হে আল্লাহ! আপনি সাক্ষী থাকুন, হে আল্লাহ আপনি সাক্ষী থাকুন। রাসূলুল্লাহ (সা.) উম্মতদেরকে ওসীয়ত করলেন- যারা উপস্থিত, তারা অনুপস্থিতদের নিকট পৌছিয়ে দাও। بلغوا عني ولو اية অর্থাৎ যার কাছে এক আয়াত ছাড়া আর কিছুই নেই সে এক আয়াতই অন্যের কাছে পৌছাবে। সুতরাং যেভাবে নির্দেশ দেয়া হয়েছে, সে ভাবে কুরআনকে কুরআন হিসেবে এবং হাদীসকে হাদীস হিসেবে নিঃসন্দেহে পৌছাতে হবে। এ জন্য রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন- من كتب عني سوي القران فليمحه যে কেউ আমার থেকে কুরআন ছাড়া অন্য কিছু লেখবে, তা যেন মিটিয়ে বা মুছে ফেলে। যেন কুরআন এর সাথে মিশে না যায়। এর অর্থ এ নয় যে, সুন্নাত সংরক্ষণ এবং রিওয়ায়ত করা জায়িয নয়। এ উক্তি হতে অবশ্য আমরা বুঝতে পারলাম যে, সাহাবায়ে কিরাম (রা.) কুরআন হিসেবে ঐসব কিছু

Scanned with CamScanner

পৌঁছিয়েছেন, যা রাসূলল্লাহ (সা.) তাঁদের কাছে পৌঁছিয়েছিলেন।

তাই, একথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, হযরত আবূ বকর (রা.) এবং হযরত উমর (রা.) যে কাজ সম্পাদন করেছেন, সত্যিই এটি একটি মহৎ কাজ এবং দ্বীনের মধ্যে কল্যাণমূলক কাজ। পুস্তিকা আকারে আল্লাহ তায়ালার কুরআনকে সংরক্ষণ করার ফলে যারা রাসূলুল্লাহ (সা.) থেকে কুরআন হাসিল করেছেন, তাদের মৃত্যু হলেও কুরআন বিলোপ হওয়ার কোন অবকাশ রইল না। এরপর এ কিতাব হযরত আবূ বকরের (রা.) জীবদ্দশায় তাঁর নিকট ছিল, হযরত আবূ বকরের ইন্তিকালের পর হযরত উমর (রা.) এর নিকট সংরক্ষিত ছিল। তারপর হযরত উমর (রা.)-এর ইন্তিকালের পর ওসীয়ত হিসেবে এবং উত্তরাধিকারী সূত্রে হযরত উমর (রা.) এর সন্তান উম্মুল মু'মিনীন হযরত হাফসা (রা.)-এর নিকট ছিল। শেষ পর্যন্ত উম্মুল মু'মিনীন থেকে আমিরুল মু'মিনীন হযরত উসমান বিন আফফান (রা.) নিয়েছিলেন, যার বর্ণনা ইনশাল্লাহ সামনে বিস্তারিতভাবে করা হবে।

হযরত উসমানের (রা.) কুরআন লিপিবদ্ধ করণ

قال البخاري رحمة الله عليه ثنا موسي بن اسماعيل ـ ثنا ابراهيم ثنا ابن شهاب ان انس بن مالك حدثه ان حذيفة بن اليمان قدم علي عثمانؓ وكان يغازي اهل الشام في فتح ارمنية واذربيجان مع اهل العراق فافزع حذيفة اختلافهم في القراة فقال حذيفة لعثمانؓ يا امير المومنين ادرك هذه الامة قبل ان يختلفوا في كتاب اختلاف اليهود والنصاري فارسل عثمانؓ الي حفصة ان ارسلي الينا بالمصحف فنسخها ثم نردها اليك فارسلت بها حفصة الي عثمان ـ فأمر زيد بن ثابت وعبد الله بن الزبير وسعد بن العاص وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام فنسخوها في المصاحف ـ

হযরত হুজাইফা বিন আল য়ামান আরমেনিয়া এবং আযরবাইজানের যুদ্ধে অংশ নিয়েছিলেন বিজয়ে গাজী। তিনি সিরিয়া এবং ইরাকের লোকদেরকে একত্রিত করে বিভিন্ন পরিভাষায় পাঠ শ্রবণ করতেন। এতে অনেক ধরণের বিরোধ ও মত পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। যখন তিনি ফিরে আসলেন তা হযরত উসমান (রা.)-কে অবহিত করেন এবং হযরত উসমান (রা.) কে বলেন। আপনি এ উম্মতদেরকে ইহুদ এবং খৃস্টানদের মত কিতাবে বিরোধ সৃষ্টি হওয়ার আগেই সংশোধন করুন। ইহা শুনে হযরত উসমান (রা.) হযরত হাফসা (রা.)-এর কাছে সরংক্ষিত কুরআনের কপি আনলেন এবং হযরত যায়েদ বিন সাবিত (রা.), আবদুল্লাহ বিন যুবাইর (রা.) সাঈদ বিন আস এবং আবদুর রহমান বিন হারিস (রা.)-কে কুরআন সংকলনের নির্দেশ দেন।

হযরত উসমান (রা.) কুরাইশের তিন ব্যক্তি অর্থাৎ আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর সা'দ ইবনুল আস এবং আবদুর রহমান ইবনে হারিস ইবনে হিশামকে বলেন, যখন তোমাদের এবং যায়িদ বিন সাবিত (রা.)-এর মধ্যে কুরআন শরীফের কোন শব্দ নিয়ে বিরোধ পরিলক্ষিত হয়, তখন তা কুরাইশের পরিভাষায় লেখ। কারণ তাদের পরিভাষায় কুরআন শরীফ নাযিল হয়। তাঁরা এরূপ করলেন। যখন কয়েকটি কপি লেখা হল, তখন হযরত উসমান (রা.) হযরত হাফসা (রা.) থেকে যে কপি চেয়ে নিয়ে ছিলেন, তা তাঁকে ফেরৎ দিয়ে দিলেন। প্রত্যেক এলাকায় এক একটি লিখিত কুরআনের কপি পাঠিয়ে দিলেন। এগুলো ছাড়া অবশিষ্ট যত প্রতিলিপি কুরআনের ছিল, তা জ্বালিয়ে দেয়ার জন্যে নির্দেশ দিলেন। এর রহস্য ছিল হযরত হাফসা রা. এর অনুলিপি ব্যতীত যদি অন্য কোন অনুলিপি পাওয়া যায়, তা অশুদ্ধ হওয়ার সম্ভাবনা আছে অথবা মিথ্যার সংযোজন ও হতে পারে যা ভবিষ্যতে

বির্তকের কারণ হতে পারে।

হযরত ইবনে শিহাব যুহরী (র.) বলেন, আমাকে খারিজা বিন যায়েদ বিন সাবিত (রা.) খবর দিয়েছিলেন। যায়েদ বিন সাবিত (রা.) বলেন- আমি কুরআন শরীফের কপি করার সময় সূরা আহযাবের একটি আয়াত হারিয়ে ফেললাম যা আমরা রাসূলল্লাহ (সা.) থেকে শ্রবণ করেছিলাম। আমরা তা তালাশ এবং অনুসন্ধান করে হযরত খুজাইমা বিন সাবিত আনসারীর কাছে পেয়েছিলাম। তা ছিল নিম্নোক্তি আয়াত- مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ رِجَالٌ صَدَقُوْا مَا عَاهَدُوا اللّٰهَ عَلَيْهِ -(سورة الاحزاب-٢٣) অতঃপর আমি এ আয়াতটুকু কুরআনের সাথে সংযোজন করেছিলাম। হযরত উসমান (রা.) এর কুরআন শরীফ লিপিবদ্ধকরণ বাস্তবিকই তাঁর মহৎ কার্যাবলী থেকে একটি কাজ।

হযরত আবূ বকর (রা.) এবং হযরত উমর (রা.) কুরআন শরীফ সংরক্ষণের কাজে অনন্য ভূমিকা পালন করার কারণ ছিল, তাঁদের ভয় ছিল যদি কুরআন শরীফ হতে কোন কিছু হারিয়ে যায়। এতে তাদের উদ্দেশ্য ছিল সমস্ত মানুষকে একই পাঠে যেন একত্র করা যায়, যাতে লোকেরা কুরআন শরীফ নিয়ে বির্তক না করে। এর উপর সমস্ত সাহাবায়ে কিরাম (রা.) একমত ছিলেন। উল্লেখ্য যে, হযরত আবদুল্লাহ বিন মাসউদ (রা.) পুস্তিকা আকারে লেখা কুরআনের বিরোধী ছিলেন এবং আবদুল্লাহ বিন মাসউদ তাঁর বন্ধু-বান্ধবকে মাসহফে উসমান ছাড়া পবিত্র কুরআনের যে সকল পান্ডুলিপি জ্বালিয়ে দেয়ার নির্দেশ দিয়েছিলেন, এগুলো সংরক্ষণ করে রাখারও পরামর্শ দিয়েছিলেন। কিন্তু পরক্ষণে হযরত ইবনে মাসউদ (রা.) তাঁর কথা থেকে প্রত্যাবর্তন করে মাসহাফের সাথে এক মত পোষণ করেন। এ কাজের গুরুত্ব অনুধাবন করতঃ হযরত আলী (রা.) বলেন, যদি এ কাজ হযরত উসমান (রা.) না করতেন, তবে অবশ্যই আমি এ কাজ সম্পন্ন করতাম। অতঃপর হযরত আবূ বকর (রা.) উমর (রা.), উসমান (রা.), আলী (রা.) সকলের ঐকমত্য প্রতিভাত হয়, এ কাজ দ্বীনেরই মহৎ কাজ। এরা হচ্ছেন খুলাফায়ে রাশিদীন, যাদের মহত্ব বর্ণনা করতে গিয়ে রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন- عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي অর্থাৎ তোমার আমার পরে আমার এবং খোলফায়ে রাশিদীনের সুন্নত অবশ্যই আকঁড়িয়ে ধরবে। আমার এবং খোলফায়ে রাশিদীনের সুন্নাত অনুযায়ী চলবে। সার কথা হচ্ছে ইহুদী এবং নাসারা তাদের হাতে যে কিতাব ছিল, তা নিয়ে বির্তক করে। কারণ ইহুদীদের হাতে তওরাতের একটা অনুলিপি আছে। সামেরা দলটি এ কিতাবের অনেক শব্দ এবং অর্থ নিয়ে বির্তক করে। তা ছাড়া সামেরা সম্প্রদায়ের তওরাতে হামযা, হা, এবং ইয়া, এ তিনটি বর্ণ নেই। অপর পক্ষে নাসারাদের হাতে একটি তওরাত আছে, যাকে আতীকা বলা হয়। এটা হচ্ছে ইহুদী এবং সামেরাদের অনুলিপি থেকে ভিন্ন।

তদ্রূপ ইঞ্জিল, যা নাসারাদের হাতে আছে তা ও চার ভাগে বিভক্তি। ১. ইঞ্জিল মরকস ২. ইঞ্জিল লোকা ৩. ইঞ্জিল মাত্তা এবং ৪. ইঞ্জিল ইউহানা। এ সবের মধ্যেও অনেক বিরোধ রয়েছে। এ চারটা ইঞ্জিলের বিষয়াদি অনেক নিম্নমানের। এদের মধ্যে মধ্যম আকৃতির লেখা চৌদ্দ পাতা বিশিষ্ট একটি কপিও আছে এবং কোনটাতে তার চেয়েও দেড় বা দ্বিগুণ পর্যন্ত। এরমধ্যে হযরত ঈসা (আ.)-এর চরিত্র সম্পর্কে এবং তাঁর সময়ের কথা উল্লেখ আছে। এর বিধি-বিধান খুবই অপ্রতুল, যা দ্বারা প্রতিভাত হতে পারে যে, এটি আল্লাহ তায়ালার তদুপরি এটি বিতর্কিত বিষয়, যা পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। এভাবে তাওরাতের মধ্যেও পরিবর্তন, পরিবর্জন ও পরিবর্ধন হয়েছে। যা শরীয়তে মুহাম্মদ (সা.) দ্বারা রহিত হয়েছে।

Scanned with CamScanner

যখন হযরত হুযাইফা (রা.) হযরত উসমান (রা.)-এর কাছে বিষয়টি উল্লেখ করেন, তখন তিনি উম্মুল মু'মিনীন হযরত হাফসা (রা.)-এর নিকট লোক পাঠান, যেন হযরত আবু বকর (রা.) এবং হযরত উমর (রা.) যে মসহাফ সংকলন করেছিলেন তা নিয়ে আসা হয়। যেন তা একটি মসহাফে বা পুস্তিকায় লিপিবদ্ধ করে সমগ্র পৃথিবীতে বিতরণ করা যায়। সমস্ত লোকদেরকে যেন একই পঠনে একত্রিত করা যায় এবং অবশিষ্ট অন্য মাসহফকে ত্যাগ করা হয়। হযরত হাফসা (রা.)-এ রকম করেন।

কুরআনের সংকলক সাহাবীগণ

হযরত উসমান (রা.) চারজন বুজুর্গ ব্যক্তিবর্গকে লেখার নির্দেশ দেন। তাঁদের নাম হচ্ছে-

১. হযরত যায়িদ বিন সাবিত আনসারী, তিনি অহী লেখক ছিলেন।

২. হযরত আবদুল্লাহ বিন যুবায়ের বিন আল আওয়াম আল কুরাশী আল আসদী (রা.)। তিনি ফকীহ সাহাবীদের মধ্যে একজন ছিলেন এবং ইলম, আমল, ফযীলত এবং বংশ সব দিকে সাহাবীদের মধ্য অগ্রসর ছিলেন।

৩. হযরত সাঈদ বিন আল আস ইবনে উমাইয়া কুরাশী আল উমায়ী। দয়াশীল, দানবীর ও প্রশংসিত ব্যক্তি ছিলেন এবং তাঁর উচ্চারণ ভঙ্গি রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর সাথে অধিক সাদৃশ্যপূর্ণ ছিল।

৪. হযরত আবদুর রহমান বিন আল হারিস বিন হিশাম বিন মুগীরা বিন আবদুল্লাহ বিন উমর বিন মাখযুম আল কুরায়শী আল মাখযুমী।

এরা চারজন কুরআনের কপি বা অনুলিপি করতে শুরু করেন। যখনই পরিভাষাগত ভাবে লেখার মধ্যে কোন বিরোধ পরিলক্ষিত হত, তখনই তাঁরা হযরত উসমানের (রা.) নিকট যেতেন। যেমন বিরোধ হয়েছিল তাবুত (تابوت) শব্দের মধ্যে। এটি কি তা দিয়ে লেখা হবে না সা দিয়ে লেখা হবে? এ নিয়ে মতানৈক্য দেখা দিলে হযরত যায়িদ বিন সাবেত বলেন التابوت এবং অন্য তিনজন কুরাইশ বলেন التابوت হবে। এর পরিপ্রেক্ষিতে তাঁরা হযরত উসমানের (রা.) খিদমতে হাজির হলেন। হযরত উসমান (রা.) বলেন, তা কুরাইশের পরিভাষায় লিখেন। যেহেতু কুরআন কুরাইশদের পরিভাষায় অবতীর্ণ হয়েছে।

হযরত উসমান (রা.) সূরাগুলোর ধারাবাহিকতার সমন্বয় সাধন করেছিলেন। তিনি দীর্ঘ সাতটি সূরাকে কুরআনের শুরুতেই এনেছিলেন। (আল্লাহ সবচেয়ে বেশী জ্ঞাত)।

এ ভাবে হযরত ইবনে জরীর আবূ দাউদ তিরমিযী এবং নাসাঈ একাধিক ইমাম থেকে বর্ণনা করেন, তাঁরা আউফ আল আ'রাবী থেকে, তিনি ইয়াজিদ আল ফারসী থেকে এবং তিনি হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণনা করেন। হযরত ইবনে আব্বাস বলেন, আমি হযরত উসমান (রা.)-কে বললাম- আপনি কোন অনুপ্রেরণায় সূরা আনফালের সাথে সূরা তওবাকে একত্রিত করলেন? অথচ সূরা তওবা তো মাসানী সূরার মধ্যে পড়ে। আর সূরা বরাত 'মাঈন' প্রকারে পড়ে। আপনি এ সূরাদ্বয়ের মাঝখানে بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম লেখেননি, যা এক সূরাকে অপর সূরা থেকে পৃথক করে। ইহাকে সাতটি দীর্ঘ সূরার ভিতর অন্তর্ভূক্ত করেছেন। কেন এটা করলেন? উত্তরে হযরত উসমান (রা.) বললেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) এভাবে করেছিলেন। যখন কোন আয়াত অবতীর্ণ হত, তখন

রাসূলুল্লাহ (সা.) তা কাতিবে অহীদেরকে ডেকে বলতেন আয়াতগুলো এ সূরায় লিপিবদ্ধ কর, এ আয়াতগুলো এ সূরায় লিপিবদ্ধ কর। সূরা আনফাল মদীনায় প্রথম অবতীর্ণ হয় এবং এর শেষে ছিল بـــــراءة এবং সূরা আনফালের বিষয়ের সাথে সূরা তাওবার বিষয়ের সাদৃশ্য রয়েছে। তাই, আমি ধারণা করছি এটি ও সূরা আনফালের অংশ। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সা.) ওফাত গ্রহণ করেছিলেন, যদিও তিনি এর কোনটা কিসের অংশ-তা পরিষ্কার ভাবে বলেননি। এ কারণেই আমি তা সূরা আনফালের সাথে সন্নিবেশিত করেছি এবং মাঝখানে بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ লিখি নাই। এভাবে ইহা السبع الطوال এর অন্তর্ভূক্ত করা হয়।

এ হাদীসের আলোকে বুঝা যায় যে, আয়াতসমূহকে ধারাবাহিকভাবে সূরায় সন্নিবেশিত করার কাজ রাসূলুলল্লাহ (সা.)-এর মাধ্যমে প্রদত্ত হয়েছিল। এ কথা ও সত্য যে, ধারাবাহিকভাবে সূরাগুলোকে সন্নিবেশিত করেছিলেন হযরত উসমান (রা.) বিন আফফান। কাজেই আয়াতের ধারাবাহিকতা রক্ষা করে কুরআনে পাক পাঠ করতে হবে। অন্যথায় তা দোষ হিসেবে গণ্য করা হবে। অপরদিকে কুরআন পাঠ করার সময় সূরার ধারাবাহিকতা রক্ষায় হযরত উসমান (রা.)-এর পদাংক অনুসরণ করা বাঞ্চনীয়। উত্তম পন্থা হচ্ছে সূরাগুলোকে একের পর এক পাঠ করা, যেভাবে রাসূলুল্লাহ (সা.) নামাযে পাঠ করতেন। রাসূলুল্লাহ (সা.) জুমার নামাযে সূরা জুমা এবং সূরা মুনাফিকুন হতে তিলাওয়াত করতেন। আবার কখনো কখনো সূরা সাব্বাহা এবং আল-গাশিয়া তিলাওয়াত করতেন। দু'সূরার মধ্যে পৃথক করা ও জায়িয আছে। যেমন রাসূলুল্লাহ (সা.) ঈদের নামাযে সূরা কাফ এবং اقتربت الساعة পড়তেন। যেমনটি হযরত ইমাম মুসলিম (রা.) আবূ কাতাদাহ থেকে বর্ণনা করেন।

বুখারী ও মুসলীম শরীফে হযরত আবু হুরাইরা (রা.) থেকে উল্লেখ আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সা.) জুমার দিন ফজরের নামাযে الم السجدة এবং هَلْ اَتٰى عَلَى الْاِنْسَانِ পড়তেন। তাফসীরে ইবনে কাসীরে বর্ণিত আছে- এক সূরাকে অন্য সূরার আগে পাঠ করা জায়িয আছে। কারণ হযরত হুযাইফা (রা.) থেকে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (সা.) সূরা বাকারা পাঠ করেন, এরপর সূরা নিসা এবং এরপর সূরা আলে-ইমরান পাঠ করেন। অথচ সূরা বাকারার পর সূরা আলে-ইমরান, এর পরে সূরা নিসা। কিন্তু তিনি সূরা আলে ইমরান না পড়ে সূরা নিসা আগে পাঠ করেন। এ হাদিসটি মুসলিম শরীফ থেকে বর্ণিত, হযরত উমর (রা.) ফজরের নামাযে প্রথমে সূরা নাহাল পাঠ করেন এর পরের রাকাতে সূরা ইউসুফ পাঠ করেন।

হযরত উসমান (রা.) হযরত হাফসা (রা.)-এর নিকট মসহাফ ফেরত দেয়ার পর উহা হযরত হাফসা (রা.)-এর নিকট ছিল। এমন কি মারওয়ান বিন আল হাকাম উম্মুল মু'মিনীন থেকে মসহাফ তালাশ করা সত্ত্বেও উম্মুল মোমেনীন তাঁর ওফাত পর্যন্ত মসহাফ দেননি। উম্মুল মু'মিনীনের মৃত্যুরপর মারওয়ান এ মসহাফ হযরত আব্দুল্লাহ বিন উমর (রা.) থেকে নিয়ে জ্বালিয়ে দেয়, যেন খুলাফায়ে রাশিদীনের বিরুদ্ধে এ মসহাফ নিয়ে আর কোন সমালোচনা না হয়। হযরত উসমান (রা.) যে মসহাফ চতুর্দিকে প্রেরণ করেছিলেন। একটি মাসহাফ মক্কায়, একটি বসরায়, একটি কুফায়, একটি সিরিয়ায়, একটি ইয়েমেনে, একটি বাহরাইনে এবং আর একটি মদিনাবাসীদের নিকট পৌছিয়েছিলেন।

হযরত উসমান (রা.) অন্যান্য সমস্ত মাসাহিফ জ্বালিয়ে দেয়ার নির্দেশ এজন্য দিয়েছিলেন, যেন প্রত্যন্ত অঞ্চলের লোকের পঠনে কোন বিরোধ সৃষ্টি না হয়। হযরত

Scanned with CamScanner

উসমান (রা.)-এর সিদ্ধান্তে অর্থাৎ মসহাফ লিপিবদ্ধকরণ কর্মসূচীতে তাঁর সমকালীন সময়ের সকলেই অবিসাংবাদিতভাবে ঐকমত্য পোষণ করেন এবং তাঁর এ ফায়সালার উপর কেউ দ্বিমত পোষন করতঃ প্রত্যাখান বা অস্বীকার করেননি। মাসহাফ লিপিবদ্ধ করণের ব্যাপারে শুধু ঐ সমস্ত লোকেরা দ্বিমত পোষণ করে, যারা হযরত উসমান (রা.)-কে শহীদ করেছিল। হযরত উসমান (রা.)-এর কৃতকর্মের মধ্যে যে সকল কাজকে বিরুদ্ধাচরণকারীরা ঘৃণা করত, তম্মধ্যে মসহাফ লিপিবদ্ধ করানোর কাজ হল একটা। কিন্তু সমস্ত সাহাবা (রা.) এবং তাবেয়ী সকলেই হযরত উসমান (রা.) এর সাথে একমত পোষণ করেন।

আবূ দাউদ তয়ালিসী বর্ণনা করেন- হযরত আলী (রা.) বলেন, যদি হযরত উসমান (রা.) এ মহতী কাজ সম্পাদন না করতেন, তা হলে অবশ্যই আমি এ কাজ সম্পাদন করতাম। অন্য বর্ণনায় আবু বকর বিন আবু মসআব বিন সাদ বিন আবু ওককাস উল্লেখ করেন, হযরত উসমান (রা.)-এর মসহাফ জ্বালিয়ে দেয়ার কাজে আমরা সকলেই সন্তুষ্ট অথবা এরকম বলা হয়েছে যে, কেউই এ কাজের জন্যে অসন্তুষ্টি প্রকাশ করেননি। এ হাদীসের বর্ণনা সূত্র সঠিক। অন্য এক রিওয়ায়েতে ইবনে মেহদী বলেন, হযরত উসমান (রা.)-এর মধ্যে দুটি চরিত্র পরিলক্ষিত হয়, যা হযরত আবূ বকর (রা.) এবং হযরত উমর (রা.)-এর নিকট ছিল না। তিনি এতো বেশী ধৈর্যশীল ছিলেন, যার কারণে তাঁকে মজলুম অবস্থায় হত্যা করা হয়েছে। দ্বিতীয়ত তিনি মানুষদেরকে একটি মাসহাফের বিষয়ে একতাবদ্ধ করতে সক্ষম হয়েছিলেন।

হযরত আলী (রা.) হযরত উসমানকে কুরআন লিপিবদ্ধ করার অনুরোধ করেছিলেন বলে যে কথা আছে তা অশুদ্ধ। প্রকৃতপক্ষে হযরত আলী (রা.) প্রথমে আরবী ব্যাকরণ প্রনয়ণ করেন এবং শব্দ সমূহকে তিন ভাগে বিভক্ত করেন - اسم - فعل - حرف অর্থাৎ বিশেষ্য, ক্রিয়া ও অব্যয়। এছাড়া অন্যান্য অনেক বিষয় উল্লেখ করেন। যা আবুল আসওয়াদ পরিপূর্ণ করেছেন। লোকেরা আবুল আসওয়াদ থেকে আহরণ করেছেন এবং উহা আরও বিস্তৃতও বিশ্লেষণ করে একটি পৃথক বিষয় হিসেবে রূপ দান করেছেন।

কিন্তু হযরত উসমান (রা.) এর মসাহেফ সম্পর্কে প্রসিদ্ধ বক্তব্য হচ্ছে, সিরিয়ার জামে মসজিদ দামেশক এর রোকনে মাশরেকীতে মসহাফ রয়েছে। এর পূর্বে তা তিবরিয়া শহরে ছিল। তারপর নিরাপত্তার অভাবজনিত কারণে ৫১৮ হিজরীতে দামেশক স্থানান্তর করা হয়।

হাফিজ ইমাদুদ্দীন ইবনে কসীর (র.) বলেন-

"আমি এ কিতাবকে দেখেছি যা মহান এবং বিস্তৃত যার প্রতিটি অংশ সুন্দর বর্ণনায় পরিপূর্ণ। সংগৃহীত হয়েছে উঠের চামড়া থেকে যা অত্যাধিক সম্মানিত।"

মোট কথা এ মসাহিফ হযরত উসমান (রা.) স্বয়ং নিজ হাতে লিখেছেন-এরকম কোন প্রমাণ নেই। এসব মসাহিফ যায়িদ বিন সাবিত এবং অন্যান্যরা হযরত উসমান (রা.)-এর সময়ে হযরত উসমান (রা.)-এর নির্দেশেই লেখেছেন। লেখা শেষ হওয়ার পর সাহাবায়ে কিরামদের সম্মুখে তা আবার পাঠ করে শুনানো হয়। এরপর সর্বত্র প্রেরণ করা হয়।

পক্ষান্তরে কোন কোন জায়গায় উল্লেখ আছে, একটি মসহফ বা কপি হযরত উসমান (রা.) নিজেই লিখেছেন তার প্রমাণ আছে এবং হতে পারে তা সেই কপি, যা তিনি মদীনায় দিয়েছিলেন।

প্রকৃতপক্ষে আরববাসীদের মধ্যে লেখার প্রচলন খুবই কম ছিল। প্রথমে হযরত বিশর বিন আবদুল মালিক- যিনি আকিদর দুমার ভাই ছিলেন- তিনি হযরত আমবার থেকে লিখা শিখেছিলেন। তারপর মক্কায় এসে সহবা বিনতে হরব ইবনে উমাইয়া উখতে আবু

সুফিয়ান সখর বিন হরব ইবনে উমাইয়ার সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। তাঁর থেকে হরব বিন উমাইয়া এবং তাঁর ছেলে সুফিয়ান লিখা শিখেন। এবং হযরত উমর (রা.) বিন আল খাত্তাব হযরত হরব বিন উমাইয়া থেকে শিখেন। হযরত মুয়াবিয়া তাঁর চাচা সুফিয়ান বিন হরব থেকে শিখেন। কথিত আছে, লিখন পদ্ধতি প্রথমে বুকা নামক গ্রামের বনি তাই নামক একটি কওম আমবার থেকে শিখেন। তারপর তা পুরো আরবে প্রচলণ করা হয়। পরবর্তীতে মানুষ তাদের কাছ থেকেই শিখেন। এ জন্যে শাবী (রা.) বলেন, আমাকে মুহাজিররা জিজ্ঞেস করেছিলেন, আপনি কোত্থেকে লিখন পদ্ধতি শিখলেন? উত্তরে আমি বলেছিলাম আমবার পরিবার থেকে।

হযরত ইবনে কাসীর বলেন, আগেকার দিনে লিখন পদ্ধতি একই ধরনের ছিল। অতপর ঐপদ্ধতি সংস্কার করলেন আবু আলী বিন মকলত আল উজীর। তাঁর এ লিখন একটি নিয়মে পরিণত হয়। হযরত আলী বিন হেলাল বাগদাদী মারুফ ইবনে আল বাওয়াব এ পদ্ধতি বিস্তৃতভাবে আরো সংস্কার করেন।

লোকেরা তাঁরই পদাংক অনুসরণ করেন। কারণ তাঁর নিয়ম ও পদ্ধতি খুবই স্পষ্ট ও বিস্তৃত ছিল। আসল কথা হচ্ছে, তৎকালে লিখন পদ্ধতির কোন নিয়ম ছিল না। মসাহেফ লেখার সময় লেখার শৈল্পিক কারনে শব্দগুলোর অবস্থান নিয়ে মতবিরোধ সৃষ্টি হয়েছিল শুধু। অর্থগত কোন পাথর্ক্য হয়নি। এ ব্যাপারে অনেক গ্রন্থ লেখা হয়েছে। এমন কি প্রসিদ্ধ ইমাম হযরত আবু ওবাইদ আল কাসেম বিন সালাম তাঁরই রচিত কিতাব فضائل القران এ ব্যাপারে বিস্তৃত বর্ণনা করেন এবং হযরত আবূ বকর বিন আবূ দাউদ (র.) আরো কিছু কথা সংযোজন করেন। যাকে صنعت قران 'শৈল্পিক কুরআন' নাম দেয়া হয়েছে। এর প্রতি গুরুত্ব আরোপ করত হযরত ইমাম মালিক (র.) বলেন, এর পদ্ধতি ছাড়া অন্য কোন পদ্ধতিতে মসহফ লেখা যাবে না। তিনি ছাড়া অন্যান্য ইমামদের মধ্যে কেউ কেউ তা অনুকরণ করেন আর কেউ কেউ বিরোধিতা করেন। বর্ণাকৃতি এবং নুকতা ইত্যাদি নিয়েও কেউ কেউ তাঁর অনুকরণ করেন, আর কতেক তা মেনে নেননি। কিন্তু সূরা, আয়াত পারা ইত্যাদির প্রচলন আমাদের কালেই বেশী আধিক্য পায়। এ ব্যাপারে সর্বোত্তম পন্থা হচ্ছে সলফে সালেহীনদের অনুসরণ করা।

সাত হরফ (سبعة احرف) সম্পর্কে আলোচনা

হযরত ইমাম বুখারী (র.)- انزل القران علي سبعة احرف অর্থাৎ কুরআন পাক সাত হরফের উপর অবতীর্ণ হয়। হাদীস সম্পর্কে বলেন, এর অর্থ হল তার পঠনরীতি সাত ধরনের।

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন,

ان رسول الله صلي الله عليه وسلم قال اقرأني جبرائيل عليه السلام علي حرف فراجعته فلم ازل استزيده ويزيدني حتى انتهي الي سبعة احرف -

রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন- হযরত জিবরাঈল (আ.) আমাকে এক ধরনের কুরআন পাঠ করান এবং আমি তাই পুনরাবৃত্তি করি। এরপর আরও বাড়িয়ে বলার জন্য বলি। তিনি আরও বাড়িয়ে বলেন, এভাবে সাতটি রীতিতে পাঠ করে তা শেষ করেন। হযরত উবাই ইবনে কা'ব (রা.) বলেন, আমি মুসলমান হওয়ার পর থেকে আজ পর্যন্ত একটি বিষয় আমার মনে এত বেশী প্রভাব বিস্তার করেছে। তা হল- আমি একটি আয়াত পাঠ করলাম কিন্তু অন্য একজন একই আয়াত অন্যভাবে পাঠ করলেন। এতে আমি তাঁকে বললাম- আমাকে রাসূলুল্লাহ (সা.) এভাবে পাঠ দান করেছেন। তিনিও বলেন, আমাকেও রাসূলুল্লাহ (সা.)

Scanned with CamScanner

আমি যেভাবে পড়েছি সেভাবে পাঠ দান করেছেন। এরপর আমি রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর কাছে আসলাম এবং আরজ করলাম! ইয়া রাসূলুল্লাহ (সা.) আপনি কী আমাকে ঐ আয়াত এভাবে পাঠ দান করেননি? রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেন হ্যাঁ। অতঃপর দ্বিতীয়জন বলেন- ইয়া রাসূলুল্লাহ (সা.) আপনি কী আমাকে এ আয়াত এভাবে পাঠদান করেননি? রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন হ্যাঁ। এরপর মহানবী (সা.) বলেন, জিবরাঈল এবং মিকাইল (আ.) আমার পাশে আসলেন। জিবরাঈল (আ.) আমার ডান পাশে এবং মিকাইল (আ.) আমার বাম পাশে বসলেন। জিবরাঈল (আ.) কুরআন এক ধরনের পাঠ করলেন। মিকাঈল (আ.) বললেন- অন্যধরনের পঠন রীতি বাড়ানো হউক। এতে জিবরাঈল (আ.) সাত ধরনের পর্যন্ত পাঠ করেন। প্রত্যেক পঠন রীতিই পূর্ণ এবং যথার্থ।

হযরত আহমদ বিন হাম্বল (র.) বলেন, হযরত ইহাইয়া বিন সাঈদ হযরত ইসমাইল বিন আবূ খালিদ থেকে রিওয়ায়ত করেন। তিনি বলেন- আমাকে আবদুল্লাহ্ বিন ঈসা হযরত আবদুর রহমান বিন আবূ লায়লা বর্ণনা করেন। তিনি উবাই বিন কা'আব থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, আমি মসজিদের ভিতর বসা অবস্থায় ছিলাম। হঠাৎ এক ব্যক্তি মসজিদে প্রবেশ করলেন এবং কুরআন পাঠ করলেন। আমি তা অস্বীকার করলাম। কিছুক্ষণ পর অপর এক ব্যক্তি মসজিদে প্রবেশ করলেন এবং অন্যভাবে কুরআন পাঠ করলেন। এ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-কে অবহিত করা হল- রাসূলুল্লাহ্ (সা.) ঐ দু'জনকেই পুনরায় পাঠ করতে বলেন। তাঁরা দু'জনেই রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর সম্মুখে পাঠ করেন এবং রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন- দু'জনেই সঠিকভাবে পাঠ করেছেন। মহানবী (সা.) যখন দু'জনকেই অনুরূপ বললেন, তা শুনে আমার মনে কিছু দ্বিধা লাগল। রাসূলুল্লাহ (সা.) এর রহস্য বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন, কুরআন একই রীতিতে অবতীর্ণ হয়েছিল; আমি উযর পেশ করি যেন আমার উম্মতের জন্যে সহজ ও সরল হয়। তারপর দু'রীতিতে অবতীর্ণ হয়। আমি এতেও প্রত্যাখান করি যেন আমার উম্মতের জন্যে সহজ হয়। অতঃপর সাত ধরনের পাঠ করা হয়। এখানে উযর পেশ করার অর্থ হচ্ছে রাসূলুল্লাহ (সা.) আরো অন্য ধরনের রীতির জন্যে আবেদন করেন। তিনি (সা.) বলেন, আমি বলেছিলাম- হে আল্লাহ্! আমার উম্মতকে ক্ষমা করুন, আমার উম্মতকে ক্ষমা করুন।

সাত হরফের অর্থ এ নয় যে, একটি বর্ণ বা হরফকে সাত রীতিতে বা পদ্ধতিতে পাঠ করা হয়েছে। এ ধরনের কোন সুযোগ নেই। বরং এর অর্থ হচ্ছে আরবদের মধ্যে ভাষার যে সাতটি উচ্চারণ ভঙ্গি রয়েছে সেভাবে অবতীর্ণ হয়েছে। অর্থাৎ এক জায়গায় এক গোত্রে প্রচলিত একটি শব্দ নেওয়া হয়েছে। অন্য জায়গায় অন্য গোত্রে প্রচলিত আরেকটি শব্দ নেয়া হয়েছে। তৃতীয় জায়গায় তৃতীয় গোত্রের একটি শব্দ নেয়া হয়েছে। এভাবে সাত গোত্রের শব্দের সমন্বয় ঘটেছে। তবে এর মধ্যে এক গোত্রের উপর অন্য গোত্রের শ্রেষ্ঠত্ব রয়েছে।

আল কলবী হযরত আবূ সালেহ থেকে এবং হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে রিওয়ায়ত করেন। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন- কুরআন সাত লুগাতের অর্থাৎ পরিভাষার উপর নাযিল হয়। তন্মধ্যে পাঁচটি লুগাত হচ্ছে হাওয়াজিন গোত্রের আজর عجز লুগাত। হযরত আবূ উবাইদ বলেন عجز হচ্ছেন বনু আসদ বিন বকর, খায়স বিন বকর, নসর বিন মুয়াবিয়া এবং সকীফ গোত্রের লোক। এরা হচ্ছেন হাওয়াজিন গোত্রের শ্রেষ্ঠ উপগোত্র, যাদের সম্পর্কে হযরত আবূ উমর বিন আলী বলেন, هوازن হচ্ছে আরবদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বিশুদ্ধ ভাষাবিদ এবং আরবদের বনী দারম হচ্ছে ভাষার মধ্যে দুর্বল। এজন্যে হযরত উমর বলেন- আমাদের মসাহেফকে কুরাইশ এবং সকীফ

قريش وثقيف গোত্রের বালকগণ সমৃদ্ধ করেন। হযরত ইবনে জরীর বলেন, পরবর্তী দু'টি লুগাত হচ্ছে, কুরাইশ এবং خزاعة। উদাহরণ স্বরূপ একটি শব্দ পেশ করা হচ্ছেঃ হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন- আমি فَاطِرِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ এর অর্থ বুঝতাম না। একদা দু'জন আরবী লোক একটি কুয়ার ঝগড়া নিয়ে আমার কাছে আসেন। তাঁদের মধ্যে একজন বলেন- انا فطرتها অর্থাৎ আমি প্রথম কুয়া খনন করেছি তখনই আমি এর অর্থ বুঝে নিলাম। হযরত ইবনে মাসউদ (রা.) বলেন- ان القران نزل من سبعة ابواب الجنة ـ অর্থাৎ অবশ্যই কুরআন জান্নাতের সাত দরজা থেকে অবতীর্ণ হয়েছে।

قال ابن جرير والا بواب السبعة من الجنة هي المعاني التي فيها من الامر والنهي والترغيب والترهيب والقصص والامثال

অর্থাৎ হযরত ইবনে জরীর বলেন 'জান্নাতের সাতটি দরজা' এর অর্থ হচ্ছে امر (নির্দেশ) نهي (নিষেধ) ترغيب (প্রেরণা), قصص (কাহিনীসমূহ) ترهيب (ধমক) امثال (উদাহরণসমূহ)। যে এ অনুযায়ী কাজ করে থাকে, সীমালঙ্ঘন করে না এবং যে সকল কাজ না করার জন্য ইসলামের নির্দেশ রয়েছে তা থেকে বিরত থাকে তার জন্য জান্নাত ওয়াজিব হয়।

এ প্রসঙ্গে অনেক কথা রয়েছে, যার সারসংক্ষেপ হচ্ছে শরীয়ত প্রণেতা উম্মতে মুহাম্মদীকে সাতটি হরফে তিলাওয়াতের সুযোগ দিয়েছেন।

এরপর আমীরুল মুমিনীন উসমান বিন আফফান যখন মানুষকে কিরাত নিয়ে তর্ক-বিতর্ক করতে দেখলেন। তাঁদের কলিমা সমূহে ভিন্ন ভিন্ন উচ্চারণের আশংকা করলেন। তখন ঐ তর্ক-বিতর্ককারী লোক সকলকে এক লুগাতের উপর একত্রিত করেন। এটি ঐ مصحف যার উপর উম্মতে মুহাম্মদীর ইজমা সংঘটিত হয় এবং তদানুযায়ী আমল চলতে থাকে। সকলেই মত প্রকাশ করেন যে, হযরত উসমান (রা.) যা করেছেন, এটি সঠিক এবং যথার্থ। প্রকৃতপক্ষে সাতটি পরিভাষা অনুযায়ী পাঠ করা অবশ্যাম্ভাবী ছিল না বরং এটি ঐচ্ছিক নির্দেশ ছিল। অর্থাৎ এভাবে পাঠ করাটা ইখতিয়ারী ছিল। (কিন্তু সাত ধরনের পঠনের মধ্যে রফা, নসব, জর, সাকীন, হরকত ও সকলের ঐক্যমতের শর্তে এক হরফের স্থানে অন্য হরফ ব্যবহারের ক্ষেত্রে ইখতিয়ার বাকী আছে, এজন্য এ ব্যাপারে কেউ সন্দেহ পোষণ করলে কাফির হবে না, কিন্তু সাত লুগাতের ব্যাপারে সন্দেহ পোষণ করলে কাফির হবে। হযরত ইমাম বুখারী (রা.)-এর রিওয়ায়ত ঃ হযরত উমর (রা.) বলেন- হুজুর (সা.)-এর জীবদ্দশায় আমি হযরত হিশাম বিন হাকীমকে সূরা ফুরকান পাঠ করতে শুনেছিলাম। আমি যখন মনযোগ দিয়ে শুনছিলাম, তখন এমন কয়েকটি লুগাত শুনছিলাম, যে সকল লুগাতের উপর রাসূলুল্লাহ (সা.) আমাদেরকে পাঠ করাননি। আমি নামায ভেঙ্গেই তাঁর উপর ঝাপিয়ে পড়ার ইচ্ছে হয়েছিল। কিন্তু আমি সালাম ফিরানো পর্যন্ত ধৈর্য্য ধরলাম। সালাম ফিরানোর সাথে সাথে তাকে চাদর দিয়ে বেঁধে ফেললাম এবং তাকে জিজ্ঞেস করলাম, কে তোমাকে এ সূরা শিখিয়েছে, যা তুমি এই মাত্র পড়েছ? তিনি উত্তর দিলেন, 'রাসূলুল্লাহ (সা.)'। আমি বললাম মিথ্যা কথা। হুজুর (সা.) তোমার পাঠের বিপরীত শিখিয়েছেন। আমি তাকে ধরেই রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর দরবারে নিয়ে গেলাম এবং রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর নিকট আরয করলাম; ইয়া রাসূলুল্লাহ্! আমি তাকে সূরা ফুরকান তিলাওয়াত করতে শুনেছি- এমন লুগাতে, যেভাবে আপনি আমাদেরকে শিখাননি। এতে রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন- হিশাম! পড় দেখি। তখন আমি তাকে যেভাবে পড়তে শুনেছিলাম, সেভাবে সে পড়ল। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন- এভাবে নাযিল হয়েছে। তারপর বলেন- হে

Scanned with CamScanner

উমর, তুমি পড়। তখন আমি হুজুর (সা.) এর শিখানো মত পাঠ করলাম। তখন রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন, এভাবেও অবতীর্ণ হয়েছে। নিশ্চয়ই আল-কুরআন সাত হরফের উপর অবতীর্ণ হয়। যেভাবে সহজ হয় সেভাবে পাঠ কর।

সাত হরফ সম্পর্কে উলামায়ে কিরামদের বক্তব্য

উলামায়ে কিরাম سبعة احرف 'সাত হরফ' সম্পর্কে কয়েক ধরনের অর্থ গ্রহণ করেন। হযরত আবূ আবদুল্লাহ্ মোহাম্মদ বিন আবূ বকর বিনফরহ আল-আনসারী আল কুরতুবী আল- মালিকী তার তাফসীরের ভূমিকায় সাত হরফের অর্থ নিয়ে উলামাদের পঁয়ত্রিশটি বক্তব্যের কথা উল্লেখ করেন। হযরত ইবনে কাসীর এ সম্পর্কে সংক্ষেপে পাঁচ ধরনের বক্তব্যের কথা উল্লেখ করেন।

(১.) এ বক্তব্য অধিকাংশ উলামায়ে কিরামের। যেমন- হযরত সুফিয়ান ইবনে উআইনা, আবদুল্লাহ্ ইবনে ওহাব, আবূ জাফর মুহম্মদ ইবনে জরীর এবং হযরত তাহাবী (রা.)-এর। তাঁরা বলেন- এ সাত ধরনের পাঠ পদ্ধতির অর্থ হচ্ছে কাছাকাছি অর্থ হয় এ রকম বিভিন্ন শব্দ প্রয়োগ করা। যেমন - اقبل ـ تعال ـ هلم

হযরত ইমাম তাহাবী হযরত আবূ বকর (র.)-এর হাদীসকে দলীল হিসেবে পেশ করেন। যার শেষে উল্লেখ আছে- অর্থাৎ- কুরআন সাত কিরাতে পড়া গেলেও লক্ষ রাখতে হবে যেন আয়াতে আজাব আয়াতে রহমতের সাথে মিশ্রিত না হয়। যেমন- اقبل تعال هلم اذهب اسرع عجل

এভাবে শব্দের ভিন্নতা সম্পর্কে মুজাহিদ ইবনে আব্বাস এবং উবাই বিন কাব থেকে বর্ণনা করেন- তিনি পড়তেন-

يَوْمَ يَقُوْلُ الْمُنَافِقُوْنَ وَالْمُنَافِقَاتِ لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا انْظُرُوْنَا نَاْ نَقْتَبِسْ مِنْ نُوْرِكُمْ لِلَّذِيْنَ امنوا

كُلَّمَا اَضَاءَ لَهُمْ مَّشَوْا فِيْهِ এবং امهلونا ـ للذين امنوا اخرونا ـ للذين امنوا ارقبونا এর স্থানে كُلَّمَا اَضَاءَ لَهُمْ مَرُّوْا فِيْهِ পড়তেন।

হযরত ইমাম তাহাবী প্রমুখ বলেন, কুরআন সাত ধরনের পাঠ করা লোকজনের জন্যে অনুমোদন প্রাপ্ত ছিল। কারণ অধিকাংশ লোকের লেখা-পড়া, অনুশীলন এবং মুখস্থ শক্তি ছিল না। এ জন্যে কুরাইশদের পরিভাষায় তিলাওয়াত করাটা কষ্টকর হতো। হযরত ইমাম তাহাবী, হযরত কাজী বাকিল্লানী, শেখ আবূ উমর বিন আবদুল বার সাত ধরনের পাঠ করা শুরুতে অনুমোদন প্রাপ্ত ছিল বটে, কিন্তু এ দুর্বলতা কাটিয়ে উঠার পর তা রহিত হয়- যখন মুখস্থ করাটা সহজ হয়, অনুশীলন, শিক্ষা ও লিখন পদ্ধতির প্রসার ঘটে, তখন তা বাতিল হয়ে যায়। হযরত ইবনে কসীর (র.) বলেন, ইমামদের মধ্যে কেউ কেউ বলেন- একই কিরাতের উপর কুরআন শরীফ একত্রিত করেন খুলাফায়ে রাশিদীনদের মধ্যে আমীরুল মুমিনীন হযরত উসমান বিন আফফান (রা.)। তাঁর অনুসরণ করার জন্যে সকলকেই নির্দেশ প্রদান করা হয়। আর তিনি একই ধরনের পাঠ করার জন্যে ঠিক ঐ মুহূর্তেই পবিত্র কুরআন একত্রিত করেন, যখন কিরাত বা পাঠ নিয়ে তর্ক-বিতর্ক বেশ বেড়ে গিয়েছিল- উম্মতে মুহাম্মদীর মধ্যে তা নিয়ে পরিলক্ষিত হচ্ছিল বিরোধ, এমনকি একারণে একে অপরকে কুফরীর প্রতি সম্পৃক্ত করে ছিলেন। তখন তিনি মাসাহেফের বিন্যাস সাধন করেন এবং ধারাবাহিকতা রক্ষা করেন, যেভাবে হযরত জিব্রাঈল (আ.) শেষ বারের মতো রাসুলুল্লাহ্ (সা.) এর দরবারে পেশ করেছিলেন, যা রাসুলুল্লাহ্ (সা.)-এর জীবনের শেষ রমদ্বানে হয়ে ছিল।

(২.) এ কুরআন সাত লুগাতে নাযিল হয়েছিল, এর অর্থ এ নয় যে, সম্পূর্ণ কুরআন পাককে সাত লুগাতে পাঠ করা যাবে। বরং কুরআন পাকের কিছু কিছু অংশ এক লুগাতে, আবার কিছু কিছু অংশ অন্য লুগাতে পড়া যাবে। হযরত ইমাম খাত্তাবী (র.) বলেন- কখনো কখনো কিছু শব্দকে সাত লুগাতেই পড়া যায়। যেমন- يلعب ـ يرتع وعبد الطاغوت শব্দগুলো।

হযরত কাজী আল বাকিল্লানী বলেন, হযরত উসমান (রা.)-এর বক্তব্য- انه نزل بلسان قريش অর্থাৎ কুরআন কুরাইশের পরিভাষায় নাযিল হয়- এ কথার মর্ম হচ্ছে, কুরআনের অধিকাংশ কুরাইশের পরিভাষা অনুযায়ী অবতীর্ণ হয়, সম্পূর্ণ কুরআন নয়। কারণ এ ব্যাপারে কোন দলীল নেই। আল্লাহ্ তায়ালা বলেন- قرانا عربيا অর্থাৎ কুরআন আরবী ভাষায় অবতীর্ণ হয়। এরকম বলা হয়নি যে, قرانا قريشيا কুরআন কুরাইশদের ভাষায় অবতীর্ণ হয়। আরব বিশেষ্যের মধ্যে সকল গোত্র অন্তর্ভূক্ত হয়। হিজাজ হোক, বা ইয়ামন। অনুরূপভাবে শেখ আবূ উমর বিন আবদুল বার বলেন- সমস্ত কুরআন কুরাইশদের পরিভাষায় অবতীর্ণ হয়নি। কারণ সঠিক পাঠের মধ্যে কুরাইশদের পরিভাষা ছাড়াও অন্য পরিভাষা রয়েছে। যেমন কুরআন শরীফে হামযার অস্তিত্ব আছে অথচ কুরাইশের পরিভাষায় হামযার অস্তিত্ব নেই। হযরত ইবনে আতিয়া বলেন, হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, আমি فَاطِرَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ এর অর্থ বুঝিনি। শেষ পর্যন্ত এক গ্রাম্য আরবীর কথা শুনলাম সে বলে-

لبئر ابتدأ حفرها انا فطرتها

যে কুপটি সে প্রথমে খনন করেছিল এ সম্পর্কে বলল-انا فطرتها

(৩.) কুরআন পাকের সাতটি পরিভাষা মুদার গোত্রের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। এ প্রসংগে হযরত উসমান (রা.) বলেন-

ان القران نزل بلغة قريش وقريش هم بنو النضر بن الحارث على الصحيح

অর্থাৎ কুরআন অবতীর্ণ হয় কুরাইশদের পরিভাষায় এবং কুরাইশ হচ্ছে বনু নযর বিন আল-হারিস। এটি সত্য উক্তি। (ইবনে মাজাহ)

(৪.) হযরত ইমাম বাকিল্লানী কতেক উলামা থেকে বর্ণনা করেন। কুরআন তিলাওয়াতের সাতটি পদ্ধতি রয়েছে, তন্মধ্যে (১.) প্রথম পদ্ধতি হল যাতে সূরত ও অর্থের মধ্যে পরিবর্তন ঘটেনা। যেমন - يضيق صدري

يضيق রফা বা পেশ এর সাথে অধিক সংখ্যক লোকেরা পাঠ করে। এবং 'يعقوب' এর কিরাত অনুযায়ী নসব বা যবর এর সহিত পাঠ করা হয়। এ কারণে যে, এটি আতফ عطف হয়েছে এর পূর্বের অংশ يكذبون এর উপর। (২.) এর মধ্যে এক প্রকার আছে, যার আকার ও প্রকৃতিতে পরিবর্তন হয়না; কিন্তু অর্থের মধ্যে পরিবর্তন হয়। যেমন - فقالوا ربنا باعد بين اسفارنا যেহেতু ربنا এটি হচ্ছে امر এর ছীগাহ অর্থাৎ নির্দেশমূলক ও প্রার্থনা মূলক ক্রিয়া এভাবেই অধিকাংশ লোক পাঠ করেন। يعقوب এর কিরাত অনুযায়ী এটি হচ্ছে 'ماضي' এর ছীগা অর্থাৎ অতীতকালের ক্রিয়া। হযরত ইবনে কাসীর, আবূ উমর এবং হিশাম এরা بعد শব্দ বাবে তাফঈল থেকে পাঠ করেন এবং মসহাফে এ শব্দ আলিফ ছাড়াই লিপিবদ্ধ হয়েছে। দু'ধরনের কিরাত মশহুর হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। (৩.) তন্মধ্যে এক ধরনের কিরাত যার আকৃতি এবং অর্থের মধ্যে বর্ণ বা হরফ দ্বারা পার্থক্য সৃষ্টি হয়। যেমন ننشزها এবং ننشرها প্রথমে راء দিয়ে পড়া হয়েছে এবং দ্বিতীয় বার راء দিয়ে পাঠ করা হয়েছে। সাত ধরনের মধ্য হতে এহচ্ছে দু'টি প্রকার।

Scanned with CamScanner

৪. আর এক প্রকার হচ্ছে, শব্দের মধ্যে পার্থক্য পরিলক্ষিত হবে কিন্তু অর্থের মধ্যে কোন পার্থক্য হয় না। যেমন عهن كالصوف المنفوش বা كالعين المنفوش এখানে عهن এবং صوف মতলক রয়েছে। যেটি ইচ্ছে পড়া যায়। ধরা বাঁধা নিয়ম নেই। কিন্তু এ ধরনের কিরাত মুতাওয়াতির নয়। নির্ভরযোগ্য মত অনুযায়ী এখানে صـــوف হচ্ছে عهن এর তাফসীর।

(৫.) শব্দ এবং অর্থের মধ্যে মতবিরোধ হওয়া। যেমন طلع منضود - طلح منضود কিন্তু খুব কম লোকই আইন দিয়ে পড়ে। কুরআনে পাকেও তা উল্লেখ নেই। অধিকন্তু তা ইমামের মসহাফের পরিপন্থি।

(৬.) আগে পিছে হওয়া। যেমন - وجاءت سكرة الموت بالحق অথবা سكرة الحق بالموت তবে দ্বিতীয় ধরনের কিরাত খুবই বিরল, طع এর মতো।

(৭.) কোন অংশ বর্ধিত হওয়া। যেমন تسعة وتسعون نعجة انثي শব্দে انثي বর্ধিত করে পড়া। এটি খুবই বিরল। এটি ঘটনার ব্যাখ্যার জন্যে এসেছে। কারণ نـعـجـة উটনী কে বলা হয়। অন্য আয়াতে আছে-

واما الغلام فكان كافرا و كان ابواه مؤمنين - فان الله بعد اكراههن لهن غفور رحيم -

আলোচ্য আয়াত দুটিতে كافر ও لهن শব্দ অতিরিক্ত।

৫. সাত হরফের অর্থ হচ্ছে কুরআনের বিধান সমূহ। এগুলো হচ্ছে امـــر (নির্দেশ), نهي (নিষেধ), وعده (প্রতিজ্ঞা বা প্রতিশ্রুতি) وعيد (শাস্তির ভয়), قصص (কাহিনী) محادله (বিতর্ক), امثال (উদাহরণসমূহ।)

ইবনে আতীয়া বলেন, এ বক্তব্য দুর্বল। কারণ এগুলোকে হরফ নামে অভিহিত করা যায় না তবে একথার উপর সকল একমত যে, এমন ভাবে কিরাত পড়া যাবে না যার দ্বারা অর্থ বিকৃত ও পরিবর্তিত হয়।

সূরার ধারাবাহিকতা

প্রথমে সূরা 'মুফসসল অর্থাৎ দীর্ঘ সূরাগুলোতে জান্নাত এবং দূযখের উল্লেখ আছে এমন আয়াতগুলো নাযিল হয়। যখন মানুষ ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট হয়, তখন হারাম হালালের আয়াতগুলো নাযিল হয়।

হযরত উসমান (রা.) আবূ বকর ও উমর (রা.) মাসাহিফকে ধারাবাহিকতায় রূপদিয়ে বিভিন্ন জায়গায় প্রেরণ করার আগে লোকেরা কুরআন শরীফ বিচ্ছিন্ন ভাবে তিলাওয়াত করতেন। অতঃপর যখন হযরত উসমান (রা.) হযরত আবূ বকর (রা.) এবং হযরত উমর (রা.) এর মাসহাফ হযরত হাফসা বিনতে উমর (রা.) থেকে নিয়ে নিলেন, তখন তিনি অনেক সূরার তারতীব পরিবর্তন করলেন। হযরত উসমান (রা.)-এর এ প্রচেষ্টা গবেষণামূলক ছিলনা- ইলহাম এর মাধ্যমে তিনি এ কাজ সম্পন্ন করেন। আরও একটি কারণ হতে পারে, তিনি রাসূলুল্লাহ (সা.) থেকে এ ধারাবাহিকতায় তিলাওয়াত শুনেছেন। অতএব একথা নিঃসন্দেহে বলা চলে, হযরত উসমান (রা.)-এর ধারাবাহিকতার উপর ইজমা' প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। কিছু সংখ্যক সাহাবা এ ব্যাপারে দ্বিমত করলেও পরবর্তীতে এ সংকলন এবং ধারাবাহিকভাবে কুরআন লিপিবদ্ধ করাকে তাঁরা মেনে নিয়েছেন। রাসূলুল্লাহ (সা.) যে ধারাবাহিকভাবে তিলাওয়াত করতেন, সে সম্পর্কে হযরত হুজাইফার (রা.) সহীহ হাদীস সুস্পষ্ট স্বাক্ষর বহন করে।

انه عليم السلام قرأ في قيام الليل البقرة ثم النساء ثم ال عمران -

অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ (সা.) তারাবীর নামাজে আগে সূরা বাকারাহ পাঠ করেন, তারপর সূরা নিসা এবং তারপর সূরা আলে ইমরান পাঠ করেন।

কিন্তু আয়াতের ধারাবাহিকতায় পরিবর্তন করায় ইখতিয়ার কারো নেই। কারণ ঐ বিষয়টি রাসূলুল্লাহ (সা.) থেকে প্রবর্তিত হয়। এ ধারাবাহিকতা ঐ সমস্ত মাসাহিফ থেকে নেয়া হয়েছে, যা রাসূলুল্লাহর (সা.) সময় লেখা হয়েছিল। হযরত ইমাম কুরতবী কিতাবুর-রদ গ্রন্থে আবূ বকর আমবারী থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, যে ব্যক্তি আগের সূরাকে পিছে এবং পিছের সূরা আগে করে, সে যেন কুরআনের আয়াতের শৃঙ্খলাকে নষ্ট করে এবং হরফ পরিবর্তনকারীর মতো কাজ করে। তিনি হযরত উসমান (রা.)-এর মসাহিফ থেকে সনদ পেশ করেন, যেহেতু এর ধারাবাহিকতা সর্বজন খ্যাত।

আসল কথা হল বর্তমানের মাসহাফ-এ সূরাসমূহের যে ধরাবাহিকতা বিদ্যমান, তা সাহাবায়ে কিরামের ইজতিহাদের ফসল এবং ইলহামের মাধ্যমে সম্পন্ন হয়েছে। কিন্তু আয়াতের ধারাবাহিকতা এবং সূরা সমূহের শুরুতে বিসমিল্লাহ্ -এ সব বিষয় রাসূলুল্লাহ্ (সা.) এর মাধ্যমেই প্রবর্তিত হয়েছে।

মাসহাফ এ নুকতার প্রচলন

খলীফা আবদুল মালিক বিন মারওয়ানের নির্দেশে হাজ্জাজ বিন ইউসুফ কুরআন মজীদে নুকতার প্রচলন করেন। তিনি যখন ওয়াসিত-এ ছিলেন, তখন হযরত হাসান বসরী (র.) এবং ইয়াহইয়া বিন উমর (রা.)-কে দিয়েই এ কাজ করিয়েছিলেন। কেউ কেউ বলেন- মাসাহফে নুকতা সর্বপ্রথম আবুল আসওদ আদদুওয়ালী দিয়েছিলেন। উল্লেখ্য যে, মুহাম্মদ বিন সিরীন এর একটি মাসহাফ ছিল, যার মধ্যে ইহাইয়া বিন ইয়ামর নুকতা লাগিয়েছিলেন। হযরত কাতাদাহ (রা.) বলেন ইয়াহইয়া বিন ইয়া'মরই সর্বপ্রথম نـقـطـه নুকতা লাগিয়েছিলেন। কিন্তু আবূ আমর আদ-দানী হযরত ইবনে মাসউদ (রা.) থেকে বর্ণনা করেন-তিনি তা'শীরকে পছন্দ করতেন না এবং মুজাহিদও তা পছন্দ করতেন না। তবে হযরত ইমাম মালিক (র.) এতে কোন অসুবিধা নেই বলে মন্তব্য করেন।

হযরত ইবনে মাসউদ (রা.) বলেন- আল্লাহ্ তায়ালার কিতাবে যা নেই, তা সংযোজন কর না। হযরত আবূ আমর আদ্দানী বলেন নুকতা লাগানোর ব্যাপারে সমস্ত মুসলিম জাহান একমত পোষণ করেন, তাই সর্বত্র এ নুকতা স্বীকৃত হয়েছে।

সাহাবীদের মধ্যে যারা ক্বারী ছিলেন

রাসূল (সা.) ইরশাদ করেন- তোমরা চার জন লোক থেকে কুরআন শিখবে। ১. হযরত আবদুল্লাহ্ বিন মাসউদ (রা.) ২. হযরত সালিম (রা.) ৩. হযরত মুআয বিন জাবাল (রা.) এবং ৪. হযরত উবাই বিন কা'আব (রা.)। প্রথমোক্ত দু'জন অগ্রগামী মুহাজিরীনদের অন্তর্ভুক্ত। সালিম হচ্ছেন হযরত আবূ হুযাইফার গোলাম, যাকে আবূ হুজাইফা আযাদ করে দিয়েছিলেন এবং শেষোক্ত দু'জন অর্থাৎ হযরত মুআয বিন জাবাল এবং হযরত উবাই বিন কা'ব হচ্ছেন উচু শ্রেণীর আনসার। তাঁদের মর্যাদা সম্পর্কে বুখারী এবং মুসলিম শরীফে হাদীস রয়েছে।

কুরআন পাঠে প্রশান্তি এবং ফিরিশতার অবতরণ-

হযরত লাইস বলেন, আমাকে যায়েদ বিন হাদী, হযরত মুহাম্মদ বিন ইবরাহীম এবং

Scanned with CamScanner

তিনি হযরত উসাইদ বিন হুদাইর থেকে বর্ণনা করেন। একদা রাত্রিকালে উসাইদ বিন হুদাইর (রা.) সূরা বাকারা পাঠ করছিলেন। তখন তাঁর ঘোড়াটি তাঁর নিকটে বাঁধা অবস্থায় ছিল। ঘোড়াটি নড়াচড়া করতে লাগল। কিন্তু তিনি যখন কুরআন তিলাওয়াত বন্ধ করে দিলেন তখন ঘোড়াটি চুপচাপ হয়ে যায়। এ সময় ঘোড়ার কাছে তাঁর ছেলে হযরত ইহাইয়া ছিলেন। তাঁর আশংকা হল ঘোড়া তাঁর ছেলেকে পদ দলিত করতে পারে। এ জন্য তিনি কুরআন তিলাওয়াত বন্ধ করে আসমানের দিকে তাকালেন। এক সময় তা অদৃশ্য হয়ে গেল তখন যা দেখার তা দেখলেন। যখন সকাল হল, তিনি রাসূল (সা.)-কে একথা বলেন। হযরত রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন, হে ইবনে হুদাইর! তুমি পড়াতে থাকলে না কেন? তিনি বলেন, আমি আশংকা করেছিলাম যে, এটা ইয়াহইয়াকে আঘাত করতে পারে, কারণ এটা তার নিকটবর্তী ছিল। হযরত ইবনে হুদাইর বলেন, আমি আসমানের দিকে তাকিয়ে একটি ছায়া দেখতে পেলাম যার ভেতর কতেক সংখ্যক প্রদীপের মত দেখছিলাম। তিনি ফরমাইলেন হে হুদাইর তুমি কি জান! তা কি ছিল, তিনি বলেন, জ্বিনা। হুজুর (সা.) ফরমান ওরা ছিল ফিরিশতা যারা তোমার কুরআন পাকের আওয়াজ শুনে নিকটবর্তী হয়েছিল। হুজুর (সা.) বলেন এরা হচ্ছেন ফিরিশতা। ইবনে হুদাইরের কুরআন পাঠের সুললিত কণ্ঠ শ্রবণ করার লক্ষে আসমান থেকে অবতরণ করেছিলেন। তুমি যদি সকাল পর্যন্ত পড়তে থাকতে তা হলে ফিরিশতাও সকাল পর্যন্ত অবস্থান করতেন। তাদেরকে মানুষ দেখে ফেলত, মানুষের দর্শন থেকে তারা লুকাতে পারত না।

রাসূলুল্লাহ (সা.) কুরআন এবং সুন্নাহ ছাড়া অন্য কিছু রেখে যাননি

কুতাইবা বিন সাইদ হাদীস বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, আমাদেরকে হযরত সুফিয়ান বলেন এবং সুফিয়ান হযরত আবদুল আজীজ বিন রাফী থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, আমি এবং শাদ্দাদ বিন মা'কল হযরত ইবনে আব্বাসের খিদমতে হাজির হলাম। হযরত ইবনে আব্বাসকে শাদ্দাদ বিন মাকল জিজ্ঞেস করেন। রাসূলুল্লাহ (সা.)কী রেখে গেছেন? উত্তরে ইবনে আব্বাস বলেন- কোন কিছু রেখে যাননি শুধু কুরআন এবং সুন্নাহ ছাড়া। অনুরূপভাবে আমরা হযরত মুহাম্মদ বিন আল-হানফিয়াকে ও জিজ্ঞেস করলাম, তিনিও একই উত্তর দিলেন।

হযরত আবূ দারদা বলেন, নবীরা তাদের ওয়ারিশদের জন্যে দীনার বা দিরহাম রেখে যাননি, রেখে গেছেন ইলম বা বিদ্যা। যে ব্যক্তি ইলম বা বিদ্যা আহরণ করল, সে প্রাচুর্যে পূর্ণ হল। এ জন্যে হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, রাসূল (সা.) দু'টি বিষয় রেখে গেছেন, তা হল কুরআন এবং সুন্নাহ।

যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন-

ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِيْنَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا (الاية)

অর্থাৎ আমি ওয়ারিশ বানিয়েছি আমার কিতাবের আমার বান্দাহ্দের মধ্য থেকে ঐ সমস্ত লোকদেরকে, যাদেরকে আমি নির্বাচিত বা পছন্দ করেছি। (সূরা ফাতির-৩২)

সুললিত ও বিশুদ্ধভাবে কুরআন তিলাওয়াত করা

আল্লাহ্ তায়ালার বাণী- أَوَلَمْ يَكْفِهِمْ أَنَّا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ يُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ - "তাদের জন্যে কি এটা যথেষ্ট নয়, আমি আপনার উপর কুরআন অবতীর্ন করেছি, যা তাদেরকে তিলাওয়াত করে শুনানো হবে?" (সূরা ঃ আনকাবূত-৫১)

হযরত আবূ-হুরাইরা (রা.) থেকে বর্ণিত, আল্লাহ্ তায়ালা আর কোন বিষয় এত মনযোগ দিয়ে শুনেন না যেরূপ শুনেন কোন নবীর তিলাওয়াত, যখন নবী তা সুললিত কণ্ঠে তিলাওয়াত করেন। يتغنى দ্বারা উদ্দেশ্য হল উচ্চস্বরে তিলাওয়াত। সুফিয়ান বলেন এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো সুমধুর স্বরে তিলাওয়াত। ইমাম মুসলিম ও নাসায়ী হযরত সুফিয়ান বিন উআইনা হতে এর কারণ বর্ণনা করেন এভাবে-

নবীগণের সৃষ্টিগত পরিপূর্ণতার কারণে তাঁদের তিলাওয়াত হয় সুমধুর, তিলাওয়াত থাকে পরিপূর্ণ নম্রতা। অন্যদিকে আল্লাহ তায়ালা তাঁর পূণ্যবান ও পাপী সকল বান্দার আওয়াজই শুনে থাকেন। যেমন আয়িশা (রা.) বলেন, "পবিত্র ঐ সত্ত্বা যার শ্রবণ শক্তি সকল আওয়াজকে বেষ্টন করে আছে-" তবে মুমিন বান্দার কুরআন তিলাওয়াতের আওয়াজ গুরুত্ব সহকারে মনযোগ দিয়ে শুনেন। উপরোক্ত হাদীসে উল্লেখিত اذن শব্দের অর্থ মনযোগ দিয়ে শ্রবণ। যেমন আল্লাহ্ তায়ালা বলেন-

إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ - وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ - وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ -

এ আয়াতেও اذن শব্দের মর্ম হচ্ছে মনযোগ দিয়ে শ্রবণ করা। হযরত ফুদ্বালা (রা.) থেকে বর্ণিত এক হাদীসে আছে, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন- আল্লাহ তায়ালার সর্বাধিক মনযোগ ঐ ব্যক্তির প্রতি যিনি সুমধুর স্বরে কুরআন তিলাওয়াত করেন।

হযরত আবুল কাসিম হযরত সায়িব (রা.) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, আমাকে হযরত সাদ (রা.) বলেন। ভাতিজা তুমি কী কুরআন পড়েছ? উত্তরে আমি বল্লাম, হ্যাঁ। তিনি বললেন-সুর করে কুরআন পড়। কারণ আমি রাসূলুল্লাহ (সা.) থেকে শুনেছি। রাসূল্লাহ (সা.) বলতেন -

غنوا بالقران ليس منا من لم تغن بالقران وابكوا فاذ لم تقدرو اعلي البكاء فتباكوا -

অর্থাৎ সুর করে কুরআন পাঠ কর। যে কুরআন সুললিত কণ্ঠে পাঠ করে না, সে আমার উম্মত নয়। তিলাওয়াতের সময় কাঁদো, যদি কান্না নিজে করতে না পার তা হলে কাঁদার ভান কর। সুন্দরভাবে কুরআন পাঠ কর। হযরত আবূ দাউদ সাদ বিন আবূ ওককাস হতে বর্ণনা করেন-

ان هذا القران نزل بحزن فاذا قرأتموه فابكوا فان لم تبكوا فتباكوا وتغنوا به فمن لم يتغن به فليس منا

অর্থাৎ এ কুরআন চিন্তার কথা নিয়ে অবতীর্ন হয়েছে। যখন তা পাঠ করবে, তখন কাঁদো। যদি কাঁদতে না পার, কাঁদার ভান কর। মধুর সুরে কুরআন পাঠ কর। যে সুললিত কণ্ঠে কুরআন পাঠ করবে না, সে আমার উম্মত নয়। এখানে تغني শব্দের অর্থ সুন্দর ও সুললিত কণ্ঠ। ইমামগণের নিকট থেকে এভাবে বর্ণনা এসেছে। মোটামুটি হযরত আবু মূসার কিরাত থেকে উদৃত করে ঈমামগণ বলেন- معني التغني صوتا حسنا مع خشية تامة ورقة اهل اليمن 'تغن' শব্দের অর্থ সুন্দর ও সুমধুর কণ্ঠ এবং আল্লাহ্ তায়ালার পূর্ণ ভয় মনে রেখে কুরআন পাঠ করা।

তারতীলের সাথে কুরআন তিলাওয়াত

আল্লাহ্ তায়ালা বলেন- وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا - আর তারতীলের সাথে কুরআন তিলাওয়াত কর। (মুযযাম্মিল)

وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَىٰ مُكْثٍ "আমি কুরআন অবতীর্ণ করেছি খন্ড খন্ডভাবে যাতে তুমি তা মানুষের নিকট পাঠ করতে পার ক্রমে ক্রমে।" (বনী ইসরাঈল-১০৬)

Scanned with CamScanner

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) فرقناه শব্দের অর্থ فصلنا দ্বারা ব্যাখ্যা প্রদান করেন। এবং مكث শব্দের অর্থ ভয়ভীতি চিন্তা-গবেষণা এবং ভক্তি শ্রদ্ধার সাথে পাঠ করা। ভয়-ভীতির আয়াত পাঠ করলে আল্লাহ্ তায়ালার আযাব থেকে পানাহ চাওয়া এবং সুসংবাদের আয়াত পাঠ করা হলে তা অর্জনের জন্যে প্রলুব্ধ হওয়াকে হযরত ইমাম শাফিয়ী (র.)-এর অনুসারীরা সুন্নত বলেছেন। তারতীল শব্দের অর্থ হচ্ছে বেশী তাড়াতাড়ি না করা এবং বেশি আস্তে আস্তেও না পড়া বরং মধ্যমভাবে পড়া এবং চিন্তা করে করে পাঠ করা। কারণ আল্লাহ্ তায়ালা বলেন-

كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ - (ص-٢٩)

"এক কল্যাণময় কিবাত, ইহা আমি আপনার প্রতি অবতীর্ণ করেছি, যাতে মানুষ ইহার আয়াতসমূহ অনুধাবন করে এবং বোধ শক্তি সম্পন্ন ব্যক্তিগণ গ্রহণ করে উপদেশ।"

হযরত ইমাম আহমদ (র.) আবদুল্লাহ্ বিন উমর থেকে এবং তিনি রাসূলুল্লাহ্ (সা.) থেকে বর্ণনা করেন- রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন, কিয়ামতের দিন কুরআন তিলাওয়াতকারীকে বলা হবে, তুমি দুনিয়াতে যেভাবে (তারতীল) সুললিত কণ্ঠে কুরআন তিলাওয়াত করতে তেমনিভাবে তিলাওয়াত কর এবং আরোহণ কর। তোমার অবস্থান হবে সর্বশেষ আয়াতে যা তুমি তিলাওয়াত করতে।

সাত কারীর পরিচয়

১. হযরত আবূ আমর, যবান আল-আলা, আল বসরী (র.), তিনি মুজাহিদ বিন জবর, সাইদ বিন জুবায়ির হতে কিরাত শিক্ষা লাভ করেন, তিনি আবদুল্লাহ বিন আব্বাস (রা.) থেকে, তিনি উবাই বিন কা'আব থেকে এবং তিনি রাসূলুল্লাহ (সা) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি একশ চুয়ান্ন বৎসর বয়সে ইন্তিকাল করেন। তাঁর রাবী হচ্ছেন তিনজন।

২. হযরত ইবনে কাসির (রা.)- তিনি হচ্ছেন আবূ মুহাম্মদ আবদুল্লাহ্ বিন কাসির আল-মালিকী। তিনি মুজাহিদ বিন জবর থেকে বর্ণনা করেন। তিনি ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণনা করেন। তিনি হযরত উবাই বিন কা'আব থেকে বর্ণনা করেন। তিনি রাসূলুল্লাহ (সা.) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি ১২০ বৎসর বয়সে ইন্তিকাল করেন। তাঁর রাবী চারজন।

৩. নাফে বিন আবু-নাঈম আল-মাদানী (র.) তিনি আবূ জা'ফরের নিকট পাঠ করেন। তিনি তাবিয়ী ছিলেন। তিনি হযরত ইবনে আব্বাস এবং আবূ হুরাইরা (রা.) থেকে এবং তাঁরা উবাই বিন-কা'আব এবং তিনি রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর নিকট থেকে পাঠ করেন। তিনি ১৭৯ বৎসর বয়সে ইন্তিকাল করেন। তাঁর রাবী হচ্ছেন তিনজন।

৪. হযরত আবদুল্লাহ বিন আমির (র.) তিনি হযরত মুগীরাব নিকট পড়েন। তিনি উসমান বিন আফফান (রা.)-এর কাছ থেকে এবং তিনি রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর নিকট পাঠ করেন। তিনি ১২৮ বৎসর বয়সে ইন্তিকাল করেন। তাঁর রাবী দুই জন।

৫. হযরত আসিম বিন বাহ্দালা (র.), তিনি হযরত যর বিন হুবাইশের নিকট, তিনি হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদের নিকট এবং তিনি রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর নিকট পাঠ সম্পন্ন করেন। তিনি অন্য এক সনদে আবূ আবদুর রহমানের নিকট, তিনি আবদুল্লাহ্ বিন হাবীব সালমার নিকট পাঠ শিখেন। তিনি হযরত হাসান এবং হোসাইন (রা.)-এর শিক্ষক ছিলেন। তিনি হযরত আলীর (রা.) নিকট এবং তিনি

রাসূলুল্লাহ (সা.) নিকট কুরআন পাঠ করেন। তিনি ১২৮ বৎসর বয়সে ইন্তিকাল করেন, তাঁর রাবী হচ্ছেন চার জন।

৬. হযরত হামজা বিন হাবীব আযযিয়াত আল-আজালী- তিনি হযরত সুলাইমান বিন মিহরান এর নিকট, তিনি ইহাইয়া বিন ইসাবের নিকট, তিনি যর বিন জাইশ, তিনি হযরত আলী বিন আবূ তালিব, তিনি হযরত উসমান এবং ইবনে মাসউদ (রা.)-এর কাছ থেকে এবং তাঁরা রাসূলুল্লাহ (সা.) নিকট থেকে শিখেন। তিনি ১৫৬ বছর বয়সে ইন্তিকাল করেন। তাঁর রাবী হচ্ছেন চার জন।

৭. হযরত আলী বিন হামযা আল-কাসায়ী। তিনি হামযা বিন হাবীবের নিকট, তিনি ইহাইয়া বিন ইসাবের নিকট, তিনি যর বিন জাইশের নিকট, তিনি হযরত উসমান, হযরত আলী এবং ইবনে মাসউদের নিকট পাঠ করেন। তাঁরা রাসূলুল্লাহ (সা.) এর নিকট পাঠ করেন। তিনি ১৮৯ বৎসর বয়সে ইন্তিকাল করেন।

কিরাত দীর্ঘ করা

হযরত কাতাদাহ্ (রা.) বলেন-আমি হযরত আনাস বিন মালিককে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর কিরাত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বলেন- রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর কিরাত লম্বা ছিল। তারপর তিনি بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ পাঠ করে শুনান بِسْمِ اللّٰهِ কে মদ করে পড়েন, এবং الرحيم কে মদ করে পড়েন। উম্মে সালমা (রা.) থেকে বর্ণিত-

قالت كان رسول الله صلى الله يقطع قرائه بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ - اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ اَلرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ - مَالِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ- هكذ - رواه ابو داود -

তিনি বলেন- রাসূলুল্লাহ (সা.) কুরআন পৃথক পৃথক করে পড়তেন যেমন- بسم الله الرحمن الرحيم পড়ে এরপর اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ اَلرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ। এভাবে হযরত আবূ দাউদ বর্ণনা করেন।

কিরাত পাঠে তারজী' প্রসংগে

হযরত আবদুল্লাহ্ বিন মুগাফফল থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন- আমি নবী (সা.)-কে দেখলাম, তখন তিনি স্ত্রী উট বা পুরুষ উটের উপর ছিলেন। যা দ্বারা তিনি ভ্রমণ করতেন এবং সূরা 'ফতহ' বা সূরা ফতহের কিছু অংশ পাঠ করেন এবং তিনি তাতে ترجيع করেন। সে দিন ছিল মক্কা বিজয়ের দিন। ترجيع শব্দের অর্থ একই আওয়াজ বার বার করা। যেমন বুখারী শরীফে আছে, রাসূল (সা.) পড়লেন আ-আ-আ। আলিফ। সম্ভবতঃ তা জানোয়ারের ঝাঁকীতেই দু' তিন বার উচ্চারিত হতো।

সুললিত কণ্ঠে কিরাত পড়া

হযরত আবূ মুসা (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন- হে আবূ মূসা আপনাকে দাউদ (আ.)-এর বংশধরদের বাঁশরী সমূহের একটি বাঁশরী (সুন্দর কণ্ঠস্বর) প্রদান করা হয়েছে। কেননা হযরত আবূ মূসা আশআরী তিলাওয়াতের কণ্ঠ খুব সমধুর ছিল। কি পরে আসবে হযরত ইমাম মুসলিম এ হাদীসকে একটি কাহিনীর সাথে বর্ণনা করেন এবং হযরত ইমাম বুখারী (র.) من لم يتغن بالقران এর প্রসংগে সুমধুর ও সুললিত কণ্ঠের ব্যাপার তা উল্লেখ করেন।

আউযুবিল্লাহ পাঠ

এ কথা ধ্রুব সত্য যে, শয়তান প্রত্যেক মানুষের জন্যেই দুশমন। তন্মধ্যে মুমিনদের বেলায় শয়তান জাহেরী দুশমন। কারণ মুমিন আল্লাহ তায়ালার উপর বিশ্বাস রাখে। আল্লাহ্তায়ালা

Scanned with CamScanner

বলেন- إِنَّ الشَّيْطَانَ لِلْإِنْسَانِ عَدُوٌّ مُّبِينٌ - শয়তান মানুষের জাহেরী শত্রু।
যারা আল্লাহ্ তায়ালার উপর বিশ্বাস রাখে না, তাদের জন্যে শয়তান গোপন দুশমন। কারণ নাস্তিকরা এ ব্যাপারে অজ্ঞ। মানুষের সাথে শয়তানের সম্পর্ক যেন বৃক্ষের সাথে ছালের সম্পর্ক অথবা পরগাছার মত, যার সম্পর্ক মূল মাটির সাথে হয় না। তা শুধু বৃক্ষে জড়িয়ে থাকে। স্পষ্টতঃ মনে হয়- এ পরগাছা যেন বৃক্ষকে ছায়া দিচ্ছে এবং সহায়তা করছে। অথচ প্রকৃতপক্ষে এটি গাছের জন্য ক্ষতিকর। শেষ পর্যন্ত বৃক্ষের রস চুষে খেয়ে বৃক্ষকে নষ্ট এবং ধ্বংস করে দেয়। এভাবে শয়তান মানুষের রক্ষাকারী সেজে বা ক্ষতি দেখিয়ে মানুষকে আল্লাহ্ তায়ালার ইবাদত থেকে সরিয়ে রাখে। অথবা ইবাদত করার জন্যে অনুপ্রেরণা দিয়ে রিয়া বা অহংকার নামক বিষ ক্রিয়া সৃষ্টি করে ইবাদত নষ্ট করে দেয়। শয়তান মানুষকে পিছনের দিক থেকে ধরে যদি ইবাদত থেকে বিরত রাখতে না পারে, সে ক্ষেত্রে ইবাদতের জন্যে প্রেরণা জুগিয়ে সামনে চালিয়ে- অহংকার নামক বিষক্রিয়া অন্তরে সৃষ্টি করে ইবাদত নষ্ট করে।
শয়তান আল্লাহ তায়ালার নিকট যে পাঁচটি জিনিষের জন্যে দুআ করেছিল। সে পাঁচটি প্রার্থনাই ছিল মানুষের বিরুদ্ধে। এগুলো হল-
১. হে আল্লাহ! আমাকে কিয়ামত পর্যন্ত সময় দিন।
২. আমি যেন যেকোন মানুষের রূপ ধারণ করতে পারি।
৩. প্রত্যেক আদম সন্তানের মুকাবিলায় আমাকে একটা সন্তান দান কর।
৪. মানুষের অন্তরে প্রভাব বিস্তার করার ক্ষমতা দাও।
৫. আমাকে আদম সন্তানের রক্তপ্রবাহে চলার শক্তি দাও।
আল্লাহ্ তায়ালা এ পাঁচটি দুআই কবুল করেন।
এত জঘন্য শত্রু যার উদ্দেশ্য সর্বদা মানুষকে আল্লাহ্ তায়ালা থেকে পৃথক করে রাখা। সে ক্ষেত্রে আল্লাহ্ তায়ালার সান্নিধ্য লাভের জন্যে কতটুকু সতর্কতার সাথে কাজ করতে হবে, তা সহজেই বোধগম্য। এমনকি এ ধরনের শত্রুর রক্তিম ছোবল থেকে রক্ষা করতে পারেন একমাত্র আল্লাতায়ালা-তিনি ছাড়া দ্বিতীয় আর কেউই শয়তানের ধোঁকা থেকে রক্ষা করতে পারেন না।
এর উদাহরণ হচ্ছে এরূপ- কেউ যদি কোন বাদশাহের সাথে সাক্ষাত করতে চায় এবং বাদশার দরজায় যদি ক্ষতিকারক কোন জানোয়ার থাকে এবং প্রতিরোধকারী কেউও থাকে, সে ক্ষেত্রে- সাক্ষাৎকারীকে কি করতে হবে? তাকে অবশ্যই বাদশাহের সাথে যোগাযোগ করতে হবে। তখন বাদশাহ এ ক্ষতিকারক জানোয়ার যেন সাক্ষাৎকারীকে আসতে বাঁধা না দেয় সে ব্যবস্থা করবেন এবং সাক্ষাৎকারী সহজেই বাদশাহর সাক্ষাৎ লাভ করতে পারবে।
এভাবে أَفْضَلُ الْعِبَادَتِ সর্বোত্তম ইবাদতে ইলাহী নামাযের ও সঠিকতা কবুলিয়ত নির্ভরশীল কুরআনের সঠিকতার উপর, তাছাড়া আল্লাহ্ তায়ালার সান্নিধ্য লাভের সর্বোত্তম মাধ্যম হচ্ছে কুরআন। সুতরাং কুরআন শরীফ পাঠ করার প্রাক্কালে অহংকার-রিয়া এ সবের প্রভাবে প্রভাবিত হয়ে-ইবাদত নষ্ট হয়ে যাওয়ার অধিক আশংকা রয়েছে- এজন্যে আল্লাহ্ তায়ালা বলেন- فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ - অর্থাৎ যখনই তুমি কুরআন পাঠ করবে তখনই শয়তান মরদুদ থেকে পরিত্রাণের জন্য আল্লাহ্ তায়ালার সাহায্য প্রার্থনা কর। এ আয়াতের আলোকে কতেক ইমাম সাহেবান- أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ পড়াকে মুস্তাহাব বলেছেন, কেউ কেউ সুন্নাত বলেছেন, আবার কেউ কেউ ওয়াজিবও বলেছেন। শেষোক্ত মতামতই গ্রহণযোগ্য।

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

আরবী ভাষায় যে সকল হরফ রয়েছে তার মধ্যে ب হচ্ছে- বিনম্র হরফ যা দ্বারা নম্রতা প্রকাশ হয়। এ জন্যে এ হরফ দ্বারা কুরআন শরীফ শুরু করা হয়েছে। 'বা' হরফ اللّٰه নামের সাথে মিলে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করেছে। রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর বাণী - من تواضع لله رفعه الله যে আল্লাহ তায়ালার উদ্দেশ্যে নম্রতা প্রকাশ করবে, আল্লাহ্ তায়ালা তাঁকে উচ্চ আসনে আসীন করবেন। এভাবে জুদী পাহাড়ে হযরত নূহ্ (আ.)-এর নৌকা স্থির হওয়া, জবলে রহমতে হযরত আদম (আ.)-এর তওবা কবুল হওয়া এবং মক্কা শরীফে কাবাগৃহ স্থাপন, এসব আল্লাহ্ তায়ালার দয়া এবং মেহেরবাণী ছিল। কারণ এখানে একই ধরণের নম্রতা বিদ্যমান ছিল। اللّٰه শব্দটি اسم غير مشتق অর্থাৎ যার থেকে আর কোন শব্দ বের হয় না। এ শব্দটি আল্লাহ্ তায়ালার সত্তার জন্যে নির্দিষ্ট ও নির্ধারিত, এই শব্দ দ্বারা আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কিছু বুঝা যাবে না। ইহা الـــــــــه এর বিপরীত।
الرحمٰن শব্দটি দুনিয়া এবং আখিরাতের জন্যে ব্যবহার করা হয়। الرحيم শুধু আখিরাতের জন্য ব্যবহৃত হয়। এ জন্য বলা হয় - رَحْمَنَ الدُّنْيَا وَرَحِيْمَ الْأٰخِرَةِ। হযরত ইকরামা বলেন رحمٰن একটি রহমতের সমন্বয় এবং رحيم শব্দে একশত রহমতের সমন্বয়। যেমন আল্লাহ্র রাসূল (সা.) বলেন- আল্লাহ্তায়ালার একশত রহমতের মধ্যে একটি রহমত দুনিয়াবাসীকে প্রদান করেছেন এবং অবশিষ্ট নিরানব্বইটি রহমত নিজের জন্যে রেখেছেন। তা দিয়ে কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ তায়ালা তার বান্দাহ্কে রহম করবেন।

বিসমিল্লাহ-এর ফযীলত

সকল ইল্ম বা জ্ঞান রয়েছে আসমানী চার কিতাবে। আর এই চার কিতাবের ইল্ম একত্রিত হয়েছে কুরআনে পাকে। কুরআনে পাকের সমস্ত জ্ঞান রয়েছে সূরা ফাতিহার মধ্যে এবং সূরা ফাতিহার সমস্ত ইল্ম বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম এর মধ্যে নিহিত। এ আয়াতের সমস্ত ইল্ম বিস্মিল্লাহ্ এর 'ب'-এর মধ্যে নিহিত। কেননা সমস্ত ইল্মের মূল উদ্দেশ্য এবং ভিত্তি হচ্ছে- রবের সান্নিধ্য লাভ করা এবং এ 'ب' الـــصـــاق (মিলন) অর্থে এসেছে। সুতরাং ب বান্দাহকে রব পর্যন্ত পৌছায়'। রবের সান্নিধ্য লাভই হচ্ছে বান্দাহর অন্তিম বাসনা।
হযরত ইমাম নিশাপুরী বলেন- একদা হযরত মূসা (আ.) অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন এবং পেটের মধ্যে কঠিন ব্যথা হয়েছিল। রোগমুক্তির জন্য তিনি আল্লাহ্ তায়ালার কাছে দু'আ করলেন। আল্লাহ্ তায়ালা তাঁকে এক ময়দানের একটি ঘাসের কথা বলে দেন। তিনি তা খেয়ে আল্লাহ্ তায়ালার হুকুমে ভাল হন। তারপর দ্বিতীয়বার তাঁর এ অসুখ হয়েছিল। তিনি ঐ ঘাস খেলেন, কিন্তু অসুখ তো সারেনি বরং অসুখ আরও বেড়ে গেল। তারপর তিনি বলেন- হে আল্লাহ! আমি এ ঘাস প্রথমবার খেয়েছিলাম, তাতে আপনি ভাল করে দিয়েছিলেন; কিন্তু দ্বিতীয়বার খাওয়াতে আমার ক্ষতি হয়ে গেল। আল্লাহ্ তায়ালা উত্তর দিলেন, হে মূসা! তুমি প্রথমবার আমার নির্দেশে ঘাসের কাছে গিয়েছিলে, তাই তুমি ভাল হয়েছিলে, কিন্তু দ্বিতীয়বার নিজেই গিয়েছ, তাই অসুখ বেড়ে গেছে। তুমি কী জাননা- দুনিয়াতে যা আছে, সবই বিষ, কিন্তু উহার প্রতিষেধক হচ্ছে আমার নাম, অর্থাৎ আমার নাম নিয়ে খেলেই বিষ পানি হয়ে যায়।
আর একটি ঘটনা- হযরত রাবিয়া (রা.) এক রাতে তাহাজ্জুদ এবং নফল নামাযে কাটাচ্ছিলেন- যখন সকাল হলো, তখন ঘুমিয়ে পড়লেন। তাঁর ঘরে একটি চোর প্রবেশ করল এবং তাঁর কাপড় নিয়ে দরজা দিয়ে বের হতে চেষ্টা করল; কিন্তু রাস্তা

Scanned with CamScanner

পেল না, তারপর কাপড় রেখে দিল, এতে সে দরজার সন্ধান পেল- এভাবে তিন বার করল, সে সময় ঘরের কোণ থেকে একটি আওয়াজ আসল। চুরি করা মাল রেখে বের হয়ে যা। যদিও বন্ধু ঘুমিয়ে গেছেন কিন্তু বাদশাহ্ জাগ্রত আছেন।

আরো একটি ঘটনা ঃআল্লাহর এক ওলী-ছাগল চরাতেন। তাঁর ছাগলের কাছে বাঘ আসত, কিন্তু ছাগলের কোন ক্ষতি করত না। একদিন এক লোক ঐ ছাগলের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। এ অবস্থা দেখে বললেন, কখন থেকে বাঘ এবং ছাগলের মধ্যে সন্ধি হয়েছে। রাখাল জবাব দিলেন- যখন থেকেই রাখাল আল্লাহ্ তায়ালার সাথে সন্ধি করেছেন।

বর্ণিত আছে- ফিরাউন খোদায়ী দাবী করার আগে নির্দেশ দিয়েছিল- তার দরজার বাইরে যেন بسم الله বিসমিল্লাহ লেখা হয়। যখন খোদায়ী দাবী করল এবং হযরত মূসাকে (আ.) তার নিকট প্রেরণ করা হল এবং তাকে আল্লাহ্ তায়ালার একত্বের দাওয়াত দেয়া হল, তখন ফিরাউনের মধ্যে হিদায়েতের কোন লক্ষণ দেখা গেলনা। হযরত মূসা (আ.) বললেন- হে আল্লাহ! আমি কতদিন পর্যন্ত তাকে দাওয়াত দিতে থাকব? অথচ আমি তার মধ্যে কোন ভাল লক্ষণ দেখছিনা। তখন আল্লাহ তায়ালা বলেন- হে মূসা, সম্ভবত; তুমি ফিরাউনের ধ্বংস চাচ্ছ এবং তার কুফুরের প্রতিই লক্ষ্য করছ, অথচ আমি তার দরজায় যা লেখা আছে, তার প্রতি লক্ষ্য করছি।

দরজার বাইরে বিসমিল্লাহ্ লেখার কারণে এক কাফির ধ্বংস থেকে রক্ষা পেয়ে গেল, তখন যে লোক জীবনের আদি থেকে অন্ত পর্যন্ত- নিজের অন্তরে-আল্লাহ্ তায়ালার কলিমা লেখে রেখেছেন, তাঁর অবস্থা কী হবে? যখন আল্লাহ্ তায়ালা নিজের নাম রাহমান এবং রাহীম রেখেছেন- সে ক্ষেত্রে আমরা কেন রহম পারব না।

গোলাম কোন জিনিষ ক্রয় করলে তা জানোয়ার হোক বা উপভোগ্য কোন জিনিষ, সেক্ষেত্রে তার উপর বাদশাহের প্রতীক বা মোহর লাগিয়ে দেয়া হয়, যেন শত্রুরা তাতে লোভ না করে। তেমনি আল্লাহ্ তায়ালা বলেন- হে আমার গোলাম। শয়তান তোমার দুশমন। তুমি যখন কোন কাজ বা ইবাদত শুরু করবে, তখন তুমি এর উপর আমার নামের নিশান লাগিয়ে দেবে। আর বলবে- بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

হযরত নূহ (আ.) যখন নৌকার উপর সওয়ার হলেন তখন بِسْمِ اللّٰهِ مَجْرِيهَا وَمُرْسَاهَا এ অর্ধ কলিমা পাঠ করেই মুক্তি পেয়ে গেলেন। যে ব্যক্তি সারা জীবন এ কলেমার অনুশীলন করতে থাকে- সে নাজাত থেকে বঞ্চিত কেন হবে?

উল্লেখ্য, মানুষ তিন ধরনের হয়ে থাকে।

১. سابق بالخيرات অর্থাৎ যারা কল্যাণের দ্বারা আগের সারিতে স্থান করে নেয়।

২. مقتصد ন্যায়পরায়ণ, যে ন্যায়-নীতি মেনে চলে।

৩. নিজের উপর নিজে অত্যাচার করে। নিজের খারাপ নিজেই করে বসে।

প্রথম প্রকারের লোকদের জন্য- তিনি আল্লাহ, দ্বিতীয় প্রকার অর্থাৎ ন্যায়পরায়ণ লোকদের জন্য তিনি রহমান আর তৃতীয় প্রকার লোকের জন্য তিনি রাহীম। আল্লাহ الرحيم এর গুণে মানুষের ত্রুটি প্রকাশ না করে বরং লুকিয়ে রাখেন। মানুষ নিজের ক্ষতি নিজে এতো বেশী করে- নিজের পিতাও যদি তা জানত তাকে ছেড়ে চলে যেত, নিজের সহধর্মীনী যদি জানত তা হলে সেও তাকে ছেড়ে চলে যেত, প্রতিবেশী যদি জানত, তবে তার ঘর বাড়ী ধ্বংস করে দিত।

আল্লাহ তায়ালার اَللّٰه নামের বরকতে মানুষ তাঁর বন্ধুত্ব লাভ করতে পারে। যেমন- আল্লাহ তায়ালা বলেন- اَللّٰهُ وَلِيُّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا রাহমান নামের কারনে তাঁর মুহব্বতের দাবী করা যায় যেমন আল্লাহ বলেন-إِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمٰنُ وُدًّا

"অবশ্যই যারা ঈমান আনে, নেক কাজ করে- শীঘ্রই রাহমান তাদের জন্য মহব্বতকারী নির্ধারণ করে দিবেন।" (সূরা ঃ মারইয়াম-৮৯) رحيم রাহীম নামের কারনে তিনি তার রাহমত প্রবাহিত করেন। যেমন আল্লাহ বলেন- وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِيْنَ رَحِيْمًا

আল্লাহ তায়ালা বান্দাহদের জন্য ছয়টি জায়গায় রাহীম :

১. কবর আর কবরের ভিতর যে ভঙ্কর দৃশ্যের অবতারণা হবে তা থেকে রক্ষার ক্ষেত্রে। ২.কিয়ামতের অন্ধকারের সময় ৩. আমলনামা পাঠ করার সময় ৪. সীরাত পার হওয়ার সময় যে ভীতির সঞ্চার হবে, তখন। ৫. দূযখ আর এর শাস্তির সময় ৬. জান্নাত আর এর শ্রেণী প্রদানের সময়।

হযরত ঈসা (আ.) একটি কবরের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন, তখন তিনি দেখলেন আজাবের ফিরিস্তারা ঐ মৃত ব্যক্তিকে আযাব দিচ্ছেন। তিনি নিজের কাজ শেষ করে ফেরার পথে আবার ঐ কবরের পাশ দিয়ে আসলেন। তখন দেখলেন, ঐ কবরে রাহমতের ফিরিস্তা নিয়োজিত হয়েছেন আর ঐ কবর নূরে পূর্ণ হয়ে গেছে। এতে তিনি আশ্চর্য হয়ে গেলেন। তারপর তিনি নামায আদায় করলেন আর আল্লাহ্ তায়ালার নিকট দু'আ করালেন। আল্লাহ্ তায়ালা তাঁর নিকট ওহী পাঠালেন- হে ঈসা! এ বান্দাহ্ গোনাহগার ছিল, আর মৃত্যুকালে তার স্ত্রীকে অন্তঃসত্তা রেখে এসেছিল। তার স্ত্রীর একটা ছেলে হয়, সে তাকে লালন পালন করে বড় করল এরপর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সোপর্দ করল। এ বাচ্চাকে শিক্ষক بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ শিক্ষা দিলেন। এতে আমার লজ্জা এসে গেল, আমার বান্দাহকে যমীনের পেটের ভিতর আগুনের শাস্তি দেয়া হবে, অথচ তার ছেলে জমীনের পিঠে আমার নাম স্মরণ করছে।

আল্লাহ্ তায়ালার এক ওলী এক টুকরো কাগজে بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ লিখে ওসীয়ত করে গেলেন- এটা যেন তার কফিনের মধ্যে দেয়া হয়। তাঁকে এর কারণ জিজ্ঞেস করা হল। তিনি উত্তর দিলেন-আমি কিয়ামতের দিন বলব ইলাহী, আপনি কিতাব পাঠিয়েছিলেন, আর এ কিতাবের শিরোনাম ছিল بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ। আপনি কিতাবের শিরোনাম অনুসারে আমার সাথে ব্যবহার করুন।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ এ উনিশটি হরফ রয়েছে। আর দূযখের রক্ষক হচ্ছেন উনিশ জন। আল্লাহ তায়ালা এ উনিশটি অক্ষরের বিনিময়ে উনিশ জন রক্ষকের পরীক্ষা থেকে রক্ষা করবেন।

দিন-রাত চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে পাঁচ ঘন্টার জন্যে পাঁচ ওয়াক্ত নামায ফরয করা হয়েছে, আর বাকী উনিশ ঘন্টা খালি রয়ে গেছে। যে সময়ের মধ্যে বান্দাহ্ আল্লাহ তায়ালার স্মরণে ডুবে থাকতে পারে না। এ উনিশ হরফ উনিশ ঘন্টা গোনাহের কাফফারা বা পরিপূরক।

সূরা তাওবায় যুদ্ধ বিগ্রহ হত্যাকান্ড সম্পর্কে উল্লেখ থাকার কারণে সূরার শুরুতে بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ লেখা হয়নি। তা ছাড়া জবেহ্ করার সময় بسم الله اكبر বলা কর্তব্য, কিন্তু بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ বলতে বলা হয়না। যখন আল্লাহ্ তায়ালা ফরয নামাযের মধ্যে দৈনিক সতর বার এ কালিমা সমূহ পাঠ করার তওফীক দিয়েছেন। এতে এটাই প্রমাণ হয় যে, বান্দাহকে শাস্তি দেয়ার জন্যে সৃষ্টি করা হয়নি বরং রহমত এবং সওয়াব প্রদানের জন্যে সৃষ্টি করা হয়েছে।

রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেন- যে ব্যক্তি আল্লাহ্ তায়ালার মহত্ব ও শ্রেষ্ঠত্বের প্রতি সম্মান

Scanned with CamScanner

প্রদর্শন করত ঃ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ লেখা আছে, এমন কোন কাগজ যমীন থেকে উঠাবেন, আল্লাহ্ তায়ালা তাঁকে সিদ্দীকীনের অন্তর্ভুক্ত করবেন। আর তার পিতা-মাতার উপর থেকে আজাব হ্রাস করা হবে, যদিও বা তারা মুশরিক হয়।

হযরত আলী (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন- যখন بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ আয়াত নাযিল হলো, তখন রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন, প্রথমে যখন এ আয়াত হযরত আদম (আ.)-এর উপর অবতীর্ণ হয়, তখন আদম (আ.) বলেন- আমার সন্তানগণ এ কলিমার ওসীলায় আযাব থেকে রক্ষা পাবে, যতক্ষণ তা পড়তে থাকবে। এর পর আল্লাহ এ আয়াত উঠিয়ে নিলেন। এরপর হযরত ইব্রাহীম (সা.)-এর উপর অবতীর্ণ করেন। হযরত ইব্রাহীম তা অগ্নিকুণ্ডের মধ্যে পাঠ করলে আল্লাহ্ তায়ালা অগ্নি শীতল করে দেন। তারপর আবার এ আয়াত উঠিয়ে নিলেন। তারপর হযরত সুলাইমান (আ.)-এর উপর অবতীর্ণ করেন- তখন ফিরিস্তারা বলতে লাগলেন- আল্লাহ্র কসম- এখন সুলাইমান (আ.)-এর রাজত্ব পূর্ণ হয়েছে। তারপর এ আয়াত উঠিয়ে নিলেন। তারপর আল্লাহ্ তায়ালা এ আয়াত আমার উপর নাযিল করেন। আমার উম্মতরা পড়তে থাকবে بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ আর এরই বরকতে কিয়ামতের দিন তাদের নেকীর পাল্লা ভারী হবে, তারা বেহশতে প্রবেশ করবে।

হযরত আবূ হুরাইরা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন, হে আবূ হুরাইরা! তুমি উযু করার সময় بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ বলবে। এতে ফেরেশতারা তোমার উযু শেষ না হওয়া পর্যন্ত নেকী লেখতে থাকবে। স্ত্রী সহবাসের সময় بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ বলবে, এ জন্যেও ফেরেশতারা তোমার জন্য নেকী লেখতে থাকবে, যতক্ষণ পর্যন্ত গোসল করনি। এ সহবাসে যদি কোন সন্তান লাভ কর তা হলে তার জন্যে তার নিঃশ্বাস এর সংখ্যা অনুযায়ী নেকী লেখা হবে। আর সে সন্তান থেকে যে সন্তান হবে, তাদের নিঃশ্বাস অনুযায়ী নেকী লেখা হবে-এভাবে বংশ পরম্পরায় নেকী লেখা হবে।

হে আবূ হুরাইরা! তুমি কোন সওয়ারীর উপর আরোহন করলে বলবে بسم الله والحمد لله তা হলে সওয়ারীর প্রতি কদমে তোমার জন্যে নেকী লেখা হবে। নৌকায় সওয়ার হলে বলবে بسم الله والحمد لله - তা হলে নৌকা থেকে নেমে আসার পূর্ব পর্যন্ত তোমার জন্যে নেকী লেখা হবে।

হযরত আনাস (রা.) হতে বর্ণিত, মহানবী (সা.) ইরশাদ করেন ঃ যখন বনি আদম স্ত্রী সহবাস করার জন্যে কাপড় খুলে ফেলে, তখন بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ তাঁদের লজ্জাস্থান ও শয়তানের চোখের মধ্যে পর্দা হয়।

এ থেকে এ ইংগিত পাওয়া যায় যে, আল্লাহ্ তায়ালার নাম যদি সহবাসের সময় শত্রুদের পর্দা হতে পারে, তা হলে কেন আখিরাতে তোমার আর দুযখ রক্ষীদের মধ্যে পর্দা হতে পারবে না।

সূরা ফাতিহা

মক্কায় অবতীর্ণ

৭ আয়াত, ১ রূকু

سورة الفاتحة مكية

আয়াতঃ ৭ রূকূআঃ ১

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ﴿١﴾ اَلرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ﴿٢﴾ مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ ﴿٣﴾ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ ﴿٤﴾ اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ ﴿٥﴾ صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ﴿٦﴾ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ ﴿٧﴾

দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে

১. সকল প্রশংসা জগতসমূহের প্রতিপালক আল্লাহরই,
২. যিনি দয়াময়, পরম দয়ালু,
৩. কর্মফল দিবসের মালিক।
৪. আমরা শুধু তোমারই ইবাদত করি, শুধু তোমারই সাহায্য প্রার্থনা করি,
৫. আমাদেরকে সরল পথ প্রদর্শন কর
৬. তাদের পথ, যাদেরকে তুমি অনুগ্রহ দান করেছ
৭. তাদের পথ নয় যারা ক্রোধে-নিপতিত ও পথভ্রষ্ট।

Scanned with CamScanner

সূরা ফাতিহার নাম

সূরা ফাতিহার বেশ কয়েকটি নাম আছে। প্রায় নাম থেকেই বরকতের ইংগিত পাওয়া যায়। যেমন

১. فاتحة الكتاب এ নামকরণের কারণ হচ্ছে- যেহেতু এ সূরা দিয়ে কুরআনুল কারীম শিক্ষা, নামাযের কিরাত শুরু করা হয় এবং প্রত্যেক কিতাবের শুরুতেই সূরা ফাতেহা দিয়ে আল্লাহ্ তায়ালার প্রশংসা করা হয়। যেমনিভাবে কুরআনের শুরুতেই সূরা ফাতিহা রয়েছে।

২. الحمد ঃ কারণ এ সূরার শুরু الحمد শব্দ দিয়ে করা হয়েছে।

৩. اُمُّ الْكِتَابَ و ام القران যেহেতু এটি কুরআনের আসল এবং প্রত্যেক আসমানী কিতাবের আসল। কারণ এ সূরায় আল্লাহতায়ালার একত্ব, শেষ বিচারের দিনের কথা সম্পর্কে উল্লেখ করা হয়েছে অথবা এ জন্যে যে, এ সূরা সকল আসমানী কিতাবের সার। যার মধ্যে আল্লাহ্ তায়ালার প্রশংসা, সেবায় নিয়োজিত থাকা, আল্লাহ তায়ালর নির্দেশ পালন এবং আধ্যাত্মিকতা সম্পর্কে বলা হয়েছে। বা এ জন্যে যে, সকল ইলমের উদ্দেশ্য হচ্ছে আল্লাহ্ তায়ালার মারিফত হাসিল করা এবং ইবাদত করা- যা এ সূরায় উল্লেখ করা হয়েছে অথবা হয়তঃ এ জন্যে ام الكتاب বা ام القران রাখা হয়েছে যে- এ সূরা কুরআনের সূরার মধ্যে সর্বোত্তম। যেমন-মক্কা মোয়াজ্জমাকে ام القري অর্থাৎ গ্রামের মধ্যে সর্বোত্তম গ্রাম বা আসল বলা হয় ইহা শহরগুলোর মধ্যে শ্রেষ্ঠ শহর বা সমস্ত শহরের মূল হওয়ার কারণে।

৪. سبع المثاني সূরা ফাতিহাকে سبع المثاني বলা হয়, কারণ এ সূরাটি সাত আয়াত বিশিষ্ট। অধিকন্তু এ সূরা প্রত্যেক নামাযের মধ্যে অবশ্যই দু'বার পড়তে হয়। (অর্থাৎ নামাযের প্রথম দু'রাকাতে অবশ্যই পড়তে হয়) বা এ সূরার প্রথম অংশে আল্লাহর বান্দাহ তার রবের শুধু প্রশংসা করেছে। আর শেষ অংশে তার রব যে নিয়ামত দান করেছেন তার উল্লেখ রয়েছে। অথবা مثاني শব্দটি استثناء (পৃথক করা) থেকে নির্গত। এ সূরা অন্যান্য উম্মত থেকে উম্মতে মুহাম্মদী (সা.)-কে পৃথক করেছে। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন- কসম ঐ জাতের, যার হাতের মুঠোয় আমার প্রাণ, সূরা ফাতিহার মতো মূল্যবান সূরা তাওরাত, ইঞ্জিল ও যবুরের মধ্যে নাযিল করা হয়নি। এটি سبع المثاني ও কুরআনে আযিম। অথবা এ সূরা দু'বার নাযিল হয়েছে বা এ সূরায় আল্লাহ্ তায়ালার প্রশংসা করা হয়েছে এজন্য এই নাম রাখা হয়েছে।

৫. وافيه ঃ এ শব্দের অর্থ পূর্ণ। যেহেতু এ সূরা নামাযের মধ্যে পুরো পাঠ করা ওয়াজিব। এ সূরা ছাড়া অন্য সূরা পড়লে নামায পূর্ণ হবেনা।

৬. الكافيه ঃ এ শব্দের অর্থ হচ্ছে সম্পূরক। কারণ এ সূরা অন্য সূরার সম্পূরক হতে পারে কিন্তু অন্য সূরা ফাতিহার সম্পূরক হতে পারে না।

৭. شفاء و الشافية রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন- সূরা ফাতিহা প্রত্যেক রোগের শিফা বা প্রতিষেধক।

৮. اساس ঃ এ শব্দের বাংলা অর্থ হল মূল ভিত্তি। যেহেতু এটি কুরআন পাকের প্রথম সূরা যা মূল বিষয়ের মতো বা এ সূরা সমস্ত ইবাদতের মূল। হযরত ইমাম শা'বী (র.) বলেন- আমি হযরত আবদুল্লাহ্ বিন আব্বাস (রা.) থেকে শুনেছি, তিনি বলতেন, পবিত্র কুরআন হচ্ছে অন্যান্য সকল কিতাবের اساس বা ভিত্তি। আর কুরআনের মূল হচ্ছে ফাতিহাতুল কিতাব অর্থাৎ সূরা ফাতিহা। আর সূরা ফাতিহার মূল হল بسم الله الرحمن الرحيم যখন তুমি অসুস্থ হবে বা তোমার অন্য কোন অসুবিধে হয়, অবশ্যই তুমি اساس পাঠ করবে, আল্লাহ্র হুকুমে ভাল হয়ে যাবে।

৯. الصلوة ঃ নবী করীম (সা.) বলেন আল্লাহ বলেন, الصلوة অর্থাৎ সূরা ফাতিহা আমার ও আমার বান্দাহর মধ্যে দু'অংশে বিভক্ত করে। যেহেতু সূরা ফাতিহার মধ্যে আল্লাহ্ তায়ালার মহত্ব বর্ণনা করা হয়েছে। যার কারণে নামাযে সূরা ফাতিহা পাঠ করা ওয়াজিব হয়েছে।

১০. سورة تعليم المسئلة ঃ যেহেতু এ সূরার মাধ্যমে আল্লাহ্ তার বান্দাকে কীভাবে প্রশ্ন করতে হয়, কীভাবে চাইতে হয়- সে শিক্ষা প্রদান করেছেন। এ সূরা প্রথমে আল্লাহ্ তায়ালার প্রশংসার মাধ্যমে শুরু করা হয়। তারপর দু'আর মধ্যে ইখলাস অর্থাৎ লোক দেখানো বা রিয়া থেকে মুক্ত রাখার শিক্ষা প্রদান করা হয়েছে।

১১. سورة الكنز ঃ হযরত আলী (রা.) থেকে বর্ণিতঃ তিনি বলেন- সূরা ফাতিহা আরশে আযীমের ভান্ডার থেকে মক্কা শরীফে নাযিল করা হয়।

হাদীস থেকে এ কথা স্পষ্ট হয়ে উঠে-সূরা ফাতিহা মক্কী সূরা। যেসব বুর্জগান এ সূরাকে মাদানী সূরা বলেন- তাদের কথার সমঝোতা করা যায় এভাবে- এ সূরা দু'বার অবতীর্ন হয়। তবে দু'বার অবতীর্ণ হয়েছে বলে মুতাওয়াতির কোন প্রমাণ নেই।

সূরা ফাতিহার ফযীলত

এ সূরার ফযীলত হচ্ছে - এ সূরায় ب নেই। কারণ ثبور শব্দটি ب হরফ দিয়ে লেখা হয়। যেমন আল্লাহ বলেন- لَا تَدْعُوا الْيَوْمَ ثُبُورًا وَّاحِدًا وَّادْعُوا ثُبُورًا كَثِيرًا -(سورة فرقان-١٤) আর جيم নেই কারণ জিম হরফ দিয়ে جهنم লেখা হয়। حا নেই, যেহেতু حا দিয়ে حزي অর্থাৎ চিন্তা-পেরশানী শব্দ লেখা হয়। এ সূরায় زاء হরফ নেই। যেহেতু زاء যা হরফ দিয়ে زقوم আর زقوم (এক প্রকার কাটাদার বৃক্ষ যা জাহান্নামীদেরকে খাওয়ানো হবে) লেখা হয়। شين নেই কারণ এ হরফ দিয়ে شهيق লেখা হয়। এর অর্থ হচ্ছে দুর্ভাগ্য। এ সূরার মধ্যে ظا নেই যেহেতু তা لظي শব্দের মধ্যে ব্যবহৃত হয়। আর এতে فا ফা হরফ নেই যেহেতু فا হরফ দিয়ে فراق অর্থাৎ ছিন্নতা লিখা হয়।

عذاب শব্দের ইংগিত বহন করে, এরকম সাতটি হরফ সূরা ফাতিহা থেকে বাদ দিলেন, আর এ সংখ্যা জাহান্নামের দরজার সংখ্যার সমান- যেমন আল্লাহ্ তায়ালার বাণী, لَهَا سَبْعَةُ أَبْوَابٍ لِّكُلِّ بَابٍ مِّنْهُمْ جُزْءٌ مَّقْسُومٌ "জাহান্নামের সাতটি দরজা রয়েছে। দরজা ভিন্ন ভিন্ন অংশে বিভক্ত।" (সূরা ঃ হিজর-৪৪)

একথা গভীরভাবে চিন্তা করলে -দৃঢ়ভাবে বলা যায় যে, যে ব্যক্তি সূরা ফাতিহা পাঠ করবে সে জাহান্নাম থেকে নয় শুধু জাহান্নামে প্রবেশ করা থেকে নাজাত পাবে। জাহান্নামের প্রজ্জ্বাল অগ্নিশিখা এবং জাহান্নামের শাস্তি থেকে মুক্তি পাবে।

আরবী ব্যাকরণের দৃষ্টিতে الحمد হল মুবতদা, আর لله হল خبر খবর-অর্থাৎ الحمد ثابت لله সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর।

আর إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ হচ্ছে 'হামদ' শব্দের বয়ান। যেমনত বলা হয়েছে- আল্লাহতায়ালার প্রশংসা বা হামদ কীভাবে করা যাবে? উত্তরে বলা হয় ايـاك نعبد -এভাবে বর্ণনা কর। হামদ এর উপর যে الف لام আছে তাকে الف لام جنسي হিসেবে আনা হয়েছে। এতে একথা বুঝানো হয়েছে যে, প্রশংসা জাতীয় যত কিছু আছে সবকিছু আল্লাহতায়ালার। رب শব্দের অর্থ মালিক অথবা রব শব্দটি مصدر অর্থাৎ ক্রিয়া মূল। প্রশংসা বা وصف এর মধ্যে আধিক্য বুঝানোর জন্যে নেয়া হয়েছে। যেমন- عدل শব্দটি আল্লাহ্ তায়ালার জন্যে নির্ধারিত عدل শব্দের অর্থ

Scanned with CamScanner

ন্যায়পরায়ণতা। অধিকাংশ জায়গায় رب শব্দটি مضاف অর্থাৎ সম্বন্ধ পদ হয়। যেমন رب الدار এখানে رب শব্দটি مضاف এবং الدار শব্দটি مضاف اليه

العالم শব্দটি اسم موضوع للجمع অর্থাৎ এমন বিশেষ্য, যার একবচন নেই কেবল বহুবচন বুঝানোর জন্যই গঠন করা হয়েছে। যেমন-رهـــــط শব্দটি কেবল বহুবচন বুঝায় আর عالم আলম শব্দের মধ্যে সৃষ্টিকর্তার ইলমের মধ্যে যতগুলো জাওহর এবং اعراض রয়েছে সবগুলো অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। যেমন- قَالَ فِرْعَوْنُ وَمَا رَبُّ الْعٰلَمِيْنَ قَالَ رَبُّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا ফিরাউন বলেছিল আলামীনের রব কে? উত্তরে বলা হয়েছিল- যিনি আকাশসমূহের ও জমিনের এবং এর মধ্যে যা কিছু রয়েছে এসব কিছুর মালিক (তিনিই আলামীনের রব)। (সূরা ঃ শুআরা-২৩)

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন- 'আলামীন' শব্দ দ্বারা ফিরিশতা, জ্বীন এবং ইনসানকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে। আলামীন শব্দটি عـــــلامة শব্দ থেকে এসেছে। আলামীন শব্দটি বহুবচন এ জন্যে নেয়া হয়েছে, যেন যতসব জিনিষ আল্লাহ্ তায়ালার একত্বের ইশারা দেয়, সে সব কিছুই এ শব্দের মধ্যে এসে যায়। অথবা আলামীন শব্দটি এসেছে علم শব্দ থেকে যা অধিকতর বুঝানোর জন্য উল্লেখ করা হয়।

مَالِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ দ্বিতীয় صفت - يوم দ্বারা সূর্য উদয় হওয়া থেকে সূর্যাস্ত যাওয়া পর্যন্ত সময়কে বোঝায়। বা দ্বিতীয় ফজর উদয় হওয়া থেকে সূর্য অস্ত যাওয়া পর্যন্ত সময়কে বোঝায়। শরীয়তের পরিভাষায় শেষ অর্থ গ্রহণ করা হয়ে থাকে। এ আয়াতে يـــــوم শব্দ দ্বারা দিনের যে কোন অংশকে বোঝানো হয়েছে, যেহেতু সে সময় সূর্য থাকবে না। الـــدين শব্দ দ্বারা যে সময় ভাল এবং খারাপ কাজের ফলাফল দেয়া হবে সে সময়কে বুঝানো হয়েছে। যেমন আরবী প্রবাদ আছে كما تدين تدان যেভাবে তুমি কাজ করবে, সেভাবে তোমাকে ফল দেয়া হবে। এখানে اسم فاعل কে اسم ظرف এর প্রতি সম্বন্ধ দেখানো হয়েছে। যেমন বলা হয় ياسارق الليل اهل الدار এর মধ্যে ليل শব্দটি مفعول মউফল অর্থে এসেছে এবং এতে اضافت এর দ্বারা معرفة বুঝানো হয়। ইহা কোন সময় অতীতের অর্থ প্রদান করে। যেমন نادي اصحاب الاعراف আর وَسِيْقَ الَّذِيْنَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ এর মধ্যে দেখা যাচ্ছে-দুটি ক্রিয়াই অতীতের অর্থ প্রদান করছে। কোন সময় অবিচ্ছিন্নতার অর্থ প্রদান করে। যেমন زيد مالك العبيد এখানে 'মালিক' ও عبيـــــد শব্দের মধ্যে সম্পর্ক রয়েছে- তা হচ্ছে মালিকত্ব ও গোলামত্বের সম্পর্ক।

কেউ কেউ বলেন, مالك শব্দটি ك -এর উপর نصب দিয়েও পড়া যায়, কেউ কেউ বলেন- مالك শব্দটির ك এর উপর رفع দিয়ে ও পড়া যায়, আবার কেউ কেউ বলেন- ك এর উপর نصب رفع كسرة সব দিয়ে পড়া যায়। اياك এর ك হচ্ছে ضمير منصوب কারণ আসলে এটা نعبدك এবং نستعينك ছিল। এখানে ضمير متصل কে ضمير منفصل করার জন্য আগে নিয়ে اختصاص করা হয়েছে। আরবী ব্যাকরণের নিয়ম হচ্ছে, আগেরটা পরে এবং পরেরটা আগে বসালে تخصيص প্রকাশ করে। আর غيبت থেকে حاضر ব্যবহার করা হয়েছে। বালাগাতের পরিভাষায় এটাকে التفات বলা হয়। এ রকম করার কারণ হচ্ছে- শ্রোতাকে সন্তুষ্ট করা।

العبادة অর্থ হচ্ছে বিনয়ের সাথে সর্বোচ্চ নম্রতা প্রদর্শন করা। هدي হচ্ছে فعل متعدي। কিন্তু আরবী ভাষায় এ শব্দ ل বা الى অব্যয় দিয়েই ব্যবহার হয় যা দিয়ে متعدي বোঝা যায়। যেমন اِنَّكَ لَتَهْدِيْ اِلٰى صِرَاطٍ । বা اِنَّ هٰذَا الْقُرْاٰنَ يَهْدِيْ لِلَّتِيْ هِيَ اَقْوَمُ । হিদায়াত শব্দের অর্থ হচ্ছে সত্যের দিকে আকৃষ্ট করা। صراط অর্থ প্রশস্ত রাস্তা। صراط শব্দে ص এর পরিবর্তে سين ছিল। যেমন-বলা হয় من سرط الشيء

سبيل ও طريق আর صراط স্ত্রী লিঙ্গ এবং পুং লিঙ্গ দুটিই ব্যবহার হয়। যেমন ابتلعه উভয় লিঙ্গে ব্যবহৃত হয়।

صراط المستقيم । صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ বদলে কুল হয়েছে, যার مبدل منه হচ্ছে هَلْ اَدلك علي এতে নিশ্চয়তা বা تاكيد প্রকাশ পায়। যেমন কথায় কথায় বলা যায় اكرم الناس وافضلهم فلان

এর দ্বারা প্রথমে অস্পষ্টভাবে কিছু বর্ণনা করা হয়, এরপর স্পষ্টভাবে বর্ণনা করা হয়।

صفت - اسم موصول الذين এর بدل বা غير المغضوب عليهم সর্বনাম عليهم আরবী ব্যাকরণে معرفة থেকে صفت হতে পারে। যেমন ولقد امر علي اللئيم يسبني এর মধ্যে হয়েছে। আয়াতের অর্থ مغضوب عليهم ولا الضالين خلاف منعم عليهم যেমন বলা যায়। علبك بالحركة غير السكون আর আরবী ব্যাকরণে نكرة এর معرفه বদل হয় এবং এ রকম হওয়াটা জায়েয আছে।

আয়াতের উভয় عليهم এর মধ্যে পার্থক্য এই যে, প্রথমটিতে مفعول মফউল হওয়ার কারণে মনসুব বা نصب হয়েছে আর দ্বিতীয়টি নায়িবে ফায়িল হওয়ার কারণে رفع হয়েছে। কুরআন শরীফের যতস্থানে نعمت শব্দ নুন হরফের নীচে كسرة দিয়ে পড়া হবে- সবগুলোর অর্থ নেয়া হবে মেহেরবানী ও দান। যদি نعمت শব্দের نون নুন যবর দ্বারা হয়, তার অর্থ হবে আনন্দ, উৎফুল্ল, জীবন যাত্রার উন্নতমান। যেমন আল্লাহ তায়ালার বাণী نَعْمَةً كَانُوْا فِيْهَا فٰكِهِيْنَ "যার মধ্যে বিভিন্ন ধরনের ফলমূল দেয়া হবে।"

الـــغـــضـــب শব্দের অভিধানিক অর্থ 'কাঠিন্য'। এ শব্দটি সৃষ্টি ও সৃষ্টিকর্তার ক্ষেত্রে ব্যবহার হয়।

ضلال শব্দের অর্থ বিলোপ হওয়া, অদৃশ্য হওয়া। যেমন বলা যায় ضل الماء في اللبن وضل الكافر عاب عن الحق اذا غاب فيه অর্থাৎ পানি দুধের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেছে। কাফির সত্য থেকে সরে পড়েছে বা অদৃশ্য হয়ে গেছে। غيـــر এর অর্থ لا এর মতো- অর্থাৎ 'না'। যেমন لا এর অর্থ غير হয়।

امين শব্দটি 'মদ' আর 'কসরা' যেভাবেই হোক এর অর্থ হচ্ছে- استجب অর্থাৎ কবুল করুন। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হুজুর (সা.) থেকে বর্ণনা করেন اميـــن শব্দের অর্থ افعل

সূরা ফাতিহার অর্ধেক নিয়ে ভিন্নমত

হযরত যাবু-হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন, হাদীসে কুদসীতে আল্লাহ তায়ালা বলেন اَلصَّلٰوةُ অর্থাৎ সূরা ফাতিহার অর্ধেক আমার এবং অর্ধেক আমার বান্দাহর। যখন বান্দাহ বলেন- بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ তখন আল্লাহ তায়ালা বলেন- আমার বান্দাহ আমাকে সম্মান প্রদর্শন করেছে। যখন বান্দাহ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ বলেন-তখন আল্লাহ তায়ালা বলেন-আমার বান্দাহ আমার প্রশংসা করেছে। যখন বলেন- اَلرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ তখন আল্লাহ তায়ালা বলেন- আমার বান্দাহ- আমার সানা ও তারিফ করেছে। যখন বান্দাহ বলে- مَالِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ আল্লাহ তায়ালা বলেন, আমার বান্দাহ আমার কাছে আত্ম সমর্পণ করেছে। যখন বান্দাহ বলেন- اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَ اِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ আল্লাহ তায়ালা বলেন এটিই আমার এবং আমার বান্দাহের মধ্যে। যখন বান্দাহ বলেন اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ তখন আল্লাহ তায়ালা বলেন- এটা হচ্ছে আমার বান্দাহর। আর আমার বান্দাহ যা চাইবে, তা দেয়া হবে।

এ হাদীসের আলোকে হযরত ইমাম শাফিয়ীর অনুসারীরা প্রমাণ করেন। بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الـــرَّحِيْـــمِ সূরা ফাতিহার এক আয়াত। আমরা হযরত ইমাম আবু হানিফা (র.)-এর

Scanned with CamScanner

অনুসারীরা এর জওয়াব দেই এভাবে, মুফাসসিরীনে কিরাম একথার উপর একমত যে, সূরা ফাতিহার মধ্যে সাতটি আয়াত রয়েছে। আর বান্দাহের ভাগে যে অর্ধেক দেয়া হয়েছে بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ সূরা ফাতিহার একটি আয়াত মেনে নেয়া যায়, তা হলে اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ আয়াতটি দ্বিতীয় আয়াত হবে। اَلرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ তৃতীয় আয়াত এবং مَالِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ চতুর্থ আয়াত, অথচ اِيَّاكَ نَعْبُدُ পর্যন্তই সূরার অর্ধেক বলে হাদীসের দ্বারা প্রমাণিত হয়। এ ক্ষেত্রে চার আয়াত এবং অর্ধেক আয়াত اِيَّاكَ نَعْبُدُ কে নিয়েই প্রথম অর্ধেক সাব্যস্ত করতে হবে। এরপর বাকী অর্ধেক আল্লাহ তায়ালার জন্য বাকী থাকে ৩টি আয়াত এবং অর্ধেক আয়াত। তা হলে হাদীসে কুদসীর ভাষা قسمت الصلوة بيني وعبدي نصفين সঠিক প্রমাণ হয় না। বরং বান্দাহের অংশে প্রায় তিনভাগের দুই ভাগ এসে যায়।

এ কারণে আমরা বলছি- যে হাদীস থেকে হযরত ইমাম শাফিয়ীর অনুসারীরা দলীল সংগ্রহ করেছিলেন যে, بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ সকল সূরার একটি আয়াত। তাঁরা যদি আমাদের মতের সাথে একমত হয়ে যান যে, প্রত্যেক সূরার প্রথমে বিসমিল্লাহির রাহ্মানির রাহীম পাঠ করা প্রয়োজন দুই সূরাকে আলাদা করার জন্য, তা হলে ঝগড়া শেষ হয়ে যায়।

হযরত আবদুল্লাহ্ বিন মাস্উদ (রা.) বলেন-

كنالا نعلم فصل ما بين السورتين حتي تنزل بسم الله الرحمن الرحيم-

অর্থঃ আমরা দুটো সূরার মধ্যে পার্থক্য করতে পারতাম না। শেষে বিস্মিল্লাহির রাহ্মানির রাহীম অবতীর্ণ হওয়ার পর আমরা দুটো সূরার মধ্যে পার্থক্য করতে পারি।

হযরত ইবনে উমর (রা.) বলেন بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ প্রত্যেক সূরায় নাযিল হয়। তাছাড়া বিস্মিল্লাহির রাহ্মানির রাহীম সূরা নমলের একটি আয়াত। অধিকন্তু যেভাবে হযরত আবু-হুরাইরা (রা.) থেকে রেওয়ায়ত পেশ করা হয়েছে, অন্যদিকে হযরত আবু হুরাইরা (রা.) থেকে বিস্মিল্লাহ ছাড়াও রিওয়ায়ত রয়েছে। যেমন হাদীসের ভাষা

قال يقول الله قسمت الصلوة بيني وبين عبدي نصفين فاذا قال العبد الحمد لله رب العلمين يقول الله حمد ني عبدي الخ ـ

এখানে বিসমিল্লাহর কথা উল্লেখ করা হয়নি। যদি বিসমিল্লাহ্ সূরা ফাতিহার অংশ হতো-তা হলে অবশ্যই উল্লেখ করতেন। তা ছাড়া হযরত আয়িশা সিদ্দীকা (রা.) থেকে বর্ণিত-

ان النبي صلي الله عليه وسلم كان يفتح الصلواة بالتكبير والقراة بالحمد لله رب العلمين

অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ (সা.) নামায শুরু করতেন তকবীর এর সাথে আর কিরাত শুরু করতেন- 'আলহামদু লিল্লাহি রাব্বিল আলামিন' দিয়ে। এ হাদীস থেকে একথা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে, বিস্মিল্লাহ্ সূরা ফাতিহার আয়াত নয়। বিসমিল্লাহ সূরা ফাতিহার আয়াত সাব্যস্ত করলে বিস্মিল্লাহ প্রত্যেক সূরার আয়াত, তা স্বীকার করে নিতে হয়। আর এ কথা স্বীকার করলে সূরা মূলক এর মধ্যে যে ত্রিশ আয়াত এবং সূরা কাওসার এর মধ্যে তিন আয়াত বলাটা কীভাবে ঠিক হয়? বরং বিস্মিল্লাহ মিলালে এক আয়াত বেশী হয়ে যথাক্রমে বলতে হয় একত্রিশ আয়াত ও চার আয়াত। অথচ ত্রিশ আয়াত ও তিন আয়াত সম্পর্কে দলীল রয়েছে।

এছাড়া হযরত ইমাম বুখারী (র.) স্বীয় কিতাবে হযরত আনাস (রা.) থেকে বর্ণনা করেন। হযরত আনাস (রা.) বলেন-

صليت خلف رسول الله صلي الله عليه وسلم وخلف ابي بكر وعمر وعثمان فكانوا يستفتحون القراة بالحمد لله رب العلمين -

'আমি রাসূলুল্লাহ (সা.), হযরত আবু বকর (রা.), হযরত উমর (রা.) ও হযরত উসমান (রা.)-এর পেছনে নামায আদায় করেছি। তাঁরা নামায শুরু করতেন الحمد لله দিয়ে।'

অন্য রিওয়ায়তে আছে- ولم اسمع احدا منهم قال بسم الله الرحمن الرحيم ـ

অর্থাৎ তাদের মধ্যে কোন একজনকেও বিস্মিল্লাহ্ বলে নামায শুরু করতে শুনিনি।

অন্য রিওয়ায়তে আছে ولم يجهر احد منهم بسم الله الرحمن الرحيم তাঁদের মধ্যে কেউই বিস্মিল্লাহ্ আওয়াজ করে বলেননি।

وعن عبد الله بن مغفل انه قال سمعني ابي وانا اقول بسم الله الرحمن الرحيم فقال اي ابني اياك والحدث في الاسلام قد صليت خلف ابي بكرٍ فقال الحمد لله رب العلمين وصليت خلف عمرؓ فقال الحمد لله رب العلمين وصليت خلف عثمانؓ فقال الحمد لله رب العلمين فاذا صليت فقل الحمد لله رب العلمين ـ

হযরত আবদুল্লাহ্ বিন মগফফল থেকে বর্ণিত; তিনি বলেন- নামাযে যখন আমি বললাম বিস্মিল্লাহির রাহ্মানীর রাহীম পড়লাম। আমার পিতা তা শুনে বললেন। হে আমার প্রিয় বৎস! সাবধান, ইসলামে নতুন কিছু সংযোজন করা থেকে সাবধান থেকো। আমি হযরত আবু বকর (রা.)-এর পিছনে নামায পড়েছি, তিনি اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ দিয়েই নামায শুরু করেছিলেন। আমি উমর (রা.)-এর পিছনে নামায পড়ছিলাম। তিনিও اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ দিয়ে নামায শুরু করছিলেন। আমি হযরত উসমান (রা.) এর পিছনে নামায পড়েছি, তিনিও اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ দিয়ে নামায আরম্ভ করছিলেন। সুতরাং তুমি যখন নামায আদায় করবে, তখন اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ থেকেই বা الحمد لله দিয়ে নামায শুরু করবে।

আলহামদু লিল্লাহর কারামত

বিস্মিল্লাহর বরকতে জাহান্নামের দরজা বন্ধ হয়ে যায়। এভাবে الحمد لله এর বরকতে জান্নাতের দরজাগুলো খোলে যায়। যেহেতু, الحمد لله -এ আটটি হরফ বা বর্ণ রয়েছে। জান্নাতের দরজাও আট। তাছাড়া মানুষের প্রথম বাক্যই হচ্ছে الحمد لله -কারণ আদম (আ.) এর রূহ যখন নাভী পর্যন্ত পৌছেছিল, তখন তিনি হাঁচি দিয়েছিলেন আর বলেছিলেন اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ এবং জান্নাতবাসীদের শেষ চাহিদা ও اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ-এ বিশ্বজগতের ভিত্তিও হচ্ছে حمد অর্থাৎ প্রশংসার উপর। সুতরাং প্রত্যেক কাজের শুরু এবং শেষ الحمد لله দিয়ে হওয়া বাঞ্ছনীয়।

সূরা ফাতিহার মধ্যে সাত আয়াত। মানব সৃষ্টির বিবর্তন ও উন্নয়ন সাতটি স্তরের মাধ্যমেই সম্পন্ন হয়। যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন-

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ مِنْ سُلٰلَةٍ مِّنْ طِيْنٍ ـ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِيْ قَرَارٍ مَّكِيْنٍ ـ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظٰمًا فَكَسَوْنَا الْعِظٰمَ لَحْمًا ثُمَّ اَنْشَاْنَاهُ خَلْقًا اٰخَرَ فَتَبٰرَكَ اللّٰهُ اَحْسَنُ الْخَالِقِيْنَ ـ (المؤمنون-١٢-١٤)

সুতরাং মানুষের উন্নতির জন্য সূরা ফাতিহাই হচ্ছে সর্বোত্তম পন্থা। রহমান ও রহীম শব্দদ্বয় বিশ্বজগতের জন্য দয়া ও করুনার কারণ। সুতরাং যে কষ্ট এবং বালা মুসিবত দুনিয়াতে হয়ে থাকে তাও প্রকৃতপক্ষে রহমত আর নিয়ামত। কারণ আল্লাহ তায়ালা বলেন, যে মুসিবত তোমার উপর পৌছেছে, তার মধ্যে কল্যাণ নিহিত রয়েছে আর যা তুমি পছন্দ করেছিলে, হয়ত তা তোমার জন্য অকল্যাণকর ছিল। মূসা এবং খিযির (আ.)-এর ঘটনাই ইহার প্রমাণ বহন করে।

আল্লাহ তায়ালা হযরত মুহাম্মদ (সা.)-কে রহমত উপাধিতে ভূষিত করেছেন। এ জন্যই তিনি নিজের দাঁত মোবারক শহীদ হওয়া সত্বে দুঃখ না করে সানন্দে বলেছিলেন- اللهم اهدقومي فانهم لا يعلمون

Scanned with CamScanner

"আল্লাহ্, আমার কাওমকে হিদায়াত দান করুন। কারণ তারা জানে না। তাদের জ্ঞানের অপ্রতুলার কারণেই তারা এমনটি করেছে।" আর তিনি কিয়ামতের দিন বলতে থাকবেন- امتي امتي আমার উম্মত, আমার উম্মত।

আল্লাহ্ তায়ালা নিজ সত্তাকে 'রাহমান' এবং 'রাহীম' শব্দ দ্বারা বিশেষিত করেছেন। তা থেকে বুঝা যায় একবার রহমত করার মাধ্যমে মানুষ সংশোধন হবে না। এজন্য আল্লাহ্ তায়ালার বিশেষণ রাহমান ও রাহীম- যার রহমতের কোন সীমা নেই, পরিমাণ নেই, যা অসীম ও অপরিমেয়। আর একথা অবিসংবাদিতভাবে যুক্তিযুক্ত কথা যে, সসীম অসীমের মোকাবেলায় কিছুই না। আল্লাহ্ তায়ালার রহমত অসীম। পক্ষান্তরে বান্দাহের গোনাহ্ সসীম। যেভাবে সসীম অসীমের মধ্যে ডুবে যায়, এভাবে বান্দাহের গোনাহ আল্লাহর রহমতের সাগরে ডুবে যায়। এ জন্যেই আল্লাহ বলেন- وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى অর্থাৎ তোমাকে এতো বেশী দেয়া হবে, যাতে তুমি সন্তুষ্ট হয়ে যাবে। হযরত ইব্রাহীম ইবনে আদহম বলেন- আমি এক সম্প্রদায়ের মেহমান হয়েছিলাম। আমার জন্য খাবার আনা হল। একটি কাক এ খাবার থেকে একটি রুটি নিয়ে গেল দেখলাম উহা রুটিখানা একটি টিলার উপর হাত-পা বাঁধা এক ব্যক্তির মুখে নিয়ে দিল।

হযরত জিননুন বলেন- আমি এক ঘরে ছিলাম। হঠাৎ আমার ঘর থেকে বের হয়ে যাওয়ার খেয়াল আসল। আমি ঘর থেকে বের হয়ে নীল নদের কাছে পৌছলাম। সেখানে দেখলাম একটা বিচ্ছু এদিক-সেদিক দৌড়াদৌড়ি করছে। যখন বিচ্ছু নীল নদের কাছে আসল, তখন একটি ব্যাঙ নীল নদের তীরে আসল এবং বিচ্ছুটি ব্যাঙের পিঠে উঠল আর নীল নদের পানিতে সাঁতার কাটতে লাগল, আমিও একটি নৌকা নিয়ে বিচ্ছুর পিছু ছুটলাম। যখন ব্যাঙ নীল নদের তীরে উঠল, বিচ্ছু-ব্যাঙের পিঠ থেকে নেমে দৌড়াতে লাগল। আমি ও পিছু ছুটলাম, দেখলাম একটি বৃক্ষের নীচে এক যুবক ঘুমাচ্ছিল এবং এ যুবকের নিকট একটি সাপ তাকে কামড় দেবার মনস্থ করছিল, যখনই সাপ একেবারে ওই যুবকের নিকটবর্তী হচ্ছিল, তখনই ওই বিচ্ছু সাপের কাছে গিয়ে সাপকে কামড় দিল এবং সাপও বিচ্ছুকে কামড় দিল। ফলে উভয়ে এক সাথে মরে গেল।

আহলে আরব দু'আর সময় বলতেন- يا رزاق الثعاب في عشه হে ক্লান্তিকর মানুষের রিযিক বাসায় পৌছিয়ে দানকারী। একটি ঘটনা আছে-কাকের বাচ্চা ডিম থেকে বের হওয়ার পর সাদা একটা গোশতের টুকরার মতো দেখায়। কাক বাচ্চার রঙ তার নিজের রং এর বিপরীত দেখে ঘৃনাভরে বাচ্চাদেরকে ছেড়ে চলে যায়। হযরত ইমাম দমীরী লিখেন, দু থেকে এগার দিন যখন বাচ্চা এভাবে একা পড়ে থাকে, এ সময়ের মধ্যে আল্লাহ তায়ালা বাচ্চাগুলোর শরীরে এক প্রকার গন্ধ সৃষ্টি করে দেন, এতে মাছি এদের চারপাশে ঘিরে বসে, বাচ্চাদের মুখের ভিতর আরো বেশী গন্ধ হয় আর বাচ্চাগুলো মুখ খোলে রাখে, মাছি কাকের বাচ্চার মুখে ঢুকে আর কাকের বাচ্চারা তা খেতে থাকে। এভাবে পাখা গজিয়ে উঠা পর্যন্ত চলতে থাকে। এরপর যখন কাকের বাচ্চার শরীরে পাখা গজিয়ে রং কাল হয়, তখন এদের মা তাদের কাছে আসে।

বর্ণিত আছে-এক সাহাবী মুমর্ষ অবস্থায় ছিলেন, কিন্তু তার মুখ দিয়ে لا اله الا الله বের হওয়া বন্ধ হয়ে গেল। রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-কে এ ব্যাপারে অবহিত করা হল। তিনি তাকে তলকীন করতে লাগলেন কিন্তু তার মুখ দিয়ে কালিমা বের হচ্ছিল না। এরপর রাসূলুল্লাহ (সা.) জিজ্ঞেস করলেন - এ লোক কী নামায পড়ত না? এ লোক কী যাকাত দিত না? এ লোক কী রোযা রাখত না? তখন সকলে জওয়াব দিলেন, হ্যাঁ সব কিছু করতেন। রাসূলুল্লাহ (সা.) আবার বললেন-এ লোক কী নিজের মায়ের নাফরমানী করত- লোকেরা বলল, হ্যাঁ। রাসূলুল্লাহ (সা.) বললেন- তার মাকে ডাক। এরপর এক বৃদ্ধা অন্ধ মহিলাকে ডাকা হল।

রাসূলুল্লাহ (সা.) বৃদ্ধা মহিলাকে বললেন- হে বৃদ্ধা। তুমি কী একে ক্ষমা করবে না? বৃদ্ধা জওয়াব দিলেন। আমি কখনো একে ক্ষমা করব না। কারণ এ আমাকে চড় মেরে আমার এ চোখ নষ্ট করে দিয়েছে। এরপর রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন তা হলে আগুন এবং লাকড়ী আন। এতে বৃদ্ধা রাসূলুল্লাহ রাসূলুল্লাহ (সা.)-কে জিজ্ঞেস করলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আগুন আর লাকড়ী দিয়ে কি করবেন? রাসূলুল্লাহ (সা.) বললেন- একে তোমার সামনেই আগুন দিয়ে জ্বালিয়ে দেব; সে তার কাজের ফল পাবে। এ কথা শুনে বৃদ্ধা বললেন, আমি তাকে মা'ফ করে দিলাম ইয়া রাসূলুল্লাহ। তাকে আগুনে পোড়ানোর জন্যই কি আমি নয় মাস উদরে রেখেছিলাম? আগুনে পোড়ানোর জন্যই কি তাকে দু'বৎসর দুধ পান করিয়েছিলাম? তাহলে মা এর রহমত বলতে আর কি রইলো? সাথে সাথে ওই লোকের মুখ খুলে বের হল- اشهد ان لا اله الا الله এ-তো শুধু মায়ের দয়া থেকেই হয়েছে। মায়ের দয়া থেকে যদি আগুনের পোড়া থেকে রক্ষা পাওয়া যায়,তাহলে رحمٰن رحيم এর দয়ার বিস্তৃতি কত মহীয়ান হবে তা সহজেই অনুমেয়। তিনি কিভাবে তার বান্দাহকে আগুনে পোড়াবেন- যার মুখ দিয়ে ৭০ বছর পর্যন্ত অবিরত رحمٰن رحيم অনুশীলন হতে থাকে। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন, আল্লাহ তায়ালার একশত রহমত রয়েছে। তন্মধ্যে একশত ভাগের এক ভাগ রহমত এ পার্থিব সৃষ্টি জীব তথা মানুষ, জ্বীন, পশু-পাখী, জানোয়ার সকলকে দান করা হয়েছে। আর ৯৯ ভাগ রহমত রেখে দেয়া হয়েছে, কিয়ামতের দিন আল্লাহ তায়ালা তার বান্দাদের অনুকূলে এ রহমত দিয়ে মেহেরবানী করবেন- আল্লাহ্ তায়ালার করুণার সীমা নেই আর রহমতের শেষ নেই।

مَالِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ

আদালত বা ন্যায়পরায়ণতার অর্থ হচ্ছে- ভাল আর খারাপের মধ্যে পার্থক্য করা। কৃতজ্ঞ ও কৃতঘ্ন, অনুকূল ও প্রতিকূলের মধ্যে পার্থক্য করা, সীমারেখা টানা এ গুলো বিচারের দিবস ছাড়া হতে পারে না। আল্লাহ তায়ালা বলেন- إِنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ أَكَادُ أُخْفِيهَا لِتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا تَسْعَىٰ

"কিয়ামত নিকটবর্তী ও আসন্ন। আমি ইহা গোপন রাখতে চাই যাতে প্রত্যেকেই নিজ নিজ আমল অনুযায়ী তাঁর ফল পেতে পারে।" (সূরা ত্বা-হা-১৫)

হাদীস শরীফে উল্লেখ আছে- কিয়ামতের দিন এক লোককে বিচারের জন্য আনা হবে, সে তার নিজের দিকে তাকিয়ে দেখবে কিন্তু তার একটা নেকীও খোঁজে পাবেনা। এরপর গায়িবী আওয়াজ আসবে! হে আল্লাহর বান্দাহ! তুমি জান্নাতে প্রবেশ কর। এতে ওই ব্যক্তি বলবে প্রভু, আমি কী আমল করেছি, যার কারণে বেহেশতে প্রবেশ করব! আল্লাহ্ তায়ালা উত্তর দেবেন যখন তুমি রাত্রে ঘুমাতে, তখন এপাশ ওপাশ হওয়ার সময় আল্লাহ্ বলেছিল। তারপর ঘুমের মধ্যে তা ভুলে গিয়েছিলে; কিন্তু আমার তো ঘুম নেই, তাই আমি তা ভুলিনি। অপর এক লোককে উপস্থিত করা হবে। তার নেকী আর পাপ ওজন করা হবে, তার নেক কাজগুলো হালকা হয়ে যাবে। তারপর একটা কার্ড দেয়া হবে, যাতে لا اله الا الله লিখা থাকবে যার কারণে নেকীর পাল্লা ভারি হয়ে যাবে। মোট কথা আল্লাহ তায়ালা মহান, তার মহত্বের গুণেই ক্ষমার আশা করা যায়। কারণ তিনি এ বিশ্ব ভূমন্ডলের মুখাপেক্ষী নন। কিন্তু বান্দাহর হক থেকে বেঁচে থাকা প্রয়োজন; কারণ হযরত আবু হুরাইরা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন, মুফলিস অর্থাৎ গরীব কে তা জানো? আমরা সাধারণতঃ মনে করি মুফলিস বা গরীব সে ব্যক্তি, যার দিরহাম

Scanned with CamScanner

বা আনন্দ উপভোগ করার মতো সামগ্রী নেই। কিন্তু আসলে তা নয়। মুফলিস বা দরিদ্র সেই ব্যক্তি কিয়ামতের দিন যার নামায, যাকাত ও রোযা সব কিছু হাজির করা হবে কিন্তু তার সাথে হাজির করা হবে অমুককে যে গালি দিয়েছে, অমুককে অপবাদ দিয়েছে, অমুকের মাল আত্মসাৎ করেছে, অমুকের রক্তপাত ঘটিয়েছে অমুককে প্রহার করেছে। তখন তার পূণ্য থেকে এদের সবাইকে প্রদান করা হবে। শেষ পর্যন্ত দেখা যাবে তার সকল নেকী শেষ হয়ে যাবে। তখন পাওনাদারের পাপ ঐ ব্যক্তিকে দিয়ে দেয়া হবে। তারপর তাকে দুযখে নিক্ষেপ করা হবে।

مـــالك শব্দের মধ্যে আলিফ অতিরিক্ত ব্যবহার করার রহস্য হল- কিয়ামতের দিন অনেকেই মালিক হবে কিন্তু শেষ অবধি আল্লাহ তায়ালার মালিকানা ছাড়া কারো মালিকানা থাকবে না। ملك আর مالك শব্দদ্বয়ের মধ্যে পার্থক্য হল ملك শব্দের মধ্যে ভয়-ভীতি ও কার্য কৌশলের অর্থ আছে, অন্যদিকে مالك শব্দের মধ্যে নম্রতা ও করুনার অর্থ রয়েছে। অধিকন্তু مـــالك বলা হয় রাজত্বের অধিকারী হওয়াকে। যেমন আল্লাহ তায়ালার বাণী-

قُلِ اللّٰهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ-(ال عمران-٢٦)

এখানে مالك দ্বারা সাম্রাজ্যের মালিক তথা সম্রাটকে বুঝানো হয়েছে। পক্ষান্তরে কোন বিষয়ে একক কর্তৃত্বের অধিকারীকে বলা হয় ملك যেমন বলা হয়েছে- لامـلك الا هو অর্থাৎ কিয়ামতের দিনে তিনি ছাড়া কর্তৃত্ববান আর কেউ নেই। আল্লাহ তায়ালার বাণী لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ لِلّٰهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ (আজকের কর্তৃত্ব কার? এক ও পরাক্রমশালী আল্লাহর) এবং اَلْمُلْكُ يَوْمَئِذِنِ الْحَقُّ لِلرَّحْمٰنِ (সে দিনের সত্যিকার কর্তৃতা করুনাময় আল্লাহর থাকবে।) এ আয়াত সমূহে مـــالك বলতে কর্তৃত্ব বুঝানো হয়েছে রাজত্ব নয় উল্লেখ্য যে, দুনিয়ার রাজত্বের জন্য যোগ্যতা ও ন্যায়পরায়ণতা আবশ্যক, কারণ এর উপরই জীবন সুখী হওয়া নির্ভর করে। যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন-

"নর-নারী যেই হোক যদি ভাল কাজ করে এমতাবস্থায় যে সে মুমিন, আমি তাকে উত্তম জীবন দান করব, তাকে উত্তম পুরস্কারে পুরষ্কৃত করব।" (নহল-৯৭)

এর প্রমান স্বরূপ একটা উদাহরণ প্রদান করা হল-বাদশাহ নওশিরওয়ান একদিন শিকার করার উদ্দেশ্যে বের হয়ে নিজ সৈন্য থেকে পৃথক হয়ে পড়লেন। তিনি খুবই তৃষ্ণার্ত হলেন। তিনি বনের ভিতর আনারের একটি বাগান দেখলেন। বাগানে প্রবেশ করে এক বালককে বললেন, আমাকে একটা আনার দাও। সে আনার দিল। উহা ভেংগে তিনি অনেক সুস্বাদু নির্যাস বের করে তা পান করলেন। অতঃপর তাঁর এ বাগান পছন্দ হল। তিনি মালিকের কাছ থেকে বাগান নিয়ে নেয়ার ইচ্ছে পোষণ করেন। তারপর বালকটিকে বলেন- আমাকে আর একটা আনার দাও। বালক আরও একটি আনার দিল। যখন ওটা ভাংগলেন, কিছু নির্যাস বের হল এবং তা পান করলেন, কিন্তু টক পেলেন। তিনি বালকটিকে বললেন- হে বালক, আনারের এ অবস্থা কেন? বালকটা বললেন-সম্ভবতঃ এ দেশের বাদশাহ অত্যাচারের সঙ্কল্প করেছেন, তার অত্যাচারের মন্দ প্রভাবে আনারের ঐ অবস্থা। সেই সময়েই নওশিরওয়ান মনে মনে তওবা করে নিলেন এবং বালককে বললেন, আর একটা আনার দাও, যখন ওই তৃতীয় আনারটা ভাংগলেন এবং নির্যাস বের করলেন, আগেরটার চেয়ে আরো ভাল ও সুস্বাদু পেলেন। তখন বালকটিকে বললেন- এখন তো অবস্থার পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয়। বালক জওয়াব দিল, সম্ভবতঃ বাদশাহ তার ধারণা থেকে তওবা করেছেন। যখন বাদশাহ বালকটার কথার সংগে নিজের তার ধ্যান-ধারণার মিল খোঁজে পেলেন, তখন সম্পূর্ণভাবে তওবা করলেন। এমন কি,

তখন থেকে তিনি এমন ন্যায়বান হয়ে গেলেন যে, তার সুনাম ও সুখ্যাতি চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ল- আমাদের নবী করীম (সা.) তার সম্পর্কে বলেন- এ জামানায় একজন ন্যায়পরায়ণ বাদশাহের আবির্ভাব হয়েছে-

সূরা ফাতিহার মধ্যে আল্লাহ তায়ালার পাঁচটি নাম রয়েছে।

١. اللّٰه ٢. الرب ٣. الرحمٰن ٤. الرحيم ٥. الملك

হয়তঃ এ শব্দের দ্বারা তিনি এভাবে ইশারা করে বলছেন। আমি আল্লাহই তোমাকে সৃষ্টি করেছি। তারপর বিভিন্ন ধরনের নিয়ামতের মাধ্যমে লাল-পালন করেছি সুতরাং আমি রব। এরপর তুমি নাফরমানী করেছ কিন্তু তা আমি প্রকাশ করিনি, যেহেতু আমি রহমান- এরপর তুমি তওবা করেছ, আমি তোমাকে ক্ষমা করেছি যেহেতু আমি রাহীম অর্থাৎ তওবা কারীর তওবা কবুল করে বান্দাহকে ক্ষমা করে দিই। এরপর তোমার আমলের ফল প্রদান করব যেহেতু আমি শেষ বিচারের দিনের মালিক।

আল্লাহ তায়ালা বলেন- তোমরা আমার যাতে কামালের মহত্ব বর্ণনা করতঃ আমার প্রশংসা কর, কারণ আমিই আল্লাহ। তোমরা আমার ইহসানের জন্যে প্রশংসা কর- কারণ আমিই রাব্বুল আলামীন। অনন্তর তোমরা আমার ইহসানের প্রত্যাশা কর যেহেতু আমি রাহমানুর রাহীম। পক্ষান্তরে আযাবের ভয়ে ভীত হয়ে পড়, যেহেতু আমি শেষ বিচারের দিনের মালিক।

اِيَّاكَ نَعْبُدُ

আরবী ব্যাকরণের নিয়ম হল- مـفـعـول কে فـاعـل এর আগে আনলে এতে বিশেষত্ব প্রকাশ পায়। অর্থাৎ আমরা আপনার ছাড়া আর কারো ইবাদত করি না। اي لا نـعـبـد -এখানে ايـاك শব্দটি نعبد ক্রিয়ার مفعول যার মধ্যে সর্বনাম نحن উহ্য আছে- এর জন্য ব্যবহৃত হয়েছে ايـاك نـعـبـد (যদি এরূপ না হত তা হলে অর্থাৎ যদি نـــعـبـــدك হত তা হলে ইবাদত শুধু যে আল্লাহ তায়ালার জন্যেই নির্ধারিত, সেই বিশেষত্ব এ নিয়মে প্রকাশ পেতনা।)

যেহেতু ইবাদত এর মর্মার্থ হচ্ছে মহত্ব। এর উপযুক্ত ঐ সত্তা হতে পারেন, যার থেকে শ্রেষ্ঠ পুরস্কারের আশা করা যায়। আর তিনি হচ্ছেন একমাত্র আল্লাহ তায়ালা। তা ছাড়া ইবাদত আল্লাহ তায়ালার জন্যই নির্ধারিত হওয়ার কারণ হচ্ছে- যেহেতু বান্দাহের তিনটি অবস্থা হয়ে থাকে। ১) অতীত, ২) বর্তমান, ৩) ভবিষ্যৎ। অতীতে বান্দাহের কোন অস্তিত্ব ছিলনা। আল্লাহতায়ালা তাকে আবিষ্কার করলেন। যেমন আল্লাহ্ তায়ালা বলেন- وَقَدْ خَلَقْتُكَ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ تَكُ شَيْئًا (سورة مريم-٩) অর্থাৎ আমি তোমাকে আগে সৃষ্টি করেছি। তখন তুমি কিছুই ছিলেনা" এরপর আমি শ্রবণের, দর্শনের এবং উপলব্ধি করার শক্তি প্রদান করেছি। যেমন আল্লাহ তায়ালার বাণী وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْاَبْصَارَ وَالْاَفْئِدَةَ

বর্তমানকালে- বান্দাহর অনেক প্রয়োজনীয়তা ও চাহিদা রয়েছে, যার কারণ অসীম। জীবনের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত বান্দার গোনাহ্ আর অবাধ্যতা সত্বেও তিনি রব, রাহমান ও রাহীম। ভবিষ্যৎ তথা বান্দাহের মৃত্যুর পর বান্দাহের সমস্ত কাজের সম্পর্ক তার মালিকের সাথে, কারণ তিনি শেষ বিচারের দিনের মালিক। আর সকল অবস্থায় বান্দাহ্ তার রবের নিকটই প্রার্থনা করে। সুতরাং আল্লাহ ছাড়া আর কোন সত্যিকার মাবুদ নেই। সকলেই তাঁর মুখোপেক্ষী, আল্লাহ্ কারো মুখাপেক্ষী নন। তিনিই সবকিছুর মালিক, আল্লাহ্ ছাড়া সমস্ত সৃষ্টি জীব দুর্বল ও মুখাপেক্ষী। এটা নিয়ম, নিজের চাহিদা পুরনের জন্য খিদমতের প্রয়োজন হয়। সুতরাং যিনি কারো

Scanned with CamScanner

মুখাপেক্ষী নন বরং সকলেই যার মুখাপেক্ষী তিনিই ইবাদতের অধিকারী। এজন্য আল্লাহ বলেন- وَقَضٰى رَبُّكَ اَلَّا تَعْبُدُوْٓا اِلَّآ اِيَّاهُ

তোমার রব নির্ধারণ করে দিয়েছেন, যেন তোমরা একমাত্র তাঁরই উপাসনা কর (বনী ইসরাঈল)।

ايـــاك আগে ব্যবহারে আল্লাহ তায়ালার ভীতি সৃষ্টি হয়। যাতে ইবাদত তার জন্য একনিষ্ঠ ভাবে করা হয়।

শয়তান যখন মানুষের অন্তরে আলস্য ও বাতিল খেয়ালের সঞ্চার করে, তখনই اياك نعبد বললে সাথে সাথে আল্লাহ তায়ালার জালালতের প্রভাব অন্তরকে প্রভাবিত করে। অন্তর আল্লাহ্ তায়ালার ইবাদত করার জন্য প্রস্তুত হয়ে যায়। তা ছাড়া শয়তান যে কু-প্রবৃত্তি ইত্যাদি মনের ভিতর উদয় করে, তা দূর হয়ে যায়। শয়তানের কু-প্রবৃত্তি থেকে বেঁচে থাকার এটাই উত্তম পন্থা। এ ছাড়া এটাও একটা বাস্তব সত্য যে, যে সত্তা সকলের উর্ধ্বে এবং আগে, তাঁকে সর্বদা সকলের আগে উল্লেখ করা অত্যাবশ্যক। তা ছাড়া হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর উম্মতের জন্য ইবাদতের এটাই ভাল পথ। কারণ আল্লাহ তায়ালা বনী ইসরাঈলকে সম্বোধন করে বলেন- اُذْكُـــرُوْا نِـعْـمَتِيَ তোমরা আমার নিয়ামতের কথা স্মরণ কর। তাদেরকে নিয়ামতের স্মরণের আদেশ দেয়া হয়েছিল আর উম্মতে মোহাম্মদীকে সম্বোধন করে বলা হয়েছে- فَاذْكُرُوْنِيْٓ اَذْكُرْكُمْ -তোমরা আমাকে স্মরণ কর, আমিও তোমাদেরকে স্মরণ করব। এটাই হচ্ছে এ আয়াতের বৈশিষ্ট্য।

نعبد শব্দের মধ্যে বহুবচন ব্যবহারের হিকমত

এখানে نـعـبـد বহুবচন ব্যবহার করায় আল্লাহ্তায়ালার পক্ষ হতে বান্দার প্রতি মর্যাদা প্রকাশ পেয়েছে। যেমন আল্লাহতায়ালা নিজেই বহু বচনের সিগা ব্যবহার করে বলেন-(سورة يوسف-٣) نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ اَحْسَنَ الْقَصَصِ

হে বান্দাহ! যখন তুমি আমার দাসত্ব স্বীকার করেছ এবং আমার গোলাম হওয়াকে অস্বীকার করনি- এ কারণে আমি তোমাকে একটি উম্মতের মধ্যে শামিল করলাম।- তাই আল্লাহ্ তায়ালা বলেন- اِنَّ اِبْـرٰهِيْـمَ كَانَ اُمَّةً وَّاحِـدَةً অবশ্যই হযরত ইব্রাহীম (আ.) একটি উম্মত ছিলেন।

দ্বিতীয়ত ঃ যদি اِيَّاكَ اعبد বলা হত, তা আবদ হওয়ার দাবী রাখত। আর اِيَّاكَ نَعْبُدُ বলা হলে তার অর্থ হবে, আমি আপনার গোলামদের মধ্য হতে একজন গোলাম; আর নিঃসন্দেহে এর মধ্যে বেশী আদব ও শিষ্টাচার পাওয়া যায়। এর মধ্যে আরও একটা ইশারা রয়েছে- জামাতের সাথে নামায আদায় করা সবচেয়ে ভাল। এর মধ্যে আরও ইশারা রয়েছে যে, আমি আপনারই ইবাদত করছি, ফেরেশতারা আমার সাথে আছেন এবং সাথে সাথে আল্লাহ্ তায়ালার নেক্কার বান্দাহগণও আছেন।

বর্ণিত আছে- জনৈক গ্রাম্য লোক মসজিদের দরজায় এসে নিজের উট থেকে নেমে পড়লেন এবং উটটি রেখে মসজিদে প্রবেশ করলেন। অত্যন্ত প্রশান্তি ও ভক্তিসহকারে নামায আদায় করলেন ও দু'আ করলেন। বর্ণনা কারী বলেন, আমরা এ দৃশ্য দেখে আশ্চর্য্য হয়ে গেলাম। তারপর যখন মসজিদ থেকে বের হলেন, তখন নিজের উট পেলেন না। উট দেখে তিনি বললেন- আল্লাহ! আমি আপনার আমানত আদায় করেছি, আমার আমানত কোথায়? বর্ণনাকারী বলেন- আমি এতে আরও আশ্চর্য হয়ে গেলাম। আল্লাহ্ তায়ালার নিকট এরকম বলার পর পরই বিলম্ব না করে একটি লোক উটের উপর আরোহন করে চলে আসল, আরো দেখলাম তার হাত কেটে দেয়া

হয়েছে। সে উটটি তাকে সোপর্দ করে চলে গেল।

রাসূলুল্লাহ (সা.) ইবনে আব্বাস (রা.)-কে বলেন- হে বৎস! একাকী অবস্থায় আল্লাহর নির্দেশ পালন কর, আল্লাহ্ তোমাকে রক্ষা করবেন। তিনি আরো বলেন, ইবাদতে নিমগ্ন হওয়ার অর্থ হচ্ছে অকল্যাণ হতে আনন্দের জগতে পদার্পন করা। মোট কথা- نعبد শব্দ দ্বারা ইখলাস সৃষ্টি হয়, যার দ্বারা বান্দাহ্ অন্তরের মধ্যে আনন্দ, স্বাদ, এসব অনুভব করবে। যার দ্বারা বান্দা নামাযের বাইরের সকল বস্তু হতে বেখবর হয়ে যান। হাদীস শরীফে আছে- عن رسول الله انه كان حين يشرع في الصلوة كانوا يسمعون من صدره ازيزا كازيز المرجل রাসূলুল্লাহ (সা.) যখন নামায শুরু করতেন তাঁর বক্ষ মুবারক থেকে শ্রুতিমধুর সুর অনুরনিত হত। এটা মোটেই দুরূহ নয়। কারণ আল্লাহ তায়ালার বাণী فَلَمَّا رَاَيْنَهٗٓ اَكْبَرْنَهٗ وَقَطَّعْنَ اَيْدِيَهُنَّ "অতপর যখন তারা তাকে দেখল তখন তারা তার পহিমায় অভিভূত হল এবং নিজেদের হাত কেটে ফেলল।" (সূরা ঃ ইউসুফ-৩১)

এখানে মানুষের সৌন্দর্য দর্শনে যদি এমন প্রভাব পড়তে পারে, তাহলে আল্লাহ তায়ালার মাহাত্ম্য মর্যাদা অন্তরে উপলব্ধি করে বান্দার মনে ও অনুরূপ প্রভাব পড়তে পারে। তাছাড়া একজন বাদশাহের সামনে যদি তার প্রজা দাঁড়াতে ভয় পায়, তাহলে রাব্বুল আলামীনের সামনে তার কী অবস্থা হতে পারে, তা তো সহজেই বুঝা যায়।

আবিদ তিন স্তরে ইবাদত করেন। এর মধ্যে একদল সওয়াবের আশায় প্রেরণা পায় আবার শাস্তির ভয়ে ইবাদত করার জন্যে উদ্যত হয়। এধরনের লোককে زاهـد বলা হয়। যে আল্লাহ তায়ালার সাথে সম্পর্ক গড়ার জন্য ইবাদত করে তাকে 'আরিফ' বলা হয়। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ তায়ালাকে মালিক এবং নিজকে আল্লাহ তায়ালার গোলাম খেয়াল করে। আর মালিকের সম্মানার্থে, মালিককে ভয় করে এবং মালিকের ইবাদত ভক্তি সহকারে করার ইচ্ছে করে তা ইবাদতের মধ্যে গণ্য হবে; আর ইবাদতের অন্তিম স্তর হচ্ছে ঐটাই। যার বহিঃ প্রকাশ হচ্ছে اِيَّاكَ نَعْبُدُ (অর্থাৎ আমরা আপনারই ইবাদত করি) এর মাধ্যমে।

বর্ণিত আছে- বনী ইসরাইলের এক আবিদ সত্তর বছর পর্যন্ত একাকী ইবাদত করেছিলেন। আল্লাহ্ তায়ালা ফেরেশতা পাঠিয়ে বলেন, হে আবিদ! তুমি কষ্ট করনা। কারণ তোমার ইবাদত কবুল হচ্ছেনা। আবিদ জওয়াব দিলেন, এটা আমার দায়িত্ব। আমি গোলামী করতেই থাকব। আর কবুল করা না করা এটা মা'বুদের দায়িত্বের মধ্যে রয়েছে। যখন ফেরেশতা ফিরে গেলেন, তখন আল্লাহ্ তায়ালা জিজ্ঞেস করলেন, আমার বান্দাহ কী জওয়াব দিয়েছে? ফেরেশতা বলেন, হে রব! আপনি তো জানেন- সে এরকম এরকম বলেছে। এতে আল্লাহ তায়ালা ফেরেশতাকে বলেন- আবার গিয়ে বল। হে আবিদ! তোমার নিয়তের দৃঢ়তার কারণে তোমার ইবাদত কবুল করা হয়েছে।

যেহেতু ইবাদতের চরম স্তর হচ্ছে- মানুষ তার সৃষ্টির শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করা। একারণে আল্লাহতায়ালা রাসূলুল্লাহ (সা.) এর প্রশংসা করে বলেন- سُبْحٰنَ الَّذِيْٓ اَسْرٰى بِعَبْدِهٖ لَيْلًا "ঐ মহান আল্লাহ তায়ালা অতিশয় পবিত্র যিনি তার বান্দাহকে রাতে ভ্রমণ করিয়েছেন।" (সূরা ঃ বনী ইসরাঈল-১)

আর হযরত ঈসা (আ.) এই বলে গৌরব করেছেন - انـي عـبـد الـلـه আমি আল্লাহর গোলাম। আর হযরত আলী (রা.) বলেন-

كفاني فخرا ان اكون لك عبدا ÷ كفاني شرفا ان تكون لي ربا

এ আমার গৌরবের জন্য এটাই যে, আমি আপনার গোলাম। আমার সম্মানের জন্য

Scanned with CamScanner

এটাই যথেষ্ট যে, আপনি আমার পালনকর্তা।

إِيَّاكَ نَعْبُدُ

কোন কিছু করা বা না করার ক্ষেত্রে বান্দার ইচ্ছার স্বাধীনতা রয়েছে। এজন্য একটা বিষয়কে প্রধান্য দেয়া দরকার। আর এ প্রধান্য আল্লাহ্ তায়ালা ছাড়া আর কাউকে দিতে পারে না। সুতরাং আল্লাহ্ তায়ালার দিকে আকৃষ্ট হওয়া প্রয়োজন। কোনটা ভাল কোনটা খারাপ তা উপলব্ধি করার মত বিবেক বান্দাহর থাকা সত্বেও সত্য প্রতিষ্ঠায় আল্লাহ তায়ালার সাহায্যের প্রয়োজন রয়েছে। তাছাড়া সত্যের অনুসন্ধান করার জন্যে অন্তরে প্রেরণা সৃষ্টি করে দেয়াও আল্লাহ তায়ালার কাজ। এজন্য বলা হয়- لاحول عن معصيت الله الا بعصمة الله ولا قوة علي طاعة الله الا بتوفيق الله অর্থাৎ আল্লাহ্ তায়ালার পরিত্রাণ ছাড়া কেউ গোনাহ থেকে ফিরে থাকতে পারে না। আল্লাহ্ তায়ালার বাধ্য হয়ে চলার কারো শক্তি নেই, আল্লাহ্ তায়ালার তওফীক ছাড়া। কাজেই কাজের ফলাফল আল্লাহ্ তায়ালার কুদরতী হাতের মুঠোয় রয়েছে- এব্যাপারে কারো দ্বিমত নেই।

প্রশ্ন হতে পারে কাজের শুরুতেই কী সাহায্যের প্রয়োজন রয়েছে? এর জবাবে বলা যায়, যেন বান্দাহ বলে- আমি ইবাদত শুরু করলাম, হে আল্লাহ তুমি তা পূর্ণ কর। আল্লাহ্ তোমার সাহায্য কামনা করি, যেন কোন অন্তরায় সৃষ্টি না হয়। কেননা قلب المؤمنين بين اصبعين من اصابع الرحمٰن মু'মীনের অন্তর আল্লাহর দুই আঙ্গুলের মধ্যখানে। হযরত ইব্রাহীম (আ.) আল্লাহ্ তায়ালার উপর নির্ভর করেছিলেন এবং বলেছিলেন- আল্লাহ্ ছাড়া আর কারো নিকট সাহায্য চাইব না। কারণ তাঁর হাত পা বেঁধে আগুনে ঢেলে দেয়া হয়েছিল। তখন হযরত জিবরাঈল (আ.) এসে জিজ্ঞেস করলেন- আমার সাহায্যের প্রয়োজন আছে? হযরত ইবরাহীম খলিল জওয়াব দিলেন- তোমার কাছে আমার কোন কিছু প্রয়োজন নেই। এতে জিবরাঈল (আ.) বললেন, তা হলে আল্লাহ্ তায়ালার কাছে সাহায্য চাও। হযরত ইবরাহীম (আ.) জওয়াব দিলেন- حسبي من سؤالي علمه بحالي আমার চাওয়ার প্রয়োজন নেই, আমার অবস্থা সম্পর্কে তিনি জানেন।

এ থেকে একটি রহস্য উদঘাটিত হয় যে- মুমিন নামাযে দাঁড়ালে চলা থেকে পা বেঁধে নেয়া হয়, হাত কোন কিছু ধরা থেকে বেঁধে নেয়া হয়, আর মুখ পাঠ ও স্মরণ করা থেকে বন্ধ রাখা হয়। যে আল্লাহ তায়ালা বলেন- يٰنَارُ كُوْنِيْ بَرْدًا وَّسَلٰمًا عَلٰى إِبْرٰهِيْمَ "হে আগুন তুমি ইবরাহীমের উপর ঠান্ডা এবং শান্তি পূর্ণ হয়ে যাও। (সূরা ঃ আম্বিয়া-৬৯)"

এ ভাবে জাহান্নামের আগুন বলবে- حريا مؤمن فقد اطفأنورك لهبي হে মুমিন! তুমি তাড়াতাড়ী কর। কারণ তোমার নূর আমার অগ্নীশিখা নিভিয়ে দিচ্ছে।

حاضر এর প্রতি প্রত্যাবর্তন করার মধ্যে উপকারিতা

প্রশ্ন হতে পারে مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ পর্যন্ত غائب ব্যবহার করে, إِيَّاكَ نَعْبُدُ থেকে حاضر এর প্রতি প্রত্যাবর্তন করার মধ্যে কি হিকমত রয়েছে?

এর উত্তর বলা যায় যেহেতু নামায শুরু করার সময় মুসল্লী অপরিচিত ছিল, কাজেই নামপুরুষ দ্বারা مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ পর্যন্ত আল্লাহ তায়ালার প্রশংসা করা হয়। এরপর যেন আল্লাহ্ তায়ালা বলেন- হে বান্দাহ! তুমি আমার প্রশংসা করেছ এবং তুমি স্বীকার করেছ- আমি সমস্ত সৃষ্টি জগতের পালন কর্তা, যেহেতু তুমি বলেছ إِيَّاكَ نَعْبُدُ । তাই

সত্যিই তুমি আমার খুব ভাল বান্দাহ। আজ তোমার আর আমার মধ্যে কোন পর্দা রইলো না। যে দূরত্ব ছিল তা নৈকট্য দ্বারা পারিবর্তন করা হল। তুমি কথা বল এবং বল- إِيَّاكَ نَعْبُدُ এরপর إِيَّاكَ نَعْبُدُ এর মধ্যে ভয়-ভীতির ভাব পরিলক্ষিত হয়। কাজেই তা দূর করার জন্যে সাথে সাথে إِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ আনা হল।

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ

প্রশ্ন হচ্ছে মুমিন তো হিদায়ত প্রাপ্তই হয়। সুতরাং পুনরায় হিদায়ত চাইলে তো একটা জিনিষ আছে, তা পুনরায় চাওয়ার মত হয়!

এর জবাবে বলা যায়- صراط مستقيم এর মর্মার্থ হচ্ছে صراط الاولين বা পূর্ববর্তীগণের রাস্তা, যা افراط ও تفريط থেকে মুক্ত। আনুগত্যের দিক থেকে ইহা পূর্ববর্তী নবীগণের মত। যেমন- আল্লাহর নির্দেশে হযরত ইব্রাহীম (আ.) নিজের ছেলেকে কুরবানী দিয়েছিলেন। হযরত ইসমাঈল (আ.) এতে রাজী হয়ে আনন্দে গর্দান পেশ করে দিয়েছিলেন। হযরত ইউনূস (আ.) নিজেকে সমুদ্রে নিক্ষেপ করার জন্যে রাজী হয়েছিলেন। পক্ষান্তরে কেউ কেউ صراط শব্দ দ্বারা কুরআন এবং 'ইসলাম' অর্থ নিয়ে থাকেন। কিন্তু صراط المتقدمين বলার পর কুরআন অর্থ নেয়া কিভাবে ঠিক হতে পারে? কারণ সে সময় কুরআন ছিলনা। কাজেই অবশ্যই এর অর্থ নেয়া হবে শরীয়তের নিয়মনীতি এবং আইন সমূহ। যেমন আল্লাহ বলেন- فبهداهم اقتده

যেমন- হযরত আলী (রা.) বলেন- اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ এর মর্মকথা হচ্ছে- ثبتنا علي الهداية ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا "আল্লাহ! আমাদেরকে হিদায়তের উপর দৃঢ় রাখুন। হে আমাদের পালনকর্তা! আমাদের অন্তরকে হিদায়াত দান করার পর তা থেকে সরিয়ে দেবেন না।" কারণ অনেক আলিমের পা ও পিছলে যায়, অনেক হিদায়াতপ্রাপ্ত লোকও গোমরাহ হয়ে যায়।

এখানে صراط শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে, سبيل এবং طريق শব্দ ব্যবহার করা হয়নি। কারণ صراط শব্দ উল্লেখ করে জাহান্নামের রাস্তাসমূহকে বন্ধ করার প্রতি ইংগিত করা হয়েছে। যেন আল্লাহ তায়ালা আমাদেরকে জাহান্নামের রাস্তা অতিক্রম করে জান্নাতে প্রবেশের পথ সহজ করে দেন। তাছাড়া اهدنا শব্দের মধ্যে সর্বনাম (نا) বহু বচন এজন্য নেওয়া হয়েছে, যেন দু'আ সকলের জন্য হয়, এতে দু'আ কবুল হওয়ার অধিক সম্ভাবনা থাকে। তাছাড়া দু'আ করার সময় সমস্ত মুসলমানকে অন্তর্ভুক্ত করা বাঞ্ছনীয়। কারণ মুসলমানদের মধ্যে এমন ব্যক্তিও আছে, যার দু'আ কবুল করা হয়। আর আল্লাহ্ তায়ালা কিছু লোকের জন্য দু'আ কবুল করবেন আর কিছু লোকের দু'আ ফিরিয়ে দেবেন- তা তাঁর শানের খেলাফ। তিনি একজনের ওসীলায় সকলকে কবুল করে নেন।

এর উপর ভিত্তি করেই দু'আর আগে পিছে দরুদ পাঠ করার জন্যে বলা হয়েছে- কারণ দরুদ কবুল হওয়া সম্পর্কে কারো দ্বিমতনেকা নেই। যদি দু'আর শুরুতে দরুদ পাঠ করা হয় এবং দু'আর শেষে দরুদ পাঠ করা হয়- তা হলে একথা নিশ্চিত যে, শেষ আর শুরুর অংশ কবুল করে নিলে মধ্যের অংশ কবুল না হওয়ার কোন অবকাশ নেই। তা ছাড়া রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন- তুমি এমন লোক দিয়ে দু'আ করাবে, যার মুখ দিয়ে গোনাহের কথা বের হয়নি। সাহাবায়ে কিরাম (রা.) আরয করলেন- ইয়া রাসূলুল্লাহ! এধরনের লোক আমাদের মধ্যে কে আছে? রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন- তোমরা একে অপরের জন্য দু'আ কর। কারণ তুমি ওই লোকের মুখ দিয়ে গুনাহ করনি আর সে তোমার মুখ দিয়ে গোনাহ করেনি।

Scanned with CamScanner

কাজেই إِيَّاكَ نَعْبُدُ এর মধ্যে الْحَمْدُ لِلَّهِ সকল প্রশংসাকারীর পক্ষ থেকেই। আর ইবাদত সকলের পক্ষ থেকেই। إِيَّاكَ نَسْتَعِينُ দ্বারা সকলের পক্ষ থেকে সাহায্য তলব করা হয়, হিদায়ত সকলের জন্য তলব করা হয়। এভাবে সালেহীনদের ইকতেদা তলব করা হয়। غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ দ্বারা সব ধরনের গোমরাহী ও ক্রোধ থেকে রক্ষা করা বোঝায়। আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন-

وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا

যারা আল্লাহ্ আর রাসূলের অনুসরণ করবেন, তাঁরা ঐ সমস্ত লোকের সঙ্গী হবেন, যাদেরকে আল্লাহ তায়ালা নিয়ামত প্রদান করেছেন। এরা হলেন- নবী, সিদ্দীক্বীন, শহীদ ও সালেহীন। উল্লেখ্য যে, হিদায়ত যখন আল্লাহ্ তায়ালার পক্ষ থেকে হয়, তখন ايصال الى المطلوب হয়। অর্থাৎ হিদায়তের কর্তা যদি আল্লাহ্ হন, তখন মাধ্যম ছাড়াই হেদায়ত হয়, মাধ্যম ছাড়াই অভিষ্ট লক্ষ্যে আল্লাহ তায়ালা পৌঁছিয়ে দেন, কারণ আল্লাহ তায়ালা কারো মুখাপেক্ষী নন।

আর صِرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ এর অর্থ মধ্যম পন্থা যা চরমপন্থা থেকে মুক্ত।

صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ

নিয়ামত দু'ভাগে বিভক্ত- একটি হল মু'মিন আর মু'মিনাতের জন্য, আর দ্বিতীয় নিয়ামত হল এ পার্থিব জগতের নিয়ামত যার মধ্যে কাফিরও অন্তর্ভুক্ত। যেমন-জীবন। এটি একটি নিয়ামত যার উপর অন্যান্য সকল নিয়ামত নির্ভরশীল। কারণ যখন জীবনের সমাপ্তি ঘটে, তখন পার্থিব নিয়ামতেরও অবসান ঘটে। যদিও এর মধ্যে কাফিরও আছে; তবে পার্থিব জগতের এ নিয়ামত তাদের জন্য গৌরবের বা মঙ্গলের কিছুই নয়। কারণ আল্লাহ তায়ালা বলেন-

وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنْفُسِهِمْ إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُوا إِثْمًا

"তোমরা কাফিরদের ব্যাপারে একথা ধারণা কর না যে, তাদের কল্যাণ সাধনের জন্য আমি তাদেরকে অবকাশ দিচ্ছি বরং আমি তাদেরকে ঢিল দিচ্ছি এজন্য- যেন তারা আরো বেশী গোনাহ করে।" (সূরা ঃ আলে-ইমরান-১৭৮)

অন্যত্র বলা হয়েছে, فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ (ال عمران) "যারা কাফির তাদের এ নিয়ামত শুধু কয়েকদিনের জন্যে, তারপর তাদেরকে জাহান্নামের আগুনে নিক্ষেপ করব।" আসল ব্যাপার হচ্ছে- এ পৃথিবীর যত ধরনের নিয়ামত আছে, সব ধরনের নিয়ামতে কাফিররাও শরীক। কিন্তু তা তাদের জন্যে ক্ষতির কারণ। যেমন কোন লোককে ভাল মিষ্টি খাওয়ানো হল, কিন্তু তার পেটে অসুখ থাকলে তা যতোই ভাল হোক না কেন, তাতে তার পেট পীড়া হবেই। যেমন ডিম, দুধ, মধু ও সূর্যের আলো অনেকের জন্য ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়ায়- যদিও বা এসব জিনিষ খুবই ভাল ও পুষ্টিকর।

কাজেই কাফিরদের নিয়ামত তাদের জন্য ক্ষতির কারণ হয়। যেহেতু তারা কোথায় এবং কীভাবে মাল ব্যয় করবে তা জানেনা, এ জন্য এ মাল বাহ্যিক দৃষ্টিতে ভাল কাজের জন্য হলেও তা পরকালে কোন কাজে আসেনা। যেহেতু আল্লাহ্ তায়ালার দরবারে ভাল কাজ কবুল হওয়ার জন্য ঈমান পূর্বশর্ত। তাই বে-ঈমানের ভাল কাজও আল্লাহ্ তায়ালার দরবারে কবুল হয় না। এ'জন্য রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন- نعم المال الصالح للرجل الصالح অর্থাৎ নেক্কার লোকের উত্তম মালই হল সর্বোত্তম মাল।

আর এপার্থিব জগতের দ্বিতীয় নিয়ামত হল ঈমান। দৌহিক পূর্ণতা যেমন আল্লাহ তায়ালার

পক্ষ থেকে হয়, তেমনি আত্মিক পূর্ণতা লাভ করা যায় ঈমানের মাধ্যমে। দৈহিক পূর্ণতা যেমন আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে হয়, তেমনি ঈমানও আল্লাহ প্রদত্ত তওফীক এর মাধ্যমে হয়। তা হলে আয়াতের ভাবার্থ হবে-

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّنَ وَالصِّدِّيْقِيْنَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِيْنَ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ بعني يهود ولا الضالين يعني النصاري ـ

অর্থাৎ আমাদেরকে নবী, সিদ্দীক, শহীদ ও সালেহীনদের পথে পরিচালিত করে তাদেরকে যে পুরস্কারে পুরস্কৃত করেছেন, সেই ধরনের পুরস্কারে আমাদেরকেও পুরস্কৃত করুন- ইহুদী আর নাসারাদের পথে পরিচালিত করোনা, যারা আপনার ক্রোধের রোষানলে নিপতিত। অন্যত্র ইহুদী সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা বলেন وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ অর্থাৎ তারা আল্লাহ তায়ালার ক্রোধে পতিত হয়েছে, আর নাসারা সম্পর্কে বলেন وَضَلُّوا عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ অর্থাৎ তারা সঠিক পথ থেকে বিচ্যুত হয়েছে।

সূরা ফাতিহার মাহাত্ম্য

সূরা ফাতিহা যখন নামাযে পাঠ করা হয়- তখন তার বিকশিত আলো যমীন হতে আকাশ তথা লাওহে মাহফূয এর দিকে উঠে যায়। যেমনিভাবে রাসূলুল্লাহর যামানায় তা আসমান হতে যমীনে অবতরণ করত। একারণে রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন- الصلوة معراج المؤمنين অর্থাৎ নামায হচ্ছে মুমিনদের মি'রাজ।

তিনটি দিক থেকে শয়তান মানুষের উপর প্রভাব বিস্তার করে। ওই তিনটি হল- ১.কাম ২.ক্রোধ ৩.লোভ। কাম হচ্ছে পশুত্ব, ক্রোধ হচ্ছে আরো মারাত্মক আর লোভ হচ্ছে শয়তানী। এজন্য বলা হয়- কাম হল বিপদ, কিন্তু ক্রোধ তার চেয়েও বড়, আর গজব বা ক্রোধের চেয়ে বড় হল-হাওয়া অর্থাৎ লোভ। আল্লাহ্ তায়ালা বলেন- اِنَّ الصَّلٰوةَ تَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَاءِ اي الشهوة والمنكر الغضب ـ অর্থাৎ নামায ফাহিশা ও অপছন্দনীয় কাজ থেকে দূরে রাখে। এখানে ফাহিশা দ্বারা উদ্দেশ্য করা হয়েছে লালসা, আর منكر দ্বারা ক্রোধ।

একারণে রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন- الظلم ثلاثة فظلم لايغفر وظلم لا يترك فظلم عسي الله ان يتركه অর্থাৎ "রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন- যুলুম তিন ধরণের। এক ধরণের যুলুম যা ক্ষমা করা হয় না। আর এক ধরনের যুলুম যা ত্যাগ করা যায় না। আর এক ধরনের যুলুম আশা করা যায়, আল্লাহ্ তা ছেড়ে দেবেন।" যে যুলুম ক্ষমা করা যায় না তা হল শিরক। আল্লাহ্ তায়ালার সাথে শিরক করা। আর যে যুলুম ত্যাগ করা যায় না তা হল আল্লাহর বান্দার উপর অপর বান্দার যুলুম। আর এক ধরণের যুলুম, যা আশা করা যায়, আল্লাহ্ মাফ করতে পারেন, তা হল মানুষ নিজে নিজের উপর যুলুম করা। শাহওত বা কামের ফল হল- লোভ করা ও কার্পণ্য করা। ক্রোধের ফল হল, নিজের কাজকে নিজে ভাল মনে করা আর অহংকার করা। কুপ্রবৃত্তির ফল হল, কুফর ও বিদআ'ত করা। আদম সন্তানের মাঝে এ ছয়টি স্বভাবের ফলে আরও একটি স্বভাব সৃষ্টি হয়, তা হল حسد বা হিংসা। হিংসা হচ্ছে অত্যন্ত খারাপ স্বভাব। যেমনি ভাবে শয়তান হচ্ছে প্রাণী জগতের মধ্যে কিনৃষ্টতম। এজন্য আল্লাহ্ তায়ালা বলেন হিংসা হচ্ছে মানুষের খারাপ গুণাবলীর সমন্বয় বা সমষ্টি। আল্লাহ তায়ালা বলেন- "আপনি বলুন আমি আশ্রয় প্রার্থনা করছি হিংসুকের হিংসা থেকে জ্বীন ও ইনসানের মধ্যে হতে যারা মানুষের অন্তরে মন্দ প্ররোচনা দিয়ে থাকে, তা থেকে।" বর্ণিত আছে, ইবলিস ফিরআ'উনের দরজায় এসে আওয়াজ দিল। ফিরআ'উন বলল কে? ইবলিস বলল-তুমি যদি মা'বুদ হতে, তাহলে চিনতে পারতে। যখন শয়তান

Scanned with CamScanner

প্রবেশ করল, তখন ফরআ'উন বলল-তুমি এ দুনিয়াতে আমার ও তোমার চেয়ে বেশী খারাপ কিছু আছে বলে জান? শয়তান উত্তর দিল হ্যাঁ, জানি, সে হিংসুক। এ দুনিয়াতে মন্দ যা কিছু ঘটেছে হিংসার দ্বারাই হয়েছে।" বিসমিল্লাহির রাহমানীর রাহীম এর মধ্যে এ যে তিনটি নাম রয়েছে- তা দ্বারা মানব চরিত্রের এ দোষ দূর হয়ে যায়।

সূরা ফাতিহায় সাতটি আয়াত রয়েছে। এসাতটি আয়াত দ্বারা মানুষের যে সাত ধরনের খারাপ স্বভাব রয়েছে, তা দূর হয়ে যায়। কাজেই যে আল্লাহকে চিনতে পারে কামনার দ্বারা সৃষ্ট শয়তানী ভাব তার থেকে তা দূর হয়ে যায়। যে ব্যক্তি জানবে যে আল্লাহ হচ্ছেন রাহমান তার মাঝে ক্রোধ থাকবেনা, কারন ক্রোধের জন্য অভিভাবক হওয়া শর্ত। আর অভিভাবকত্ব কেবল আল্লাহর, যেমন তিনি বলেন- اَلْمُلْكُ يَوْمَئِذِ الْحَقُّ لِلرَّحْمٰنِ 'সে দিনের সত্যিকার রাজত্ব হবে দয়াময় আল্লাহর।' আর যে রাহীমকে চিনতে পেরেছে, সে নিজের উপর জুলুম করবেনা এবং নিজের কাজ নিয়ে গৌরব বোধ করবেনা।

মোট কথা বান্দা আলহামদুলিল্লাহ পাঠ করার পর যা পায় বা পাওয়া যায়না কেন, তাতে সন্তুষ্ট হয়ে যায়। এতে তার লালসা দূর হয়ে যায়। আর যে জানতে পারল তিনিই رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ সে যা পেল তাতে কৃপণতা করবেনা, আর যা পেল না তার প্রতি লোভ করবেনা। আর যে জানল তিনিই اَلرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ এবং তিনিই مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ সে ক্রোধ দেখাবে না। আর যেই বলল, اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ তার গৌরব ও অহংকার চলে যাবে, নিজের কাজকে নিজে পছন্দ করা এবং নিজের প্রশংসা নিজে করার অভ্যাস চলে যাবে। আর যখন বলা হয় اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ তখন হাওয়া নামক শয়তান দূর হয়ে যায়। আর যখন বলা হয়- صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ সে সময় কুফুর দূর হয়ে যায়। আর যখন বলা হয় غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ তখন তার থেকে যে বিদআ'ত আবিস্কার হয় তা দূরে হয়ে যায়। আর যখন এ ছ'ধরনের খারাপ স্বভাব দূর হয়ে যায়, তখন এমনিতেই হিংসাও দূর হয়ে যায়। সূরা ফাতিহা যেমনটি উল্লেখিত সাতটি মন্দ স্বভাবের প্রতিষেধক তেমনটি একথা মেনে নিতে হয় যে, কুরআন মানুষের জন্য সকল রোগের চিকিৎসা। এখানে একটি সূক্ষ্ম বিষয় পরিলক্ষিত হয়, যা ملك - رب ও اله এ তিন শব্দের সাথে সম্পৃক্ত। رب, ملك, اله এ তিনটি শব্দের উপরই কুরআন শেষ হয়েছে (কেননা কুরআনুল কারীমের শেষ সূরা নাস-এর মধ্যে এ তিনটি শব্দ রয়েছে)। যেন বলা হয়েছে- যদি শয়তান শাহওয়াত এর পক্ষ হতে আসে তা হলে বল- قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ যদি রাগের পক্ষ থেকে আসে তা হলে বল مَلِكِ النَّاسِ যদি কুপ্রবৃত্তির পক্ষ থেকে আসে তাহলে বল- اِلٰهِ النَّاسِ। যত জিনিষের প্রতি মানুষ মুখাপেক্ষী সূরা ফাতিহা সব কিছুকে অন্তর্ভুক্ত করে।

الحمد لله একথার প্রতি ইংগিত বহন করে যে, তিনিই হচ্ছেন সবকিছুর সৃষ্টিকর্তা যার জন্য তিনিই সমস্ত প্রশংসা, সানা ও শ্রেষ্ঠত্বের অধিকারী। رب العلمين ইশারা করে মা'বুদের একত্বের উপর। অর্থাৎ সমগ্র বিশ্বের মালিক ও রাজত্ব আল্লাহ তায়ালার। বিশ্ব জগতে আল্লাহ্ ছাড়া আর কোন মাবুদ নেই। اَلرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ থেকে এ সত্য প্রতিভাত হয় যে, মৃত্যুর আগে-পরে এবং মৃত্যুকালে শুধু তাঁরই ইহসান বিদ্যমান।

رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ইশারা করে এ সত্যের প্রতি যে, এদিনের অবসান হওয়ার পর আর

একটি দিন আছে- যেদিন নেককার বদকার থেকে, জালিম মজলুম থেকে পৃথক হয়ে যাবে সেই দিনই সৃষ্টিকর্তার রবুবিয়ত উপলব্ধি করা যাবে।

আর اِيَّاكَ نَعْبُدُ থেকে আল্লাহ্ তায়ালার ইবাদত এবং আল্লাহ্ তায়ালার সাহায্য ছাড়া বান্দাহর যে কিছুই করার শক্তি নেই, তা উপলব্ধি করা যায়। একারণেই ايّاك نستعين বলতে হয়। তাছাড়া সকল কাজেরই একটি প্রভাব থাকে, তদানুযায়ী মানুষের উপর اِيَّاكَ نَعْبُدُ এর প্রভাব পড়ে বলেই মানুষ হেদায়ত প্রাপ্ত হয়। এজন্য বলা হয়েছে اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ

صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ হল একথার উপর দলীল যিনি পূর্ণ মালিক, তার নূরে আলোকিত হতে হলে তার সন্তুষ্টি অর্জন করতে হবে। আর তারা (হেদায়াত প্রাপ্তগণ) এমন এক সম্প্রদায় যাদের সাথে উপবিষ্ট কেউ হতভাগ্য হয় না। আর غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ ইশারা করে যে, বেদআ'তী বন্ধু-বান্ধব এবং যারা কু-প্রবৃত্তির বশবর্তী হয়ে চলে, তাদের থেকে বেঁচে থাকা আবশ্যক। যেমন কবির কবিতা-

عن المرء لا تسئل وسل عن قرينه + فكل قرين بالمقارن يقتدي

"ব্যক্তি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করনা বরং তার বন্ধু সম্পর্কে জিজ্ঞাসা কর। কেননা প্রত্যেক বন্ধু তার বন্ধুর অনুসরণ করে।"

সূরা ফাতিহার মধ্যে সাতটি আয়াত। আর নামাযে এমন সাতটি কাজ রয়েছে যা অনুভব করা যায়। যেমন ১. কিয়াম অর্থাৎ দাঁড়ানো, ২. রুকু, ৩. প্রথম সিজদা, ৪. প্রথম সিজদার পর বসা, ৫. দ্বিতীয় সিজদা, ৬. শেষ বৈঠক ৭. রুকুর পর সোজা হয়ে দাড়ানো- এসব কাজগুলো ধরে নেয়া যায় একজন লোক, আর এর প্রাণ হল সূরা ফাতিহা।

তাছাড়া সূরা ফাতিহার اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَ اِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ এর মধ্যে শুধু শাব্দিক সম্বোধন নয়; বরং রূহানী দিক থেকে আল্লাহ তায়ালার সামনা সামনি হওয়া যায়। হাদীস শরীফে আছে- যদি কোন মুসল্লীর থুথু ফেলার প্রয়োজন হয় সে যেন সামনে অথবা ডান দিকে না ফেলে। কারণ নামাযের মধ্যে বান্দাহ আল্লাহ তায়ালার কাছে তার মনের গোপন কথা ব্যক্ত করে।

والله اعلم

Scanned with CamScanner

সূরা বাক্বারাহ্

মদীনায় অবতীর্ণ

২৮৬ আয়াত, ৪০ রূকু

اياتها ٢٨٦ : سورة البقرة مدينة : ركوعها ٤٠

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

الٓمّٓ ﴿١﴾ ذٰلِكَ الْكِتٰبُ لَا رَيْبَ فِيْهِ ۛ هُدًى لِّلْمُتَّقِيْنَ ﴿٢﴾ الَّذِيْنَ يُؤْ
مِنُوْنَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَمِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ ﴿٣﴾ وَالَّذِيْنَ
يُؤْمِنُوْنَ بِمَآ اُنْزِلَ اِلَيْكَ وَمَآ اُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ ۚ وَبِالْاٰخِرَةِ هُمْ
يُوْقِنُوْنَ ﴿٤﴾ اُولٰٓئِكَ عَلٰى هُدًى مِّنْ رَّبِّهِمْ ۗ وَاُولٰٓئِكَ هُمُ
الْمُفْلِحُوْنَ ﴿٥﴾ اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا سَوَآءٌ عَلَيْهِمْ ءَاَنْذَرْتَهُمْ اَمْ لَمْ
تُنْذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُوْنَ ﴿٦﴾ خَتَمَ اللّٰهُ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ وَعَلٰى سَمْعِهِمْ ۭ
وَعَلٰٓى اَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ ۡ وَّلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيْمٌ ﴿٧﴾

দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে

১. আলিফ্-লাম মীম
২. এটা সেই কিতাব; এতে কোন সন্দেহ নেই, মুত্তাকীদের জন্য ইহা পথ নির্দেশ।
৩. যারা অদৃশ্যে ঈমান আনে, সালাত কায়েম করে ও তাদেরকে যে জীবনোপকরণ দান করেছি তা হতে ব্যয় করে।
৪. এবং তোমার প্রতি যা নাযিল হয়েছে ও তোমার পূর্বে যা নাযিল হয়েছে তাতে যারা ঈমান আনে ও আখিরাতে যারা নিশ্চিত বিশ্বাসী।
৫. তারা তাদের প্রতিপালক নির্দেশিত পথে রয়েছে এবং তারাই সফলকাম।
৬. যারা কুফরী করেছে তুমি তাদেরকে সতর্ক কর বা না কর, তাদের পক্ষে উভয়ই সমান, তারা ঈমান আনবে না।

৭. আল্লাহ তাদের হৃদয় ও কর্ণ মোহর করে দিয়েছেন, তাদের চক্ষুর উপর আবরণ রয়েছে এবং তাদের জন্য রয়েছে মহাশাস্তি।

الٓمّٓ

এ ধরনের 'হরফ' বা বর্ণ- যা কতকগুলো সূরার শুরুতে রয়েছে, এ সম্পর্কে দুটি বক্তব্য রয়েছে। প্রথম বক্তব্য হচ্ছে, এগুলো হলো আশিক ও মাশুকের মধ্যে পরস্পর ভাব বিনিময়ের কতেকগুলো সংকেত, যা আল্লাহ্ ও আল্লাহ্র রাসূল (সা.) ছাড়া অন্য কেউ জানেনা। আর পৃথক পৃথক একটা একটা হরফ নিয়ে সম্বোধন করে আহবান করাই হচ্ছে অন্তিম ও অত্যধিক প্রেম-প্রীতির নিদর্শন, যার উপর কোন পর্যবেক্ষকের নিয়ন্ত্রণ থাকেনা অর্থাৎ যার অর্থ কোন পর্যবেক্ষকও বুঝতে পারে না। যেমন কবি তার কবিতায় বলেন-

بين المحبين سر ليس يفشيه قول ولا قلم للخلق يحكيه

দু' প্রেমিকের মধ্যে রয়েছে এমন কিছু গোপনীয় বিষয়, সৃষ্টি জগতের কাছে এমন কোন কথা বা কলম সৃষ্টি হয়নি যা তা প্রকাশ করতে পারে।

হযরত আবু বকর (রা.) হতে বর্ণিত, প্রত্যেক কিতাবের কিছু গোপনীয় বিষয় থাকে, এ হরফ গুলো হল কুরআনের গোপনীয় কথা।

হযরত আলী কাররামাল্লাহু ওজহাহু বলেন, একথা অনস্বীকার্য যে, প্রত্যেক কিতাবের মধ্যে হৃদ্যতামূলক কিছু কথা থাকে, এ হরফগুলো হল- কুরআনের হৃদ্যতার সংকেত। দ্বিতীয় বক্তব্য হচ্ছে- আরেফীনরা বলেন-

ইলম হচ্ছে সমুদ্র, সমুদ্রে রয়েছে নদী-খাল-পাহাড়। কিন্তু এ কথা সত্য যে, নদী সমুদ্রের অঢেল পানির প্রবাহ ধারণ করে রাখতে পারে না। পাহাড় নদীর পানি ধারণ করতে পারে না। বরং আসমান হতে পানি বর্ষণ করা হয় এবং উপত্যকা যথাসম্ভব প্রবাহিত করে দেয়। তদ্রূপ ইলমের সমুদ্র সমূহ আল্লাহ্ তায়ালার নিকট রক্ষিত। তিনি রাসূল ও নবীগণকে নদী হিসেবে প্রেরণ করেছেন। নবীদের থেকে উলামাগণ খাল হিসেবে ইলম পেলেন। আলিমদের থেকে ছোট ছোট উপত্যকা সৃষ্টি হল এবং এদের ধারণ ক্ষমতা অনুযায়ী ইলম গ্রহণ করল। হাদীস শরীফে আছে, আলেমদের কিছু গোপন বিষয় রয়েছে, খলীফাদের অনুরূপ গোপন বিষয় রয়েছে, নবীগণের গোপন বিষয় রয়েছে, ফেরেশতাদের গোপন বিষয় রয়েছে- আর সমস্ত গোপনীয়তা আল্লাহ তায়ালার কাছে রক্ষিত। উলামাদের গোপন তথ্য মূর্খ লোকেরা জানলে তা তারা অবশ্যই প্রকাশ করে দিত। খলীফার গোপন তথ্য আলেমগণ জানলে তাদেরকে তারা গ্রহণ করত না। নবীদের গোপন তথ্য (যা সাধারণ মানুষ বুঝে না) খলীফাগণ জানলে অবশ্যই তাঁরা এর বিরোধীতা করত, নবীগণ কিন্তু ফেরেস্তাদের গোপন তথ্য জানলে তা তারা ভক্তি সহকারে গ্রহণ করতেন, ফেরেস্তারা আল্লাহ্ তায়ালার গোপন তথ্য জানলে তা নিয়ে তারা দিশেহারা হয়ে পড়তেন এবং ঘুরতে থাকতেন। এ রকম হওয়ার কারণ হচ্ছে বুদ্ধিও জ্ঞানের দুর্বলতা। কারণ তারা এ নিগূঢ় তথ্যের গোপন রহস্য বুঝতে পারেনা বিধায় এ রকম করে, যেমনিভাবে বাদুরের চোখ সূর্যের আলো সহ্য করতে পারে না। অনুরূপভাবে কুরআনের এ হরফগুলোর মধ্যে গোপনীয় কিছু মাহাত্ম্য রয়েছে যা সধারন মানুষের বোধগম্য নয়।

হযরত শা'বী (র.) বলেন, এ সব হরফ বা বর্ণ হচ্ছে আল্লাহ্ তায়ালার গোপন তথ্য। কাজেই এর তথ্য ও গোপনীয়তা জানতে চেষ্টা করনা। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)

Scanned with CamScanner

বলেন, এ সকল হরফের অর্থ উপলব্ধি করতে আলিম সমাজ সক্ষম নয়। কোনো কোনো মুফাসসীর এ বিচ্ছিন্ন হরফগুলোকে মুতাশাবিহ (অর্থাৎ যার অর্থ অস্পষ্ট ও বুঝা যায় না) বলেছেন।

ذٰلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيْهِ

ذالك ইসমে ইশারা বঈদ। যদিও কুরআন দৃশ্যতঃ নিকটবর্তী, কিন্তু কুরআনের রহস্য আর নিগূঢ় তথ্যের প্রতি দৃষ্টি প্রদান করলে বুঝা যায় যে, কুরআনের সবই গায়েব আর দূরের। অথবা কুরআন যেহেতু লাওহে মাহফুজ হতে অবতীর্ণ হয়েছে এ জন্য ذالك ব্যবহার করা হয়েছে। যেমন আল্লাহ বলেন- إِنَّهُ فِيْ أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيْمٌ ذالك ইসমে ইশারার مشار اليه হয়েছে الكتاب। এজন্য ইসমে ইশরা مذكر ব্যবহার হয়েছে। আর কিতাব দ্বারা কুরআনকে বুঝানো হয়েছে।

পবিত্র কুরআনে কুরআন শরীফের অনেক নাম রয়েছে- নিম্নে এগুলো উল্লেখ করা হলো

১. أم الكتاب যেমন -إِنَّهُ فِيْ أُمِّ الْكِتَابِ নিশ্চয় ইহা কিতাবের মূল।

২.القران যেমন-بَلْ هُوَ قُرْاٰنٌ مَّجِيْدٌ বরং এটি হচ্ছে মহিমান্বিত কুরআন।

৩. فرقان যেমন- تَبٰرَكَ الَّذِيْ نَزَّلَ الْفُرْقَانَ -বরকতময় সেই সত্তা যিনি ফুরকান অবতীর্ণ করেছেন।

৪. تذكرة যেমন- وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِّلْمُتَّقِيْنَ -এটি পরহেজগার লোকদের জন্যে নসীহত।

৫. ذكرى যেমন- وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرٰى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِيْنَ -আপনি উপদেশ দিন। নিশ্চয় উপদেশ মুমিনদের উপকারে আসে।

৬. ذكر যেমন- وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَّكَ وَلِقَوْمِكَ অর্থাৎ এ কুরআন তোমার জন্যে (হযরত সা.) আর তোমার কওমের জন্যে নসীহত ও উপদেশ স্বরূপ।

৭. تنزيل যেমন- وَإِنَّهُ لَتَنْزِيْلُ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ নিশ্চয় ইহা জগৎ সমূহের প্রতিপালকের পক্ষ হতে অবতীর্ণ।

৮. أَحْسَنَ الْحَدِيْثِ যেমন- اَللّٰهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيْثِ আল্লাহ তায়ালা সর্বোত্তম বাণী অবতীর্ণ করেছেন।

৯. موعظة যেমন- قَدْ جَاءَتْكُمْ مَّوْعِظَةٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ তোমাদের পরওয়ারদিগারের পক্ষ থেকে তোমাদের কাছে উপদেশ বাণী এসেছে।

১০.حكم যেমন- وَكَذٰلِكَ أَنْزَلْنَاهُ حُكْمًا عَرَبِيًّا এমনিভাবে আমি তা আরবী ভাষায় বিধান রূপে অবতীর্ণ করেছি।

১১. حِكْمَةٌ,যেমন- حِكْمَةٌ بَالِغَةٌ فَمَا تُغْنِ النُّذُرُ ইহা পরিপূর্ণ জ্ঞান, তবে এ সতর্কবাণী তাদের কোন উপকারে আসেনি।

১২. حكيم যেমন-تِلْكَ اٰيَاتُ الْكِتَابِ الْحَكِيْمِ ঐগুলো জ্ঞানগর্ভ কিতাবের আয়াত।

১৩. محكم যেমন- فَإِذَا أُنْزِلَتْ سُوْرَةٌ مُّحْكَمَةٌ যখন মুহকম সূরা অবতীর্ণ হয়।

১৪. شفاء যেমন-وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْاٰنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَّرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ আমি কুরআন অবতীর্ণ করেছি মুমীনদের জন্য শিফা ও রহমত স্বরূপ।

১৫ رحمة যেমন-وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْاٰنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَّرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ আমি কুরআন অবতীর্ণ করেছি মুমীনদের জন্য শিফা ও রহমত স্বরূপ।

১৬. هُدًى যেমন- هدى للمتقين এ কুরআন মুত্তাকীদের জন্য হিদায়তকারী।

১৭. هادي, যেমন إِنَّ هٰذَا الْقُرْاٰنَ يَهْدِيْ لِلَّتِيْ هِيَ أَقْوَمُ এ কুরআন হিদায়তকারী ঐ সমস্ত লোকদেরকে যারা প্রতিষ্ঠিত।

১৮. صراط المستقيم যেমন- اَنَّ هٰذَا صِرَاطِيْ مُسْتَقِيْمًا এটি আমার সঠিক রাস্তা।

১৯. حبل الله যেমন- وَاعْتَصِمُوْا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيْعًا তোমরা সকলেই আল্লাহ তায়ালার রশি মজবুত করে ধর।

২০. روح যেমন- وَكَذٰلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوْحًا مِّنْ أَمْرِنَا -এ ভাবে আমি তোমার নিকট অহী পাঠিয়েছি।

২১.قصص যেমন ان هذا لهو القصص الحق অবশ্যই এগুলো সত্য কাহিনী।

২২. بيان , যেমন-هٰذَا بَيَانٌ لِّلنَّاسِ-ইহা মানুষের স্পষ্ট বর্ণনা।

২৩. تبيان যেমন-وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْاٰنَ تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ-আমি আপনার প্রতি কুরআন অবতীর্ণ করেছি প্রতিটি বিষয়ে বর্ণনা স্বরূপ।

২৪. مُبِيْن যেমন- تِلْكَ اٰيَاتُ الْكِتَابِ الْمُبِيْنِ ঐগুলো স্পষ্ট কিতাবের আয়াত।

২৫. بصائر - যেমন- هٰذَا بَصَائِرُ مِنْ رَّبِّكُمْ এটি তোমাদের পরওয়ারদেগারের পক্ষ থেকে নিদর্শণ স্বরূপ।

২৬. فصل যেমন- إِنَّهُ لَقَوْلٌ فَصْلٌ নিশ্চয় ইহা পার্থক্যকারী বাণী।

২৭. مثاني যেমন الله نزل احسن الحديث كتابامتشابهامثاني- আল্লাহ অবতীর্ণ করেছেন উত্তম বাণী সম্বলিত কিতাব যা সুসমঞ্জস্য এবং যা পুনঃপুনঃ তিলাওয়াত করা হয়।

২৮. نعمة যেমন- وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ আপনার পরওয়ার দিগারের পক্ষ থেকে প্রেরিত নিয়ামতের আলোচনা করুন।

২৯.برهان যেমন- قَدْ جَاءَتْكُمْ بُرْهَانٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ তোমাদের সৃষ্টিকর্তার পক্ষ থেকে তোমাদের নিকট এসেছে দলীল।

৩০. بشير যেমন- قُرْاٰنًا عَرَبِيًّا لِّقَوْمٍ يَّعْلَمُوْنَ بَشِيْرًا وَّ نَذِيْرًا এ আরবী ভাষায় প্রেরিত কুরআন সুসংবাদ প্রদানকারী এবং ভীতি প্রদানকারী হিসেবে প্রেরিত হয়েছে।

৩১. نذير যেমন- قُرْاٰنًا عَرَبِيًّا لِّقَوْمٍ يَّعْلَمُوْنَ بَشِيْرًا وَّ نَذِيْرًا এ আরবী ভাষায় প্রেরিত কুরআন সুসংবাদ প্রদানকারী এবং ভীতি প্রদর্শনকারী হিসেবে প্রেরিত হয়েছে।

৩২. قيم যেমন- قيما لينذر بأسا شديدا ইহাকে করেছেন সু-প্রতিষ্ঠিত তাঁর কঠিন শাস্তি সম্পর্কে সতর্ক করার জন্য।

৩৩. المهيمن যেমন- مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ এ কিতাব তার পূর্ববর্তী কিতাবে সত্যায়নকারী ও সংরক্ষক।

৩৪. النور যেমন -وَاتَّبَعُوا النُّوْرَ الَّذِيْ أُنْزِلَ مَعَهُ আর তারা অনুসরণ করেছেন সেই নূরের যা তার সাথে অবতীর্ণ হয়েছে।

৩৫. الحق যেমন- وانه لحق اليقين নিশ্চয় ইহা নিশ্চিত সত্য।

৩৬. العزيز যেমন- وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيْزٌ নিশ্চয় ইহা মহিমান্বিত কুরআন।

৩৭. الكريم যেমন- وَإِنَّهُ لَقُرْاٰنٌ كَرِيْمٌ নিশ্চয় ইহা সম্মানিত কুরআন।

৩৮. العظيم যেমন- وَلَقَدْ اٰتَيْنٰكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِيْ وَالْقُرْاٰنَ الْعَظِيْمَ। আমি আপানাকে সাত মাসানী ও কুরআনে আযীম দান করেছি।

৩৯. المبارك যেমন- كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ এ কিতাব আমি আপনার প্রতি অবতীর্ণ করেছি বরকতময় করে।

الم প্রথম মুবতদা ذالك দ্বিতীয় মুবতাদা আর الكتاب হচ্ছে খবর। এর পরের বাক্য প্রথম বাক্যের খবর অথবা الم مبتدا محذوف এর খবর। যা আসলে এরকম هذه

Scanned with CamScanner

الم আর ذالك الكتاب কিতাবের بدل হয়ে خبرثاني অথবা الم একটি বাক্য এবং অপর আর একটি বাক্য, আর এর মধ্যখানে কোন অব্যয় বা حـــرف ব্যবহার করা হয়নি, যার কারণ এ ক্ষেত্রে দ্বিতীয় বাক্য প্রথম বাক্যের বয়ান الـريـب মাসদার, এটি এসেছে راب থেকে। অর্থ قلق النفس যা অধিকাংশ ক্ষেত্রে মন্দভাবে সন্দেহ করা অর্থে ব্যবহৃত হয়। এ কুরআন যে আল্লাহ্ তায়ালার নিকট হতে অবতীর্ণ হয়েছে, এ ব্যাপারে সন্দেহ করা কারো জন্য বাঞ্ছনীয় নয়। হ্যাঁ, কেউ যদি সন্দেহ করেও থাকে, তার জন্য বলা হয়েছে وَاِنْ كُنْتُمْ فِيْ رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلٰى عَبْدِنَا فَاْتُوْا بِسُوْرَةٍ مِّنْ مِّثْلِهٖ -এ কুরআন আল্লাহ্ তায়ালার নিকট হতে অবতীর্ন হয়েছে- এ ব্যাপারে বিন্দু মাত্র সন্দেহ থাকলে এ ধরনের একটি সূরা প্রনয়ন কর দেখি। কাজেই এখানে সন্দেহ করার কোন অবকাশ নেই, যদিও কেউ কেউ সন্দেহ করে থাকে।

هُدًى لِّلْمُتَّقِيْنَ

এখানে هـدي মাসদার, অর্থ হিদায়ত যা গোমরাহীর বিপরীত শব্দ এবং মুত্তাকী وقـاء থেকে فـاتـقي এর সীগাহ। وقايت এমন বৈশিষ্টা সম্পন্ন অবস্থার নাম, যাতে খুবই কঠোরভাবে নিজকে সংরক্ষণ করা হয়। الـمـتـقـي বলা হয় শরীয়তের দৃষ্টিতে যা হারাম তা থেকে পরহেজকারীকে। تـقـوي শব্দের প্রকৃত অর্থ হল ভীতি আবার কখনো তাকওয়া শব্দ দ্বারা ঈমান বুঝানো হয়। যেমন- اَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوٰى اي التوحيد অর্থাৎ একত্ববাদের উপর বিশ্বাস করা অবশ্যই তোমাদের জন্য জরুরী। আবার কখনো تقوى দ্বারা 'তওবা' বুঝায়। যেমন- وَلَوْ اَنَّ اَهْلَ الْقُرٰى اٰمَنُوْا وَاتَّقَوْا اي تـابـوا অর্থাৎ যদি গ্রামবাসীরা ঈমান আনত আর তাকওয়া ধারণ করত অর্থাৎ তওবা করত। আবার কখনো গোনাহ ছেড়ে দেয়াকে বোঝায়। যেমন وَاْتُوا الْبُيُوْتَ مِنْ اَبْوَابِهَا وَاتَّقُوا اللّٰهَ অর্থাৎ তোমরা ঘরের দরজা দিয়ে ঘরে প্রবেশ কর এবং আল্লাহ্কে ভয় কর। আবার কখনো ইখলাস (অর্থাৎ বিশুদ্ধতা যেখানে রিয়ার কোন অবকাশ থাকেনা) অর্থ হয়। যেমন অন্যত্র এসেছে فَاِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوْبِ اي من اخلاصها আর تـقـوي হচ্ছে মর্যাদাবান হওয়ার শ্রেষ্ঠতম পন্থা। এজন্য আল্লাহ্ তায়ালা বলেন اِنَّ اللّٰهَ مَعَ الَّذِيْنَ اتَّقَوْا -আল্লাহ তায়ালা মুত্তাকীদের সাথেই রয়েছেন। اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقَاكُمْ আল্লাহ তায়ালার কাছে মুত্তাকী লোকই সবচেয়ে বেশী সম্মানী।

وَتَزَوَّدُوْا فَاِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوٰى তোমার পাথেয় সংগ্রহ কর; তাকওয়া হচ্ছে সর্বোত্তম পাথেয়।

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন- যে ব্যক্তি মানুষের মধ্যে বেশী সম্মানী হতে চায়, সে যেন আল্লাহকে ভয় করে। আর যে ব্যক্তি মানুষের মধ্যে সবচেয়ে বেশী শক্তিশালী হতে চায়, সে যেন তার কাছে যা আছে, এর চেয়ে আল্লাহ পাকের কাছে যা আছে তাকে অধিক মজবুত মনে করে।

আর হযরত আলী (রা.) বলেন تـقـوي শব্দের অর্থ تـرك الاصـرار عـلـي المعصيت বারবার গোনাহ করার অভ্যাস ছেড়ে দেয়া। আর তাকওয়া শব্দের অন্য অর্থ تـــرك الاغترار بالطاعت প্রতারণা ছেড়ে দিয়ে আল্লাহ্তায়ালার আনুগত্য করা।

হযরত ইবরাহীম বিন আদহাম (রা.) বলেন تـــقـــوي শব্দের অর্থ হচ্ছে, সৃষ্টি জগত তোমার কথায় কোন দোষ পাবেনা। ফেরেশতারা মুত্তাকীর কাজে কোন ত্রুটি দেখবেনা। হযরত ওয়াকেদী (র.) বলেন, অন্তরকে সত্য গ্রহণ করার জন্য সজ্জিত

করে রাখার নাম হচ্ছে তাকওয়া।

অন্য আয়াতে বলা হয় شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِيْ اُنْزِلَ فِيْهِ الْقُرْاٰنُ هُدًى لِّلنَّاسِ অর্থাৎ আল্লাহ্ তায়ালা রমদ্বান মাসে কুরআন অবতীর্ণ করেছেন মানুষের হিদায়াতের জন্যে। এ আয়াত থেকে বুঝা যাচ্ছে- نـــاس শব্দটি মুত্তাকীর মধ্যে সীমাবদ্ধ আর মুত্তাকী ছাড়া অন্য যতসব ইনসান আছে- সব اُولٰٓئِكَ كَالْاَنْعَامِ بَلْ هُمْ اَضَلُّ জানোয়ারের মত নিকৃষ্ট। এখন কথা হচ্ছে, যে ব্যক্তি মুত্তাকী, সে তো হিদায়াতপ্রাপ্ত। তাকে দ্বিতীয়বার কীভাবে হিদায়াত করা যাবে? এর জওয়াব হচ্ছে- মুত্তাকী মানে হিদায়াত প্রাপ্ত হয়ে হিদয়াত অনুসারে চলে যিনি নিজেকে হিদায়াতের আলোতে সমৃদ্ধ করেছেন। এজন্যে মুত্তাকীন শব্দটি বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। তাছাড়া এ শব্দটি مـجـاز অর্থাৎ এর আসল অর্থ নয়, এর আভ্যন্তরীণ অর্থ নিতে হবে। বালাগতের নিয়ম অনুসারে কোন জিনিষের নাম উল্লেখ করে তার আসল অর্থ না নিয়ে উহা যাকে ইংগিত করে, তা নেয়ার প্রথা রয়েছে। যেমন- مـن قـتـل قـتـيلا فـلـه سـلـبـه অর্থাৎ যেই যাকে হত্যা করবে তার জন্যই নিহতের পরিত্যক্ত সম্পত্তি।

اَلَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِالْغَيْبِ

এখানে ঈমান এর অর্থ تـصـديـق যাদের মধ্যে ইতিকাদের অভাব রয়েছে তারা যদিও বা মুখে সাক্ষ্য দেয় এবং আমলও করে; তবুও তারা মুনাফিক। যে শাহাদত দেয় না সে কাফির, আর যে আমল করে না, সে ফাসিক হয়। কিন্তু হযরত ইমাম আবু হানিফা (র.) اقـرار بـالـلـسـان او تـصـديـق بالجنان অর্থাৎ মুখে স্বীকার করা অথবা অন্তরে বিশ্বাস করাকেই ঈমান বলেছেন।

আর হযরত আবুল হাসান আশআরী (র.) অন্তরে এবং মুখে বিশ্বাস করাকেই অর্থাৎ একই সাথে দুটো পাওয়া গেলেই 'ঈমান' বলা হবে।

এখানে পার্থক্য হল- হযরত আবু হানিফার দৃষ্টিতে মুখে বা মনে বিশ্বাস করার নামই-ঈমান। একজন লোকের ঈমানের জন্যে দুটোই এক সাথে পাওয়া যাওয়া জরুরী নয়।

সার কথা হল-يُؤْمِنُوْنَ بِالْغَيْبِ অর্থ হচ্ছে বিশ্বাসকৃত বস্তুকে না দেখে বিশ্বাস করা।

وَيُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَمِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ

ইকামতে সালাতের যে তিন অর্থ রয়েছে, তার মধ্য হতে যে কোন একটি অর্থই এখানে উদ্দেশ্য করা যেতে পারে। প্রথমতঃ এ অর্থ নেয়া যেতে পারে, নামাযে যে তাদীলে আরকান রয়েছে তা সংরক্ষণ করা, ফরায়িয, সুন্নাত এবং মুসতাহাবগুলো আদায় করার মধ্যে কোন প্রকার ত্রুটি বিচ্যুতি না হওয়ার নামই হচ্ছে اقـامـت صـلـوة যখন কেউ কাঠ সোজা করে, তখন বলা হয় اقام العود

দ্বিতীয় অর্থ- উহার উপর সর্বদা দৃঢ় থাকা বা নামায আদায়কালে সহিষ্ণুতা প্রদর্শন করা। তৃতীয় অর্থ নামায আদায় করার সময় কোন আলসেমি বা অবহেলা ও তাড়াহুড়া না করা। যদি এরকম কিছু ঘটে তাহলে قـام فـي الامر এর বিপরীত تـقـاعـد عـنـه অর্থ হবে। তদ্রুপ তাড়াহুড়া করে নামায আদায় করলেও اقامة صلوة হবে না।

আভিধানিক অর্থে رزق রিযক বলা হয় مـا يـنـتـفـع بـه অর্থাৎ যার থেকে উপকৃত হওয়া যায়। مـن এখানে تـبـعـيـض তথা 'কিছু' অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। যাতে অপব্যয় থেকে রক্ষা পাওয়া যায়। কারণ অপব্যয় ইসলামে নিষিদ্ধ। আর এখানে رزقنا শব্দকে فعل-

Scanned with CamScanner

وبخصوص بعض المال يتفقون এর আগে আনা হয়েছে গুরুত্ব বুঝানোর জন্য। অর্থাৎ الحلال بالتصدق به যেই মাল হালাল উপায়ে অর্জিত হয়েছে তা থেকেই তারা সদকার জন্য কিছু মাল নির্ধারণ করে নেয়। এ আয়াত দ্বারা কল্যাণের পথে যে কোন ব্যয়কে বুঝানো হয়েছে।

وَالَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوْقِنُوْنَ۔

সম্ভবতঃ الذين দ্বারা আহলে কিতাবীদের মধ্যে হতে যারা ঈমান এনেছে, তাদেরকে বুঝানো হয়েছে। যেমন আবদুল্লাহ বিন সালাম এবং তার মতো অন্যরাও যারা আল্লাহ তায়ালার নিকট হতে যত কিতাব নাযিল হয়েছে তার উপর ঈমান রাখেন, তাঁদেরকেই বুঝানো হয়েছে। এ আয়াত থেকে আরো বুঝা যায় সমস্ত আসমানী কিতাবে বিশ্বাস করা ওয়াজিব। পার্থক্য শুধু এতটুকু পূর্ববর্তী নবীদের উপর যে কিতাব নাযিল হয়েছে, তাঁর উপর ঈমান আনাটাই ওয়াজিব। কিন্তু হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর উপর যে কিতাব নাযিল হয়েছে, তার উপর ঈমান আনা এবং তদানুযায়ী আমল করা দুটোই ওয়াজিব। আখিরাত শব্দের অর্থ হচ্ছে পরকাল।

أُولٰئِكَ عَلٰى هُدًى مِّنْ رَّبِّهِمْ وَأُولٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ

যারা না দেখে ঈমানের আলোতে আলোকিত হয়েছেন। যাঁরা রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর উপর এবং রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর পূর্ববর্তী আম্বিয়া (আ.)-এর উপর যে কিতাব নাযিল হয়েছে, তার উপর ঈমান এনেছেন- তাঁরাই আল্লাহ্ তায়ালার পক্ষ থেকে সঠিক পথের সন্ধান পেয়েছেন। তাঁরাই কৃতকার্য হয়েছেন। তাঁরাই জান্নাতের অধিকারী হয়েছেন এবং শাস্তি থেকে মুক্ত হয়েছেন।

إِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ ءَأَنْذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُوْنَ خَتَمَ اللّٰهُ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ وَعَلٰى سَمْعِهِمْ وَعَلٰى أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ وَّلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيْمٌ۔

কাফির দ্বারা এখানে তিনটি দলকে উদ্দেশ্য করা হতে পারে। এক রিওয়ায়াতে আছে, কাফির দ্বারা রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর যামানার যে সকল ইহুদী মদীনায় ছিল তাদেরকে বুঝানো হয়েছে। অপর এক রিওয়ায়তে আছে- সূরা বাকারার শুরু থেকে (১০০) একশত আয়াত পর্যন্ত যে সকল কাফিরের কথা উল্লেখ আছে তাঁরা নির্দিষ্ট ব্যক্তি, যাদের বংশ তালিকা জানা আছে। তারা ইহুদী, মুনাফিক, আউস আর খাযরজ গোত্রের থেকে ছিল। তাদের ব্যাপারে এ আয়াত নাযিল হয়েছে। আর তৃতীয় বর্ণনায় আছে- কাফির বলে নির্ধারিত কিছু ব্যক্তিকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে। যেমন আবু লাহাব, আবু জেহেল ওলীদ বিন মুগীরা প্রমুখ যাদেরকে বদরের যুদ্ধে হত্যা করা হয়। অথবা কুফফার বলে সকল কাফিরকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে, যারা কুফরের উপর স্থায়ী হয়ে গেছে।

হযরত রবী বিন আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত إِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا থেকে وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيْمٌ পর্যন্ত যে সকল লোকের কথা উল্লেখ আছে, তাদের উল্লেখ রয়েছে নিম্নোক্ত আয়াতে-

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِيْنَ بَدَّلُوْا نِعْمَةَ اللّٰهِ كُفْرًا وَّأَحَلُّوْا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ جَهَنَّمَ يَصْلَوْنَهَا وَبِئْسَ الْقَرَارُ

"তুমি কি তাদেরকে দেখ নাই যারা আল্লাহর অনুগ্রহের বদলে কুফুরি করে এবং

সসম্প্রদায়কে নামিয়ে আনে ধ্বংসের ক্ষেত্রে।" (সূরা ঃ ইবরাহীম-২৮)

এখানে যে সব কাফিরের কথা বলা হয়েছে তারা বদরের যুদ্ধে নিহত হয়েছিল।

'কুফর' শব্দের অভিধানিক অর্থ ঢেকে রাখা, লুকিয়ে রাখা। আর পরিভাষাগতভাবে 'কুফর' শব্দের অর্থ হচ্ছে অস্বীকার করা। যেহেতু তারা রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর নবুওয়ত অস্বীকার করেছিল। হযরত মুহাম্মদ (সা.) শেষ নবী হওয়ার যে সব লক্ষণ তারা তাঁর মধ্যে পেয়েছিল, তা তারা গোপন করেছিল। যেমন কুরআনে উল্লেখ আছে- يَعْرِفُوْنَهُ كَمَا يَعْرِفُوْنَ أَبْنَاءَهُمْ

"তারা হযরত মুহাম্মদ (সা.) যে নবী, তা একমনভাবে চিনে যেমনিভাবে তারা আপন সন্তানদের চিনে।" আল্লাহ্ তায়ালা নিম্নের আয়াতে তাদের পরিনতি সম্পর্কে বলেন-

إِنَّ الَّذِيْنَ يَكْتُمُوْنَ مَا أَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدٰى مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ أُولٰئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللّٰهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُوْنَ

নিশ্চয় যারা গোপন করে আমি সেসব নিদর্শন ও হিদায়তের বানী প্রেরণ করেছি মানুষের জন্য, কিতাবের মধ্যে বিস্তারিত বর্ণনা করার পরও। আল্লাহ্ তাদেরকে তাঁর রহমত থেকে দূরে রাখেন এবং লানতকারীরা তাদেরকে লা'নত করে।" এ আয়াতেও ঐ সকল কাফির সম্পর্কে বলা হয়েছে- (সূরা ঃ বাকারা-১৫৯)

إِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ

এখানে سواء এর অর্থ যার দুটি অবস্থা একসমান। যেমন কবি বলেন-

وليل يقو المرء من ظلماته ÷ سواء صحيحات العيون وعورها -

রাতের অন্ধকার ভাল চোখ এবং কানা চোখ উভয়ের জন্য সমান। এখানে বরাবর এ কথা বুঝানোর জন্য سواء শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। انذار শব্দের অর্থ হচ্ছে ভয়-ভীতির ঘটনা বলা। ختم শব্দের অর্থ হচ্ছে মোহর লাগিয়ে দেয়া আর পাত্রের উপর ঢাকনা দেয়া। (যেন বাহিরের জিনিষ ভিতরে ঢুকতে না পারে আর ভিতরের জিনিষ বাহির হতে না পারে।)

হযরত আ'মশ (রা.) বলেন- হযরত মুজাহিদ (র.) নিজের হাত দেখিয়ে বলেন, অন্তর বা কলব হচ্ছে হাতের তালুর মত। মানুষ যখন একটা গোনাহ করে তখন তার একটি আঙুল বন্ধ হয়ে যায়। এই বলে তিনি তার কনিষ্ঠ আংগুল বন্ধ করলেন এবং বললেন এভাবে- অতঃপর যখন দ্বিতীয় গুনাহ করে, তখন আরও একটি আঙ্গুল বন্ধ হয়ে যায়। এই বলে তিনি তার হাতের দ্বিতীয় আঙ্গুলি বন্ধ করলেন। এভাবে তিনি আমাকে সমস্ত আঙ্গুল বন্ধ করে দেখালেন। হযরত মুজাহিদ (র.) আরো বলেন, সাহাবায়ে কিরাম (র.) এটাকেই দীন বলতেন যা كَلَّا بَلْ رَانَ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ (মুমীনদের অন্তরে কখনো মরিচিকা পড়ে না) আয়াতে বলা হয়েছে।

হযরত মুজাহিদ (র.) বলেন- গোনাহ মানুষের অন্তরকে বেষ্টন করে দেয়। অবশেষে তার অন্তরে পর্দা পড়ে যায়, যাকে ختم বলা হয়েছে। হযরত ইবনে জুরাইহ বলেন- খতম হল অন্তর এবং কানের উপর মোহর পড়া, যার কারণে অন্তরেও কিছু ঢুকেনা এবং কানেও কিছু শুনেনা।

হযরত ইবনে জুরাইহ (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন- হযরত আহমদ (র.) বলেন, আবদুল্লাহ বিন কসীর আমাকে হাদীস বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন- তিনি হযরত মুজাহিদ (র.)-কে বলতে শুনেছেন, হযরত মুজাহিদ বলেন, ران বা মরিচিকা মোহরের চেয়ে হালকা, ختم বা মোহর غفل এর চেয়ে হালকা। غفل সবচেয়ে বেশী

Scanned with CamScanner

শক্ত। আল্লাহ্তায়ালার বাণী خَتَمَ اللّٰهُ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ অর্থ যখনই কাফেদেরকে হক তথা ঈমানের প্রতি দাওয়াত পেশ করা হত, তখন তারা গর্ব করত এবং শ্রবণ করাকে এড়িয়ে চলত।

হযরত আবু-হুরাইরা (রা.) থেকে বর্ণিত- রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন, মুমিনি যখন গোনাহ করে, তার অন্তরে কালো দাগ পড়ে যায়। এরপর তওবা করলে, গোনাহ আর না করলে- তার কলুষিত অন্তর ঈমানের নূরে চকচক ও ঝলমল করে। পক্ষান্তরে গোনাহ করলে তা আরো বেশী হয়ে অন্তর গোনাহের আবরণে আবৃত হয়ে পড়ে- নূর বিচ্ছুরিত হতে পারে না। এটিই হচ্ছে رَان যা আল্লাহ পাক كَلَّا بَلْ رَانَ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ আয়াতে উল্লেখ করেছেন- রাসূলুল্লাহ্ (সা.) আরো ইরশাদ করেন, গোনাহ সমূহ যখন অন্তরকে আবৃত করে ফেলে, তখন আল্লাহ্ তায়ালার পক্ষ থেকে অন্তরের উপর সীল করে দেয়া হয়। যার কারণে ঈমান তথায় আর কোন কাজ করে না। এটাই হচ্ছে সীল মোহর। যা আল্লাহ্ তায়ালা خَتَمَ اللّٰهُ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ وَعَلٰى سَمْعِهِمْ আয়াতে বলেছেন।

আল্লাহ্ তায়ালা তাদের অন্তরের উপর এবং কানের মধ্যে সীল করে দিয়েছেন, غِشَاوَة অর্থাৎ 'পর্দা' কারণ মানুষ অন্তর দিয়ে কিছু না দেখলে-তার দেখা আর না দেখা সমান হয়ে যায়, ভাসাভাসা দেখায় কোন কাজ হয় না। যেন তার চোখের উপর পর্দা পড়েছে।

وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيْمٌ

তাদের জন্যে কঠিন শাস্তির ব্যবস্থা রয়েছে। হযরত রাবি বিন আনস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি জানান, এ দু'টি আয়াত ঐ সমস্ত লোকদের জন্য অবতীর্ণ হয়েছে, যারা আল্লাহ্ তায়ালার নিয়ামতের বদলে কুফর গ্রহণ করেছে। নিজের ঘর ধ্বংস করেছে, যাদেরকে বদরের যুদ্ধে নিহত করা হয়েছে- তাদের মধ্য হতে দুজন ছাড়া কোন নেতাই ইসলাম ধর্মে প্রবেশ করেনি। তাঁরা দুজন হলেন হযরত আবু সুফিয়ান বিন হারব এবং হযরত হাকাম বিন আবুল আস (রা.)। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন- এ কঠিন আযাব তাদের জন্য নয় বরং ইহুদীদের জন্য নির্ধারিত রয়েছে যেহেতু ইহুদীরা হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর নিকট যা অবতীর্ণ হয়েছে তা সত্য জানার পরও মিথ্যা বলেছে।

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّقُوْلُ اٰمَنَّا بِاللّٰهِ وَبِالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِيْنَ ﴿٨﴾
يُخٰدِعُوْنَ اللّٰهَ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا ۚ وَمَا يَخْدَعُوْنَ اِلَّآ اَنْفُسَهُمْ وَمَا
يَشْعُرُوْنَ ﴿٩﴾ فِيْ قُلُوْبِهِمْ مَّرَضٌ فَزَادَهُمُ اللّٰهُ مَرَضًا ۚ وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ
بِمَا كَانُوْا يَكْذِبُوْنَ ﴿١٠﴾ وَاِذَا قِيْلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوْا فِي الْاَرْضِ قَالُوْٓا اِنَّمَا
نَحْنُ مُصْلِحُوْنَ ﴿١١﴾ اَلَآ اِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُوْنَ وَلٰكِنْ لَّا يَشْعُرُوْنَ ﴿١٢﴾
وَاِذَا قِيْلَ لَهُمْ اٰمِنُوْا كَمَآ اٰمَنَ النَّاسُ قَالُوْٓا اَنُؤْمِنُ كَمَآ اٰمَنَ السُّفَهَآءُ ۗ

اَلَآ اِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَآءُ وَلٰكِنْ لَّا يَعْلَمُوْنَ ﴿١٣﴾ وَاِذَا لَقُوا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا
قَالُوْٓا اٰمَنَّا ۚ وَاِذَا خَلَوْا اِلٰى شَيٰطِيْنِهِمْ قَالُوْٓا اِنَّا مَعَكُمْ اِنَّمَا نَحْنُ
مُسْتَهْزِءُوْنَ ﴿١٤﴾ اَللّٰهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِيْ طُغْيَانِهِمْ
يَعْمَهُوْنَ ﴿١٥﴾ اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ اشْتَرَوُا الضَّلٰلَةَ بِالْهُدٰى فَمَا رَبِحَتْ
تِّجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُوْا مُهْتَدِيْنَ ﴿١٦﴾

৮. আর মানুষের মধ্যে এমন লোকও রয়েছে যারা বলে, আমরা আল্লাহ ও আখিরাতে ঈমান এনেছি, কিন্তু তারা মু'মিন নয়;

৯. আল্লাহ এবং মু'মিনগণকে তারা প্রতারিত করতে চায়। অথচ তারা যে নিজেদেরকে ভিন্ন কাউকেও প্রতারিত করে না, এটা তারা বুঝতে পারে না।

১০. তাদের অন্তরে ব্যাধি রয়েছে। অতঃপর আল্লাহ্ তাদের ব্যাধি বৃদ্ধি করেছেন আর তাদের জন্য রয়েছে কষ্টদায়ক শাস্তি, কারণ তারা মিথ্যাবাদী।

১১. তাদেরকে যখন বলা হয়, পৃথিবীতে অশান্তি সৃষ্টি করো না, তারা বলে আমরাই তো শান্তি স্থাপনকারী।

১২. সাবধান! তারাই অশান্তি সৃষ্টিকারী, কিন্তু তারা বুঝতে পারে না।

১৩. যখন তাদেরকে বলা হয়, যে সকল লোক ঈমান এনেছে তোমরাও তাদের মত ঈমান আনয়ন কর, তারা বলে, নির্বোধগণ যেরূপ ঈমান এনেছে আমরাও কি সে রূপ ঈমান আনব? সাবধান! তারাই নির্বোধ, কিন্তু তারা জানে না।

১৪. যখন তারা মু'মিনগণের সংস্পর্শে আসে তখন বলে, আমরা ঈমান এনেছি', আর যখন তারা নিভৃতে তাদের শয়তানদের সাথে মিলিত হয় তখন বলে, আমরা তো তোমাদের সাথেই রয়েছি; আমরা শুধু তাদের সাথে ঠাট্টা-তামাশা করে থাকি।

১৫. আল্লাহ তাদের সাথে তামাশা করেন এবং তাদেরকে তাদের অবাধ্যতায় বিভ্রান্তের ন্যায় ঘুরে বেড়াবার অবকাশ দেন।

১৬. তারাই হিদায়াতের বিনিময়ে ভ্রান্তি ক্রয় করেছে। সুতরাং তাদের ব্যবসা লাভজনক হয় নি, তারা সৎপথেও পরিচালিত নয়।

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّقُوْلُ اٰمَنَّا بِاللّٰهِ وَبِالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِيْنَ

নাস শব্দটি বহুবচন, যার শাব্দিক দিক থেকে একবচন নেই। বরং এর একবচন হচ্ছে اِنْسَان ইনসান। অথবা এর আসল ছিল اُنَاس সকল আহলে তাবীল এর মতে

Scanned with CamScanner

এ আয়াত মুনাফিকদেরকে উদ্দেশ্য করে নাযিল হয়েছে। আহলে তাবীলদের কেউ কেউ তাদের নাম উল্লেখ করেছেন। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন- وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّقُوْلُ اٰمَنَّا بِاللّٰهِ وَبِالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَمَاهُمْ بِمُؤْمِنِيْنَ দ্বারা আল্লাহ্ তায়ালা আউস ও খাযরাজ গোত্রের মুনাফিকদেরকে বুঝিয়েছেন এবং ঐ সমস্ত লোকদেরকেও বুঝিয়েছেন, যারা তাদের অনুসারী ছিল। হযরত কাতাদা (রা.) হতে বর্ণিত আছে যে, فَمَا رَبِحَتْ تِّجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُوْا مُهْتَدِيْنَ পর্যন্ত আয়াত মুনাফিকদের উদ্দেশ্য করে অবতীর্ণ হয়েছে। হযরত মুজাহিদ (র.) বলেন ومن الناس হতে ১৩ আয়াত পর্যন্ত মুনাফিকদের উদ্দেশ্য করে অবতীর্ণ।

তাদের মুনাফিকীর কারণ বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন, যখন আল্লাহ তায়ালা ইসলামকে বিজয়ী করলেন এবং মুশরিক ও মূর্তিপূজারীগণকে লাঞ্ছিত ও পরাজিত করলেন, তখন ইহুদী পন্ডিতদের অনেকেই মহানবী (সা.)-এর প্রতি ক্রোধ, হিংসা ও ধৃষ্টতা প্রদর্শন করতে শুরু করল। কয়েকজন আহবার অবশ্য ছিলেন তার ব্যতিক্রম। যাদেরকে আল্লাহ তায়ালা হিদায়ত দান করেছিলেন। এ প্রসংগে আল্লাহ্ তায়ালা কুরআন পাকে বলেন- وَدَّ كَثِيْرٌ مِّنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ لَوْ يَرُدُّوْنَكُمْ مِنْ بَعْدِ اِيْمَانِكُمْ كُفَّارًا ۚ حَسَدًا مِّنْ عِنْدِ اَنْفُسِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ ۔ سورة البقرة۔١٠٩)

আহলে কিতাবদের মধ্য থেকে অধিকাংশ লোক, যারা মুসলমানদেরকে ভালবাসে, তাদের মধ্য থেকেও কিছু লোক রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর আনসার ও তাদের সাথীদের সাথে শত্রুতা করত। তাই তারা মুমিনদের সাথে মোলাকাত করলে বলত-আমরা আল্লাহর উপর আর শেষ দিবসের উপর ঈমান এনেছি, পক্ষান্তরে তারা তাদের ভাই-বেরাদর, ইহুদী আর মুশরিকদের সাথে মিলিত হলে বলত- اِنَّا مَعَكُمْ اِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِءُوْنَ আমরা তো তোমাদের সাথে, মুসলমানদের সাথে শুধু ঠাট্টা করছি।

কিয়ামতের দিনকে يوم الاخر শেষ দিবস এজন্য বলা হয়, যেহেতু এদিনের পর আর কোন দিন হবেনা। অরবীরা يوم সেই দিনকে বলে, যার আগে রাত আসে। কাজেই সেই রাতের পর কিয়ামতের সকাল আরম্ভ হয়ে যাবে। এরপর কোন রাত হবেনা। এ কারণেই এর নাম রাখা হয়েছে يوم الاخر এ দিনকে اليوم العقيم ও বলা হয়; কারণ এর পর আর কোন রাত হবে না। وَمَاهُمْ بِمُؤْمِنِيْنَ অর্থাৎ এরা ঈমানদার নয়। কারণ তাদের মুখের আর অন্তরের কথা এক ছিলনা। মুখে যদিও ঈমান এনেছিল কিন্তু অন্তরে তা সত্য বলে মেনে নিত না। يُخٰدِعُوْنَ اللّٰهَ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا আরব ভাষাভাষীরা অন্তরের কথা আর মুখের কথার মধ্যে সাদৃশ্য না থাকলে তাকে خداع বলে। মুনাফিকরা তাদের ধারনানুযায়ী আল্লাহ্ তায়ালা আর মুমীনিদেরকে ধোঁকা দিচ্ছে, যেহেতু তারা মনে যা নেই, তাই প্রকাশ করত। উল্লেখ্য যে, يخادع শব্দটি যদিও باب مفاعلة হতে এসেছে, যার বৈশিষ্ট্য হচ্ছে পরস্পর কোন কাজ সংঘটিত হওয়া; কিন্তু এখানে তা অর্থ নয় বরং অর্থ হবে يخدع ধোঁকা দিচ্ছে। কারণ আরবীদের পরিভাষায় يخادع শব্দকে يخدع শব্দের অর্থে ব্যবহার করা হয়। যেমন- قاتلك الله শব্দ قتلك الله (আল্লাহ্ নিহত করেছেন) অর্থে ব্যবহার হয়। وَمَا يَخْدَعُوْنَ اِلَّا اَنْفُسَهُمْ অর্থাৎ এ ধোকার ফল তারাই ভোগ করবে, وَمَا يَشْعُرُوْنَ- অথচ এসব লোকের কি যে

করুন অবস্থা হবে, তা তারা উপলব্ধি করতে পারে না।

فِيْ قُلُوْبِهِمْ مَّرَضٌ

مرض বলা হয় অসুস্থতাকে। আল্লাহ্ তায়ালা তাদের অন্তরের অসুখের কথা বলেছেন। কারণ তাদের ইতিকাদের মধ্যে ত্রুটি রয়েছে। কুরআন আল্লাহ্ তায়ালার পক্ষ থেকে যে হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর উপর অবতীর্ণ হয়েছে, তাতে তাদের সন্দেহ রয়েছে। এরা বিশ্বাসও করতে পারেনা আবার প্রত্যাখানও করেনা। এদের অবস্থা সম্পর্কে আল্লাহ্ তায়ালা বলেন- مُّذَبْذَبِيْنَ بَيْنَ ذٰلِكَ لَآ اِلٰى هٰٓؤُلَآءِ وَلَآ اِلٰى هٰٓؤُلَآءِ ۔ আসলে এখানে مرض শব্দের অর্থ হল ইসলাম ধর্ম নিয়ে তারা সন্দেহ করে।

فَزَادَهُمُ اللّٰهُ مَرَضًا

তাদের অসুখের আধিক্য সম্পর্কে অন্য আয়াতে বলা হয়- وَاِذَا مَآ اُنْزِلَتْ سُوْرَةٌ فَمِنْهُمْ مَّنْ يَّقُوْلُ اَيُّكُمْ زَادَتْهُ هٰذِهٖٓ اِيْمَانًا "যখনই কোন সূরা অবতীর্ণ হয় তখন তাদের কেউ কেউ বলে ইহা তোমাদের মধ্যে কার ঈমান বৃদ্ধি করল।" (সূরা ঃ তাওবা-১২৪)

আসল কথা হচ্ছে প্রত্যেক পুষ্টিকর জিনিষের মধ্যে ক্ষতি রয়েছে। যেমন দুধ, মধু খুবই পুষ্টিকর খাদ্য, কিন্তু যার হজমের অসুবিধা রয়েছে সে দুধ পান করতে পারে না। চোখে ব্যথা করলে মধু খেলে ক্ষতি হয়। অনুরূপভাবে যখন কুরআনের মাধ্যমে আল্লাহ তায়ালার ওয়াদা ও শাস্তি সম্পর্কে, হারাম-হালাল, ফরয ও ওয়াজিব সম্পর্কে আয়াত অবতীর্ন হওয়া শুরু করল, তখন তাদের মধ্যে সন্দেহ প্রবণতা বেড়ে গেল; বিশেষ করে অদৃশ্যকে বিশ্বাস করা সম্পর্কে-

وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ

আর তাদের জন্য যন্ত্রণাদায়ক আযাব রয়েছে। اليم শব্দটি الم থেকে উদ্ধৃত হয়েছে, যার অর্থ ব্যথা। পবিত্র কুরআনের যত স্থানে اليم এসেছে তা موجع অর্থে বুঝহৃত হয়েছে।

بِمَا كَانُوْا يَكْذِبُوْنَ

এর মধ্যে দুটি কিরাত রয়েছে। ১. ইয়া এর فتح দিয়ে আর ذ এর তাশদীদ ছাড়া পাঠ করা হয়। এ কিরাত অধিকাংশ কুফাবাসীরা পাঠ করেন। ২. يا এর উপর পেশ দিয়ে এবং জাল ذ এর উপর تشديد দিয়ে। অধিকাংশ মদিনাবাসী, হিজায এবং বসরার লোকেরা এভাবে পাঠ করেন। মুনাফিকরা যে মিথ্যা কথা বলে, এর উপর কুরআন সাক্ষ্য দিচ্ছে- وَاللّٰهُ يَشْهَدُ اِنَّ الْمُنٰفِقِيْنَ لَكٰذِبُوْنَ অর্থাৎ 'আল্লাহ্ তায়ালা সাক্ষ্য দিচ্ছেন যে, অবশ্যই মুনাফিকরা মিথ্যুক।' (সূরা ঃ মুনাফিকুন-১)

وَاِذَا قِيْلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوْا فِي الْاَرْضِ

এখানে ফাসাদ শব্দের মর্মকথা হচ্ছ- আল্লাহ্ তায়ালা যা করতে নিষেধ করেছেন তা করা এবং যা করতে বলেছেন তাতে নতুন তথ্য সংযোজন করে নিজের মনগড়া কাজ করা। কারণ ফাসাদ এর আসল কারণ হচ্ছে, আল্লাহ্ তায়ালার দ্বীন সম্পর্কে সন্দেহ সৃষ্টি। আর একথাও শরীয়তে সুস্পষ্ট যে, ঈমান আর ইয়াকীন ছাড়া যত ভাল কাজই হোক না কেন তা আল্লাহ্ তায়ালার কাছে কবুল হয় না।

والفساد خروج الشئ من ان يكون منتفعا به অর্থাৎ ফাসাদ হচ্ছে- কোন বস্তু হতে উপকার গ্রহণের উযুক্ততা নষ্ট হয়ে যাওয়া।

Scanned with CamScanner

قَالُوْٓا اِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُوْنَ

মুনাফিকরা বলত আমরা সংশোধনকারী। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, মুনাফিকরা বলে- আমরা দু দল তথা মুমিনি আর আহলে কিতাবের মধ্যে মধ্যস্ততা ও সংশোধনকারী।

اَلَآ اِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُوْنَ وَلٰكِنْ لَّا يَشْعُرُوْنَ

আল্লাহ্ তায়ালা মুনাফিকদের এ কথার উত্তর এভাবে দেন- সাবধান! তারা অবশ্যই ফাসাদকারী, যদিও তারা এ ব্যাপারে অবগত নয়। কারণ তারা আল্লাহ্ তায়ালার নির্দেশ অনুযায়ী কাজ করে না বরং গোনাহ করে। অধিকন্তু তারা সীমালঙ্ঘনকারী।

وَاِذَا قِيْلَ لَهُمْ اٰمِنُوْا كَمَآ اٰمَنَ النَّاسُ

যখন মুনাফিকদেরকে বলা হত, তোমরা হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর সাথীদের মত ঈমান গ্রহণ কর- এখানে الناس শব্দের উপর الف لام ব্যবহার করে আল্লাহ্ তায়ালা ইঙ্গিত করছেন যে, الف لام আহদী জিনছী নয়। ناس শব্দের উপর الف لام দিয়ে বুঝানো হয়েছে যারা আল্লাহ্ এবং আল্লাহর রাসূলের উপর ঈমান এনেছেন তাদেরকে, (দুনিয়ার সমস্ত মানুষকে উদ্দেশ্য করা হয়নি) যেমন- اَلَّذِيْنَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ اِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوْا لَكُمْ আয়াতে الناس শব্দে الف لام ব্যবহার করে মানুষ জাতিকে উদ্দেশ্য করা হয়নি।

قَالُوْٓا اَنُؤْمِنُ كَمَآ اٰمَنَ السُّفَهَآءُ

سُفَهَآءُ শব্দটি سفيه শব্দের বহু বচন। যার অর্থ বুদ্ধিহীন। যেমন عليم এর বহুবচন علماء এবং حكيم এর বহুবচন حكماء ব্যবহার হয়। السفيه শব্দের অর্থ দুর্বল, মুর্খ, যার উপলব্ধি করার ক্ষমতা খুবই ক্ষীণ, মুনাফিকরা উপকারী ও ক্ষতিকারক বস্তুর মধ্যে পার্থক্য করতে পারে না। এ জন্য আল্লাহ্ তায়ালা মহিলা আর বাচ্চাদেরকে سفهاء সুফাহা নামে আখ্যায়িত করেছেন। যেমন আল্লাহ্ তায়ালা বলেন-

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَآءَ اَمْوَالَكُمُ الَّتِيْ جَعَلَ اللّٰهُ لَكُمْ قِيٰمًا

তোমাদের সম্পদ যা আল্লাহ তোমাদের জন্য উপজীবিকা করেছেন, তা নির্বোধ মালিকগণের হাতে অর্পন করনা। (সূরা ঃ নিসা-৫)

اَلَآ اِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَآءُ وَلٰكِنْ لَّا يَعْلَمُوْنَ

সাবধান! এ লোকরাই মূর্খ, বুদ্ধিহীন অথচ তারা তা জানেনা, কারণ নির্বোধ লোকেরা সংশোধন মনে করে ফাসাদ করে, ঝগড়া করে, তর্ক-বিতর্ক করে। সংরক্ষণ মনে করে অপব্যয় ও ক্ষতি করে। কৃতজ্ঞতা মনে করে অকৃতজ্ঞতা করে, ঈমান মনে করে কুফ্রী করে। নিজের ভাল করতে গিয়ে খারাপ করে। যেমন আল্লাহ্ তায়ালা তাদের পরিচয় দিতে গিয়ে বলেন- اَلَآ اِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُوْنَ وَلٰكِنْ لَّا يَشْعُرُوْنَ এবং আরো বলেন- اَلَآ اِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَآءُ

وَاِذَا لَقُوا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا قَالُوْٓا اٰمَنَّا وَاِذَا خَلَوْا اِلٰى شَيٰطِيْنِهِمْ قَالُوْٓا اِنَّا مَعَكُمْ اِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِءُوْنَ

মুনাফিকরা যখন মুমিনদের সংশ্রবে আসত, তখন তারা তাদের জান-মাল ও সন্তান-সন্ততি রক্ষা করার মানসে ধোকা দিয়ে বলত, আমরা ঈমান এনেছি। আল্লাহ যা কিছু নাযিল করেছেন তার উপর ঈমান এনেছি। পক্ষান্তরে যে সকল ইহুদী ও

কাফির নেতৃবৃন্দ তাদেরকে রাসূলুল্লাহ (সা.)-কে অস্বীকার করার জন্য ও ইসলামের বিরুদ্ধে কাজ করার জন্য আদেশ দিত, তাদের সাথে একাকী মিলিত হলে বলত, আমরা রাসূলের বিরুদ্ধাচরণে আপনাদের সাথে আছি এবং আপনাদের মতই اِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِءُوْنَ "আমরা তাদের সাথে শুধু ঠাট্টা করছি।"

اَللّٰهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ

আল্লাহ্ তায়ালা কিয়ামতের দিন তাদের সাথে অনুরূপ আচরণ করবেন। যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন- সে দিন মুনাফিক পুরুষ ও মুনাফিক মহিলা মুমিনদেরকে বলবে, তোমরা আমাদের জন্য একটু অপেক্ষা কর, যাতে তোমাদের নূর থেকে আমরা কিছু সংগ্রহ করতে পারি। তখন তাদেরকে বলা হবে-তোমরা ফিরে যাও এবং পিছনে নূরের খোজ কর। অতঃপর উভয় দলের মধ্যখানে একটি প্রাচীর খাড়া করে দেয়া হবে, যার অভ্যন্তরে থাকবে রহমত এবং বাইরে থাকবে আযাব। তখন তারা মুমিনদেরকে ডেকে বলবে- আমরা কি তোমাদের সাথে ছিলাম না? উত্তরে তারা বলবে, হ্যাঁ ছিলে।

আল্লাহ্ তায়ালা তাদের সাথে এরকম আচরণ এজন্য করবেন, যেহেতু তারা ঠাট্টা বিদ্রূপ করত, ধোঁকা দেয়ার চেষ্টা করত। যেমন আল্লাহ্ তায়ালা বলেন-

وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اَنَّمَا نُمْلِيْ لَهُمْ خَيْرٌ لِّاَنْفُسِهِمْ اِنَّمَا نُمْلِيْ لَهُمْ لِيَزْدَادُوْٓا اِثْمًا - (ال عمران-١٧٨)

আর কাফিররা যেন মনে না করে- আমি তাদেরকে যে অবকাশ দিচ্ছি তা তাদের জন্য কল্যাণকর, বরং আমি তাদেরকে ঢিল দিচ্ছি যেন তারা আরো গোনাহ করতে পারে।

কেউ কেউ বলেন- কাফিরদের পাচাচারও কুফরের কারনে তাদেরকে দোষারোপ করাই আল্লাহর পক্ষ হতে استهزاء বা ঠাট্টা। আহলে তাবীলের একটি দল বর্ণনা করেন-

اِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِءُوْنَ اَللّٰهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ او يخادعون الله وهو خادعهم فيخرون منهم سخر منهم نَسُوا اللّٰهَ فَاَنْسٰهُمْ এ ধরনের শব্দ ব্যবহার করে আল্লাহ এ কথা বুঝিয়েছেন, তাদের এ অপরাধের বদলা বা পরিণাম অবশ্যই দেয়া হবে। প্রকৃত তাবীল বা তাৎপর্য হচ্ছে- আরবী ভাষার নিয়ম অনুযায়ী যাকে নিয়ে ঠাট্টা করা হয় এবং যে বিষয়ে ঠাট্টা করা হয় তা প্রকাশ করে দেয়াকেও استهزاء বলে। যেহেতু আল্লাহ্ তায়ালা তাদের মুখের কথা যে অন্তরের বিপরীত, তা প্রকাশ করে দিয়েছেন, এজন্য এটাকেও استهزاء বলা হয়েছে। ويمدهم শব্দের অর্থ امدادناهم হযরত ইউনুস জরমী (র.) বলেন মন্দ অর্থের ক্ষেত্রে مدت বলে, আর সাধারণ খবর দেয়ার ক্ষেত্রে امدد বলে। মোট কথা কিছুক্ষণের জন্য তাদেরকে ছেড়ে দেয়া হয়েছে।

فِيْ طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُوْنَ

তাদেরকে কুফর আরো বেশী করার জন্য ঢিল দেয়া হয়েছে। طغيان শব্দের অর্থ কোন কাজে সীমা লঙ্ঘন করা। অর্থাৎ তারা কুফর করার মধ্যে সীমালঙ্ঘন করেছে।

اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ اشْتَرَوُا الضَّلٰلَةَ بِالْهُدٰى

ওরা এমন লোক, যারা হেদায়াতের পরিবর্তে গোমরাহী গ্রহণ করেছে। شراء শব্দের অর্থ এক জিনিষের পরিবর্তে অন্য জিনিষ গ্রহণ করা। গোমরাহী কবুল করেছে আর হেদায়াত (ইসলামী জীবন-বিধান) ত্যাগ করেছে। তারা হেদায়াতের মুকাবিলায়

Scanned with CamScanner

গোমরাহী পছন্দ করেছে। এখানে اشتروا শব্দের অর্থ استحبوا অর্থাৎ তারা পছন্দ করেছে। সার সংক্ষেপ এই- তারা ঈমান এনেছিল। পরিতাপের বিষয় আবার ঈমান থেকে বিচ্যুত হয়ে কুফর গ্রহণ করল। যেমন আল্লাহ তায়ালার বাণী- وَمَنْ يَّتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيْمَانِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيْلِ যে ঈমানের বদলে কুফর গ্রহণ করল, সে সঠিক পথ হতে বিচ্যুত হয়ে পড়ল। (সূরা ঃ আনআম-১০৮)

فَمَا رَبِحَتْ تِّجَارَتُهُمْ

অর্থাৎ তাদের এ ব্যবসায় লোকসান হয়েছে। আরবীরা পরস্পরের মধ্যে এ রকম শুদ্ধ বাক্য ব্যবহার করেন-যেমন তারা একে অপরকে বলে থাকে- حساب سعيك وتمام ليلك وحسر بيعك যখন ربح ব্যবসার ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয় তখন فَمَا رَبِحُوْا تِّجَارَتُهُمْ ব্যবহার না করে فَمَا رَبِحَتْ تِّجَارَتُهُمْ বললেই হয়।

وَمَا كَانُوْا مُهْتَدِيْنَ

তারা হিদায়তের মুকাবিলায় গোমরাহী, ঈমানের মুকাবিলায় কুফর, বিশ্বাস আর স্বীকৃতির মুকাবিলায় মুনাফিকী গ্রহণ করায় সত্য ও সঠিক পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে গেছে।

مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِى اسْتَوْقَدَ نَارًا ۚ فَلَمَّا اَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ اللّٰهُ بِنُوْرِهِمْ وَتَرَكَهُمْ فِىْ ظُلُمٰتٍ لَّا يُبْصِرُوْنَ ﴿١٧﴾ صُمٌّ بُكْمٌ عُمْىٌ فَهُمْ لَا يَرْجِعُوْنَ ﴿١٨﴾ اَوْ كَصَيِّبٍ مِّنَ السَّمَآءِ فِيْهِ ظُلُمٰتٌ وَّرَعْدٌ وَّبَرْقٌ ۚ يَجْعَلُوْنَ اَصَابِعَهُمْ فِىْ اٰذَانِهِمْ مِّنَ الصَّوَاعِقِ حَذَرَ الْمَوْتِ ۚ وَاللّٰهُ مُحِيْطٌ بِالْكٰفِرِيْنَ ﴿١٩﴾ يَكَادُ الْبَرْقُ يَخْطَفُ اَبْصَارَهُمْ ۚ كُلَّمَا اَضَاءَ لَهُمْ مَّشَوْا فِيْهِ ۙ وَاِذَا اَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوْا ۚ وَلَوْ شَآءَ اللّٰهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَاَبْصَارِهِمْ ۚ اِنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ ﴿٢٠﴾

১৭. তাদের উপমা, যেমন এক ব্যক্তি অগ্নি প্রজ্বলিত করল; তা যখন তার চতুর্দিক আলোকিত করল আল্লাহ তখন তাদের জ্যোতি অপসারিত করলেন এবং তাদেরকে ঘোর অন্ধকারে ফেলে দিলেন, তারা কিছুই দেখতে পায়নি।

১৮. তারা বধির, মূক, অন্ধ, সুতরাং তারা ফিরবেনা।

১৯. কিংবা যেমন আকাশের বর্ষণমুখর ঘন মেঘ, যাতে রয়েছে ঘোর অন্ধকার, বজ্রধ্বনি ও বিদ্যুৎ চমক। বজ্রধ্বনিতে মৃত্যুভয়ে তারা তাদের কানে আঙুল প্রবেশ করায়। আল্লাহ কাফিরদেরকে পরিবেষ্টন করে

রয়েছেন।

২০. বিদ্যুৎ চমক তাদের দৃষ্টিশক্তি প্রায় কেড়ে নেয়। যখনই বিদ্যুতের আলো তাদের সম্মুখে উদ্ভাসিত হয়, তারা তখনই পথ চলতে থাকে এবং যখন অন্ধকারাচ্ছন্ন হয় তখন তারা থমকে দাঁড়ায়। আল্লাহ ইচ্ছা করলে তাদের শ্রবণ ও দৃষ্টিশক্তি হরণ করতেন। আল্লাহ সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান।

مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِى اسْتَوْقَدَ نَارًا فَلَمَّا اَضَآءَتْ مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ اللّٰهُ بِنُوْرِهِمْ وَتَرَكَهُمْ فِىْ ظُلُمَاتٍ لَّا يُبْصِرُوْنَ

এ সব মুনাফিকদের উদাহরণ এরকম, যখন ওরা দৃশ্যতঃ ঈমান আনল, যেন আগুন জ্বালিয়ে আশপাশ আলোকিত করল। অথবা তারা জীবন পরিচালনার উদ্দেশ্য মুসলমানদের সাথে বিবাহ ও তাদের ওয়ারিশ হওয়ার জন্য ঈমান আনল। যখন তাদের মধ্যে কুফুর আর মুনাফিকী সৃষ্টি হল, তখন আল্লাহ্ তায়ালা তাদের আলো নিয়ে গেলেন এবং তাদেরকে কুফরের অন্ধকারে ছেড়ে দিলেন, যার কারণে তারা হিদায়ত দেখল না এবং সঠিক রাস্তার উপর দৃঢ়ভাবে থাকতে পারল না। অথবা আয়াতের অর্থ হবে- তাদের মৃত্যুর পর তাদের থেকে নূর ছিনিয়ে নেয়া হবে এবং তাদেকে অন্ধকারাচ্ছন্ন শাস্তির মধ্যে ঢেলে দেয়া হবে। এ দুটি তফসীরের উপর রিওয়ায়ত রয়েছে। দ্বিতীয় রিওয়ায়তের প্রতি يَوْمَ يَقُوْلُ الْمُنٰفِقُوْنَ وَالْمُنٰفِقٰتُ لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوا انْظُرُوْنَا نَقْتَبِسْ مِنْ نُّوْرِكُمْ সেদিন (কিয়ামতের দিন) মুনাফিক নারী-পুরুষ ঈমানদারদের উদ্দেশ্যে বলবে, আমাদের দিকে দৃষ্টি দাও, আমরা তোমাদের থেকে আলো গ্রহণ করব। (সূরা ঃ হাদীদ-১৩) আয়াত ইঙ্গিত প্রদান করে।

صُمٌّ بُكْمٌ عُمْىٌ فَهُمْ لَا يَرْجِعُوْنَ

তারা বধির, তারা হিদায়ত আর সত্যের কথা শুনছে না। তাদের মুখের উপর সীল মেরে দেয়া হয়েছে, যার কারণে তারা সত্য কথা বলতে পারে না। بكم শব্দের অর্থ মূক। عمي তাদের চোখ অন্ধ হয়ে যাওয়ার কারণে তারা হিদায়ত ও সত্যকে দেখতে পায় না এবং বুঝতে পারে না। কারণ আল্লাহ্ তায়ালা তাদের মুনাফিকীর কারণে তাদের অন্তরের উপর সীল মেরে দিয়েছেন, যার কারণে তারা হিদায়াত বা ইসলামী জীবন বিধান দেখতে পাচ্ছেনা। অর্থাৎ মুনাফিকগণ কল্যাণ থেকে বধির, মূক এবং অন্ধ। فهم لا يرجعون সুতরাং হেদায়াত এবং ইসলামের দিকে তারা ফিরে আসবে না।

اَوْ كَصَيِّبٍ مِّنَ السَّمَآءِ

صيب শব্দটি মূলতঃ صيوب ছিল। واو এর উপর জবর হয়েছে এবং এর আগের হরফ ب সাকিন হয়েছে। এক্ষেত্রে নিয়ম অনুযায়ী واو কে ب দ্বারা পরিবর্তন করা হয়েছে এবং দুটি ب একত্রে এক জায়গা হওয়ায় যেহেতু ব্যাকরণের রীতি বিরোধী সুতরাং ب কে অপর ب এর মধ্যে প্রবেশ করানো হয়েছে। ফলে صيب হয়েছে। যেমন ঃ سيد আর جيد শব্দ ব্যবহার হয় অথবা তাদের উপমা হচ্ছে বৃষ্টি, যা

Scanned with CamScanner

আসমান থেকে বর্ষিত হয়। আবার কোন কোন আহলে তাবীলের মতে او হরফ واو এর অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে।

فِيْهِ ظُلُمٰتٌ وَّرَعْدٌ وَّبَرْقٌ

এতে অন্ধকার, বজ্রধ্বনি ও বিদ্যুৎ রয়েছে। এ অবস্থায় যারা পথ চলে, তারা কানের ভিতর মৃত্যুর ভয়ে আংগুল গুঁজে দেয়। আল্লাহ্ তায়ালা কাফিরদেরকে চতুর্দিক থেকে। ঘিরে রেখেছেন মনে হয়, যেন বিদ্যুৎ তাদের দৃষ্টি শক্তি এক্ষুনি ছিনিয়ে লয়। যখনই তাদের উপর বিদ্যুৎ জ্বলে উঠে, তখনই উহার আলোকে তারা চলতে থাকে। আর যখন অন্ধকার তাদেরকে আচ্ছন্ন করে ফেলে, তখন তারা থমকে দাঁড়ায়।

ظلمات শব্দটি বহুবচন, এর একবচন হচ্ছে ظلمة। আর رعد শব্দে ভিন্ন ভিন্ন বর্ণনা রয়েছে। হযরত মুজাহিদ (র.) বলেন الرعد ملك يزجر السحاب بصوته অর্থাৎ رعد হচ্ছেন একজন ফেরেস্তা, যিনি আওয়াজ দিয়ে মেঘ তাড়ান। হযরত আবু সালেহ (র.) বলেন- رعد নামের একজন ফেরেশতা তাসবীহ পাঠে রত আছেন। আর হযরত শহর বিন হাওশাব (র.) বলেন-

الرعد ملك موكل بالسحاب ـ يسوقه كما يسوق الحاوي الابل يسبح كما خالفت سحابة سحابة صاح بها ـ فاذا اشتدت غضبه طارت النار من فيه فهي الصواعق التي رائتهم

অর্থাৎ رعد একজন ফিরিশতা, যিনি বাদল-বৃষ্টি তত্ত্বাবধান করেন যেমনিভাবে রাখাল উট চড়ায়। তিনি তসবীহ পাঠে রত আছেন। মেঘ নিয়ন্ত্রণের বাইরে গেলে, এ ফেরেশতা উচ্চ স্বরে ডাক দেন। তার রাগ প্রচণ্ড হলে তখন তার মুখ থেকে আগুন বের হয়, যাকে صواعق বলা হয়, যে আগুন তোমরা দেখ।

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন رعد একজন ফেরেশতা, হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) আরও বলেন- رعد একজন ফেরেশতা যিনি তাসবীহ আর তাকবীর এর সাথে মেঘকে তাড়ান।

وعن ابن عباسؓ قال الرعد اسم ملك وصوته هذا تسبيحه فاذا اشتد زجره السحاب اخطرب السحاب ـ واحتك فتخرج الصواعق من بينه ـ

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, رعد রাদ একজন ফেরেশতার নাম, যার আওয়াজ হচ্ছে তাসবী'হ। তিনি মেঘকে কঠোরভাবে দমন করেন- যার থেকে صواعق অর্থাৎ বড় ধরনের আওয়াজ বের হয়।

হযরত ইকরামা (র.) বলেন, رعد এক ফেরেশতা, যার কাজ হচ্ছে মেঘ একত্রিত করা। যেমন রাখাল উটদেরকে একত্রিত করে। হযরত ইকরামা (র.) আরও বলেন, বৃষ্টির সময় মেঘের যে গর্জন শোনা যায়, তা এ ফেরেশতার তাসবীহ'র আওয়াজ।

وقال اخرون ان الرعد ريح تختنق تحت السحاب فتصاعد فيكون منه ذالك الصوت

কেউ কেউ বলেন - رعد হল এক ধরনের বাতাস যা মেঘের নীচে বিচরণ করে। বাতাস ও মেঘের মধ্যে ধাক্কা লেগে যে বড় আওয়াজ হয় তাই رعد। برق অর্থ বিদ্যুৎ বা বিজলী। عن علىؓ قال البرق مخاريق الملائكة হযরত আলী (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন- برق হল ফিরেশতার অগ্নিশিখা।

عن ابن عباس البرق مخاريق با يدي الملائكة يزجرون بها السحاب

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন برق হল ফেরেশতাদের হাতে যে অগ্নি মশাল থাকে তা যা দ্বারা তারা মেঘকে বিতাড়িত করেন।

কেউ কেউ বলেন برق হচ্ছে মেঘ। কেউ কেউ বলেন, ওটা একটা আলোর লাঠি, যা

দ্বারা ফেরেশতারা মেঘ তাড়ান। হযরত আবু খুলদ (র.) বলেন- برق প্রত্যেক ঐ লাঠিকে বলা হয়, যা দ্বারা অন্যকে তাড়ানো যায়। যুদ্ধকালীন সময়ে হোক আর স্বাভাবিক সময়ে হোক। হযরত মুজাহিদ (র.) থেকে বর্ণিত برق হল ফেরেশতার একটি পাখা। হযরত মুহাম্মদ বিন মুসলিম আল তায়েফী থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন- বারক হচ্ছে একজন ফেরেশতা, যার চারটি চেহারা রয়েছে। কখনো মানুষের চেহারায় দেখা যায়, কখনো বলদের চেহারায় দেখা যায়, কখনো শকুনের চেহারায় আবার কখনো বাঘের চেহারায় দেখা যায়। এই ফিরেশতার পাখা নাড়ানোকে برق বলা হয়। হযরত শুয়াইব (র.) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আল্লাহ্ তায়ালার কিতাবে আছে, আরশের প্রত্যেক ফিরেশতার ভিন্ন ভিন্ন চেহারা রয়েছে। কখনো মানুষের চেহারা ধারণ করে, কখনো বলদের, কখনো বাঘের পাখা নিয়ে তারা বিচরণ করেন। যখনই তারা পাখা নাড়াচাড়া করেন, তখন যে আওয়াজ হয় এটাই برق

হযরত ইবনে জুরাইজ (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন- برق হল একজন ফেরেশতা, যে অগ্নিশিখা নিয়ে মেঘকে মারেন এবং এটি যে কোন কিছু বা যে কাউকে মুসিবতে ফেলতে পারে। হযরত আলী বিন আবূ তালিব (রা.) হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) এবং হযরত মুজাহিদের (রা.) কথার সমন্বয় এ ভাবে করা যায়- مخارق নূরের তৈরী লাঠি। এ লাঠি দিয়ে ফেরেশতা মেঘকে বিতাড়িত করেন। ফেরেশতা যা দিয়ে মেঘকে বিতাড়িত করেন তা হল ঢাল। কারণ আবরদের দৃষ্টিতে তলোয়ার প্রতিরোধ করাকে ঢাল বলে। লাঠি এবং তলোয়ার দিয়ে আঘাত করার সময় পাখাগুলোর সঞ্চালন হয়। এ ভাবে হযরত আবূ জাফর (রা.) হাদীসের বিষয়গুলোর সমন্বয় সাধন করেন।

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.), হযরত ইবনে মাসউদ (রা.) আরও কিছু সংখ্যক সাহাবায়ে কিরাম নবী (সা.) থেকে বর্ণনা করেন-

صيب শব্দের অর্থ বৃষ্টি। মুনাফিকদের মধ্য হতে দুজন পুরুষ মদীনা থেকে পালিয়ে মুশরিকদের সাথে মিলিত হতে রওয়ানা করল। পথিমধ্যে বৃষ্টি নামল। যে বৃষ্টির মধ্যে কঠিন বজ্রপাত, বিদ্যুৎ এবং বিজলীর আওয়াজ ছিল। যখন মেঘের গর্জন হত, তারা তাদের আংগুল কানের ভিতর গুঁজে দিত। বিজলী পথ আলোকিত করলে তারা পথ চলত। যখন বিজলী চমকানো বন্ধ হত, তখন তারা পথ দেখত না, দাঁড়িয়ে থাকত। অবশেষে তারা বলতে লাগলেন, হায় যদি ভোর হয়ে যেত, তবে মুহাম্মদ (সা.)-এর কাছে চলে যেতাম। অতঃপর ভোর হলে সত্যিই তারা মহানবী (সা.) এর নিকট ফিরে গেলেন এবং পুনরায় ইসলাম গ্রহণ করলেন। আল্লাহ্ তায়ালা এ দু'জন পালিয়ে আসা মুনাফিকের উদাহরণ দিয়ে বলেন যে, সকল মুনাফিকের জন্য তারা উপমা হয়ে রইলেন। মুনাফিকরা যখন আল্লাহর রাসূলের নিকট উপস্থিত হত বা তাঁর মজলিসে বসত, তখন রাসূলুল্লাহর বাণী না শুনার জন্য কানের মধ্যে আঙ্গুল দিত যেমনটি করেছিল পালিয়ে আসা দুই মুনাফিক। যখন তাদের মাল-সম্পদ, সন্তান-সন্ততি, দাস-দাসী বৃদ্ধি পেল, ধনাঢ্যের ছোঁয়া পেল এবং যখন তারা কোন গনীমত অথবা বিজয় লাভ করত তখন তারা বলত হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর দীন সত্য, তারা ঐ দীনের উপর দৃঢ়ভাবে থাকল। যেমনভাবে ঐ মুনাফিকরা চলেছিল, যখন বিজলীর আলো হত তখন চলত, পক্ষান্তরে অন্ধকার হলে দাঁড়িয়ে থাকত। যখন তাদের মাল-সম্পদ ধ্বংস হয়ে গেল, সন্তান-সন্ততি, আত্মীয়-স্বজন ধ্বংস হল, তাদের উপর মুসীবত পৌছল, তখন তারা বলতে শুরু করল এ সব মুহাম্মদ (সা.)-এর দীনের কারণেই, তখন তারা আবার কাফির হয়ে গেল। যেভাবে ঐ দুই

Scanned with CamScanner

মুনাফিক অন্ধকার এবং বিজলীর আলোর মধ্যে করত।
হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত كَصَيِّبٍ مِّنَ السَّمَاءِ এর মধ্যে صيب অর্থ হল বৃষ্টি, যার উদাহরণ আল্লাহ তায়ালা কুরআনে পাকে দিয়েছেন। ظلمات শব্দ দিয়ে পরীক্ষা বুঝানো হয়েছে। رعد শব্দের অর্থ ভয়ভীতি। برق বিজলী, যা তাদের দৃষ্টি শক্তি ছিনিয়ে নিত। আয়াতের বিষয় বস্তু মুনাফিকদের আভ্যন্তরীন বিষয় প্রকাশ করে দিয়েছে। "যখনই আলো হত, তারা চলত।" এর অর্থ হচ্ছে মুনাফিকদের যখন তদের কল্যাণ হত তখন তারা আনন্দ করত। আবার ইসলামের কোন মুসিবত হলে তারা কুফরের দিকে প্রত্যাবর্তন করত। এ জন্যই আল্লাহ বলেন- وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا। অন্যত্র আল্লাহ্ তায়ালা বলেন-

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّعْبُدُ اللّٰهَ عَلٰى حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ نِ اطْمَأَنَّ بِهٖ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةُ نِ انْقَلَبَ عَلٰى وَجْهِهٖ (الحج-١١)

"মানুষের মধ্যে কেউ কেউ দ্বিধা নিয়ে আল্লাহর ইবাদ করে। তার মঙ্গল হলে তার চিত্ত প্রশান্ত হয়, আর কোন বিপর্যয় ঘটলে সে তার পূর্বাবস্থায় ফিরে যায়।"
ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন ظلمات শব্দের অর্থ গোমরাহী برق শব্দের অর্থ ঈমান এবং رعد শব্দের অর্থ আল্লাহ্ তায়ালার দাসত্ব।

يَجْعَلُوْنَ أَصَابِعَهُمْ فِيْ اٰذَانِهِمْ مِّنَ الصَّوَاعِقِ حَذَرَ الْمَوْتِ وَاللّٰهُ مُحِيْطٌ بِالْكَافِرِيْنَ

এ আয়াতে এমন এক সম্প্রদায় সম্পর্কে বলা হয়েছে যারা কোন কিছু শুনলেই মনে করত তারা ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে। মেঘের গর্জন থেকে বাঁচতে তাদের আঙুল সমূহ কানে প্রবিষ্ট করত।
অর্থাৎ মুনাফিকদের উদাহরণ আসমানী মেঘের মত, যার মধ্যে অন্ধকার, গর্জন আর বিজলী বাতির বিচ্ছুরিত আলো রয়েছে। তারা মৃত্যু থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য কানের মধ্যে আঙ্গুল গুঁজিয়ে দিত। আল্লাহ তায়ালা কাফিরদেরকে ঘিরে রেখেছেন। যখন তারা ইসলামের আলো পেত তখন চলত, আবার অন্ধকার হলে দিশেহারা হয়ে দাঁড়িয়ে থাকত।

وَلَوْ شَاءَ اللّٰهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ إِنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ

অর্থাৎ আল্লাহ্ যদি ইচ্ছে করতেন, তাদের শ্রবণ শক্তি এবং দৃষ্টি শক্তি নিয়ে যেতেন। এ কথা অনস্বীকার্য যে, আল্লাহ্ তায়ালা সর্বশক্তিমান। হযরত ইমাম নিশাপুরী (রাহ.) লেখেন- যখন এ পার্থিব জগতের উপাদান অর্থাৎ মাটি, পানি, আগুন ও বাতাস এর উপর আল্লাহ্ তায়ালার নির্দেশ আবর্তিত হয়, তখন এসময়ের মধ্যে তাতে শক্তির সঞ্চয় হয় এবং তা মিশ্রিত হয়ে যায়। এ মিশ্রণের ফলে অনেক কিছু অস্তিত্বের মধ্যে আসে। আবার এর মধ্যে তাপ বেশী হলে পানির অংশ হতে বাষ্প হয়। আবার মাটির অংশ বেশী হলে ধোঁয়া বের হয় এবং এ বাষ্প ও ধোঁয়ার মধ্য হতে আলোর সৃষ্টি হয়। কিন্তু ধোঁয়া উপরে উঠলে বাতাসকে অতিক্রম করে। এমনকি তারকারাজির স্থর পর্যন্ত উঠে যায়। এতে তা আলোকজ্জ্বল হয়। কখনো এর মধ্যে আলো বেশী হয়-যার কারণে দেখা যায় তারকা পড়ছে। কখনো আলোকজ্জ্বল হয় না এবং তা জ্বলে দগ্ধ হয়ে যায়, যার কারণে লালও কালো রঙ দেখা যায়। কিন্তু উর্ধ্বগামী তাপ কখনো খুব হালকা হয় যার কারণে অনেক উপরে উঠে যায় এবং গাঢ় হয়। এতে

আলো থেকে বিচ্যুত হয়ে বাতাসের মধ্যে এর বিচরণ হয়। এরপর তা ঠাণ্ডা হয়ে যায়। এ অবস্থাকে মেঘ বলা হয়, এর থেকে যে ফোটা পড়ে, তাকে বৃষ্টি বলা হয়। এর মধ্যে যা ভারী তা উপরে উঠতে পারে না বরং তা তাড়াতাড়ী ঠাণ্ডা হয়ে যায়। একত্রিত হয়ে মেঘ হওয়ার পূর্বেই তা পড়ে যায় এ রকম অবস্থাকে بسر তুষার বলা হয়। তা ছাড়া এটাকে ছায়াও বলা হয়। আর কখনো ধোঁয়া উপরে উঠে মেঘের সাথে মিশে বরফ হয়ে নীচে অবতারিত হয়। আবার বাষ্প উপরে উঠে ছায়ার উপাদান সৃষ্টি করে-যার থেকে কুয়াশা পড়ে। আবার কখনো বাষ্প পানির বিন্দুতে পরিণত হয়ে শক্ত হয়ে কুয়াশা হয়ে পড়ে। এ গুলো শক্ত হয় শীতকালে। সে সময় তা মেঘ থেকে পৃথক হয়। বসন্তকালে তা মেঘে পরিণত হয়। আবার কখনো পানি হয়ে পড়ে, আবার কখনো বাতাস বেশী ঠাণ্ডায় গাঢ় হয়ে মেঘ হয়। কিন্তু ঠাণ্ডা আর গরম মিশ্রিত হয়ে সমুদ্রের তরঙ্গ আর ধোঁয়ার সৃষ্টি হয়। এর মধ্যে যা মাটি থেকে পৃথক হয়ে যায়, তা থেকে এক প্রকার ঘ্রাণের সৃষ্টি হয়। আরো উর্ধ্বে উঠে গেলে বাষ্প ধোঁয়া থেকে পৃথক হয়ে যায়, তখন বাষ্প জমাট হয়ে মেঘ হয়ে যায়। যখন ধোঁয়া উর্ধ্বে উঠতে চেষ্টা করে, তখন এর মধ্যে আওয়াজ সৃষ্টি হয়। এ আওয়াজ থেকেই رعد সৃষ্টি হয়। এ'টিই হল গর্জন, এ গর্জন অনেক সময় দীর্ঘ হয়। বাতাস প্রতিকূল হলে এর মধ্যে ধাক্কা লেগে আগুনের ঝিলিক বের হয় এবং মেঘের টুকরা ভেদ করে, জ্বলন্ত অগ্নিশিখার মত বের হয়ে পড়ে। সে সময় এর থেকে এক ধরনের আওয়াজ শুনা যায়-এ আওয়াজ আরো বেশী প্রচণ্ড হলে তাকে صواعق বলে। আবার কখনো মেঘ হালকা হলে বেশী আওয়াজ হয় না, এমনিতেই বের হয়ে যায়।

يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوْا رَبَّكُمُ الَّذِيْ خَلَقَكُمْ وَالَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ ﴿٢١﴾ اَلَّذِيْ جَعَلَ لَكُمُ الْاَرْضَ فِرَاشًا وَّالسَّمَاءَ بِنَاءً وَّاَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَاَخْرَجَ بِهٖ مِنَ الثَّمَرٰتِ رِزْقًا لَّكُمْ ۚ فَلَا تَجْعَلُوْا لِلّٰهِ اَنْدَادًا وَّاَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ﴿٢٢﴾ وَاِنْ كُنْتُمْ فِيْ رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلٰى عَبْدِنَا فَاْتُوْا بِسُوْرَةٍ مِّنْ مِّثْلِهٖ ۖ وَادْعُوْا شُهَدَآءَكُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ﴿٢٣﴾ فَاِنْ لَّمْ تَفْعَلُوْا وَلَنْ تَفْعَلُوْا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِيْ وَقُوْدُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ اُعِدَّتْ لِلْكٰفِرِيْنَ ﴿٢٤﴾ وَبَشِّرِ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ اَنَّ لَهُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ ۖ كُلَّمَا رُزِقُوْا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ رِّزْقًا ۙ قَالُوْا هٰذَا الَّذِيْ رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ وَاُتُوْا بِهٖ مُتَشَابِهًا ۭ وَلَهُمْ فِيْهَآ اَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ ۙ وَّهُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ﴿٢٥﴾

Scanned with CamScanner

২১. হে মানুষ! তোমরা তোমাদের সেই প্রতিপালকের ইবাদত কর যিনি তোমাদেরকে ও তোমাদের পূর্ববর্তীগণকে সৃষ্টি করেছেন; যাতে তোমরা মুত্তাকী হতে পার।

২২. যিনি পৃথিবীকে তোমাদের জন্য বিছানা ও আকাশকে ছাদ করেছেন এবং আকাশ হতে পানি বর্ষণ করে তাদ্বারা তোমাদের জীবিকার জন্য ফলমূল উৎপাদন করেন। সুতরাং তোমরা জেনে শুনে কাউকে আল্লাহর সমকক্ষ দাঁড় করো না।

২৩. আমি আমার বান্দাহর প্রতি যা অবতীর্ণ করেছি তাতে তোমাদের কোন সন্দেহ থাকলে তোমরা এর অনুরূপ কোন সূরা নিয়ে আস এবং তোমরা যদি সত্যবাদি হও তবে আল্লাহ ব্যতীত তোমাদের সকল সাহায্যকারীকে আহ্বান কর।

২৪. যদি তোমরা আনয়ন না কর এবং কখনও করতে পারবে না, তবে সে আগুনকে ভয় কর, মানুষ ও পাথর হবে যার ইন্ধন, কাফিরদের জন্য যা প্রস্তুত করে রাখা হয়েছে।

২৫. যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে তাদেরকে সু-সংবাদ দাও যে, তাদের জন্য রয়েছে জান্নাত, যার তলদেশে নদী প্রবাহিত। যখনই তাদেরকে ফলমূল খেতে দেয়া হবে তখনই তারা বলবে, আমাদেরকে পূর্বে জীবিকারূপে যা দেয়া হত ইহা তো তাই। তাদেরকে অনুরূপ ফলই দেয়া হবে এবং সেখানে তাদের জন্য পবিত্র সঙ্গিনী রয়েছে, তারা সেখানে স্থায়ী হবে।

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ

অত্র আয়াতে আল্লাহ্ তায়ালা কাফির আর মুনাফিকদেরকে সম্বোধন করে বলেন- হে লোক সকল। তোমরা এককভাবে আল্লাহ্ তায়ালার ইবাদত কর, যে আল্লাহ্ তোমাদেরকে এবং তোমাদের পূর্ববর্তীদেরকে সৃষ্টি করেছেন।

لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

অর্থাৎ যাতে তোমরা আল্লাহ্ তায়ালার ক্রোধ থেকে রক্ষা পাবে। আর তোমরা আল্লাহ্ তায়ালার ক্রোধ থেকে রক্ষা পেলে মুত্তাক্বী হিসেবে পরিগণিত হবে-যাঁদের উপর আল্লাহ্ তায়ালা সন্তুষ্ট হয়েছেন।

الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَاشًا

অর্থাৎ ঐ জাতে-পাক, যিনি তোমাদের জন্য জমীনকে বিছানা বানিয়েছেন, যার উপর মানুষ চলাফেরা করে।

وَالسَّمَاءَ بِنَاءً

'সামা' শব্দকে سماء নামে নামকরণ করা হয়েছে এজন্য যে আসমান মাটি থেকে উর্ধ্বে। আর আসমানকে ছাদ বানানো হয়েছে। একটি বস্তুর উপর আর একটি বস্তু রাখা হলে উপরের বস্তুকে سماء বলে। আসমানকে জমীনের উপর গুম্বুজের আকৃতিতে ছাদ বানিয়েছেন।

وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ

মহান আল্লাহ্ তায়ালা আসমান হতে বৃষ্টি বর্ষণ করেন। এই বৃষ্টি কণা হতেই বিভিন্ন ধরনের ফল-মূল সৃষ্টি করেন, যা তোমাদেরকে রিয্ক হিসেবে প্রদান করা হয়। অর্থাৎ মানুষের ক্ষেত এবং রোপণের মাধ্যমে জমিন হতে যেই ফল-মূল ও উদ্ভিদ উৎপাদিত হয়- তাতে শক্তি রয়েছে। এ ফসল খাদ্য আর শক্তি হবার কারণে তাঁকে রিযক বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে।

فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا

এর মর্মকথা হচ্ছে আল্লাহ তায়ালার সাথে অন্য কিছুকে তুলনা করনা, কারণ তাঁর সমান কিছুই নেই।

وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

হে মুশরিক ও আহলে কিতাব! তোমরা তো জান আল্লাহ্ তায়ালার কোন শরীক ও সাদৃশ্য নেই। যেমন আল্লাহ্ তায়ালা বলেন- (তোমাদেরকে যদি প্রশ্ন করা হয়- তোমাদেরকে কে সৃষ্টি করেছেন-উত্তরে তোমরা অবশ্যই বলবে- আল্লাহ্ তায়ালা।) আল্লাহ তায়ালা আরো বলেন- হে, মুহাম্মদ (সা.)! আপনি তাদেরকে জিজ্ঞেস করুন, তোমাদেরকে আসমান এবং জমিন হতে কে রিযক দান করেছেন? কান আর চোখের মালিক কে? মৃত থেকে জীবিত এবং জীবিত থেকে মৃত কে করেন? কে সকল বিষয় পরিচালনা করছেন? এ কথা অবিসংবাদিতভাবে সত্য যে, এসব প্রশ্নের উত্তরে তারা সমস্বরে বলবে- আল্লাহ। ফলাফল যদি তাই হয়ে থাকে, তা হলে হে মুহাম্মদ (সা.) আপনি তাদেরকে জিজ্ঞেস করুন- এ সত্য উপলব্ধি করার পর কেন তারা ঈমানের আলোকে আলোকিত হচ্ছেনা? কেন তারা আল্লাহ্কে ভয় করছেনা?

وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِنْ مِثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ

অর্থাৎ হে কাফিরগণ! তোমাদের নিজ দাবী এবং ধারণা সত্য হলে হযরত মুহাম্মদ (সা.) যে কুরআন নিজেই প্রণয়ন করেছেন, (এর সত্যতা প্রমাণের জন্য চ্যালেঞ্জ করে বলা হচ্ছে) এ কুরআনের সূরার মত একটা সূরা প্রয়োজনে তোমাদের সাহায্যকারীর সাহায্য নিয়ে হলেও উপস্থাপন কর, দেখি!

فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا

যদি তোমরা তা করতে না পার, আর কখনো করতে পারবে না। অর্থাৎ তোমাদের এধরণের সূরা প্রণয়ন করার যোগ্যতা ও ক্ষমতা নেই।

فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ

ফলতঃ তোমাদের উচিত সত্যকে মেনে নিয়ে দুযখের আগুন থেকে নিজকে রক্ষা করা। যে আগুনের ইন্ধন হচ্ছে মানুষ এবং পাথর।

أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ

এটা কাফিরদের জন্যে সদা প্রস্তুত করে রাখা হয়েছে।

وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ

Scanned with CamScanner

হে মুহাম্মদ (সা.) ঐসব লোকদের জন্যে সু-সংবাদ দিন, যারা ঈমানের বলে বলীয়ান হয়ে সৎকাজে নিবেদিত। তাদের জন্য এমন উদ্যান বা বেহেশতের ব্যবস্থা রয়েছে, যার নীচ দিয়ে নাহার বা ঝরণা সমূহ প্রবাহমান।

كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ رِّزْقًا قَالُوا هٰذَا الَّذِيْ رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ وَأُتُوا بِهٖ مُتَشَابِهًا ـ

যখনই তাদেরকে বেহেশতের ফলের মধ্যে হতে রিযক দেয়া যায়, তখন তারা বলে এটাতো ঐ জিনিষ, যে রিযক আমাদেরকে আগে অর্থাৎ পৃথিবীতে দেয়া হয়েছিল। একই ধরনের ফল বটে, কিন্তু স্বাদে ভিন্ন। অর্থাৎ জান্নাতবাসীকে যখন ফলের দ্বারা রিযক দেয়া হবে, তখন তারা দেখে বলবে, এ ধরনের ফল দিয়েই আমাদেরকে দুনিয়াতে রিযক দেয়া হয়েছিল। তবে এ সাদৃশ্য রঙ এবং খাদ্যের মধ্যে হবে, স্বাদে কিন্তু ভিন্ন হবে। অপর এক রিওয়ায়তে আছে- বেহেশতের কোন ফল যখন অপসারণ করা হয়, সেখানে ঐ ফলের মতো অন্য আরেকটি আনা হয়। واتوا به তাদেরকে অনুরূপ ফল দেয়া হবে। এখানে অনুরূপ বা متشابها শব্দের অর্থ হচ্ছে গুণগত মানে সাদৃশ্য হবে। অপর বর্ণনায় আছে في قوله متشابها ـ قال خيارا كلها لا رزل فيها অর্থাৎ সবগুলোই উত্তম ফল হবে। তাতে কোন নিকৃষ্ট ফল নেই।

وَلَهُمْ فِيْهَا أَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ وَّهُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ

যারা আল্লাহ্ তায়ালার বিধি-নিষেধ অনুযায়ী জীবন পরিচালনা করে, তাদের জন্য বেহেশতের মধ্যে পূত পবিত্র স্ত্রী রয়েছেন। এখানে ازواج বহুবচন, যার এক বচন হচ্ছে زوج অর্থাৎ স্ত্রী আর مطهرة শব্দের অর্থ হচ্ছে এ স্ত্রীগণ সকল ধরনের অপরিচ্ছন্নতা ও সন্দেহ হতে পবিত্র হবে। যেহেতু দুনিয়াতে মেয়েরা হায়িয, নিফাস পায়খানা, পেশাব, বীর্য, থুথু এধরনের অনেক কিছু দ্বারা অপরিষ্কার ও অপরিচ্ছন্ন হয়ে থাকে, কিন্তু বেহেশতে এ সবকিছু থাকবেনা।

আর কোন কোন রিওয়ায়তে আছে, হযরত হাওয়া (আ.)-কে আল্লাহর নিষেধ লঙ্ঘন করার আগে পবিত্র বলা হয়েছিল, যেহেতু এর আগে তাঁর হায়িয হত না। যেমন হাদীস শরীফে আছে, যখন তিনি আদেশ অমান্য করলেন, আল্লাহ বললেন, আমি তোমাকে পবিত্র করে সৃষ্টি করেছিলাম। এখন তোমাকে রক্তাক্ত করব যেমনি তুমি করেছ এই বৃক্ষকে।

وَهُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ আর তারা সর্বাবস্থায় বেহেশতে থাকবেন অর্থাৎ ঈমানদার এবং আমলে সালেহ যারা করেন, তারা সব সময় জান্নাতে থাকবেন এবং সর্বদা তাদেরকে নিয়ামত দেয়া হবে।

إِنَّ اللّٰهَ لَا يَسْتَحْيِيْ أَنْ يَّضْرِبَ مَثَلًا مَّا بَعُوْضَةً فَمَا فَوْقَهَا ط فَأَمَّا الَّذِيْنَ كَفَرُوْا فَيَقُوْلُوْنَ مَاذَآ أَرَادَ اللّٰهُ بِهٰذَا مَثَلًا ج يُضِلُّ بِهٖ كَثِيْرًا وَّيَهْدِيْ بِهٖ كَثِيْرًا ط وَمَا يُضِلُّ بِهٖٓ إِلَّا الْفٰسِقِيْنَ ﴿٢٦﴾ الَّذِيْنَ يَنْقُضُوْنَ عَهْدَ اللّٰهِ مِنْ بَعْدِ مِيْثَاقِهٖ وَيَقْطَعُوْنَ مَا أَمَرَ اللّٰهُ بِهٖٓ أَنْ يُّوْصَلَ وَيُفْسِدُوْنَ فِي الْأَرْضِ ط أُولٰٓئِكَ هُمُ الْخٰسِرُوْنَ ﴿٢٧﴾ كَيْفَ تَكْفُرُوْنَ بِاللّٰهِ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ ج ثُمَّ يُمِيْتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيْكُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ ﴿٢٨﴾ هُوَ الَّذِيْ خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيْعًا ق ثُمَّ اسْتَوٰٓى إِلَى السَّمَآءِ فَسَوّٰهُنَّ سَبْعَ سَمٰوٰتٍ ط وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ ﴿٢٩﴾

২৬. আল্লাহ মশা কিংবা তদপেক্ষা ক্ষুদ্র কোন বস্তুর উপমা দিতে সংকোচ বোধ করেন না। সুতরাং যারা ঈমান এনেছে তারা জানে যে নিশ্চয়ই এটা সত্য যা তাদের প্রতিপালকের নিকট হতে এসেছে। কিন্তু যারা কাফির তারা বলে যে, আল্লাহ কি অভিপ্রায়ে এই উপমা পেশ করেছেন, এর দ্বারা অনেকেই তিনি বিভ্রান্ত করেন, আবার বহু লোককে সৎপথে পরিচালিত করেন। বস্তুত তিনি পথ পরিত্যাগিগণ ব্যতীত আর কাউকেও বিভ্রান্ত করেন না।

২৭. যারা আল্লাহর সাথে দৃঢ় অঙ্গীকারে আবদ্ধ হবার পর তা ভঙ্গ করে, যে সম্পর্ক অক্ষুণ্ন রাখতে আল্লাহ আদেশ করেছেন তা ছিন্ন করে এবং দুনিয়ায় অশান্তি সৃষ্টি করে বেড়ায়, তারাই ক্ষতিগ্রস্ত।

২৮. তোমরা কিরূপে আল্লাহকে অস্বীকার কর? অথচ তোমরা ছিলে প্রাণহীন, তিনি তোমাদেরকে জীবিত করেছেন, আবার তোমাদের মৃত্যু ঘটাবেন ও পুনরায় জীবিত করবেন, পরিণামে তাঁর দিকে তোমাদেরকে ফিরিয়ে আনা হবে।

২৯. তিনি পৃথিবীর সব কিছু তোমাদের জন্য সৃষ্টি করেছেন, তৎপর তিনি আকাশের দিকে মনোসংযোগ করেন এবং তাকে সাতটি আকাশে বিন্যস্ত করেন; তিনি সর্ব বিষয়ে সবিশেষ অবহিত।

إِنَّ اللّٰهَ لَا يَسْتَحْيِيْ أَنْ يَّضْرِبَ مَثَلًا مَّا بَعُوْضَةً فَمَا فَوْقَهَا

হযরত ইবনে মাসউদ (রা.) কিছু সংখ্যক সাহাবী (রা.) থেকে বর্ণনা করেন, যখন আল্লাহ তায়ালা মুনাফিকদের সম্পর্কে বলতে গিয়ে বর্ণিত দুটি উদাহরণ বর্ণনা করেন

Scanned with CamScanner

অর্থাৎ- مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْقَدَ نَارًا এবং أَوْ كَصَيِّبٍ مِنَ السَّمَاءِ তখন মুনাফিকগণ বলতে লাগল- আল্লাহ তায়াল এ ধরণের উদাহরণ দিতে পারেন না, যেহেতু তিন এর থেকে অনেক উপরে।

হযরত কাতাদাহ থেকে বর্ণিত, যখন আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কুরআনে মাছির কথা এবং মাকড়সার কথা উল্লেখ করেন, তখন গোমরাহ সম্প্রদায়ের লোকেরা বলে- مـا اراد الـلـه مـن ذكـر هـذا এ গুলো উল্লেখ করে আল্লাহ তায়ালা কী চেয়েছেন? তখন আল্লাহ তায়ালা এ আয়াত নাযিল করেন।

অর্থাৎ আল্লাহ যাদের জন্য এ উদাহরণ পেশ করেছেন, তারা মাছির মত। কারণ মাছি যতক্ষণ ক্ষুধার্ত থাকে ততক্ষণ বেঁচে থাকে, আর যখন পেট পুরে খেয়ে ফেলে, তখন মারা যায়। তদ্রূপ এরা যখন দুনিয়াতে তৃপ্তি সহকারে ভোগ করে তখন আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে ধরেন এবং ধ্বংস করে দেন। যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন- حَتّـى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُتُوا أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً যখন তারা দুনিয়াতে যা পেয়েছে তা নিয়ে আনন্দে মাতওয়ারা হয়ে যায়, তখনই আমি তাদেরকে হঠাৎ করে ধরি। তখন তারা দিশেহারা হয়ে পড়ে।

এখানে استـحـيـاء শব্দের অর্থ- حشية আর حشية শব্দের অর্থ লজ্জা করা। অর্থাৎ নিঃসন্দেহে আল্লাহ তায়ালা মাছি বা এর চেয়ে ক্ষুদ্র ও নিকৃষ্ট জিনিষের উদাহরণ দিতেও কোন লজ্জা বোধ বা ভয় করেন না। এমন কী, মাছির চেয়ে বড় হলেও তাতে লজ্জা বোধ করেন না।

فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَٰذَا مَثَلًا

অতঃপর যারা ঈমান আনলেন তারা জানেন, এগুলো আল্লাহ তায়ালার পক্ষ হতে অবতীর্ণ সত্য। আর যারা কুফুর করে তারা বলে, এসব কিছুর উদাহরণ দিয়ে আল্লাহ তায়ালা কী বুঝাতে চেয়েছেন? অর্থাৎ মুমিন এসব উদাহরণকে সত্য বলে মেনে নেয় ও বিশ্বাস করে; পক্ষান্তরে কাফির ও মুনাফিক তা সত্য বলে জানার পরও বলে এসব উদাহারণ দিয়ে আল্লাহ কি বুঝাতে চেয়েছেন?

يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا

এসব উদাহরণের দ্বারা আল্লাহ তায়ালা অনেক লোককে গোমরাহ করেন, আবার অনেক লোককে হিদায়ত করেন। অর্থাৎ এ উদাহরণের দ্বারা মুনাফিক আর কাফিরকে গোমরাহ করে দেন এবং অনেক বিশ্বাসী আর ঈমানদারকে হিদায়ত করেন। অর্থাৎ এর দ্বারা হিদায়ত আর ঈমান বৃদ্ধি পায়।

وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ

এসব উদাহরণের মাধ্যমে আল্লাহ তায়ালা কেবল ফাসিক অর্থাৎ যারা আল্লাহ তায়ালার অবাধ্য–তাদেরকে গোমরাহ করেন।

الَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ

যারা আল্লাহ তায়ালার সাথে অঙ্গীকার ও প্রতিজ্ঞা করার পর তা পূরণ করেনি। যারা আম্বিয়া (আ.) এবং কিতাব সম্পর্কে অবগত হওয়ার পরও আমল করেনি, তাদের কথাই এখানে বলা হয়েছে।

মুফাসসিরদের মধ্য অন্য একদল বলেন- এ আয়াত কাফির ও আহলে কিতাবদের মধ্যে যারা মুনাফিক, তাদের ব্যাপারে নাযিল হয়েছে। তাদের কাছ থেকে আল্লাহ তায়ালা তওরাত অনুযায়ী চলার এবং হযরত মুহাম্মদ (সা.) নবুওয়ত প্রাপ্তির পর তাঁর অনুসরণ করার যে ওয়াদা নিয়েছিলেন, সেই ওয়াদা তারা ভঙ্গ করেছে। তাদের কাছ থেকে আরও ওয়াদা গ্রহণ করেছিলেন যে, তারা যা অবগত হল, তা তারা বর্ণনা করবে। এর কোন অংশ গোপন করবেনা, কিন্তু তাদের কাছ থেকে ওয়াদা ভঙ্গের বিষয়টি পাওয়া গেল। তারা সত্য জানার পরও তা প্রত্যাখ্যান করেছে। তারা فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا আয়াত কে কার্যকর করেছে। কেউ কেউ বলেন এ আয়াত দিয়ে সকল শিরিককারী, কুফুরকারী এবং মুনাফিককে উদ্দেশ্য করা হয়েছে। আল্লাহ তায়ালার ওয়াদা অনুযায়ী তওহীদের সত্যতা প্রমাণের জন্য সকল আয়াত, আর মুজিযাত পেশ করা হয়, যা মানবীয় শক্তি দ্বারা কিছুতেই সম্ভব নয়, অথচ তা সত্য একথা জানার পর ও তারা তা অস্বীকার করেছে। এটাই তাদের ওয়াদার মধ্যে ত্রুটি। অপর দল বলেন عهـد এর অর্থ ঐ ওয়াদা, যা আদমের সন্তানাদি আদমের পিঠে থাকা অবস্থায় নিয়েছিলেন, যেমন বলা হয়েছে-

وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ . (اعراف=١٧٢)

"স্মরণ কর তোমার প্রতিপালক আদম সন্তানের পৃষ্ঠদেশ হতে তার বংশধরকে বের করেন এবং তাদের নিজেদের সম্বন্ধে স্বীকারোক্তি গ্রহণ করেন।"

তারা সে ওয়াদা পূরণ করেনি। এ সব লোক হল ইহুদী, অবশিষ্ট বনি ইসরাইল এবং মুনাফিক। এভাবে হযরত ইবনে জরীর (র.) বলেন- وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ এ সব লোক যেখানে এবং যাদের সাথে সম্পর্কের বন্ধন দৃঢ় করতে বলা হত তাদের সাথে সম্পর্ক দৃঢ় না করে বরং সম্পর্ক ছিন্ন করত। যেমন- আল্লাহ তায়ালা বলেন-

فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ

"তবে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হলে সম্ভবত তোমরা পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করবে এবং আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করবে।" (সূরা ঃ মুহাম্মদ-২২)

وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ

এরা জমিনে ফাসাদ করে অর্থাৎ তারা রাসূলুল্লাহ্ এর সাথে নাফরমানী, কুফর করত এবং তাঁকে (সা.) মিথ্যা প্রতিপন্ন করত। তাঁর নবুওতকে অস্বীকার করত, আল্লাহ্ তায়ালার কুরআনকে অস্বীকার করত।

أُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ

এসব লোকেরাই নিজের ক্ষতি সাধনকারী (আল্লাহ্ তায়ালার রহমত হতে বঞ্চিত হয়)। যেভাবে ব্যবসায়ী নিজের ব্যবসায় লোকসান উঠায়।

كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا

আল্লাহ্ তায়ালা প্রশ্নবোধক বাক্য দিয়ে আশ্চার্যান্বিত হয়ে বলছেন, কীভাবে এসব লোকেরা নাফরমানী করে আল্লাহ্ তায়ালার সাথে? অথচ তারা মৃত ছিল, তাদেরকে জীবিত করা হয়েছে তারপর আবার তারা মৃত্যুবরণ করবে, এরপর আবার জীবিত

Scanned with CamScanner

করবেন-এরপর আল্লাহ্ তায়ালার নিকট প্রত্যাবর্তন করবে। ঐ মহান আল্লাহ্ তোমাদের কল্যাণের জন্যে পৃথিবীর সবকিছু সৃষ্টি করেছেন।

হযরত ইবনে মাসউদ (রা.) আরও কতেক সাহাবা (রা.) থেকে বর্ণিত, তারা বলেন- وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ এর অর্থ হচ্ছে- প্রথমে তোমরা কিছুই ছিলে না। সেই অবস্থায় তিনি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন। তারপর তোমাদেরকে মেরে ফেলবেন, তারপর জীবন দান করবেন কিয়ামতের দিনে।

অর্থাৎ তোমরা প্রথমে বীর্য ছিলে, এটিই হচ্ছে মৃত, এরপর তোমাদেরকে জীবিত করেছেন অর্থাৎ সৃষ্টি করেছেন, এরপর তোমাদেরকে মেরে ফেলবেন, কবর দেয়া হবে, এটি হচ্ছে দ্বিতীয়বারের মৃত্যু। এরপর তোমাদেরকে কিয়ামতের দিন উঠানো হবে, এটি হল দ্বিতীয়বার জীবন দান করা। এখন দুই হায়াত আর দুই মরণ পাওয়া গেল। যেমন আল্লাহ্ তায়ালার বাণী- رَبَّنَا أَمَتَّنَا اثْنَتَيْنِ وَأَحْيَيْتَنَا اثْنَتَيْنِ فَاعْتَرَفْنَا بِذُنُوبِنَا হে আল্লাহ! আপনি আমাদেরকে দু'টি মৃত্যু ও দু'টি জীবন দান করেছেন। অতএব আমরা আমাদের গুনাহসমূহ স্বীকার করছি।

ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ

এখানে اســـتـــوى শব্দের অর্থ দৃষ্টি ফিরান, ইচ্ছে করেন, উঁচু করেন, এসব অর্থ রিওয়ায়ত দ্বারা সাবিত আছে।

হযরত আবু জাফর (র.) বলেন, কোন এক বর্ণনাকারী বলেন, আল্লাহ তায়ালা আসমানের প্রতি মনোযোগ করলেন। তা কি আসমান সৃষ্টির পূর্বে? না পরে। জবাবে বলা হল, তা আসমান সৃষ্টির পরে, তবে তা পরিপাটি করার পূর্বে। যেমন আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন- "অতঃপর তিনি (আল্লাহ) মনোনিবেশ করলেন আকাশের দিকে যা, তখন ছিল ধোঁয়ার কুন্ডুলী। অতঃপর তিনি আসমান ও জমিনকে বললেন স্বেচ্ছায় হউক আর অনিচ্ছায় তোমরা দুজনেই অস্তিত্ব লাভ কর।" সুতরাং اســـتـــواء হয়েছিল সাত আসমান সৃষ্টির পূর্বে তবে ধোঁয়া সৃষ্টির পরে। এ ব্যাপারে নিম্নোক্ত হাদীস হতে সমাধান পাওয়া যায়।

"আমাকে মুহাম্মদ বিন হুমাইদ বর্ণনা করেন। তিনি বলেন আমাকে সালমা বিন আল-ফযল বলেন হযরত মুহাম্মদ বিন ইসহাক (র.) বলেন- আল্লাহ্ তায়ালা সব কিছুর আগে আলো ও অন্ধকার সৃষ্টি করেন। তারপর এদের মধ্যে পার্থক্য করলেন। তারপর অন্ধকারকে কালো রাতে পরিণত করেন এবং নূরকে দিনে পরিণত করেন যেই আলোতে সব কিছু দেখা যায়। তারপর ধোঁয়া থেকে সাত আসমান সৃষ্টি করেন। অতঃপর এগুলোকে শক্ত করলেন। তারপর দিন-রাত সৃষ্টি করলেন। এরপর যমীন সম্প্রসারণ করলেন এবং তাতে খাবার নির্ধারণ করলেন, আর তাতে যত ইচ্ছা সৃষ্টি জগতকে সম্প্রসারণ করলেন। জমিন সৃষ্টি এবং তাতে খাবার উৎপাদন করা ৪ দিনে শেষ করেন। অতঃপর আকাশের প্রতি মনোনিবেশ করেন, তখন তা ছিল ধোঁয়া। তিনি এগুলোকে শক্ত করলেন এবং দুনিয়ার আসমানে চন্দ্র, সূর্যও তারকারাজি সৃষ্টি করলেন। এসব কিছু দু'দিনে সৃষ্টি করা হয়। সুতরাং মোট ছয় দিনের মধ্যে আসমান এবং জমিন সৃষ্টি করা হয়। সপ্তম দিনে আকাশের উপরের প্রতি মনোনিবেশ করলেন। তারপর আসমান এবং যমীনকে বলেন- তোমরা আমার বাধ্য হবে না অবাধ্য হবে? উত্তরে আসমান ও যমীন বলল, বাধ্য হয়ে চলব।

হযরত আবু জাফর (র.) বলেন- হযরত মূসা বিন হারুন আমাকে বলেন, হযরত

উমর বিন হাম্মাদ (র.) আমাকে বলেন। তিনি বলেন, হযরত আসবাত (রা.) আমাকে বলেন, তিনি আল-সুদ্দী (রা.) থেকে বর্ণনা করেন- তিন হযরত আবু মালিক (রা.) হতে বর্ণনা করেন, তিনি হযরত আবু সালেহ (রা.) হতে বর্ণনা করেন, তিনি হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণনা করেন, অন্য বর্ণনায় হযরত মুররাহ (রা.) হযরত ইবনে মাসউদ (রা.) থেকে তিনি মহানবী (সা.)-এর সাহাবীগণের একজন থেকে বর্ণনা করেন, আল্লাহ তায়ালা এ যমীনের মধ্যে যা কিছু আছে, সব তোমাদের কল্যাণের জন্য সৃষ্টি করেন। তারপর আসমান সৃষ্টির জন্য ইচ্ছে করেন এবং আসমানকে সাত স্তরে সৃষ্টি করেন। তিনি বলেন- আল্লাহ তায়ালার আরশ পানির উপর ছিল। পানি সৃষ্টির আগে কোন কিছু সৃষ্টি করা হয়নি। আল্লাহ তায়ালা তার সৃষ্টি জগত সৃষ্টির ইচ্ছা করলেন, তিনি পানি থেকে বের করলেন ধোঁয়া এবং তা পানির উপর রাখলেন। (আর سمو শব্দের অর্থ উপরের অংশ) তাই আসমান কে سماء বলা হয়। তারপর এ পানি শুকালেন এবং যমীনে পরিণত করলেন। এরপর এটাকে বিদীর্ণ করে রোববার এবং সোমবার সাত যমীন স্তর সৃষ্টি করেন। তারপর যমীনকে একটি 'মাছ' এর উপর রাখলেন। আর সে মাছ হল নুন যার সম্পর্কে কুরআনে পাকে আল্লাহ ن-والقلم সূরায় উল্লেখ করেন। মাছ ছিল পানির মধ্যে। পানি রয়েছে একটি মসৃন পাথর খন্ডের উপরে। পাথরটি রয়েছে এক ফেরেশতার পিঠে। ফেরেশতা রয়েছে আরেকটি পাথরের উপর, পাথরটি রয়েছে বাতাসের মধ্যে। صـخـرة দ্বারা হচ্ছে যার কথা হযরত লুকমান (আ.) উল্লেখ করেছিলেন। এটা আসমানে ও নয় এবং যমীনের মধ্যে নয়। মাছ নড়াচড়া করল, এতে সৃষ্টি হল ভূমিকম্প। এ কারণে যমীনের উপর পাহাড় তৈরী করলেন। ফলে যমীন স্থির হল। এ জন্য পাহাড় যমীনের উপর গর্ব করতে লাগল। যেমন আল্লাহ পাক বলেন- وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ أَنْ تَمِيدَ بِكُمْ অর্থাৎ আল্লাহ তায়ালা যমীনের মধ্যে ভারী বোঝা রেখে দিয়েছেন, যাতে তা তোমাদের নিয়ে এক দিকে ঝুকে না পড়ে অতঃপর এর মধ্যে পর্বতমালা পয়দা করা হয়। যমীনে বসবাসকারীর জন্যে খাবার সৃষ্টি করেছেন। এ যমীনের মধ্যে বৃক্ষাদি সৃষ্টি করা হয়েছে, যার জন্যে আরো দু'দিন অর্থাৎ মঙ্গলবার ও বুধবার পর্যন্ত সময় লাগে।

এ যমীনের মধ্যে অনড় পর্বতমালা সৃষ্টি করেছেন, যা এ দুনিয়াবাসীর জন্যে শক্তি স্বরূপ। এ পাহাড় পর্বতে অসংখ্য বৃক্ষরাজি সৃষ্টি করেছেন এবং খাবার সৃষ্টি করেছেন। এ জন্য মোট চার দিন সময় যায়। এরপর আল্লাহ তায়ালা আসমানের দিকে দৃষ্টি প্রদান করেন। তা ধোঁয়া ছিল যে ধোঁয়া হল পানির নিশ্বাস। পানির এ নিশ্বাস যা ধোঁয়ার মত ছিল তা দিয়ে একটি আসমান সৃষ্টি করেন। এরপর ঐ আসমানকে খন্ডিত করে দু'দিনের মধ্যে অর্থাৎ বৃহস্পতিবার ও শুক্রবারের মধ্যে সাতটি আসমানের সৃষ্টি করেন। প্রত্যেক আসমানে ফেরেশতা নিয়োগ করেন এবং সাগর, পাহাড়, শীতলতা এবং অজানা অনেক কিছু সৃষ্টি করেন। এরপর দুনিয়ার আসমানকে তারকারাজি দিয়ে সুশোভিত করেন। শয়তানের শয়তানী থেকে রক্ষা করেন, যেন এর সৌন্দর্য নষ্ট করতে না পারে। আল্লাহ তায়ালার পছন্দনীয় সবকিছু সৃষ্টি করার পর আরশের দিকে মনযোগ দেন। যেমন তিনি বলেন- এভাবে আল্লাহ তায়ালা ছয় দিনের মধ্যে আসমানসমূহ ও যমীন সৃষ্টি করেন। অন্যত্র বলেন, এগুলো মিলিত ছিল, আমি এগুলোকে আমি আলাদা করলাম।

Scanned with CamScanner

হযরত আবদুল্লাহ বিন সালাম (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন- আল্লাহ তায়ালা সৃষ্টি আরম্ভ করেন রবিবারে, এরপর যমীনগুলো সৃষ্টি করেন রবিবারে ও সোমবারে। এরপর জীবিকা, ও পর্বতমালা যথাক্রমে মঙ্গলবার ও বুধবারে সৃষ্টি করেন। এরপর আসমানসমূহ সৃষ্টি করেন বৃহস্পতিবার ও শুক্রবারে এবং জুমাবারে শেষ মুহূর্তেই হযরত আদম (আ.)-কে সৃষ্টি করেন। এটি এমনই মুহূর্ত যেই মুহূর্তে কিয়ামত সংঘটিত হবে।

হযরত আবূ জাফর (র.) উপরোক্ত আয়াতের অর্থ বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন- তা হলে বাক্যের অর্থ হচ্ছে, তিনি ঐ সত্তা, যিনি তোমাদের উপর অনুগ্রহ করেছেন। সুতরাং পৃথিবীতে যা কিছু আছে সব তোমাদের কল্যাণের জন্য সৃষ্টি করেছেন এবং অনুগ্রহ বশত এগুলোকে তোমাদের অনুগত করেছেন। অতঃপর তিনি সাত আসমানের প্রতি মনোনিবেশ করলেন, তখন এগুলো ছিল ধোঁয়া। তিনি এগুলো পরিপাটি করলেন। এর কিছু অংশকে সূর্য, চন্দ্র ও তারকা সৃষ্টি করলেন। তাদেরকে নিজ নিজ ক্ষমতা অনুযায়ী নিজ স্তরে সুবিন্যস্ত করা হয়। আসল কথা হল- استوى এবং السماء استوى على العرش এবং জাতীয় বাক্যের প্রকৃত ধরণ আল্লাহর সত্ত্বার চাহিদা মত যেভাবে হওয়ার সেভাবেই হয়েছে।

وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ

তিনি এমন মহান সত্তা, যিনি প্রত্যেক কিছুই জানেন। তিনি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন এবং যমীনের মধ্যে যা কিছু বিরাজমান সবই তোমাদের কল্যাণের জন্যে সৃষ্টি করেছেন। সাত আসমান এবং এর মধ্যে যা বিদ্যমান রয়েছে, এসব সৃষ্টির গুপ্ত রহস্য একমাত্র আল্লাহ তায়ালাই জানেন।

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰئِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيْفَةً ۚ قَالُوْا
أَتَجْعَلُ فِيْهَا مَنْ يُّفْسِدُ فِيْهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ ۚ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ
بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ۚ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ ﴿٣٠﴾ وَعَلَّمَ
اٰدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلٰئِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُوْنِي بِأَسْمَاءِ
هٰؤُلَاءِ إِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ﴿٣١﴾ قَالُوْا سُبْحٰنَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا
عَلَّمْتَنَا ۚ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيْمُ الْحَكِيْمُ ﴿٣٢﴾ قَالَ يٰاٰدَمُ أَنْبِئْهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ
ۚ فَلَمَّا أَنْبَأَهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ ۙ قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَّكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ غَيْبَ
السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ ۙ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُوْنَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُوْنَ ﴿٣٣﴾

৩০. স্মরণ কর, যখন তোমার প্রতিপালক ফিরিশতাদের বললেন, আমি পৃথিবীতে প্রতিনিধি সৃষ্টি করব। তারা বলল, আপনি কি সেখানে এমন কাউকে সৃষ্টি করবেন যে অশান্তি ঘটাবে ও রক্তপাত করবে? আমরাই তো আপনার প্রশংসা, স্তুতিগান ও পবিত্রতা ঘোষণা করি। তিনি বললেন, আমি যা জানি তোমরা তা জান না।

৩১. আর তিনি আদমকে যাবতীয় নাম শিক্ষা দিলেন, তৎপর তা সমুদয় ফিরিশতাদের সম্মুখে প্রকাশ করেন এবং বলেন, এই সমুদয়ের নাম আমাকে বলে দাও, যদি তোমরা সত্যবাদী হও।

৩২. তারা বলে, আপনি মহান পবিত্র। আপনি আমাদেরকে যা শিক্ষা দিয়েছেন তা ছাড়া আমাদের তো কোন জ্ঞানই নেই। বস্তুত আপনি জ্ঞানময় ও প্রজ্ঞাময়।'

৩৩. তিনি বলেন, হে আদম! তাদেরকে এই সকল নাম বলে দাও।' সে তাদেরকে এই সকলের নাম বলে দিলে তিনি বলেন, আমি কি তোমাদেরকে বলি নি যে, আকাশমণ্ডল ও পৃথিবীর অদৃশ্য বস্তু সম্বন্ধে আমি নিশ্চিতভাবে অবহিত এবং তোমরা যা ব্যক্ত কর বা গোপন রাখ আমি তাও জানি।

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰئِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيْفَةً

আর যখন আপনার রব ফিরিশতাদেরকে বললেন, আমি যমীনে আমার এক প্রতিনিধি সৃষ্টি করব।

কুরআনের শব্দ جاعل এর অর্থ হয়- خالق আর خليفة শব্দের অর্থ প্রতিনিধি। যেমন- আল্লাহ তায়ালা বলেন-

ثُمَّ جَعَلْنٰكُمْ خَلٰٓئِفَ فِي الْأَرْضِ مِنْ بَعْدِهِمْ لِنَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُوْنَ

"অতপর আমি তাদের পর তোমাদেরকে পৃথিবীতে স্থলাভিষিক্ত করেছি তোমরা কিরূপ কাজ কর তা দেখার জন্য।" (সূরা ঃ ইউনুস-১৪)

হযরত ইবনে ইসহাক (র.) বলেন, خليفة শব্দের অর্থ অবস্থানকারী ও বসবাস যোগ্যকরে তৈরী কারী।

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহ তায়ালা সর্বপ্রথম যমীনে জ্বীন পয়দা করেন। তারা এ যমীনে ফ্যাসাদ সৃষ্টি করল এবং তাতে রক্তপাত করল। পরস্পর পরস্পরকে হত্যা করল। তারপর আল্লাহ তায়ালা তাদের প্রতি ইবলীসের নেতৃত্বে ফেরেশতাদের এক সৈন্য বাহিনী সহ ইবলীসকে পাঠালেন। ইবলীস তাদেরকে মেরে ফেলল। জ্বীন জাতীর যারা বাকী ছিল, তাদের সাথে সমুদ্রের দ্বীপে এবং পর্বত প্রান্তরে ইবলীসের সাক্ষাৎ হয়।

এরপর হযরত আদম (আ.)-কে সৃষ্টি করা হল। আদম যমীনে বসবাস করতে আরম্ভ করলেন। এ মর্মানুযায়ী খলীফা বলতে জীন বুঝানো হয়েছে, যারা পৃথিবীতে বসবাস করত এবং তা আবাদ করত। কেউ কেউ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيْفَةً এর অর্থ এভাবে করেন- خليف হচ্ছে একজন অপরজনের প্রতিনিধিত্ব করা, আর তাঁরা হল হযরত আদম (আ.)-এর সন্তান। যারা নিজের পিতা আদম (আ.)-এর প্রতিনিধিত্ব করেন। এভাবে যুগে যুগে পরবর্তীরা পূর্ববর্তীদের প্রতিনিধিত্ব করবে। হযরত হাসান

Scanned with CamScanner

বসরী (র.) ও এভাবে বলেন।

হযরত ইবনে যায়িদ (র.) বলেন- আল্লাহ তায়ালা ফেরেশতাদেরকে অবহিত করেন যে, অবশ্যই আল্লাহ তায়ালা যমীনে তার প্রতিনিধি পয়দা করবেন, যারা আল্লাহ তায়ালার বিধি নিষেধ পৃথিবীর বুকে বাস্তবায়ন করবে। যেমন বাদশাহর প্রতিনিধি বাদশাহ হয়ে নির্দেশাবলী বাস্তবায়ন করে।

قَالُوْا اَتَجْعَلُ فِيْهَا مَنْ يُّفْسِدُ فِيْهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ

ফেরেশতারা আপত্তি করে বলেন- হে আল্লাহ আপনি কী এমন এক জাতিকে সৃষ্টি করবেন, যারা যমীনে ফাসাদ করবে এবং রক্তপাত করবে?

হযরত আদম (আ.) থেকে ঝগড়া-ঝাটি এবং রক্তপাত প্রকাশ হয়নি। ফেরেশতারা যেই ঝগড়া এবং রক্তপাতের কথা বলেন, তা ধারনা করেই বলছিলেন। কারণ ফেরেশতারা গায়েবী খবর জানেনা।

ফসাদ আর রক্তপাত সম্পর্কে হযরত ইবনে আব্বাস (র.)-এর হাদীস হতে জানা যায়- ইবলীস ফেরেশতাদের অনেক গোত্রের মধ্যে একটি গোত্রের মধ্যে হতে ছিল, যে গোত্রটিকে জীন বলা হত। তাদেরকে نار السموم হতে সৃষ্টি করা হয়েছে। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, ইবলীসের নাম হারিস ছিল, সে বেহেশতের একজন পাহারাদার ছিল।

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, ইবলীসের গোত্র ছাড়া সমস্ত ফেরেশতাদেরকে নূর হতে সৃষ্টি করা হয়েছিল। কুরআন পাকে যেই জীনের কথা উল্লেখ আছে ঐ জীন مارج من النار অর্থাৎ لسان النار থেকে পয়দা করা হয়। لسان النار হচ্ছে ঐ আগুন যা জ্বলে উঠার সময় কেন্দ্রের চারিদিকে সৃষ্টি হয়; আর মানুষকে সৃষ্টি করা হয় মাটি হতে। জীনই হচ্ছে যমীনে প্রথম বসবাসকারী। তারা যমীনে ঝগড়া সৃষ্টি করে, যমীনে রক্তপাত করে এবং একে অপরকে হত্যা করে। অতঃপর আল্লাহ তায়ালা ফেরেশতার সৈন্যদলে ইবলীসকে প্রেরণ করেন। এ সৈন্যদলকে জীন বলা হত।

মোট কথা যমীনের জীনদেরকে ইবলীস এবং তার সাথীরা মেরে সমুদ্রের দ্বীপেও পর্বত প্রান্তরে তাড়িয়ে দিয়েছিল। ইবলীস এ কাজ করার পর তার অন্তরে অহংকার আসল, "বা! আমি এমন এক বড় কাজ করলাম। অন্য কেউ তো এ কাজ করতে পারেনি।" আল্লাহ তায়ালা তার অন্তরের খবর সম্বন্ধে অবগত হন; কিন্তু তার সাথী ফেরেশতারা এ ব্যাপারে অবগত ছিলেন না। তখন আল্লাহ তায়ালা ইবলীসের সাথী ফেরেশতাদেরকে বলেন, "اِنِّىْ جَاعِلٌ فِى الْاَرْضِ خَلِيْفَةً" অর্থাৎ আমি যমীনে আমার প্রতিনিধি সৃষ্টি করব। এর উত্তরে ফেরেশতারা বলেন, আল্লাহ! আপনি কী যমীনে এমন এক জাতি সৃষ্টি করবেন যারা ঝগড়া করবে, রক্তপাত করবে, যেভাবে জীন জাতি করেছিল? জীনরা ঝগড়া করেছিল এবং রক্তপাত ঘটিয়েছিল। তাদেরকে বধ্বস্ত করার জন্যে আমাদেরকে পাঠানো হয়েছিল। তখন আল্লাহ তায়ালা বলেন, আমি যা জানি, তা তোমরা জান না। অর্থাৎ আল্লাহ তায়ালা বুঝাতে চেয়েছেন, আমি ইবলীসের অন্তর সম্পর্কে অবগত, যা সম্পর্কে অর্থাৎ ইবলীসের গর্ব ও অহংকার সম্পর্কে তোমরা অবগত নও।

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, যমীনকে নির্দেশ দেয়া হল হযরত আদম (আ.)-এর মাটি দেয়ার জন্য, অতঃপর মাটি নেয়া হল। শক্ত মাটি হতে আদমকে সৃষ্টি করা হয়। এ মাটিকে খামির বানানো হয়। এরপর এ মাটি হতে আল্লাহ তায়ালা

নিজ হাতে হযরত আদম (আ.)-কে সৃষ্টি করেন। হযরত আদম (আ.)-এর শরীর চল্লিশ রাত পর্যন্ত পড়ে থাকল।

ইবলীস আদম(আ)-এর কাছে আসা যাওয়া করত এবং তার দেহে পা দিয়ে মারত। এতে আওয়াজের সৃষ্টি হত অর্থাৎ মাটির ঝনঝনানী শুরু হত। যাকে আল্লাহ তায়ালা এভাবে প্রকাশ করেন- مِنْ صَلْصَالٍ كَالْفَخَّارِ তারপর শয়তান আদমের মুখ দিয়ে ভেতরে প্রবেশ করে পিছনের রাস্তা দিয়ে বের হয়, আবার পিছনের রাস্তা দিয়ে প্রবেশ করে মুখ দিয়ে বের হয়ে যায়। এরপর বলে, তুমি তো এমন কোন বস্তু নও, যা থেকে এরূপ আওয়াজ হতে পারে। আমি যদি তোমার উপর বিজয়ী হই তা হলে তোমাকে ধ্বংস করে দেব, আর তুমি আমার উপর বিজয়ী হলে আমি তোমার অবাধ্য হব। এরপর আল্লাহ তায়ালা হযরত আদম (আ.)-এর মধ্যে রূহ ফুঁকেন। এ রূহ হযরত আদম (আ.)-এর মাথা দিয়ে প্রবেশ করে। এরপর তা শরীরের যে অংশ দিয়েই চলল, তা-ই রক্ত আর মাংসে পরিণত হয়ে গেল। যখন ফুঁক নাভী পর্যন্ত পৌঁছে যায়, তখন আদম (আ.) স্বীয় শরীরের প্রতি দৃষ্টি প্রদান করেন। তিনি তার সৌন্দর্যে বিমোহিত হয়ে পড়েন। সাথে সাথে তিনি উঠে যেতে চাইলেন কিন্তু পারেননি। এর প্রতি লক্ষ্য করে আল্লাহ তায়ালা বলেন- وَكَانَ الْاِنْسَانُ عَجُوْلًا 'মানব ছিল ধৈর্যহীন ও অসহিষ্ণু সব কিছুতে তাড়াহুড়া করে।' (সূরা ঃ বনী ইসরাঈল-১১) দুঃখ কষ্টে বা আনন্দের সময় ও ধৈর্য্য ধারণ করতে পারেনা।

হযরত আদম (আ.)-এর শরীরের ভিতর ফুঁক শেষ হয়ে গেলে, আদম (আ.) হাঁচি দিলেন। আল্লাহ তায়ালার ইলহামের মাধ্যমে শিখিয়ে দেন اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ বলার জন্য। জবাবে আল্লাহ বলেন- হে আদম, তোমাকে আল্লাহ রহম করুন। এরপর আল্লাহ তায়ালা ফেরেশতাদেরকে- বিশেষ করে যারা ইবলীসের সাথে ছিল তাদেরকে বলেন- (ঐ সকল ফেরেশতাদেরকে নয় যারা আসমানসমূহের মধ্যে ছিল) আদমকে সিজদা কর। ইবলীস ছাড়া সকল ফেরেশতা আদম (আ.)-কে সিজদা করেন।

ইবলীস সিজদা করতে অসম্মতি প্রকাশ করল এবং মনে মনে অহংকার বোধ করল। সে বলল আমি আদম (আ.)-কে সিজদা করবনা যেহেতু আমি আদম (আ.)-এর চেয়ে উৎকৃষ্ট, বয়সে বড়, সৃষ্টিতেও বেশী শক্তিশালী। যেহেতু আমাকে আগুন হতে সৃষ্টি করা হয়েছে; আর আদম (আ.)-কে মাটি হতে সৃষ্টি করা হয়েছে। সে বলল, আগুন মাটি থেকে বেশী শক্তিশালী। যখন ইবলীস সিজদা করা হতে বিরত থাকল, আল্লাহ তায়ালা তাকে সকল কল্যাণ থেকে নিরাশ করে দিলেন। তাকে শয়তানে মরদুদ করে দিলেন। তার নাফরমানীর জন্যে তাকে এ শাস্তি প্রদান করা হল।

এরপর আল্লাহ তায়ালা আদম (আ.)-কে শিক্ষা প্রদান করেন সব কিছুর নাম। তা ছিল ঐ সব জিনিষের নাম যা দিয়ে মানুষ পরস্পর পরিচয় লাভ করে। জানোয়ার, জমিন, নরম, সমুদ্র, পাহাড়, গাধা এবং এ জাতীয় সব কিছু। এরপর এসব জিনিষের নাম। ঐ সকল ফেরেশতাদের সামনে পেশ করলেন যারা ইবলীসের সাথে ছিল যাদেরকে نَارِ السَّمُوْمِ উত্তপ্ত আগুন হতে সৃষ্টি করা হয়েছে। তিনি সকল ফেরেশতাদেরকে বললেন- এসব জিনিষের নাম বল। যদি তোমাদের দাবীতে তোমরা সত্য হও।

যখন ফেরেশতাগণ জানলেন তারা অদৃশ্য বিষয় নিয়ে যে সকল কথাবার্তা বলেছিলেন

Scanned with CamScanner

তার কারণেই আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে দোষারোপ করছেন, যে অদৃশ্য বস্তুর জ্ঞান তাদের নেই। উত্তরে তারা বলেন, আল্লাহ আপনি যা শিখিয়েছেন তাছাড়া আমরা অন্য কিছু জানিনা। তারা আরো বলেন, আপনি মহানও পবিত্র। এরপর আল্লাহ তায়ালা হযরত আদম (আ.)-কে বলেন হে আদম, তুমি এ সব জিনিষের নাম বল। আদম (আ.) ফেরেশতাদেরকে এসব জিনিষের নাম সম্পর্কে অবহিত করেন। যখন আদম (আ.) ফেরেশতাদেরকে এ সব জিনিষের খবর দিলেন, তখন আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে বলেন, হে ফেরেশতা! আমি কী বলিনি- শুধু আমিই গায়েব জানি, আর কেউ জানে না। আসমান এবং যমীনের মধ্যে প্রকাশ্যে এবং গোপনে যা কিছু করা হয় সবই জানি। অর্থাৎ ইবলীসের অন্তরে যে অহংকার ও গৌরবের সৃষ্টি হয়েছিল তা আমি জানতাম। (ইবনে আব্বাস (রা.) হতে এ হাদীস শরীফ বর্ণিত)

এ হাদীস হতে এ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে, এ কথা আল্লাহ তায়ালা শুধু এক জামাত ফেরেশতা-যারা ইবলীসের সম্প্রদায়ভুক্ত ছিল-তাঁদেরকে উদ্দেশ্য করে বলেছেন- সকল ফেরেশতাকে বলেননি। যারা হযরত আদম (আ.)-এর সৃষ্টির পূর্বে ইবলীসের সাথে এ জমিনে জীনের বিরুদ্ধে লড়াই করেছিল। আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে এ কথা পরীক্ষা করার উদ্দেশ্যে বলেন, যেন তারা বুঝতে পারেন, তাদের ইলম পূর্ণ নয়। সাথে সাথে এ কথাও যেন বুঝতে পারেন, এ দুর্বল আদমের মধ্যে অনেক মহত্ব নিহিত রয়েছে। শুধু শারীরিকভাবে শক্তিশালী হলে মর্যাদা হাসিল করা যায় না।

আল্লাহ্ তায়ালা ফেরেশতাদেরকে এ অপছন্দনীয় কথা সম্পর্কে অবহিত করেন এবং তওবা করার জন্যে তওফীক দান করেন; তারা তওবা করে আল্লাহ তায়ালার নৈকট্য লাভ করেন। তাদের সামনে ইবলীসের গোপন তথ্য প্রকাশ করেন।

হযরত আবূ মালিক থেকে বর্ণিত, তিনি আবূ সালেহ হতে, তিনি হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতে, তিনি হযরত মুররা হতে তিনি হযরত ইবনে মাসউদ (রা.) থেকে, তিনি মহানবী (সা.) এর সাহাবীগণের একজন হতে বর্ণনা করেন। যখন আল্লাহ তায়ালা তার প্রিয় জিনিস সৃষ্টি করে অবসর হলেন এবং আরশের প্রতি মনযোগ দিলেন। তখন ইবলীসকে দুনিয়ার আসমানে নিয়োগ করেন ইবলীস ঐ ফিরিশতাদের গোত্র হতে ছিল, যাদেরকে জ্বীন নামে ডাকা হত। তাদেরকে জ্বীন নামে নাম রাখা হয় যেহেতু তারা বেহেশতের পাহারাদার ছিল। ইবলীসও পাহরাদার ছিল। অতঃপর ইবলীসের অন্তরে অহংকারের অবতারণা হয়। সে বলে আল্লাহ তায়ালা আমাকে যা দান করেছেন তা আমার বৈশিষ্ট্যের কারণেই দিয়েছেন।

এভাবেই হযরত মূসা বিন হারুন (র.) বর্ণনা করেন এবং তিনি ছাড়া অন্যরাও আমার কাছে বর্ণনা করেন। ইবলীস বলেছিল, আমাকে বেহেশতের খাযিন করা হয়েছে এ জন্য যে, ফেরেশতাদের উপর আমার মর্যাদা রয়েছে। যখন এ অহংকার ইবলীসের অন্তরে উদিত হয়, আল্লাহ তায়ালা এ ব্যাপারে অবগত হন। তারপর আল্লাহ তায়ালা ফেরেশতাদেরকে বলেন- إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً এতে ফেরেশতারা বলেন- হে পরওয়ারদিগার! ঐ খলীফা দিয়ে কি হবে ? যমীনে তার বংশ বৃদ্ধি পাবে, যমীনে তারা ফাসাদ করবে, পরস্পর পরস্পরকে হিংসা করবে, পরস্পর পরস্পরকে হত্যা করবে। আমরা আপনার প্রশংসা করছি এবং তসবীহ পড়ছি ও আপনার পবিত্রতা বর্ণনা করছি। এরপর আল্লাহ তায়ালা বলেন- আমি ইবলীস সম্পর্কে যা জানি, তা

তোমরা জাননা।

অতপর আল্লাহ তায়ালা হযরত জিব্রাইল (আ.)-কে এ পৃথিবীতে প্রেরণ করেন। যমীন হতে মাটি নেয়ার জন্য। যমীন বলে, আমি আল্লাহর ওয়াস্তে আপনার থেকে পানাহ চাই যেন আপনি আমার মধ্যে অপূর্ণতা না আনেন। এর ফলে জিব্রাঈল মাটি না নিয়েই ফিরে গেলেন। জিব্রাঈল (আ.) আল্লাহকে বলেন- হে আল্লাহ যমীন পানাহ চায় আপনার ওসিলা ধরে তাই আমি পানাহ দিয়েছি। আল্লাহ তায়ালা তারপর হযরত মীকাঈল (আ.)-কে প্রেরণ করেন। যমীন অনুরূপভাবে পানাহ চায় এবং পানাহ দেয়া হয়। হযরত মীকাঈল (আ.) চলে আসলেন এবং যেভাবে হযরত জিব্রাঈল (আ.) বলেছিলেন সেভাবে উত্তর দিলেন। এরপর আল্লাহ তায়ালা হযরত আজরাঈল (আ.)-কে প্রেরণ করেন। জমিন হযরত আজরাঈল (আ.)-এর কাছে আল্লাহর আশ্রয় কামনা করে। হযরত আজরাঈল (আ.) বলেন, আমিও আল্লাহর কাছে পানাহ চাই। আল্লাহ প্রদত্ত নির্দেশ পালন না করে যেন প্রত্যাবর্তন না করি। এভাবে আজরাঈল যমীনের উপরি ভাগ হতে মাটি নিলেন এবং মিশ্রিত করলেন- যমীনের এক জায়গা হতে মাটি নিলেন না বরং লাল, সাদা এবং কালো মাটি মিশ্রিত করে নিলেন। এ জন্যে বনি আদম ভিন্ন ভিন্ন রং এ জন্মগ্রহণ করে। তিনি মাটি নিয়ে আকাশে উঠলেন। এ মাটি ছিল কর্দমাক্ত নরম, যার একটি অপরটির সাথে লেগে যায়। আল্লাহ পাক এ মাটি রেখে দিলেন। অবশেষে তা দুর্গন্ধযুক্ত হয়ে আসল রূপ পরিবর্তন হল। একথার প্রতি আল্লাহ তায়ালা অন্যত্র ইঙ্গিত প্রদান করেন-

إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّن طِينٍ ـ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ

"আমি মানুষ সৃষ্টি করেছি মাটি হতে, যখন আমি তাকে সুষম করব এবং তাতে আমার রূহ সঞ্চার করব, তখন তোমরা তার প্রতি সিজদায় অবনত হও।" (সূরা ঃ সোয়াদ-৭১-৭২)

আল্লাহ তায়ালা নিজ হাতে আদমকে তৈরী করলেন, যাতে শয়তান মানুষের উপর অহংকার করতে না পারে, এবং আল্লাহ বলতে পারেন আমি নিজহাতে যা তৈরী করলাম তার উপর তুমি অহংকার করছ কেন? এরপর আল্লাহ মানুষের দেহ তৈরী করলেন। তা চল্লিশ বৎসর পর্যন্ত মাটির মধ্যে ছিল। ফেরেশতাগণ এর পাশ দিয়ে যেতে তাঁকে দেখে ভীত হলেন। সবচেয়ে বেশী ভীত হয়েছিল ইবলীস। এরপর তাতে রূহ ফুৎকার করলেন। আদমের মধ্যে রূহ যখন মাথা দিয়ে প্রবেশ করে তখন তিনি হাঁচি দিলেন। ফেরেশতা তাঁকে শিখিয়ে দেন আলহামদুলিল্লাহ বল, তিনি আলহামদুলিল্লাহ বললেন। জবাবে আল্লাহ তায়ালা বললেন, رحمك ربك আল্লাহ আপনাকে রহম করুন। যখন রূহ চোখ দিয়ে প্রবেশ করল তিনি বেহেশতের ফলমূল দেখলেন। যখন রূহ আদমের পেটে প্রবেশ করল, খাওয়ার ইচ্ছে জাগল। এজন্য রূহ পায়ে পৌঁছার পূর্বেই তাড়াতাড়ি বেহেশতের ফলের দিকে গেলেন। এ জন্যে আল্লাহ বলেন ইনসান পয়দা করা হয়েছে তাড়া হুড়োর বৈশিষ্ট্য দিয়ে। অতঃপর ইবলীস ছাড়া সকল ফিরিশতা সিজদায় মাথা অবনত করে। ইবলীস সিজদা করা থেকে বিরত থাকে এবং গৌরব ও অহংকার করে। এভাবে সে কাফিরে পরিণত হয়। আল্লাহ তায়ালা তাকে বলেন- কোন বস্তু তোমাকে আমার হুকুমে সিজদা করা থেকে বিরত রাখে? উত্তরে ইবলীস বলে- আমি আদমের চেয়ে উত্তম, আমি কেন সিজদা করব এমন এক মানুষকে যে হচ্ছে মাটির তৈরী? এতে আল্লাহ তায়ালা রাগান্বিত হয়ে

Scanned with CamScanner

বলেন এখান থেকে বের হয়ে যা! তোমার অধিকার নেই অহংকার করার। তুমি এখান হেত বের হয়ে যাও। তুমি লাঞ্ছিতদের একজন।

অন্যান্য মুফাসসীরীনে কিরাম লিখেন- আল্লাহ তায়ালা ফেরেশতাদেরকে আদমের বংশধর যে ফসাদ সৃষ্টিকারী, রক্তপাতকারী হবে তা নিয়ে প্রশ্ন করার জন্য অনুমতি দিয়েছিলেন। এজন্যে ফেরেশতারা পরামর্শমূলকভাবে প্রশ্ন করেন। اَتَجْعَلُ فِيْهَا مَنْ يُّفْسِدُ فِيْهَا الخ

অর্থাৎ হে রব! কীভাবে তারা আপনার নাফরমানী করবে! অথচ আপনি তাদের সৃষ্টিকর্তা। এর উত্তরে তাদের পরওয়ারদিগার তাদেরকে বলেন- তাদের পক্ষ হতে এটিই ঘটবে, যদিও তোমরা তা জাননা। তাফসীরকারীগণ বলেন- اَتَجْعَلُ فِيْهَا الخ এ প্রশ্ন ফেরেশতাদের অস্বীকার করার আঙ্গিকে ছিল না বরং বাস্তবতা কী এবং প্রসংগক্রমে তারা যে দিন রাত তসবীহ পড়েন তাই বলা মকসুদ ছিল। অর্থাৎ অস্বীকার না করে এ কথাই বলা উদ্দেশ্য ছিল আমরা তো সর্বদা তসবীহ পাঠে রত আছি। সুতরাং আহলে ফসাদের একটি দল যমীনে সৃষ্টি করার কি উদ্দেশ্য? সেই সময় আল্লাহ তায়ালা উত্তর দেন اِنِّىْ اَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ অর্থাৎ আমি তাদের সৃষ্টির পর ফলাফল কি হবে না হবে তা জানি। তাদের মধ্য হতে আলিম, সালেহীন, আউলিয়া আর মুত্তাকী পয়দা হবে, যাদের দ্বারা যমীনে শান্তি ও ন্যায় পরায়ণতা প্রতিষ্ঠা হবে।

وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ

হযরত আবু জা'ফর (র.) বলেন, এ আয়াতের অর্থ আমরা আপনার প্রশংসার মাধ্যমে আপনার মহত্ব প্রকাশ করছি, শুকরিয়া আদায় করছি। আরবদের পরিভাষায় আল্লাহর প্রতিটি স্মরণই হচ্ছে তসবীহ ও সালাত। আর تقديس অর্থ হচ্ছে পবিত্রতা ও মহত্ত্ব।

قَالَ اِنِّىْ اَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ

অর্থাৎ আমি ইবলীসের গোপন কথা যাতে আল্লাহ তায়ালার নাফরমানী এবং অহংকার রয়েছে- তা জানি।

হযরত কাতাদাহ (র.) বলেন- আল্লাহ তায়ালার ইলমে ছিল যে, যেই খলীফার কথা বলা হয়েছে- তাদের মধ্য হতে আম্বিয়া, রাসূল, জাতির সংশোধনকারী এবং জান্নাতবাসী পয়দা হবেন। যেহেতু আল্লাহ তায়ালা ফেরেশতাদেরকে অবহিত করেন যে, এ খলীফাদের উত্তরসূরী হতে ফসাদ ও রক্তপাত প্রকাশ পাবে। এজন্য ফেরেশতাগণ বলেন, আমাদেরকে বাদ দিয়ে কি আপনি যমীনে আপনার প্রতিনিধি সৃষ্টি করবেন, যাদের বংশ হতে কৃতঘ্ন ও অবাধ্যকারী প্রজন্ম লাভ করবে, না কি আমাদের মাঝ থেকেই প্রতিনিধি নির্বাচন করবেন? অথচ আমরা আপনার মহত্ব, গুণগান করছি আপনার নির্দেশ পালনার্থে নামায আদায় করছি। আপনার অনুসরণ করছি। আপনার নাফরমানী করছি না। এ সব কিছু বলার কারণ হল- তাদের শেখ ইবলীসের অহংকার সম্পর্কে তাদের কোন জ্ঞান ছিল না। তখনই আল্লাহ তায়ালা বলেন, তোমরা পরস্পর যা বলছ, তা ছাড়া আমি এমন কিছু জানি যা তোমরা জান না।

وَعَلَّمَ اٰدَمَ

হযরত আবূ জাফর (র.) হযরত ইবনে আব্বাসের (রা.) উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন। আল্লাহ তায়ালা হযরত আজরাঈল (আ.)-কে মাটি সংগ্রহের জন্য প্রেরণ করেন। তিনি যমীনের উপরিভাগ হতে মিঠা মাটি ও লবনাক্ত মাটি আহরণ করেন এবং সে মাটি

হতে আদম (আ.)-কে সৃষ্টি করেন। এ জন্যে আদম (আ.)-কে আদম নামে অভিহিত করেন। যেহেতু যমীনের উপরিভাগকে اَدَمٌ বলা হয়। আর যমীনের উপরিভাগের মাটি দিয়েই আদম (আ.)-কে সৃষ্টি করা হয়।

হযরত সাঈদ বিন জুবাইর (র.) বলেন, হযরত আদম (আ.)-কে ادم الارض তথা যমীর উপরিভাগে মাটি হতে পয়দা করার কারণেই আদম নামে আখ্যায়িত করা হয়।

হযরত ইবনে মাসউদ সহ আসহাবে রাসূল (সা.)-এর একটি জামাত হতে বর্ণিত আছে- হযরত আদম (আ.)-এর মাটি নেয়ার জন্যে যখন আল্লাহ তায়ালা আজরাঈল (আ.)-কে প্রেরণ করেন- তখন তিনি পুরো যমীন হতে মাটি নিয়ে তা মিশ্রিত করেন। এক জায়গা হতে না নিয়ে বিভিন্ন জায়গা হতে বিভিন্ন রং এর মাটি নিয়ে তা মিশ্রিত করে নেন। এ জন্যেই আদম সন্তান বিভিন্ন রং এর হয়ে থাকে। আর আদম (আ.)-কে আদম এ জন্যে নাম রাখা হয়েছে, যেহেতু মাটির উপরের অংশ ادیـــــم الارض হতে তাঁকে সৃষ্টি করা হয়েছে। অন্য এক রিওয়ায়তে আছে-

عن ابي موسى الاشعري قال قال رسول اللّٰه ان الله خلق ادم من قبضة قبضتها من جميع الارض فجاء بنو ادم على قدر الارض جاء منهم الاحمر والاسود والابيض وبين ذالك والسهل الحزن والخبيث والطيب ـ

হযরত আবূ মূসা আশআরী (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেন, আল্লাহ তায়ালা হযরত আদম (আ.)-কে এক মুষ্টি মাটি হতে সৃষ্টি করেন। আর এক মুষ্টি মাটির ভিতর সারা যমীনের মাটি অন্তর্ভুক্ত ছিল। সেই অনুযায়ী আদম সন্তান লাল, কাল, সাদা রং-এর হয়। তা ছাড়া মাটির বৈশিষ্ট্য হিসেবে নরম, চিন্তাশীল, খারাপ ও ভাল স্বভাবের হয়ে থাকে। আদম শব্দটি ادمة থেকে فـــعـل কে রূপান্তরিত করে اسم বা বিশেষ্য বানানো হয়েছে।

الْاَسْمَاءَ كُلَّهَا

সব কিছুর নাম। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণনা করা হয়েছে- তিনি বলেন, আল্লাহ তায়ালা হযরত আদম (আ.)-কে সব কিছুর নাম শিখিয়ে দিয়েছিলেন। এমন সব জিনিষ যার সাথে মানুষ পরিচিত। যেমন ইনসান, জানোয়ার, জমিন, সমুদ্র, পাহাড়, গাধা এবং এ জাতীয় অনেক কিছু।

হযরত মুজাহিদ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন- আল্লাহ তায়ালার বাণী وَعَلَّمَ اٰدَمَ الْاَسْمَاءَ كُلَّهَا ـ الخ এরঅর্থ হযরত আদম (আ.)-কে প্রত্যেক কিছুর নাম শিক্ষা দেয়া হয়। তাঁর থেকে আরো বর্ণিত আছে- আদম (আ.) কে কাকের নাম, গাধার নাম, কবুতরের নাম এবং প্রত্যেক জিনিষের নাম শিক্ষা দিয়েছিলেন।

হযরত সাঈদ বিন আল জুবাইর হতে বর্ণিত, তিনি বলেন- তাঁকে আল্লাহ তায়ালা প্রত্যেক কিছুর নাম শিক্ষা দেন। এমন কি ভেড়া, গরু, ছাগল এর নাম পর্যন্ত শিক্ষা দেন।

وعن ابن عباسؓ قال علمه اسم القصعة و القصوة والفسية وعنه ايضا قال علمه اسم كل شي حتى الهنة والهنية والفسوة الضرطة ـ

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, আল্লাহ তায়ালা আদম (আ.)-কে সবকিছুর নাম শিখিয়ে ছিলেন- চামচ, মুহূর্ত, কাল এমন কি পশ্চাদ বায়ুর নাম পর্যন্ত শিখিয়ে ছিলেন।

Scanned with CamScanner

وعن الحسن وقتادة قالا علمه كل شي هذه الخيل وهذه البغال والابل والحمر والوحش وجعل يسمي كل شي باسمه ـ

হযরত হাসান ও কতাদাহ (রা.) থেকে বর্ণিত- তাঁরা বলেন, আল্লাহ তায়ালা হযরত আদম (আ.)-কে প্রত্যেক জিনিষের নাম শিখিয়ে দিয়েছিলেন কোন জিনষকে কোন নামে অভিহিত করা হবে তা জানিয়ে দিয়েছিলেন। যেমন ঘোড়া, খচ্চর, উট, জ্বীন, জানোয়ার এভাবে সব কিছু। অন্য একদল মুফাসসিরীনে কিরাম বলেন, عَلَّمَ اٰدَمَ الْاَسْمَاءَ এর অর্থ হচ্ছে, ফিরিশতাদের নাম। অন্য একদল মুফাসসীর বলেন- আল্লাহ তায়ালা হযরত আদম (আ.)-কে প্রত্যেক বংশধরের নাম শিখিয়ে দিয়েছিলেন।

অবশেষে এ কথায় উপনীত হওয়া যায় যে, হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর বর্ণনাই প্রনিধান যোগ্য। কারণ অন্যান্য সকল বর্ণনা এর অন্তর্ভুক্ত।

ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلٰئِكَةِ

এরপর আল্লাহ তায়ালা ঐ সব জিনিষ ফিরিশতাদের সম্মুখে পেশ করেন। হযরত হাসান (র.) ও হযরত কাতাদাহ (র.) বলেন, হযরত আদম (আ.)-কে প্রত্যেক জিনিষের নাম শিখিয়ে ছিলেন তা এ রকম। هٰذه الخيل এটি ঘোড়া هٰذه البغال এটি খচ্চর। এভাবে প্রত্যেক জিনিষের নাম পৃথক পৃথক করে শিখিয়েছিলেন ও পৃথক পৃথক এক একটি দলকে তার কাছে পেশ করেছিলেন।

فَقَالَ اَنْۢبِـُٔوْنِىْ بِاَسْمَاۤءِ هٰٓؤُلَاۤءِ

অতঃপর আল্লাহ তায়ালা বলেন, তোমরা এসব জিনিষের নাম বলবা আদম (আ.)-বর্ণনা করেছেন।

اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ

তোমরা যদি তোমাদের যুক্তিতে সত্য হও। অর্থাৎ তোমরা যদি এ সব জিনিষের নাম জান, তা হলে আমি যমীনে খলীফা বা প্রতিনিধি নিয়োগ করব না। অথবা তোমরা যদি এ কথায় সত্য হও যে, আমি তোমাদেরকে যমীনে খলীফা নিয়োগ করলে তোমরা আমার তসবীহ পড়বে, পবিত্রতা বর্ণনা করবে, পক্ষান্তরে তোমরা ছাড়া অন্য কাউকে খলীফা নিয়োগ করলে তারা এবং তাদের সন্তানরা নাফরমানী করবে, ঝগড়া করবে এবং রক্তপাত ঘটাবে।

قَالُوْا سُبْحٰنَكَ لَا عِلْمَ لَنَاۤ اِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا ؕ اِنَّكَ اَنْتَ الْعَلِيْمُ الْحَكِيْمُ

ফেরেশতারা বললেন, আল্লাহ আপনি পবিত্র। আমাদের ইলম নেই। আপনি যা শিখিয়েছেন তা ছাড়া। আপনি জ্ঞানী ও প্রজ্ঞাময়।

হযরত আবূ জাফর (র.) বলেন এর অর্থ হচ্ছে- হে আমাদের পরওয়ারদিগার! আপনি যা কিছু বিরাজমান এবং যা কিছু ভবিষ্যতে হবে সব কিছুই আপনি জানেন। গায়েব সম্পর্কে শুধু আপনি জ্ঞাত, তোমার সমস্ত সৃষ্টির মধ্যে অন্য কেউই তা জানে না।

قَالَ يٰۤاٰدَمُ اَنْۢبِئْهُمْ بِاَسْمَاۤئِهِمْ ۚ فَلَمَّاۤ اَنْۢبَاَهُمْ بِاَسْمَاۤئِهِمْ ۙ قَالَ اَلَمْ اَقُلْ لَّكُمْ اِنِّىْۤ اَعْلَمُ غَيْبَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۙ وَاَعْلَمُ مَا تُبْدُوْنَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُوْنَ

অর্থাৎ আল্লাহ তায়ালা বলেন, হে আদম! ফিরিশতাদেরকে জানিয়ে দাও এ সব

জিনিষের নাম। যখন হযরত আদম (আ.) তাদেরকে এসব জিনিষের নাম বলে দিলেন, তখন আল্লাহ তায়ালা বলেন, আমি কী তোমাদেরকে বলিনি আসমান এবং যমীনের মধ্যে যা তোমরা প্রকাশ কর তাও আমি জানি আর যা গোপন কর তাও আমি জানি? مَا تُبْدُوْنَ দ্বারা ফিরিশতাদের কথার প্রতি ইশারা করেন। ফিরিশতারা প্রকাশ্যে বলেছিলেন- اَتَجْعَلُ فِيْهَا مَنْ يُّفْسِدُ فِيْهَا। আর مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُوْنَ দ্বারা ইবলীসের অহংকার, গৌরব এর প্রতি ইশারা করছে। অথবা এর অর্থ হবে এরূপ- হযরত আদম (আ.)-কে সৃষ্টি করার পর এঅদ্ভুত সৃষ্টি দেখে তারা পরস্পরে বলেছিল, আল্লাহ তায়ালা এ সৃষ্টি দিয়ে কি করবেন? আমরা এ সৃষ্টি হতে বেশী সম্মানিত ও বেশী জ্ঞানী। এ সব কথা ফিরিশতাদের মধ্যে গোপন ছিল। হয়ত; এসব কথার প্রতি ইংগিত দিয়েছেন। তবে এ সব রিওয়ায়তের মধ্যে প্রথম রিওয়ায়তকে প্রাধান্য দেয়া হয়, কারণ এর বর্ণনাকারী হচ্ছেন হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)।

وَاِذْ قُلْنَا لِلْمَلٰٓئِكَةِ اسْجُدُوْا لِاٰدَمَ فَسَجَدُوْۤا اِلَّاۤ اِبْلِيْسَ ؕ اَبٰى وَاسْتَكْبَرَ ۗ وَكَانَ مِنَ الْكٰفِرِيْنَ ﴿۳۴﴾ وَقُلْنَا يٰۤاٰدَمُ اسْكُنْ اَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا ۪ وَلَا تَقْرَبَا هٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُوْنَا مِنَ الظّٰلِمِيْنَ ﴿۳۵﴾ فَاَزَلَّهُمَا الشَّيْطٰنُ عَنْهَا فَاَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيْهِ ۪ وَقُلْنَا اهْبِطُوْا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ ۚ وَلَكُمْ فِى الْاَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَّمَتَاعٌ اِلٰى حِيْنٍ ﴿۳۶﴾ فَتَلَقّٰۤى اٰدَمُ مِنْ رَّبِّهٖ كَلِمٰتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ ؕ اِنَّهٗ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ ﴿۳۷﴾ قُلْنَا اهْبِطُوْا مِنْهَا جَمِيْعًا ۚ فَاِمَّا يَاْتِيَنَّكُمْ مِّنِّىْ هُدًى فَمَنْ تَبِعَ هُدَاىَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ ﴿۳۸﴾ وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَكَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَاۤ اُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ النَّارِ ۚ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ﴿۳۹﴾

৩৪. যখন আমি ফিরিশতাদেরকে বললাম আদমকে সিজদা কর,' তখন ইবলীস ব্যতীত সকলেই সিজদা করল; সে অমান্য করল ও অহংকার করল। সুতরাং সে কাফিরদের অন্তর্ভুক্ত হল।

৩৫. এবং আমি বললাম, হে আদম! তুমি ও তোমার স্ত্রী জান্নাতে বসবাস কর এবং যথেচ্ছা স্বচ্ছন্দে আহার কর কিন্তু এই বৃক্ষের নিকটবর্তী হয়ো না; হলে তোমরা অন্যায়কারীদের অন্তর্ভুক্ত হবে।

Scanned with CamScanner

৩৬. কিন্তু শয়তান তা হতে তাদের পদস্খলন ঘটাল এবং তারা যেখানে ছিল সেখান হতে তাদেরকে বহিষ্কৃত করল। আমি বললাম, তোমরা একে অন্যের শত্রুরূপে নেমে যাও, পৃথিবীতে কিছু কালের জন্য তোমাদের বসবাস ও জীবিকা রয়েছে।

৩৭. অতঃপর আদম তার প্রতিপালকের নিকট হতে কিছু বাণী প্রাপ্ত হলেন। আল্লাহ তার প্রতি ক্ষমা পরবশ হলেন। তিনি অত্যন্ত ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

৩৮. আমি বললাম, তোমরা সকলেই এই স্থান হতে নেমে যাও। পরে যখন আমার পক্ষ হতে তোমাদের নিকট সৎপথের কোন নির্দেশ আসবে, তখন যারা আমার সৎপথের নির্দেশ অনুসরণ করবে তাদের কোন ভয় নেই এবং তারা দুঃখিতও হবে না।

৩৯. যারা কুফরী করে এবং আমার নিদর্শনসমূহকে অস্বীকার করে তারাই অগ্নিবাসী, সেখানে তারা স্থায়ী হবে।

وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلٰٓئِكَةِ اسْجُدُوْا لِاٰدَمَ فَسَجَدُوْٓا اِلَّآ اِبْلِيْسَ

আরবী ব্যাকরণের আলোকে উপরোক্ত বাক্যটি عطف হয়েছে পূর্ববর্তী বাক্য- وَاِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ الخ এর উপর। অর্থাৎ হযরত আদম (আ.)-কে ইলম, মর্যাদা আর কিরামত দেয়ার পর আল্লাহ তায়ালা ফিরিশতাদেরকে দিয়ে হযরত আদম (আ.)-কে সিজদা করালেন। আর ইবলীসকে ফিরিশতাদের থেকে استثناء করেন। এতে একথা বুঝা যায় যে, ইবলীস ফিরিশতা ছিল। এ জন্যে ইবলীসকেও ফিরিশতাদের সাথে সিজদা করতে বলেন। যেমন অন্যত্র আল্লাহ তায়ালা বলেন

اِلَّآ اِبْلِيْسَ لَمْ يَكُنْ مِّنَ السّٰجِدِيْنَ قَالَ مَا مَنَعَكَ اَلَّا تَسْجُدَ

"ইবলীস ব্যতীত। সে সিজদাকারীদের অন্তর্ভুক্ত হয়নি। তিনি বললেন, কোন বস্তু তোমাকে সিজদা করতে নিষেধ করেছে।" (সূরা ঃ আ'রাফ-১২)

এ থেকে স্পষ্টতঃ বুঝা যায় যে, আল্লাহ তায়ালা ইবলীসকে সিজদা করতে বলেছিলেন ঐ সকল ফিরিশতাদের সাথে, যাদেরকে আল্লাহ তায়ালা আদম (আ.)-কে সিজদা করতে বলেছিলেন।

যখন ইবলীস সিজদা করলনা, তখনই তাকে আনুগত্যের সিফত থেকে বের করে দিলেন।

তারপরও মুফাসসীরগণ এ নিয়ে তর্ক বিতর্ক করেন যে, ইবলীস ফিরিশতা ছিল কিনা? عن ابن عباسؓ قال كان ابليس من حي من احياء الملائكه হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, ইবলীস ফিরিশতাদের একটি গোত্রের অন্তর্ভুক্ত ছিল। তাদেরকে জীন বলা হয়ে থাকে। ফিরিশতাদের মধ্যে ঐ গোত্রকে نار السموم বা উত্তপ্ত আগুন হতে সৃষ্টি করা হয়। তিনি আরো বলেন, তার নাম হারিস। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) আরো বলেন, ইবলীস বেহেশতের একজন প্রহরী ছিল, তিনি বলেন ঐ গোত্র ছাড়া বাকী ফেরেশতাগণকে নূর দিয়ে তৈরী করা হয়েছে। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, পবিত্র কুরআনে উল্লেখিত জ্বীনদেরকে সৃষ্টি করা হয়েছে ধোঁয়া বিহীন আগুন হতে। তা হচ্ছে আগুনের মুখ, যা আগুনের চতুর্দিকে থাকে, যখন

আগুন জ্বলে উঠে। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) আরো বলেন, ইবলীস নাফরমানী করার আগে ফিরিশতাদের অন্তর্ভুক্ত ছিল এবং তার নাম ছিল আযাযীল। সে যমীনের বাসিন্দা ছিল। খুবই পরিশ্রমী ফেরেশতা ছিল এবং তার খুব বেশী ইলম ছিল। এটাই তাকে অহংকারের দিকে নিয়েছিল। সে জীন নামক সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত ছিল। অপর এক বর্ণনায় আছে, ইবলীস জীন জাতীয় ফেরেশতা ছিল।

হযরত ইবনে মাসউদ (রা.) সাহাবায়ে কিরামের (রা.) একদল হতে বর্ণনা করেন, আল্লাহ ইবলীসকে দুনিয়ার আসমানের বাদশাহ বানিয়েছিলেন। সে ফিরিশতাদের অন্তর্ভুক্ত ছিল। তাদেরকে জীন বলা হত। তাদের নাম জীন রাখা হয়েছিল, কারণ তারা বেহেশতের প্রহরী ছিল। অনুরূপভাবে ইবলীসও প্রহরী ছিল।

হযরত ইবনে জুরাইজ (রা.) হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন- ইবলীস ফেরেশতাদের মধ্যে খুবই মর্যাদাবান ফিরিশতা ছিল, তাদের গোত্র খুবই সম্মানী ছিল। বেহেশতের পাহারাদার ছিল। দুনিয়ার আসমানের রাজত্ব তার ছিল।

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) তাঁর বর্ণনায় বলেন- ইবলীস জীন ছিল। তাকে حسان জানান নামে ডাকা হত। কারণ সে বেহেশতের পাহারাদার ছিল। যেমন- বলা হয় কোন লোক মক্কায় থাকলে তাকে মক্কী, মদীনায় থাকলে মদনী, এভাবে কুফী, বসরী বলা হয়।

হযরত ইবনে জুরাইজ (রা.) বলেন, ইবলীস জীন ফিরিশতাদের একটি দলের নাম। একই ধরনের কথা অন্যরাও বলেন। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, ফিরিশতাদের একটি দলের নাম জ্বীন, ইবলীস সে দলের ছিল। সে আসমান এবং যমীনের মধ্যে বিচরণ করে কুমন্ত্রণা দিত।

হযরত সাঈদ ইবনে আল মুসাইয়াব (রা.) বলেন- ইবলীস দুনিয়ার আসমানের ফিরিশতাদেরর প্রধান ছিল।

হযরত মুহাম্মদ বিন ইসহাক (র.) থেকে বর্ণিত, আরবরা বলে, যা কিছু গোপন থাকে, তাই জীন। আল্লাহ তায়ালার বাণী كان من الجن الا ابليس كان من الملائكه অর্থ ইবলীস ফিরিশতাদের মধ্যে একজন ছিল। ফিরিশতাদেরকে জীন বলার কারণ তারা অদৃশ্য। তাদেরকে দেখা যায় না। যেমন আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন।

وَجَعَلُوْا بَيْنَهٗ وَبَيْنَ الْجِنَّةِ نَسَبًا وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ اِنَّهُمْ لَمُحْضَرُوْنَ۔

তারা আল্লাহ ও ফিরিশতাদের মধ্যে বংশগত সম্পর্ক সাব্যস্ত করে, অথচ ফিরিশতারাও জানেন যে তাদেরকে আল্লাহর কাছে উপস্থিত হতে হবে। (সূরা সাফফাত-১৫৮)

তিনি আরো বলেন, আরবদের পরিভাষায় জীন হলো যাদেরকে দেখা যায় না।

কুরাইশরা বলত- ফেরেশতারা হচ্ছেন আল্লাহ তায়ালার কন্যা। আল্লাহ তায়ালা বলেন, যদি ফিরিশতা আমার কন্যা হত, তাহলে ইবলীস তাদের মধ্যে হতে একটি কন্যা হত।

সুলাইমান বিন দাউদ বলেন-

ولو كان شي خالدا او معمرا ÷ لكان سليمان البري من الدهر
براه الهي واصطفاه عباده وملكه ما بين ثريا الي مصر
وسخر من جن الملائك تسعة قياما ÷ بلا اليه يعملون لا اجر

Scanned with CamScanner

অন্য একদল মুফাসসির হযরত হাসানের (র.) উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন, ইবলীস কখনও ফিরিশতা ছিল না। সে প্রকৃতপক্ষে জীনই ছিল। যেমন হযরত আদম (আ.) প্রকৃত ইনসান ছিলেন।

হযরত কাতাদাহ্ হাসানের (র.) এর উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন, হযরত হাসান (র.) সর্বদা বলতেন, ইবলীস জীন ছিল, আল্লাহ তায়ালা বলেন, তোমরা কী তাকে এবং তার বংশধরকে বন্ধু বানাবে আমাকে বাদ দিয়ে। জীনদের ও সন্তান সন্ততি হয় বনি আদমের মত।

হযরত শহর বিন হাওশাব থেকে বর্ণিত, তিনি জীন সম্পর্কে বলেন, ইবলীস জীন ছিল, যে জীনদেরকে ফেরেশতাগণ নির্বাসন দিয়েছিলেন। ইবলীস একজন ফেরেশতাকে মুগ্ধ করল। তিনি তাকে আকাশে নিয়ে গেলেন।

হযরত সাঈদ বিন মাসউদ (রা.) বলেন, ফেরেশতাগণ জীনদেরকে হত্যা করলেন এবং ইবলীসকে বন্দী করে নিয়ে গেলেন। ইবলীস তখন ছোট ছিল, সে ফেরেশতাদের সাথে ইবাদত করত। যখন আদম (আ.)-কে সিজদা করতে বলা হল, তখন ফেরেশতারা সিজদা করল কিন্তু ইবলীস সিজদা করল না। আল্লাহ তায়ালার বাণী- الاابليس থেকে এ কথা স্পষ্ট হয় যে, ইবলীস জীনই ছিল।

হযরত ইবনে যায়ীদ (র.) বলেন, ইবলীস হচ্ছে ابوالجن অর্থাৎ জীনের জনক। যেমন হযরত আদম (আ.) ابوالانس অর্থাৎ ইনসানের জনক। একথা বলার কারণ হল, আল্লাহ তায়ালা ইবলীসকে লু-হাওয়া এবং ধোঁয়া ছাড়া আগুন হতে সৃষ্টি করেছেন, যে সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা কুরআনে পাকে বর্ণনা দিয়েছেন। ফেরেশতাদেরকে এ সব বস্তু হতে সৃষ্টি করেছেন, এ রকম কথা কুরআনে পাকে নেই। আল্লাহ তায়ালা বলেন- ইবলীস হচ্ছে জীন। এক্ষেত্রে আল্লাহ তায়ালা জিনকে যার সাথে সম্পর্কিত করেছেন, সেই সম্পর্ক ছিন্ন করে অন্য কিছুর সাথে সম্পর্কিত করা জায়েয হবেনা। যেহেতু ইবলীসের বংশ এবং সন্তান-সন্ততি রয়েছে, অপর পক্ষে ফেরেশতাগণ এসব হতে পবিত্র।

হযরত ইমাম আবু জাফর (র.) বলেন, ইবলীসকে আগুন হতে সৃষ্টি করেছেন, আর ফেরেশতাকে নূর হতে সৃষ্টি করেছেন- এ কথা থেকে বুঝা যায় না ইবলীস ফেরেশতা নয়, কারণ একথা যখন স্বতঃসিদ্ধ যে, এক ধরনের ফেরেশতাকে আগুন হতে সৃষ্টি করা হয়েছে- হয়তঃ ইবলীস এ ধরনের ফেরেশতাদের অন্তর্ভুক্ত হয়ত কেবল ইবলীসকে نار السموم হতে সৃষ্টি করা হয়েছে এবং অবশিষ্ট ফেরেশতাকে এ রকম আগুন হতে সৃষ্টি করা হয়নি। একথাও যদি ধরে নেয়া যায় যে, ইবলীসের বংশ রয়েছে এবং সন্তান-সন্তানাদি রয়েছে, তবুও তাকে ফেরেশতা বলা হয়, কারণ আল্লাহ তায়ালা আগে থেকেই জানতেন যে, সে নাফরমানী করবে, এ জন্যে তাকে কামনা এবং বিভিন্ন ধরনের ইচ্ছের সমন্বয়ে সৃষ্টি করেছিলেন। যা অন্য সব ফেরেশতা হতে ছিনিয়ে নেয়া হয়েছিল। আর ইবলীসের উপর "জিন" শব্দটি এ জন্যে বর্তায় যে, জীন হচ্ছে যাকে চোখ দিয়ে দেখা যায় না। ইবলীসকেও দেখা যায় না তাই তাঁকে জীন বলা হয়।

হযরত আবু জাফর (রা.) বলেন ইবলীস افعيل এর ওজনে ابلاس মসদর থেকে গৃহীত হয়েছে। যার অর্থ নিরাশ হওয়া। ইবলীস কল্যাণ হতে নিরাশ হয়েছে এবং লজ্জা ও চিন্তা বলতে কিছুই তার মধ্যে নেই। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে

বর্ণিত। তিনি বলেন, ইবলীস এমন এক সৃষ্টি যার থেকে আল্লাহ্ তায়ালা সমস্ত কল্যাণ ছিনিয়ে নিয়েছেন। তার নাফরমানীর শাস্তি স্বরূপ তাকে বিতাড়িত শয়তান করেছেন। হযরত সুদ্দী (র.) হতে বর্ণিত, ইবলীসের নাম হল আল হারিস। তাকে ইবলীস নাম দেওয়া হয়, যখন সে সব হারিয়ে আল্লাহর রহমত হতে নিরাশ হয়ে যায়। যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন- فاذاهم مبلسون অর্থাৎ তাদের কল্যাণ বা ভাল হওয়ার কোন আশা নেই, তারা কল্যাণ হতে নিরাশ।

وَكَانَ مِنَ الْكٰفِرِيْنَ

অর্থাৎ শয়তান সিজদা করা থেকে অস্বীকার করে কৃতঘ্ন হয়ে গেছে।

وَقُلْنَا يٰاٰدَمُ اسْكُنْ اَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ

হযরত আবূ জাফর (র.) বলেন- এ আয়াত হতে একথা স্পষ্ট হয়ে উঠে যে, হযরত আদম (আ.)-কে ইবলীস সিজদা করতে অস্বীকার করার পর তাকে বেহেশত হতে বের করা হয়েছিল। হযরত আদম (আ.)-কে বেহেশ্‌ত হতে নামানোর আগে ইবলীস বেহেশতে থাকত, তবে হযরত আদম (আ.)-কে জান্নাতে অবস্থান করানোর পর ইবলীসকে জমিনে নামানো হয়েছে।

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত, অন্য এক সনদে হযরত মুররা (রা.) হতে বর্ণিত, আবূ মাসউদ (রা.) নবী করীম (সা.)-এর কোন এক সাহাবা হতে বর্ণনা করেন- তারা বলেন, আল্লাহ তায়ালার শত্রু ইবলীস আল্লাহর নামে কসম করে বলল, সে আদমের বংশধর ও সন্তানদেরকে নাফরমান বানাবে। কিন্তু যাঁরা আল্লাহ তায়ালার খালিস বান্দাহ তাদেরকে পারবে না।

তাফসীকারগণ বিতর্ক করেন যে, হযরত আদম (আ.)-এর জন্য কোন অবস্থায় এবং কোন সময় তার স্ত্রীকে সৃষ্টি করা হয়। একটি মত এ রকম যে, হযরত আদম (আ.)-কে জান্নাতে অবস্থান করানোর পরেই হযরত হাওয়া (আ.)-কে সৃষ্টি করা হয়। এ কথার সত্যতার উপর এ হাদীস ইংগিত বহন করে।

নবী করীম (সা.)-এর সাহাবীদের কোন একজন হতে বর্ণিত, আল্লাহ ইবলীসকে বের করে দিলেন। আর হযরত আদম (আ.)-কে বেহেশতে অবস্থান করতে দিলেন। তখন তিনি সেখানে একাকী চলাফেরা করতেন, একদা তিনি ঘুমিয়ে পড়লেন। জাগ্রত হয়ে দেখলেন তার মাথার পার্শ্বে একজন মহিলা বসে আছেন। আল্লাহ তায়ালা তাকে হযরত আদম (আ.)-এর পাঁজর থেকে সৃষ্টি করেন। তাকে হযরত আদম (আ.) জিজ্ঞাসা করেন- من انت -কে তুমি? সে জওয়াব দিল আমি 'মহিলা'! আদম বললেন তোমাকে কেন সৃষ্টি করা হয়েছে? তিনি উত্তর দিলেন- আমাকে নিয়েই তুমি বসবাস করবে। ফেরেশতারা হযরত আদম (আ.)-এর জ্ঞানের পরিসীমা যাচাই এর জন্য বললেন, হে আদম তার নাম কী? হযরত আদম (আ.) ফেরেশতাদেরকে বলেন- حوا হাওয়া। ফেরেশতারা বলেন- এর নাম হাওয়া কেন রাখা হল। হযরত আদম (আ.)-জওয়াব দিলেন- যেহেতু তাকে জীবিত বস্তু হতে সৃষ্টি করা হয়েছে। আল্লাহ তায়ালা হযরত আদম (আ.)-কে সম্বোধন করে বলেন- হে আদম (আ.) তুমি এবং তোমার স্ত্রী বেহেশতে বসবাস কর। এবং বেহেশত হতে যা ইচ্ছে তা তোমরা সাচ্ছন্দে খাও। এ বর্ণনা থেকে বুঝা যায়- হযরত আদম (আ.) জান্নাতে অবস্থান শুরু করার পরই হাওয়া (আ.)-কে সৃষ্টি করা হয়। এভাবে হযরত আদম (আ.) জান্নাতে আনন্দে অবস্থান করেন।

Scanned with CamScanner

অন্য এক দল বলেন- হযরত আদম (আ.)-এর অবস্থান জান্নাতে শুরু হওয়ার আগেই হযরত হাওয়া (আ.)-কে সৃষ্টি করেন। তাদের দলীল হল এভাবে- হযরত আবূ ইসহাক (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন আল্লাহ তায়ালা ইবলীসকে শাস্তি প্রদান শেষ করেন, তখন হযরত আদম (আ.)-এর দিকে মনযোগ দেন। তাঁকে সব কিছুর নাম শিক্ষা দেয়া হয়। এরপর হযরত আদম (আ.)-কে এক বৎসর ফেলে রাখলেন। এটা আহলে কিতাব তথা আহলে তওরাত হতে এবং আহলে ইলমদের কাছ থেকে জানা যায়।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস এবং অন্যান্যদের থেকে বর্ণিত, এরপর হযরত আদম (আ.)-এর বাম পাঁজর থেকে এক টুকরা পাঁজর নেয়া হয়। সে সময় আদম (আ.) ঘুমাচ্ছিলেন ঘুম হতে জাগ্রত হওয়ার পূর্বেই আল্লাহ তায়ালা সে পাঁজর থেকে তার জোড় হাওয়া (আ.)-কে সৃষ্টি করলেন এবং তাকে হযরত আদম (আ.)-এর স্ত্রী হিসেবে নির্দিষ্ট করলেন যেন আদম (আ.) শান্তিতে ও সুখে বেহেশতে অবস্থান করতে পারেন। এক বৎসর অতিক্রান্ত হওয়ার পর আদম (আ.) জাগ্রত হলেন, হাওয়া (আ.)-কে তার পাশে দেখলেন। তখন তিনি বলেন, এ দ্বারা আল্লাহ তায়ালার কী উদ্দেশ্য, আল্লাহ তায়ালাই ভাল জানেন। আমারই গোশত, আমারই রক্ত এবং আমার স্ত্রী। এভাবে হযরত আদম (আ.)-কে মানসিক শান্তি প্রদান করা হয়। আল্লাহ তায়ালা অতঃপর বলেন- يَاٰدَمُ اسْكُنْ اَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا 'হে আদম! তুমি এবং তোমার স্ত্রী বেহেশতে বসবাস কর। বেহেশতের নিয়ামত স্বচ্ছন্দে খাও, কিন্তু ঐ বৃক্ষ থেকে কিছু খেয়োনা। যদি খাও, তাহলে তোমরা সীমা লঙ্ঘনকারীর অন্তর্ভুক্ত হবে।' আরবীদের পরিভাষায়- স্ত্রীর ক্ষেত্রে زوجة এবং زوج উভয় শব্দ প্রয়োগ করা হয়। তবে زوجة এর ব্যবহার অধিকাংশ সময় স্ত্রীর বেলায় এবং زوج এর ব্যবহার স্বামীর বেলায় হয়। আর رَغَدًا শব্দের অর্থ ব্যাপক এবং খাওয়া দাওয়া বোঝায় যা কখনো বন্ধ হয় না। আর কেউ কেউ رَغَدًا শব্দের অর্থ লেখেন لا حساب عليهم যার কোন হিসাব নেই।

আরবী ভাষায় প্রত্যেক সোজাভাবে দাঁড়ানো জিনিষকে شجر বলে। এজন্য আল্লাহ তায়ালা বলেন- (والنجم والشجر يسجدان) نجم শব্দের অর্থ যা জমিন হতে উদঘটিত হয়। আর شجر শব্দের অর্থ যা কান্ডের উপর সোজাভাবে থাকে। বর্ণনাকারীদের মতভেদ রয়েছে- হযরত আদম (আ.) কে যে বৃক্ষের ফল খেতে নিষেধ করেছেন তা কোন বৃক্ষ? কেউ বলেন, তা হচ্ছে গম জাতীয় বৃক্ষ। নিম্নের বর্ণনা হতে তা বুঝা যায়

عن ابن عباسؓ قال الشجرة التي نهي عن اكل ثمرها ادم هي السنبلة ـ

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, যে গাছের ফল খাওয়া থেকে আল্লাহ তায়ালা হযরত আদম (আ.) কে নিষেধ করেছিলেন, তা হল সুনবুলা অর্থাৎ ফলের থোকা বা ছড়া। হযরত আবূ মালিক, হযরত আতিয়া এবং হযরত কাতাদা (রা.) হতেও 'সুনবুলা' শব্দ পাওয়া যায়।

হযরত মুজাহিদ ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণনা করেন, আদম (আ.)-কে যে গাছের ফল খেতে নিষেধ করা হয়েছিল তা হল গম বৃক্ষ। আর হযরত সাঈদ ইবনে আল জুবাইর ইবনে আব্বাস হতে বর্ণনা করেন- তা হল গমের ছড়া। হযরত ইবনে ইসহাক কিছু বিদ্ধান ব্যক্তির উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন- তারা হযরত ওহব বিন মুনাব্বিহ আল ইয়ামানী থেকে রেওয়ায়ত করেন, তারা বলতেন সেই বৃক্ষ হল গম, যা মাখন

হতে অধিক নরমও মধু হতে অধিক মিষ্টি।

অন্য এক দল আঙ্গুর বৃক্ষের কথা বলেন। তাঁরা এ সম্পর্কে হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) ইবনে মাসউদ, সুদ্দী, জা'দা বিন হিররা, সাইদ বিন জুবাইর (রা.)-এর বর্ণনাকে দলীল হিসেবে পেশ করেন। হযরত ইবনে জুরাইজ (র.) কতেক সাহাবায়ে কিরাম (রা.) থেকে রিওয়ায়ত করেন। এ বৃক্ষ হল 'ত্বীন' যা এক প্রকার ফলের নাম।

হযরত ইমাম আবু জাফর (র.) বলেন যে, আল্লাহ তায়ালা হযরত আদম (আ.) এবং হাওয়া (আ.)কে জান্নাতের একটি নির্দিষ্ট বৃক্ষের ফল খেতে নিষেধ করেছিলেন। যার নাম, যার কথা কুরআন শরীফেও নেই, হাদীস শরীফেও নেই। যা জানার মধ্যে কোন উপকারিতা নেই, আবার না জানার মধ্যে কোন ক্ষতিও নেই। কাজেই তা নিয়ে এতো দীর্ঘ তর্ক-বিতর্ক করার কোন যৌক্তিকতা নেই।

وَلَا تَقْرَبَا هٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُوْنَا مِنَ الظّٰلِمِيْنَ

তোমরা দু'জন এ গাছের নিকটে যেও না, যদি যাও তাহলে তোমরাও জালিমদের অন্তর্ভুক্ত হবে। আরবদের ভাষায় জুলুম শব্দের আসল অর্থ যেই জিনিষ যেই জায়গায় রাখা প্রয়োজন, সেই জায়গায় না রেখে অপর জায়গায় রাখা। তা ছাড়াও জুলুমের কয়েকটি অর্থ রয়েছে। এর বর্ণনা পরে দেয়া হবে।

فَاَزَلَّهُمَا الشَّيْطٰنُ عَنْهَا

যেই জিনিষ যেখানে থাকার নিয়ম, সেখান থেকে সরিয়ে দেয়ার নাম হল - ازالة-হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন- এ আয়াতের অর্থ শয়তান জান্নাত হতে পা পিছলিয়ে দিল। এ ঘটনার বিশদ বর্ণনা নিম্নের হাদীসে পাওয়া যায়।

হযরত আবু জাফর (র.) বলেন, হযরত মূসা বিন হারুন (রা.) আমাকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, আমাদেরকে হযরত আমর (রা.) বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, আমাদেরকে আসবাত, তিনি হযরত সুদ্দী (রা.) হতে, তিনি হযরত আবু মালিক (রা.)-এর উদ্ধৃতি দিয়ে, তিনি আবু সালেহ হতে, তিনি মুররা (রা.) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি হযরত ইবনে মাসউদ (রা.) থেকে বর্ণনা করেন- তিনি কয়েকজন সাহাবী থেকে বর্ণনা করেন- যখন আল্লাহ তায়ালা হযরত আদম (আ.)-কে বলেন, তুমি এবং তোমার স্ত্রী জান্নাতে বসবাস কর। যা ইচ্ছা খাও। কিন্তু ঐ গাছের নিকট যেও না। যদি যাও অর্থাৎ যদি এর ফল খাও, তা হলে তোমরা জালিমদের অন্তর্ভুক্ত হবে। ইবলীস হযরত আদম (আ.) এবং হযরত হাওয়া (রা.)-এর নিকট যাওয়ার জন্য জান্নাতে প্রবেশ করতে চাইলে জান্নাতের প্রহরীরা ইবলীসকে বাঁধা প্রদান করেন। এরপর সে একটি সাপের নিকট আসল। সাপটির জানোয়ারের মত চারটি পা ছিল। যেন একটি উট।

ইহা ছিল জানোয়ারের মধ্যে খুবই সুন্দর। সাপের সাথে তার কথা হল যে, তার মুখে করে সে শয়তানকে আদমের কাছে নিয়ে যাবে। সাপের মুখে করে ইবলীস বেহেশতে প্রবেশ করল। এমনকি হযরত আদম (আ.) পর্যন্ত পৌছল। সে সাপের মুখে থেকেই আদম (আ.)-এর সাথে কথা বলল, কিন্তু আদম কোন জবাব দিলেনা, তখন সে বের হয়ে আসল এবং হযরত আদম (আ.)-কে বলল, আমি কী তোমাকে এমন এক বৃক্ষের কথা বলব, যার ফল খেলে তুমি আল্লাহ তায়ালার মত বাদশাহ হবে অথবা তোমরা সর্বদা এখানে থাকতে পারবে, কোন দিন মরবে না এবং তাদের সামনে

Scanned with CamScanner

ইবলিস আল্লাহর নামে শপথ করেছিল এর দ্বারা তার উদ্দেশ্য ছিল আদম ও হাওয়ার পোশাক খুলে পড়ার মাধ্যমে তাদের সতর উম্মোচিত করা। কারণ সে জানত যে তাদের লজ্জা আছে। সে তা জানতে পেরেছিল ফেরেশতাদের কিতাব পড়ে। অথচ আদম (আ.) তা জানতেন না। হযরত আদম (আ.) ফল খেতে অস্বীকার করলেন। কিন্তু হযরত হাওয়া (আ.)-অগ্রসর হলেন এবং খেয়ে নিলেন। তারপর হযরত আদম (আ.)-কে বললেন- হে আদম! খাও, আমি খেয়েছি। আমার কোন ক্ষতি হয়নি। তার কথায় হযরত আদম (আ.) খেলেন। পরক্ষনেই তাদের লজ্জাস্থান প্রকাশ হয়ে গেল। তাঁরা জান্নাতের গাছের পাতা দিয়ে তাঁদের লজ্জাস্থান আবৃত করলেন।

হযরত আবূ আল আলিয়া (রা.)-এর রিওয়ায়তে নিম্নরূপ বর্ণনা রয়েছে। وَلَا تَقْرَبَا هٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُوْنَا مِنَ الظّٰلِمِيْنَ বলার পর হযরত হাওয়া (আ.) এর নিকট শয়তান আসল এবং বলল, তোমাদেরকে কিছু জিনিষ হতে কি নিষেধ করা হয়েছে? হাওয়া বললেন হ্যাঁ, এ গাছ হতে। শয়তান বলল- তোমাদেকে এজন্য নিষেধ করা হয়েছে যেন তোমরা বাদশাহ হতে না পার বা যেন এখানে চিরকাল থাকতে না পার। এরপর হাওয়া (আ.) প্রথমে খেলেন এবং হযরত আদম (আ.)- কে খাওয়ার জন্য হাওয়া (আ.) বললেন। হযরত আদম (আ.) ও খেলেন। তা এমন বৃক্ষ, যে কেউ তার ফল খেলে সে আর জান্নাতে থাকার মতো যোগ্যতা রাখেনা; যেহেতু তার মধ্যে পায়খানা প্রশাবের হাজত হয়। এভাবে শয়তান তাদেরকে বেহেশত হতে বের করেছিল।

মোটকথা হল, শয়তান তাদেরকে ধোঁকা দেয়ার জন্য প্রথমে এ কৌশল অবলম্বন করেছিল। হযরত ইমাম কাসতলানী (র.) বলেন, শয়তান আগে গান শুরু করেছিল। হযরত আবূ জাফর (র.) বলেন- শয়তান কাঁদতে আরম্ভ করল। যার কারণে হযরত আদম (আ.) আর হাওয়া (আ.) চিন্তিত হলেন। তাঁরা দু'জনেই শয়তানকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি জন্য কাঁদছ? শয়তান তাদেরকে বলল, তোমাদের চিন্তায়, কারণ তোমরা দু'জনেই মরে যাবে এবং একজন অপর জন হতে পৃথক হয়ে যাবে। বর্তমান এ নিয়ামত এবং সম্মান হতে বঞ্চিত হয়ে যাবে। এ কথা তাদের অন্তরে দাগ কাটল। এরপর শয়তান আবার তাদের কাছে আসল। শয়তান তাদেরকে এভাবে কুমন্ত্রণা দিল। শয়তান বলল, হে আদম! আমি তোমাকে কী এমন এক বৃক্ষের কথা বলব, যার ফল খেলে সর্বদা জীবিত থাকবে আর এমন এক রাজত্বের কথা ঠিক কি বলব? যা কোন দিন শেষ হবে না। শয়তান আরও বলল, তোমাদেরকে যেই বৃক্ষের ফল খেতে নিষেধ করা হয়েছে, উহার ফল খেলে তোমরা ফেরেশতা হয়ে যাবে অথবা আর কখনো মরবে না, সর্বদা এখানে থাকতে পারবে। শয়তান তাদের শুভাকাঙ্খী, এ বলে শপথ করেছিল। এতে দু'জনেই ধোঁকায় পড়ে গিয়েছিলেন।

হযরত ইবনে যায়েদ (র.) বলেন, শয়তান হযরত হাওয়া (আ.)-কে ধোঁকা দিয়ে বৃক্ষের কাছে এনেছিল। তারপর আদম (আ.)-এর চোখে হযরত হাওয়া (আ.)-এর শরীরে সৌন্দর্য বৃদ্ধি করে দিয়েছিল। হযরত হাওয়া (আ.)-কে দেখে আদম (আ.) নিজের প্রয়োজন পূরনের মানসে কাছে ডাকলেন। তখন হাওয়া (আ.) রাজী হননি বরং বলেন, যতক্ষণ তুমি এখানে না আসবে আমি রাজী হব না। এতে হযরত আদম (আ.) এখানে আসলেন। তখন হাওয়া (আ.) বলেন, আমি রাজী হব না যতক্ষণ এ বৃক্ষের ফল খাবে না। এভাবে তারা দু'জনেই ফল খেলেন এবং তাদের সতর খুলে গেল। হযরত আদম (আ.)বেহেশতে পালাতে গেলেন। তখন আল্লাহ তায়ালা বলেন,

তোমরা কি আমার কাছ থেকে দূরে সরে যেতে চাচ্ছ? আদম বললেন, হে আল্লাহ! আমার লজ্জা বোধ হচ্ছে। আল্লাহ বলেন, তুমি তা কিভাবে করলে? হযরত আদম (আ.) বলেন, হে রব! হাওয়ার মাধ্যম এ কাজ হয়েছে। আল্লাহ বলেন, এজন্যে হাওয়ার থেকে প্রতি মাসে রক্ত ঝরবে, যেমনটি সে এই গাছকে রক্তাক্ত করেছে। তাকে নির্বোধ ও ধৈর্য্যশীলা বানাব, আমি তাকে অপছন্দনীয় বোঝা হলেও গর্ভধারণ করতে দিব। আমি তাকে সৃষ্টি করেছি সহজেই হামল ধারণ করবে এবং সহজেই সন্তান জন্ম দিবে। হযরত ইবনে যায়েদ (র.) বলেন, যদি হাওয়া (আ.)-এর এ পরীক্ষা না হত তা হলে দুনিয়ার মহিলাদের হায়েজ হত না।

হযরত মুহাম্মদ বিন কায়েস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন- আল্লাহ তায়ালা হযরত আদম (আ.) এবং হাওয়া (আ.)কে জান্নাতের একটি বৃক্ষ হতে ফল খেতে নিষেধ করেছিলেন এবং অন্যান্য সকল বৃক্ষ হতে পেটপুরে স্বাচ্ছন্দ্যে খাওয়ার অনুমতি প্রদান করেছিলেন। এরপর শয়তান আসল, সাপের পেটে প্রবেশ করল এবং হযরত হাওয়া (আ.)-এর সাথে কথা বলল সে হযরত আদম (আ.)-কে কুমন্ত্রণা দিল এবং বলল, তোমরা দুজনকে এ বৃক্ষের ফল খেতে নিষেধ করা হয়েছে, যেন তোমরা বাদশাহ হতে না পার বা সর্বদা যেন এখানে থাকতে না পার। অধিকন্তু বিশ্বাস করানোর জন্যে শপথ করে বলল- আমি তোমাদের ভাল চাই, আমি তোমাদের পরামর্শ দাতা।

একথা বলায় হযরত হাওয়া (আ.) বৃক্ষটি কামড়ে ধরলেন। তখন গাছ হতে রক্ত বের হল আর এদিকে তাদের কাপড়-চোপড় পড়ে যেতে শুরু করল। তারা বেহেশতের পাতা দিয়ে তাদের লজ্জাস্থান আবৃত করলেন। আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে বললেন- আমি কী তোমাদেরকে ঐ বৃক্ষ হতে নিষেধ করিনি? আমি কি তোমাদেরকে বলিনি শয়তান তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু? তোমাদেরকে নিষেধ করা সত্ত্বে কেন তোমরা তা খেলে? হযরত আদম (আ.) বলেন, হে রব! হাওয়া আমাকে খাইয়েছে। হযরত হাওয়া (আ.)-কে বলা হল, কেন তুমি খাওয়ালে? হাওয়া জওয়াব দেন- আমাকে সাপ হুকুম দিয়েছিল। সাপকে জিজ্ঞেস করা হল, কেন তুমি হুকুম করলে? সাপ বলল- আমাকে ইবলিস হুকুম দিয়েছিল। আল্লাহ তায়ালা বলেন, এ ইবলিস আমার রহমত হতে বঞ্চিত এবং ধিকৃত। কিন্তু হে হাওয়া! তুমি যেভাবে বৃক্ষ হতে রক্ত ঝরিয়েছ, তেমনি তোমার থেকেও প্রত্যেক নতুন চন্দ্রে অর্থাৎ প্রত্যেক মাসে রক্ত বের হবে। আর হে সাপ! আমি তোর পা কেটে দিলাম, সুতরাং বুক দিয়ে চলাচল করবে। যেই তোর নিকটবর্তী হবে পাথর দিয়ে তোর মাথা ভেঙ্গে দেবে। তোমরা বের হয়ে যাও, নেমে যাও পরস্পর পরস্পরের শত্রু হয়ে।

হযরত ইমাম আবূ জাফর (র.) বলেন, হযরত আদম (আ.) ও হযরত হাওয়া (আ.)-কে বেহেশত থেকে নামানোর ব্যাপারে যতগুলো হাদীস সাহাবায়ে কিরাম (রা.) এবং তাবেঈন (র.) হতে বর্ণিত হয়েছে, তন্মধ্যে ঐসব হাদীসই সর্বোত্তম, যার সাথে কুরআনের কথার মিল ও সাদৃশ্য রয়েছে। অধিকন্তু শয়তান যেই শক্তিতে আদম (আ.) এবং হাওয়া (আ.)-এর নিকট পৌঁছেছিল তা আল্লাহ প্রদত্ত শক্তি। যেন আদম (আ.) এবং তাঁর সন্তান-সন্ততি থেকে পরীক্ষা নেয়া যায়। কারণ শয়তান আদম সন্তানের কাছে ঘুম ও জাগ্রত সবাস্থায় আসতে থাকবে। যেন সে নিজের মনোবাঞ্ছা পূরণ করতে পারে তাদেরকে গোনাহের প্রতি আহ্বান করবে। তাদের

Scanned with CamScanner

অন্তরে কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ ঢেলে দেবে, যা তারা দেখতে পাবে না। হযরত ইমাম কাসতলানী (র.) বলেন, শয়তান বেহেশতের দরজায় মন মাতানো গান গেয়েই আদম (আ.)-এবং হাওয়া (আ.)-কে কাছে টেনে ছিল। এরপর তারা শয়তানের কাছে গেলে শয়তান কাঁদতে শুরু করল। আল্লাহ তায়ালা বলেন- فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ তারা উভয়কে অর্থাৎ হযরত আদম (আ.) এবং হাওয়া (আ.)কে শয়তান কুমন্ত্রণা দিয়ে তাদেরকে বেহেশত হতে বের করে দিল। আল্লাহ তায়ালা আরো বলেন, হে আদম সন্তান! শয়তান যেন তোমাদেরকে ফসাদে বা বিপাকে না ফেলে, যেমনটি তোমাদের পিতা-মাতাকে ধোকা দিয়ে জান্নাত হতে বের করেছিল। তাদের কাপড়-চোপড় সব ছিনিয়ে নিয়েছিল। শয়তান তোমাদেরকে দেখে, যদিও তোমরা তাদেরকে দেখতে পাওনা। আমি শয়তানকে কাফিরদের বন্ধু বানিয়েছি। আল্লাহ তায়ালা তার নবী (সা.) কে বলেন - قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ مَلِكِ النَّاسِ الخ হে মুহাম্মদ (সা.) আপনি বলুন আমি মানুষের রবের সাহায্যে পানাহ চাচ্ছি। যিনি মানুষের বাদশাহ। মানুষের ইলাহ।

রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন, শয়তান মানুষের শরীরের রক্তের মতো প্রবাহিত হয়। হযরত ইবনে ইসহাক (র.) বলেন, আল্লাহ তায়ালা শয়তানকে বলেছিলেন, তুমি এখান থেকে অবতরণ কর। এখান থেকে অহংকার করবে তা হতে পারে না। তুমি নেমে যাও। তুমি নিকৃষ্টদের অন্তর্গত। আদম (আ.) এবং হাওয়া (আ.) এর কাছে গেল এবং তাদের সাথে কথা বলল। যেমন আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন। "শয়তান আদম (আ.)-কে কুমন্ত্রণা দিয়েছিল। বলেছিল হে আদম! আমি কী তোমাকে এমন এক বৃক্ষের সন্ধান দেব, যার ফল খেলে চিরজীবি এবং বাদশাহ হবে, যা কখনো নষ্ট হবে না।" এভাবেই আদমের সন্তান-সন্ততিকে শয়তান ধোঁকা দেয়, অথচ শয়তানকে দেখা যায় না।

فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ

অতঃপর শয়তান হযরত আদম (আ.) এবং হযরত হাওয়া (আ.) -কে জান্নাত থেকে বের করেছিল। অথচ তারা দু'জনেই জান্নাতের অসীম নিয়ামত স্বাচ্ছন্দ্যে ভোগ করছিলেন। এখানে জান্নাত থেকে বের করার কথাটি শয়তানের দিকে এজন্য করা হয়েছে যেহেতু শয়তানই হল কারণ, অন্যথায় বের করার আসল মালিক হচ্ছেন আল্লাহ তায়ালা।

قُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ

আমি বললাম তোমরা অবতরণ কর। তোমরা পরস্পর শত্রু। এ কথা থেকে অবহিত হওয়া যায় যে আদম, হাওয়া (আ.) এবং শয়তানের এ অবতরণ একই সময় হয়েছিল। কারণ আল্লাহ তায়ালা তাঁদেরকে সংবাদ দেয়ার ক্ষেত্রে বহুবচন ব্যবহার করেছেন। এখানে বলা হয়েছে। اهبطوا যা বহুবচনের ক্ষেত্রে ব্যবহার হয়। আদম (আ.) এবং হাওয়া (আ.)-এর পদস্খলনের পর অবতরণের ক্ষেত্রে ইবলীসকেও অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

হযরত আবু সালেহ (রা.) থেকে বর্ণিত اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ এর অর্থ আদম (আ.), হাওয়া (আ.), ইবলীস এবং সাপ হযরত সুদ্দী (রা.) হতে বর্ণিত তিনি এ আয়াত প্রসঙ্গে বলেন, সাপকে লানত দেয়া হল, পা কেটে দেয়া হল, পেটের উপর

ভর করে চলতে হল, আর আল্লাহ মাটিতে তার রিযক নির্ধারণ করলেন। আদম (আ.); হাওয়া (আ.), ইবলীস এবং সাপের অবতরণ হয়। আর হযরত মুজাহিদ (র.) বলেন, اهبطوا শব্দের সম্বোধন আদমের সন্তান এবং ইবলীসের সন্তানদের প্রতি করা হয়েছে।

وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ

জমিনকে তোমাদের জন্য বিছানা এবং ঠিকানা বানানো হয়েছে। আর হযরত সুদ্দী (র.) বলেন, وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ এর অর্থ এ জমিনেই হবে তোমাদের কবর। এ আনন্দ ফূর্তি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত অর্থাৎ মৃত্য আসা পর্যন্ত করবে। আরবদের পরিভাষায় متاع শব্দের অর্থ আনন্দ ও খুশীতে জীবনধারা পরিচালিত হওয়া।

فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ

অর্থাৎ আল্লাহ তায়ালা তওবার শব্দাবলী শিখিয়ে দেন। হযরত আদম (আ.) তওবা করেন এবং আল্লাহ তায়ালা তওবা কবুল করেন। হযরত ওহব (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, ইবনে যায়েদ (রা.)-বলেন, আল্লাহ তায়ালা হযরত আদম (আ.) এবং হযরত হাওয়া (আ.)-কে তওবা করার জন্য যে আয়াত শিক্ষা দিয়েছিলেন, তা হচ্ছে-

رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ -

"হে আমাদের প্রতিপালক, আমরা নিজের উপর অবিচার করেছি। যদি আপনি আমাদেরকে ক্ষমা না করেন এবং আমাদের প্রতি দয়া না করেন তা হলে আমরা ক্ষতিগ্রস্থদের অন্তর্ভুক্ত হবো।" (সূরা ঃ আ'রাফ-২৩)

যে সব শব্দমালা আল্লাহ তায়ালার পক্ষ হতে হযরত আদম (আ.) লাভ করেছিলেন, তা নিয়ে তাফসীরকারীদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে।

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন- فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ এ আয়াতে আল্লাহ যে কলিমার কথা বলেছেন তা হল আদম বললেন- হে রব! আপনি কী আমাকে আপনার হাত দিয়ে সৃষ্টি করেন নি? আল্লাহ বলেন, হ্যাঁ। আদম বলেন, হে রব, আপনি কি আপনার রূহ হতে আমাতে ফুঁক দেননি? আল্লাহ বলেন, হ্যাঁ, আদম (আ.) বলেন হে রব! আপনি কী আমাকে আপনার বেহেশতে রাখেন নি? আল্লাহ বলেন হ্যাঁ। আদম বলেন, হে রব! আপনার রহমত কী আপনার গজবের উপর অগ্রাধিকার পাবে না? আল্লাহ বলেন হ্যাঁ। তারপর আদম বলেন- যদি আমি তওবা করি এবং সংশোধন হই তবে আপনি কি আমাকে জান্নাতে ফিরিয়ে নেবেন। আল্লাহ বলেন হ্যাঁ। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন- فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ এর মর্মকথা হচ্ছে এ উপরোক্ত কথাগুলোই।

হযরত সুদ্দী (রা.) বলেন- فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ এর অর্থ- হযরত আদম (আ.) বলেন, আপনি কি আপনার হাতেই আমাকে পয়দা করেননি? আল্লাহ বলেন হ্যাঁ!। আদম বললেন আপনি কী আমাকে আপনার রূহ থেকে ফুঁক দেননি? আল্লাহ বলেন হ্যাঁ। তারপর বলেন, আপনার রহমত কি আপনার রাগের উপর অগ্রাধিকার পাবেনা? আল্লাহ বলেন হ্যাঁ। আদম (আ.) বলেন, হে রব আপনি কী আমার জন্য ইহা লিখে রেখেছিলেন? আল্লাহ বলেন হ্যাঁ। আবার বলেন- হে রব! আমি যদি তওবা করি, সংশোধন হয়ে যাই তখন কি আমাকে জান্নাতে ফিরিয়ে নেবেন? আল্লাহ বলেন হ্যাঁ, যেমন আল্লাহ বলেন-١٢٢ ـطه ثُمَّ اجْتَبَاهُ رَبُّهُ فَتَابَ عَلَيْهِ وَهَدَىٰ ـ

Scanned with CamScanner

অতঃপর তার রব তাকে মনোনীত করলেন, তার তওবা কবুল করলেন এবং হিদায়ত দান করলেন। (ত্বা-হা-১২২)

হযরত উবাইদ বিন উমাইর (রাঃ) থেকে বর্ণনা করা হয়। তিনি বলেন, হযরত আদম (আ.) বলেন, হে রব! আমি যেই দোষ করেছি, তা কি আমার জন্মের পূর্বেই লিখে রাখা হয়েছিল ? না কি আমি নিজেই তা গঠন করেছি ? আল্লাহ বললেন আমি তোমার জন্মের আগেই এ দোষ তোমার জন্য লিখে রেখেছিলাম। তারপর হযরত আদম (আ.) বলেন, যখন আমার জন্মের আগেই লিখে রেখেছিলেন, তাহলে আমাকে ক্ষমা করে দিন। তিনি বলেন এই হচ্ছে- فَتَلَقَّى اٰدَمُ مِنْ رَّبِّهٖ كَلِمٰتٍ এর মূল ভাবার্থ।

হযরত আবদুর রহমান বিন জিদ বিন মুয়াবিয়া (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন- فَتَلَقَّى اٰدَمُ مِنْ رَّبِّهٖ كَلِمٰتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ এর ভাবার্থ হচ্ছে এ রকম- হযরত আদম (আ.) বলেন, হে আল্লাহ! আপনি ছাড়া কোন মাবুদ নেই, আপনি পবিত্র, সমস্ত প্রশংসা আপনার, আমি আপনারই সমীপে ক্ষমা প্রার্থনা করছি, আপনারই নিকট তওবা করছি। আপনি আমার তওবা কবুল করুন। নিশ্চয় আপনি তওবা গ্রহণকারী এবং দয়ালু।

হযরত মুজাহিদ (র.) বলেন فَتَلَقَّى اٰدَمُ مِنْ رَّبِّهٖ كَلِمٰتٍ এর অর্থ হল- আদম (আ.) বলেন, হে আল্লাহ! আপনি ব্যতীত আর কোন মাবুদ নেই। আপনি পবিত্র, সমস্ত প্রশংসা আপনারই। পরওয়ারদেগার! আমি আমার উপর জুলুম করেছি। কিন্তু আপনি ক্ষমাশীল। আপনিই সর্বোত্তম ক্ষমাকারী।

فَتَابَ عَلَيْهِ এর অর্থ হল, অপছন্দনীয় জিনিষ ত্যাগ করে আল্লাহ তায়ালার আনুগত্য স্বীকার ও বরণ করা।

اِنَّهٗ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ অবশ্যই তিনিই তওবা গ্রহণকারী, মেহেরবান, ঐসব লোকদের প্রতি যারা লজ্জবোধ করে ও অনুতপ্ত হয়।

قُلْنَا اهْبِطُوْا مِنْهَا جَمِيْعًا আল্লাহ তায়ালা বলেন, আমি বললাম, তোমরা সকল অর্থাৎ হযরত আদম (আ.), হযরত হাওয়া (আ.), সাপ এবং ইবলীস জান্নাত হতে নেমে পড়।

অবশ্যই আমি তোমাদের কাছে হিদায়তের বাণী আসবে। যে আমার দেয়া জীবন বিধান অনুসরণ করে চলবে তার জন্যে কোন ভয় নেই, কোন চিন্তা নেই। অর্থাৎ তোমাদের কাছে আমার নির্দেশ, আনুগত্য, আমার পথের সন্ধান এবং আমার ধর্মের বাণী আসবে। সুতরাং তোমরা তা মেনে চললে তোমাদের কোন ভয় ও চিন্তা নেই।

خوف হচ্ছে কোন মুসিবত আসতে পারে তার জন্য ভয় হওয়া আর حزن হল অতীত হয়ে গেছে এমন কোন জিনিষের জন্য চিন্তিত হওয়া।

وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَكَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا اُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ النَّارِ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ

অর্থ হল- যে লোক আমার প্রেরিত কুরআনের আয়াতকে অস্বীকার করে এবং মিথ্যা বলে, তারা দুযখী। তারা সর্বদা দুযখে থাকবে। অর্থাৎ যারা আল্লাহ তায়ালার একত্ববাদ, প্রভুত্ব আর রাসূলুল্লাহ (সা.)-কে মিথ্যা বলে তারা সর্বদা দুযখে থাকবে। অর্থাৎ অনির্দিষ্টকালের জন্য দুযখে পুড়তে থাকবে।

عن ابي سعيد الخدريؓ قال قال رسول الله صلي الله عليه وسلم اما اهل النار الذين هم

اهلها فانهم لا يموتون فيها ولا يحيون ولكن اقواما اصابتهم

হযরত আবু সাইদ খুদী (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন, দুযখী লোকেরা মরবেওনা, বাঁচবেও না। বরং জ্বলে অঙ্গার হয়ে যাবে। তখন শাফায়তের ইজাযত বা অনুমতি প্রদান করা হবে।

يٰبَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ اذْكُرُوْا نِعْمَتِيَ الَّتِيْٓ اَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَاَوْفُوْا بِعَهْدِيْٓ اُوْفِ بِعَهْدِكُمْ ۚ وَاِيَّايَ فَارْهَبُوْنِ ﴿٤٠﴾ وَاٰمِنُوْا بِمَآ اَنْزَلْتُ مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُوْنُوْٓا اَوَّلَ كَافِرٍ بِهٖ ۠ وَلَا تَشْتَرُوْا بِاٰيٰتِيْ ثَمَنًا قَلِيْلًا ۠ وَّاِيَّايَ فَاتَّقُوْنِ ﴿٤١﴾ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَاَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ﴿٤٢﴾ وَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ وَارْكَعُوْا مَعَ الرّٰكِعِيْنَ ﴿٤٣﴾ اَتَاْمُرُوْنَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ اَنْفُسَكُمْ وَاَنْتُمْ تَتْلُوْنَ الْكِتٰبَ ۭ اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ ﴿٤٤﴾ وَاسْتَعِيْنُوْا بِالصَّبْرِ وَالصَّلٰوةِ ۭ وَاِنَّهَا لَكَبِيْرَةٌ اِلَّا عَلَي الْخٰشِعِيْنَ ﴿٤٥﴾ اَلَّذِيْنَ يَظُنُّوْنَ اَنَّهُمْ مُّلٰقُوْا رَبِّهِمْ وَاَنَّهُمْ اِلَيْهِ رٰجِعُوْنَ ﴿٤٦﴾

৪০. হে বনী ইসরাঈল! আমার সেই অনুগ্রহকে তোমরা স্মরণ কর যদ্বারা আমি তোমাদেরকে অনুগৃহীত করেছি এবং আমার সঙ্গে তোমার অঙ্গীকার পূর্ণ কর, আমিও তোমাদের সঙ্গে আমার অঙ্গীকার পূর্ণ করব। আর তোমাদের শুধু আমাকেই ভয় কর।

৪১. আমি যা অবতীর্ণ করেছি তোমরা তাতে ঈমান আন। ইহাতে তোমাদের নিকট যা আছে তার প্রত্যয়নকারী। আর তোমরাই এর প্রথম প্রত্যাখ্যান কারী হবে না এবং আমার আয়াতের বিনিময়ে তুচ্ছ মূল্য গ্রহণ করো না। তোমরা শুধু আমাকেই ভয় কর।

৪২. তোমরা সত্যকে মিথ্যার সাথে মিশ্রিত করও না এবং জেনে শুনে সত্য গোপন করো না।

৪৩. তোমরা নামায কায়েম কর ও যাকাত দাও এবং যারা রুকু করে তাদের সাথে রুকু কর।

৪৪. তোমরা কি মানুষকে সৎ কার্যের নির্দেশ দাও, আর নিজদেরকে বিস্মৃত হও! অথচ তোমরা কিতাব অধ্যয়ন কর। তবে কি তোমরা বুঝ না ?

Scanned with CamScanner

৪৫. তোমরা ধৈর্য্য ও নামাযের মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনা কর এবং এটা বিনীতগণ ব্যতীত আর সকলের নিকট নিশ্চিতভাবে কঠিন।

৪৬. তারাই বিনীত যারা বিশ্বাস করে যে, তাদের প্রতিপালকের সাথে নিশ্চিতভাবে তাদের সাক্ষাতকার ঘটবে এবং তাঁরই দিকে তারা ফিরে যাবে।

يٰبَنِيْ اِسْرَائِيْلَ

অর্থাৎ হে ইয়াকুব বিন ইসহাক ইবনে ইব্রাহীম খলীলুর রহমানের সন্তান! اِسْرَائِيْل শব্দের অর্থ عبدالله যেহেতু اسر শব্দের অর্থ বান্দাহ বা গোলাম আর ايل শব্দের অর্থ আল্লাহ يا بني اسرائيل শব্দের অর্থ আল্লাহর বান্দাহ। يٰبَنِيْ اِسْرَائِيْلَ বলে যেইখানেই আহ্বান করা হয়েছে, সেইখানে ধরে নিতে হবে, আহলে কিতাব ইহুদীদেরকে সম্বোধন করা হয়েছে।

اذْكُرُوْا نِعْمَتِيَ الَّتِيْ اَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ

তোমরা আমার দেয়া নেয়ামতের কথা স্মরণ কর। তাদের প্রতি আল্লাহর নিয়ামতের মধ্যে আছে- তাদের মধ্য হতে নবী প্রেরণ করা, কিতাব অবতীর্ণ করা, ফিরাউনের কওমের মুসীবত হতে রক্ষা করা, সুন্দর জমিন প্রদান করা, পাথর হতে পানির নহর প্রবাহিত করা, আসমানী খাবার من و سلوى প্রদান করা। এ কারণেই তাদের বংশধরকে আল্লাহ তায়ালা নির্দেশ দেন এ বলে যে, তোমাদের পূর্ববর্তীদেরকে যে নিয়ামত এবং ইহসান করা হয়েছিল, তা ভুলে যেওনা এবং কুফরী করনা। প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ তায়ালা যেই নিয়ামতের কথা উল্লেখ করলেন, তাই অগ্রগণ্য। যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন-

وَاِذْ قَالَ مُوْسٰى لِقَوْمِهٖ يٰقَوْمِ اذْكُرُوْا نِعْمَةَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ اِذْ جَعَلَ فِيْكُمْ اَنْبِيَآءَ وَجَعَلَكُمْ مُّلُوْكًا وَّاٰتٰكُمْ مَّا لَمْ يُؤْتِ اَحَدًا مِّنَ الْعٰلَمِيْنَ

"হযরত মূসা (আ.) নিজের কওমকে বলে দিলেন হে কাওম! তোমরা আল্লাহ তায়ালার নিয়ামতকে স্মরণ কর, যা তোমাদেকে দিয়েছিলেন। যেমন তোমাদের থেকে নবী প্রেরণ করেছেন, তোমাদেকে রাজত্ব দিয়েছেন। আর তোমাদেরকে এমন নিয়ামত দান করেছেন যা দুনিয়ার অন্য কাউকে দান করেননি।" (সূরা ঃ মায়িদা-২০)

وَاَوْفُوْا بِعَهْدِيْ اُوْفِ بِعَهْدِكُمْ

তোমাদের থেকে যেই প্রতিজ্ঞা নেয়া হয়েছে তা তোমরা পূরণ কর, আমিও তোমাদেরকে দেয়া ওয়াদা পূরণ করব। এখানে عهد الله এর মর্মবাণী হচ্ছে, যে প্রতিশ্রুতি আল্লাহ তায়ালা বনি ইসরাঈল হতে তৌরাতের মধ্যে নিয়েছিলেন। তওরাত কিতাবের মাধ্যমে, হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর আবির্ভাবের পূর্বাভাস তাদেরকে দেয়া হয়েছিল, বিভিন্ন সংকেতের কথা তাদের কাছে উল্লেখ করা হয়েছিল যেন তারা হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর উপর ঈমান আনেন, তাঁর শরীয়ত অনুযায়ী চলেন, اوف بعهدكم এর অর্থ আমি এর বিনিময়ে তোমাদেরকে জান্নাতে প্রবেশ করাব। যেভাবে আল্লাহ তায়ালা বলেন-

وَلَقَدْ اَخَذَ اللّٰهُ مِيْثَاقَ بَنِيْٓ اِسْرَائِيْلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيْبًا

"আল্লাহ তায়ালা বনি ইসরাইল হতে ওয়াদা নিয়েছিলেন এবং তাদের মধ্য হতে

বারজন শীর্ষ স্থানীয় লোক পাঠালাম।" (সূরা ঃ মায়িদা-১২)

অন্যত্র বলেন- فَسَاَكْتُبُهَا لِلَّذِيْنَ يَتَّقُوْنَ وَيُؤْتُوْنَ الزَّكٰوةَ وَالَّذِيْنَ هُمْ بِاٰيٰتِنَا يُؤْمِنُوْنَ الَّذِيْنَ يَتَّبِعُوْنَ الرَّسُوْلَ النَّبِيَّ الْاُمِّيَّ

"অর্থাৎ আল্লাহ তায়ালা বলেন, আমি সত্বর এসব কিছু লিখে রাখব, যারা আল্লাহকে ভয় করে যাকাত আদায় করে, আর তারা আমার নিদর্শন সমূহ বিশ্বাস করে। যাঁরা নবীয়ে উম্মীর অনুসরণ করে।" (সূরা ঃ আ'রাফ-১৫৬)

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি اَوْفِ بِعَهْدِكُمْ এর তাফসীর করতে গিয়ে বলেন- তোমরা যদি মুহাম্মদ (সা.)-কে সত্য বলে মেনে নাও, আর তাঁর অনুসরণ কর, তা হলে আমি তোমাদের সাথে যেই ওয়াদা করেছি, তা পূরণ করব। অর্থাৎ তোমাদের আমলের কারণে তোমাদের ঘাড়ে যে বেড়ী পরিয়ে দেয়া হয়েছে তা সরিয়ে দেব।

وَاِيَّايَ فَارْهَبُوْنِ

আল্লাহ তায়ালার প্রেরিত রাসূলগণকে অস্বীকার করার কারণে তোমাদের পূর্ববর্তীদের উপর যেই শাস্তি পৌছেছিল, তা থেকে তোমরা বেঁচে থাক ও ভয় কর।

وَاٰمِنُوْا بِمَآ اَنْزَلْتُ مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَكُمْ

আর বিশ্বাস কর ঐ সবকিছু যা আমি মুহাম্মদ (সা.) এর উপর অবতীর্ণ করেছি এটা তোমাদের উপর যা নাযিল হয়েছিল তাকেও সত্যায়িত করে।

হে বনি ইসরাঈল। তোমাদের তওরাতকে সত্যয়নকারী কুরআন যা হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর উপর নাযিল করেছি, তার প্রতি বিশ্বাস কর। (অন্য রিওয়ায়তে তওরাত এবং ইঞ্জিল দুটিরই উল্লেখ আছে।)

কারণ কুরআনকে বিশ্বাস করলেই তওরাত এবং ইঞ্জিল যে সত্য, তা স্পষ্ট হয়। আর কুরআনকে মিথ্যা বললে তওরাত আর ইঞ্জিলেরও সত্যতা প্রমাণ হয় না। অধিকন্তু এসব লোকেরা তওরাত আর ইঞ্জিলে মহানবী (সা.)-এর অবস্থা সমূহের কথা লিখিতভাবে পেয়েছে।

وَلَا تَكُوْنُوْٓا اَوَّلَ كَافِرٍ بِهٖ

তোমরাই প্রথম কুরআনকে অস্বীকারকারী হয়োনা কারণ তোমাদের কাছে কুরআন সম্পর্কে যে জ্ঞান রয়েছে, তা অন্য কারো কাছে নেই।

وَلَا تَشْتَرُوْا بِاٰيٰتِيْ ثَمَنًا قَلِيْلًا

তোমরা এ কুরআনের বিনিময়ে অন্য কোন কিছু গ্রহণ করনা। তোমরা সাময়িক আনন্দ উপভোগের জন্য কুরআনকে বিক্রি করনা এবং আল্লাহ তায়ালার নামকে গোপন কর না। হযরত আবূ আল আলীয়া বলেন- তোমরা মানব সমাজকে হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর নির্দেশাবলী অর্থাৎ শরিয়ত সম্পর্কে বল এবং এর পরিবর্তে কোন বিনিময় গ্রহণ করনা।

وَاِيَّايَ فَاتَّقُوْنِ

তোমরা এ ব্যাপারে আমাকে ভয় কর। অর্থাৎ আমি যা আমার রাসূলের উপর নাযিল করেছি, তা তোমরা অস্বীকার করার মাধ্যমে এবং নবুওয়তে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর

Scanned with CamScanner

বিরোধিতা করার মাধ্যমে তোমরা আমার প্রেরিত আয়াতসমূহ বিক্রি কর না সামান্য জিনিষের বিনিময়ে। তোমরা এসব বিষয়ে আমাকে ভয় কর।

وَلَاتَلْبِسُوْا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ

তোমরা সত্যকে মিথ্যা দিয়ে মিশ্রিত কর না। মুনাফিকরা প্রকাশ্যে হযরত মুহাম্মদ কে সত্য বলত; কিন্তু গোপনে কুফর লুকিয়ে রাখত। তারা বলত, মুহাম্মদ (সা.) নবী সত্য, কিন্তু আমাদের জন্য নয়, অন্যান্য লোকদের জন্য নবী হয়ে প্রেরিত হয়েছেন। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, وَلَاتَلْبِسُوْا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ এর অর্থ সত্যকে মিথ্যার সাথে মিশ্রিত কর না। হযরত ইবনে যায়দ (রা.) বলেন, হক্ব حـــق শব্দের অর্থ হল তৌরাত, যা হযরত মূসা (আ.)-এর উপর নাযিল হয়েছিল। আর بـــاطـل শব্দ দ্বারা তারা তৌরাতে নিজ হাতে যা লিখে দিয়েছিল, তার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে।

وَتَكْتُمُوْا الْحَقَّ وَاَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ

এ আয়াত সম্পর্কে হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, এ বাক্যটি উপরের বাক্যের উপর عطف হয়েছে। তাই এর পূর্ণ বাক্য হবে وَلَاتَكْتُمُوْا الْحَقَّ وَاَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ অর্থাৎ তোমরা জেনে শুনে সত্য গোপন করনা। হযরত আবুল আলীয়া (র.) বলেন, প্রথম نهـى এবং দ্বিতীয় বাক্য جـملة خـبرية অর্থাৎ তারা হযরত মুহাম্মদ (সা.) যে বাক্য রাসূল হয়ে আবির্ভূত হয়েছেন, তা জানা সত্ত্বেও গোপন করে। হযরত মুজাহিদ (র.) আল্লাহ তায়লার বাণী-وَتَكْتُمُوْا الْحَقَّ وَاَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ সম্পর্কে বলেন, আহলে কিতাবগণ হযরত মুহাম্মদ (সা.) আল্লাহ তায়ালার রাসূল, তা জানা সত্ত্বেও তা গোপন করে; অথচ তারা তওরাত এবং ইঞ্জিলের মাধ্যমে তাঁর নবুওয়তের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে সম্পূর্ণ ওয়াকেফহাল কারণ তওরাতে উল্লেখ আছে যে, হযরত মুহাম্মদ (সা.) সমস্ত উম্মতের জন্যেই রাসূল হয়ে প্রেরিত হয়েছেন আর তোমরা বলছ কিছু সংখ্যক গোত্রের জন্যই তিনি রাসূল হয়ে এসেছেন। অথচ আমি তোমাদের কিতাবের মাধ্যমে মুহাম্মদ (সা.)-এর উপর ঈমান আনার জন্য তোমাদের থেকে ওয়াদা নিয়েছি।

وَاَقِيْمُوْا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ وَارْكَعُوْا مَعَ الرّٰكِعِيْنَ

তোমরা নামায প্রতিষ্ঠা কর, যাকাত আদায় কর এবং জামাতের সাথে নামায আদায় কর। হযরত আবু জাফর (র.) বলেন, এখানে ইহুদীও মুনাফিক সম্পর্কে বলা হয়েছে। তারা নিজে অন্যকে বলত নমায প্রতিষ্ঠা কর, যাকাত আদায় কর, অথচ নিজেরা তা করত না। এ কারণে আল্লাহ তায়ালা আদেশ করেন, যেন তারা মুসলমান ও বিশ্বাসীদের সাথে নামায আদায় করে। অর্থাৎ যারা হযরত মুহাম্মদ (সা.)-কে এবং আল্লাহ তায়ালা তাঁর মাধ্যমে যা প্রেরণ করেছেন তা মনে প্রাণে বিশ্বাস করে, তাদের সাথে নামায আদায় কর। তাদের সাথেই তোমাদের মালের যাকাত আদায় কর। তারা যেভাবে আল্লাহ এং রাসূল (সা.)-কে ভয় করে, তমনি তোমরাও ভয় কর।

ইকামতে সালাত এর বর্ণনা পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। যাকাত শব্দের অর্থ মালকে পবিত্র করা আর রুকু শব্দের অর্থ ভয় করা ও নম্রভাবে পেশ হওয়া।

اَتَاْمُرُوْنَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ اَنْفُسَكُمْ وَاَنْتُمْ تَتْلُوْنَ الْكِتٰبَ اَفَلَا

تَعْقِلُوْنَ

তোমরা অন্যকে ভাল কাজের নির্দেশ দাও কিন্তু নিজে তা করতে ভুলে যাও। অথচ তোমরা কিতাব পাঠ কর। তা হলে কি তোমরা বুঝনা?

আল্লাহ তায়ালার আনুগত্য করাকেই بـــــر বলা হয়। তোমরা কি মানুষকে আল্লাহ তায়ালার রাসূল (সা.)-কে বিশ্বাস করতে এবং দ্বীনে মুহাম্মদীতে প্রবেশ করতে বল অপরদিকে নিজেরাই তা ভুলে যাও ? অথচ তোমরা কিতাব পাঠ কর, তোমরা কী তা বোঝ না? অর্থাৎ তোমরা মানুষকে এমন কথা ও কাজের নির্দেশ দাও, যেখানে আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টি নিহিত রয়েছে। আর তোমরা নিজেরা কিতাব পাঠ কর অথচ তদানুযায়ী আমল করনা।

وَاسْتَعِيْنُوْا بِالصَّبْرِ وَالصَّلٰوةِ

আর তোমরা নামায এবং রোযার মাধ্যমে আমার কাছে সাহায্য প্রার্থনা কর। অর্থাৎ আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে ধৈর্য্য ধারনের জন্যে বলেন, সবরের আসল অর্থ হল নফস যা চায় তা থেকে নফসকে নিষেধ করা, প্রবৃত্তিকে তার ইচ্ছে থেকে বিরত রাখা। এজন্য বিপদে ধৈর্য্য ধারণ করাকে সবর বলে। তা ছাড়া রমযান মাসকে সবরের মাস বলা হয়, যেহেতু রোজাদার দিনে খাওয়া দাওয়া ও পান করা থেকে বিরত থাকে। আর সালাত শব্দের অর্থ আগেই বলা হয়েছে। হযরত হুজাইফা (রা.) থেকে বর্ণিত- قال كان رسول الله صلي الله عليه وسلم اذا حذبه أمر فزع الي الصلوة অর্থাৎ তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর কাছে যখন কোন কাজ কঠিন হত, তখন তিনি নামাযের আশ্রয় নিতেন অথাৎ নামাযের মাধ্যমে আল্লাহ তায়ালার নিকট এর সমাধান প্রার্থনা করতেন।

وَاِنَّهَا لَكَبِيْرَةٌ اِلَّا عَلَى الْخٰشِعِيْنَ

হে আহলে কিতাব! তোমরা সাহায্য কামনা কর। নিজেদেরকে আল্লাহ তায়ালার আনুগত্যে নিমগ্ন ও নিমজ্জিত করে রাখ। নিজেকে গোনাহ ও আল্লাহ তায়ালার নাফরমানী করা থেকে নিবৃত্ত রাখ। নামায কায়েম কর, নামায অশ্লীল, অপছন্দনীয় ও গর্হিত কাজ থেকে দূরে রাখে, নামায আল্লাহ তায়ালার সান্নিধ্য অর্জনের সোপান। এ নামায খুবই কঠিন কাজ; কিন্তু যারা আল্লাহর আনুগত্যে নিবেদিত এবং আল্লাহকে ভয় করে, তাদের কাছে কঠিন নয় বরং নামায আদায় করে তারা আনন্দ পায় এবং নামায আদায় করার জন্যে সদা আগ্রহ প্রকাশ করে। অর্থাৎ সবর এবং নামাযের মাধ্যমে সাহায্য চাওয়া অবশ্যই কঠিন; কিন্তু খোদাভীরু লোকদের জন্য তা খুবই সহজ।

اَلَّذِيْنَ يَظُنُّوْنَ اَنَّهُمْ مُّلٰقُوْا رَبِّهِمْ

যাদের প্রগাঢ় ও দৃঢ় বিশ্বাস রয়েছে যে, তাঁরা নিজ রবের সাথে সাক্ষাৎ করবে। হযরত আবুল আলীয়া এবং হযরত মুজাহিদ কুরআন শরীফে যেখানেই ظـــن শব্দ ব্যবহার হয়েছে তার অর্থ 'ইয়াকীন' গ্রহণ করেছেন। হযরত মুজাহিদ (র.) এর অনুরূপ একটি মত রয়েছে। হযরত ইবনে জুরাইয (র.) ظـــن শব্দের অর্থ ইলম নিয়েছেন। এ অর্থ শুধু কুরআনের বেলায়। যেমন - الذين يظنون اي يعلمون اني ظننت اني ملاق حسيبه এখানে ظن শব্দের অর্থ علم নেয়া হয়েছে।

Scanned with CamScanner

وَاَنَّهُمْ اِلَيْهِ رٰجِعُوْنَ

নিঃ সন্দেহে এ লোক কিয়ামতের দিন আল্লাহ তায়ালার নিকট প্রত্যাবর্তন করবে। আর অন্য বর্ণনায় আছে- يرجعون শব্দের অর্থ يبعثون অর্থাৎ মৃত্যুর পর জীবিত হয়ে আল্লাহ তায়ালার নিকট প্রত্যাবর্তন করবেন।

يٰبَنِىْٓ اِسْرَاۤءِيْلَ اذْكُرُوْا نِعْمَتِىَ الَّتِىْٓ اَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَاَنِّىْ فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعٰلَمِيْنَ ﴿٤٧﴾ وَاتَّقُوْا يَوْمًا لَّا تَجْزِىْ نَفْسٌ عَنْ نَّفْسٍ شَيْـًٔا وَّلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَّلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَّلَا هُمْ يُنْصَرُوْنَ ﴿٤٨﴾ وَاِذْ نَجَّيْنٰكُمْ مِّنْ اٰلِ فِرْعَوْنَ يَسُوْمُوْنَكُمْ سُوْٓءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُوْنَ اَبْنَاۤءَكُمْ وَيَسْتَحْيُوْنَ نِسَاۤءَكُمْ ۭ وَفِىْ ذٰلِكُمْ بَلَاۤءٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ عَظِيْمٌ ﴿٤٩﴾ وَاِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَاَنْجَيْنٰكُمْ وَاَغْرَقْنَآ اٰلَ فِرْعَوْنَ وَاَنْتُمْ تَنْظُرُوْنَ ﴿٥٠﴾ وَاِذْ وٰعَدْنَا مُوْسٰٓى اَرْبَعِيْنَ لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْۢ بَعْدِهٖ وَاَنْتُمْ ظٰلِمُوْنَ ﴿٥١﴾ ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُمْ مِّنْۢ بَعْدِ ذٰلِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ ﴿٥٢﴾ وَاِذْ اٰتَيْنَا مُوْسَى الْكِتٰبَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُوْنَ ﴿٥٣﴾

৪৭. হে বনী ইসরাঈল! আমার সে অনুগ্রহকে স্মরণ কর যদ্বারা আমি তোমাদেরকে অনুগৃহীত করেছিলাম এবং বিশ্বে সবার উপরে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছিলাম।

৪৮. তোমরা সে দিনকে ভয় কর যে দিন কেউ কারও কোন কাজে আসবেনা, কারও সুপারিশ গ্রহণ করা হবে না, কারও নিকট হতে বিনিময় গৃহীত হবে না এবং তারা কোন প্রকার সাহায্যপ্রাপ্তও হবে না।

৪৯. স্মরণ কর, যখন আমি ফিরআওনী সম্প্রদায় হতে তোমাদেরকে নিষ্কৃতি দিয়েছিলাম, যারা তোমাদের পুত্রগণকে যবাই করে ও তোমাদের পুত্রগণকে জীবিত রেখে তোমাদেরকে মর্মান্তিক যন্ত্রণা দিত; এবং এতে তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ হতে এক মহাপরীক্ষা ছিল;

৫০. যখন তোমাদের জন্য সাগরকে দ্বিধাবিভক্ত করেছিলাম এবং তোমাদেরকে উদ্ধার করেছিলাম ও ফিরআওনী সম্প্রদায়কে নিমজ্জিত করেছিলাম আর তোমরা তা প্রত্যক্ষ করছিলে।

৫১. যখন মূসার জন্য চল্লিশ রাত্রি নির্ধারিত করেছিলাম, তার প্রস্থানের পর তোমরা তখন গোবৎসকে উপাস্যরূপে গ্রহণ করেছিলে; আর তোমরা তো যালিম।

৫২. এরপরও আমি তোমাদেরকে ক্ষমা করেছি যাতে তোমরা কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনকর।

৫৩. আর যখন আমি মূসাকে কিতাব ও ফুরকান দান করেছিলাম যাতে তোমরা হিদায়াত প্রাপ্ত হও।

يٰبَنِىْٓ اِسْرَاۤءِيْلَ اذْكُرُوْا نِعْمَتِىَ الَّتِىْٓ اَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَاَنِّىْ فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعٰلَمِيْنَ

হে, বনী ইসরাঈলগণ! আমি তোমাদেরকে যে নিয়ামত দিয়েছি, তা স্মরণ কর। আমি তোমাদেরকে মর্যাদাবান করেছিলাম তোমাদের সমসাময়িক কালের লোকদের উপর। অন্য স্থানে আল্লাহ তায়ালা বলেন-

وَلَقَدِ اخْتَرْنٰهُمْ عَلٰى عِلْمٍ عَلَى الْعٰلَمِيْنَ

"আমি যেনে শুনে তাদেরকে বিশ্বে শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছিলাম।" (সূরা ঃ দুখান-৩২)

وَاتَّقُوْا يَوْمًا لَّا تَجْزِىْ نَفْسٌ عَنْ نَّفْسٍ شَيْـًٔا

তোমরা সেই দিনকে ভয় কর, যেই দিন কেউ কারো কাজে আসবেনা। আবার এভাবেও বলা জায়েজ আছে- আরবী পরিভাষায়। جزى ফায়সালা এবং ক্ষতিপূরণকে বলা হয়। অধিকন্তু পুরস্কার প্রদান করাকেও বলা হয়। অর্থাৎ তোমরা ভয় কর ঐ দিনকে যেই দিন কেউ কারো কাজে আসবেনা। এ সম্পর্কে হাদীস শরীফে বলা হয়েছে। يوم শব্দের দ্বারা বিচারের দিন এবং কিয়ামতের দিনকেই উদ্দেশ্য করা হয়েছে।

عن ابي هريرة قال رسول الله ﷺ رحم الله عبدا كانت عنده لاخيه مظلمة في عرض

হযরত আবু হুরাইরা (রা.) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন, আল্লাহ তায়ালা ঐ বান্দাকে রহম করুন, যার কাছে অন্য বান্দার পাওনা সংক্রান্ত কোন অবিচার হয়েছে। আবুবকর (রা.) এর বর্ণনায় আছে অথবা কারো কাছে মাল পাওনা রয়েছে, অথবা যে অপরের মর্যাদা হানি করেছে, সে তা পরিশোধ করতে হবে। তবে সেখানে কোন দীনার বা দিরহাম থাকবেনা। যদি তার পুণ্য থাকে, তবে পাওনাদারকে তা থেকে দেয়া হবে। যদি তার পুণ্য না থাকে, তা হলে পাওনাদারের গুনাহ তার উপর চাপিয়ে দেয়া হবে।

হযরত আবু জাফর (র.) বলেন, لا تجزى نفس عن نفس شيئا অর্থাৎ সেই দিন কেউ কারো সম্পর্ক হবেনা। সেইদিন শুধু নেকী এবং বদীর মানদন্ডে বিচার করা হবে।

وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ

এ আয়াতে বনি ইসরাঈলকে সম্বোধন করা হয়েছে। কারণ তারা বলত- আমরা সব আল্লাহর ছেলে ও মেয়ে এবং তার বন্ধু, আম্বিয়া (আ.)-এর আওলাদ। আল্লাহ তায়ালার নিকট আমাদের পিতাগণ আমাদের জন্য সুপারিশ করবেন। তাদের এ ভুল ধারণা সম্পর্কে বলতে গিয়ে আল্লাহ তায়ালা বলেন, কিয়ামতের দিন কেউ কারো উপকারে আসবেনা, সেই দিন কারো সুপারিশ গ্রহণ করা হবেনা। বরং সেই দিন

Scanned with CamScanner

প্রত্যেককে নিজ নিজ হক প্রদান করা হবে। যদিও এ আয়াতখানা আম কিন্তু মহানবী (সা.)-এর বানী অনুযায়ী তার মর্ম খাছ কারণ, হাদীস শরীফে আছে, মুমীন গোনাহগার বান্দাদের জন্যে আমাদের নবী মুহাম্মদ (সা.) সুপারিশ করবেন এবং এতে তার গোনাহ মাফ হয়ে যাবে। যেমন রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন-

شفاعتي لا هل الكبائر من امتي

মহানবী (সা.) আরও ইরশাদ করেন, প্রত্যেক নবীকে একটি দাবী প্রদান করা হয়েছে। আমি আমার উম্মতের জন্য শাফায়তকে গ্রহণ করেছি।

وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ

তাদের থেকে কোন বিনিময় গ্রহণ করা হবে না। যেমন আল্লাহ তায়ালার বাণী- وَإِنْ تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلٍ لَا يُؤْخَذْ مِنْهَا "অর্থাৎ যদি তারা জগতের সব কিছুই বিনিময় হিসেবে দিতে চায় তবুও তাদের কাছ থেকে বিনিময় গ্রহণ করা হবেনা।" (সূরা আনআম-৭০) হযরত ইবনে যায়দ (র.) বলেন, তাদের কাছ থেকে কোন বিনিময় গ্রহণ করা হবেনা। তিনি আরো বলেন, তারা যদি জমিন ভরা স্বর্ণও দিতে চায়, তবুও তা বিনিময় হিসেবে গ্রহণ করা হবেনা। তাদের যা কিছু আছে, তা নিয়ে আসলেও গ্রহণ করা হবেনা।

وَلَا هُمْ يُنْصَرُوْنَ

অর্থাৎ সেই দিন তাদের কল্যাণার্থে কোন সাহায্যকারী হবে না, যখন তাদেরকে শাস্তি দেয়া হবে, তখন আল্লাহর শাস্তি থেকে রক্ষা করতে তাদের সাহায্যে কেউ এগিয়ে আসবেনা।

وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ

فعل عطف হয়েছে পূর্ববর্তী আয়াত يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اذْكُرُوا نِعْمَتِيَ এর উপর। এখানে اذكروا উহ্য রয়েছে। অর্থ ঃ হে বনি ইসরাইল! তোমরা স্মরণ কর সেই সময়কে, যখন তোমাদেরকে ফিরআউনের নির্যাতন থেকে নাজাত দিয়েছিলাম। আয়াতের ভাবার্থ এরূপ- اذكروا اذ انجيناكم الخ আর ال আসলে اهل ছিল هـ কে همزه হামজা দিয়ে বদল করা হয়েছে এবং ال হয়েছে যার অর্থ দ্বীন কওম এবং অনুসরণ করা।

আরবরা পরিচিত কোন কিছু বুঝাতে ال ব্যবহার করে যেমন ال عبـــاس- ال داؤد ইত্যাদি। আর পরিচিত হলে اهل ব্যবহার করে যেমন- اهل بصرة- اهل المكة ইত্যাদি।

ফিরআউন মিশরের আমালিকা সম্প্রদায়ের বাদশাহগণের উপাধি, যেমন রোমের বাদশাহদের মধ্যে কতেককে কয়সর আবার কতেককে হিরাক্লিয়াস বলা হয়। পারস্যের বাদশাহকে كـــاســـرة বলা হয়। যার একবচন كـــسـري। ইয়ামনের বাদশাহকে তবাবেয়া বহুবচন, যার এক বচন تبـــع ব্যবহার করা হত। যে ফিরউনের আযাব হতে বনি ইসরাইলকে আল্লাহ তায়ালা নাজাত দিয়েছিলেন, তার নাম হল ওলিদ বিন মাসআব বিন রিয়ান। মুহাম্মদ বিন ইসহাক (র.) ও এভাবে রেওয়ায়ত করেন। এখানে পূর্ব পুরুষদের নিয়ামতকে পরবর্তীদের প্রতি সম্পৃক্ত করে বলা হয়েছে। আসলে যাদেরকে সম্বোধন করা হয়েছে, তাদেরকে ফেরউনের আযাব হতে নাজাত দেয়া হয়নি- যদিও এভাবে বলা হয়েছে- "যখন তোমাদেরকে ফেরউনের নির্যাতন থেকে নাজাত দেয়া হয়েছিল।"

يَسُوْمُوْنَكُمْ سُوْءَ الْعَذَابِ

তারা তোমাদেরকে খুবই নিকৃষ্টতম আযাব দিত। এ বাক্যকে স্বতন্ত্র সংবাদ মূলক বাক্য (خبر مستأنف) বলা হয়। এ জন্য এর ভাবার্থ এ রকম হবে- وكانوا من قبل

يَسُوْمُوْنَكُمْ سُوْءَ الْعَذَابِ অথবা يَسُوْمُوْنَكُمْ سُوْءَ الْعَذَابِ ব্যাকাংশ حال হয়েছে এবং এর আগের বাক্য ذوالحال তখন অর্থ এভাবে হবে- يسومونكم فانه يوردونكم ويذيقونكم ويولونكم سوء العذاب بمعنى ما ساء هم من العذاب

يُذَبِّحُوْنَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُوْنَ نِسَائَكُمْ

অর্থাৎ তোমাদের ছেলে সন্তানকে হত্যা করত এবং মেয়ে সন্তানকে জীবিত রাখত। এখানে জবেহকারী হচ্ছে আলে ফেরাউন যদিও নির্দেশ ফেরাউনের। কারণ কিসাস কাতিলের উপরই হয়ে থাকে। পূর্ণ ব্যাখ্যা হাদিসে উল্লেখ রয়েছে।

যেমন হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, ফেরাউন স্বীয় বৈঠকে আলোচনা করে যে, আল্লাহ তায়ালা হযরত ইব্রাহীম খলীলুল্লাহর সাথে ওয়াদা করেন তাঁরই বংশধর হতে আম্বিয়া এবং বাদশাহ পয়দা করবেন। তাই তারা একমত হল যে, ছুরি নিয়ে লোক জন বনি ইসরাইলের মাঝে ঘুরতে ঘুরতে যেইখানেই ছেলে সন্তান হয়েছে বলে খবর পাবে, তথায় গিয়ে তাকে সাথে সাথে হত্যা করে ফেলবে। এভাবে তারা করতে ছিল। অবশেষে তারা দেখল বৃদ্ধ হওয়ার কারনেও পুরুষ লোক মারা যাচ্ছে এবং বাচ্চা সন্তানকেও হত্যা করা হচ্ছে। এভাবে স্বল্প দিনেই সব লোক শেষ হয়ে যাবে, তখন তাদের নিজেদের কাজ কর্মও সেবা শুশ্রষা নিজ হাতেই করতে হবে। তাই সিদ্ধান্ত নেয়া হল- ছেলে সন্তানকে এক বছর জবেহ করা হবে আর এক বছর ছেড়ে দেয়া হবে অর্থাৎ জবেহ করা হবেনা। হযরত হারুনের (আ.) মাতা সে বছর হারুন (আ.)কে গর্ভে ধারণ করলেন, যেই বৎসর ছেলে সন্তান হত্যা করা হত না। তাই তিনি প্রকাশ্যে জন্ম নিলেন। পরবর্তী বৎসর মূসা (আ.)-কে গর্ভেধারণ করলেন-

এ প্রসঙ্গে হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, জ্যোতিষী ফেরাউনকে বলল, এ বৎসর যে সব ছেলে সন্তান হবে, তন্মধ্যে এক ছেলে তোমার উপর বাদশাহ হবে। একথা শুনে ফেরাউন তড়িৎ ব্যবস্থা নিল এবং প্রত্যেক দশজন মহিলার জন্য একজন পুরুষ নিয়োগ করে দিল। তাদেরকে বলা হল শহরের প্রত্যেক গর্ভবতী মহিলার প্রতি নযর রাখবে। তারা সন্তান ভূমিষ্ট করার পর দেখ ছেলে সন্তান জন্ম হয়েছে, না মেয়ে সন্তান। ছেলে সন্তান হয়ে থাকলে তাকে সাথে সাথে হত্যা করে ফেল, আর মেয়ে সন্তান হলে তাকে ছেড়ে দাও অর্থাৎ তাকে জবেহ কর না। এ কথার প্রতি ইংগিত দিয়েই আল্লাহ তায়ালা বলেন- يُذَبِّحُوْنَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُوْنَ نِسَائَكُمْ وَفِيْ ذٰلِكُمْ بَلَاءٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ عَظِيْمٌ-

হযরত আবু আলীয়া (র.) বলেন, ফেরাউন মিশরের রাজত্ব চারশত বৎসর পর্যন্ত করেছিল। এরপর জ্যোতিষীরা বলেছিল, এ বছর মিশরে একটা ছেলে সন্তান হবে, তার দ্বারা তোমার পতন হবে। তখনই ফেরাউন গর্ভবতী মহিলাদের কাছে লোক পাঠাল এবং যখনই কোন সন্তান ভূমিষ্ট হত, তাকে ফেরাউনের কাছে নিয়ে আসা হত- ছেলে হলে তাকে ফেরাউন হত্যা করে ফেলত, আর মেয়ে হলে তাকে ছেড়ে দিত।

হযরত সুদ্দী (রা.) থেকে বর্ণিত। ফেরাউন স্বপ্নে দেখেছিল- বায়তুল মুকাদ্দাস হতে আগুন বের হয়ে তা মিশরের চতুপার্শ্ব ঘিরে ফেলেছে। কিবতী সম্প্রদায়কে জ্বালিয়ে দিল এবং বনি ইসরাইলকে ছেড়ে দিল এবং মিশরের গৃহসমূহ ধ্বংস করে দিল। এ স্বপ্ন দেখার পর ফেরাউন যাদুকর, জ্যোতিষী, হস্ত চিহ্ন বিশারদ ও তারকা দেখে ভাগ্য নির্ধারণকারীদেরকে ডাকল এবং তাদেকে স্বপ্নের কথা বলল। এ স্বপ্নের ব্যাখ্যা দিয়ে তারা বলল, বনি ইসরাইল যেই শহর (বায়তুল মোকাদ্দাস) হতে এসেছে, সেই শহর হতে এক ব্যক্তি বের হবে এবং সে মিশরকে ধ্বংস করবে। ইহা শুনে ফেরাউন নির্দেশ দিল বনি ইসরাইলের কোন লোকের ছেলে সন্তান হলে তাকে হত্যা করার

Scanned with CamScanner

জন্য এবং মেয়ে সন্তান হলে তাকে জীবিত ছেড়ে দেয়ার জন্য।
ফেরাউন কিবতী সম্প্রদায়ের সাথে আলোচনা করল। ছেলে সন্তানকে জবেহ করার নির্দেশ দিল। এ দিকে বনি ইসরাইল কিবতীদের আবর্জনা ও ময়লা ইত্যাদি অপসারণের কাজে নিয়োজিত ছিল। কিছুদিন যাওয়ার পর কিবতী সম্প্রদায় ফেরাউনকে বলল- ইসরাইলের কোন ছেলে সন্তান বড় না হলে এবং বৃদ্ধ লোকেরাও বয়সবৃদ্ধির কারণে মরে গেলে আমাদের কাজ আমাদের ছেলেদেরকেই করতে হবে। তখন সিদ্ধান্ত দেয়া হল- এক বছর ছেলে সন্তান ভূমিষ্ট হলে হত্যা করা হবে এবং পরের বছর হত্যা করা হবেনা। এভাবে যেই বৎসর ছেলে সন্তান হত্যা করা হতনা, সেই বৎসর হযরত হারুন (আ.) জন্ম গ্রহণ করেন- তাকে ছেড়ে দেয়া হয়- যেই বৎসর হত্যা করার নির্দেশ ছিল সেই বৎসর হযরত মূসা (আ.)-এর জন্ম হয়।
وَفِي ذَٰلِكُم بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ ـ এসব নিয়ামতের মাধ্যমে তোমাদের পরওয়ারদেগারের পক্ষ হতে বড়ই পরীক্ষা রয়েছে। অর্থাৎ ফেরাউনের নির্যাতন হতে তোমাদেরকে নাজাত দেয়ার ভিতর বড়ই রহস্যও পরীক্ষা নিহিত রয়েছে। সুতরাং এ মুসিবত আসলে মুসিবত নয়, নিয়ামত।
হযরত মুজাহিদ (র.) বলেন- بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ এর অর্থ আসলে এই রকম نعمة من ربكم عظيم আরবী পরিভাষায় بلاء শব্দটি পরীক্ষার ক্ষেত্রে, দুঃখের ক্ষেত্রে কোন সময় কল্যাণের ক্ষেত্রেও ব্যবহৃত হয়। যেমন- আল্লাহ তায়ালা বলেন-
وَبَلَوْنَاهُم بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ـ
"আমি তোমাদের ভাল ও মন্দ দিয়ে পরীক্ষা করি যেন তোমরা সঠিক পথে প্রত্যাবর্তন কর।" (সূরা ঃ আ'রাফ-১৬৮)
অধিকন্তু বলা হয়েছে- وَنَبْلُوكُم بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً অবশ্যই আমি তোমাদেরকে ভাল ও মন্দের মাধ্যমে যাচাই করি। (সূরা ঃ আম্বিয়া-৩৫)
আরবরা ভালকেও بلاء বলে আবার খারাপকেও بلاء বলে, তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রে بلاء মন্দ ও মুসিবত বুঝানো হয়। কিন্তু এ আয়াতে بلاء শব্দের অর্থ خير বা নিয়ামত লওয়া হয়েছে। এর অকাট্য প্রমাণ রয়েছে হযরত ইবনে আব্বাসের (রা.) রিওয়ায়তে।

وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ

আর যখন আমি তোমাদের জন্য সমুদ্রকে পৃথক করে দিয়েছি। তোমরা বার দল ছিলে। প্রত্যেকের জন্য পৃথক পৃথক রাস্তা করে দিলাম। যেমন হযরত সুদ্দী (র.) বলেন- যখন হযরত মূসা (আ.) সমুদ্রের নিকট আসলেন, তখন তাঁকে ابو خالد উপাধি দেয়া হয়েছিল। হযরত মূসা (আ.) যখন লাঠি দিয়ে সমুদ্রে আঘাত করলেন, তখন প্রত্যেক দলের জন্য পৃথক পৃথক পাহাড়ের মতো উঁচু রাস্তা হয়ে গেল। বনী ইসরাঈল পর্বতময় উঁচু সুড়ঙ্গে প্রবেশ করে পার হয়ে গেল। তখন সাগরে ১২টি রাস্তা হয়ে গিয়েছিল। প্রতিটি রাস্তা দিয়ে এক একটি দল পাড়ি দিল।

فَأَنجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنتُمْ تَنظُرُونَ

তারপর আমি তোমাদেরকে নাজাত দিলাম এবং ফেরউনের বংশধরকে ডুবিয়ে মারলাম, যা তোমরা স্বচক্ষে দেখেছ। কীভাবে তাদেরকে ডুবিয়ে মারা হয়েছিল। এ সম্পর্কে হাদীস রয়েছে-
عن عبد الله بن شداد بن الهاد قال لقد ذكرلي انه خرج فرعون في طلب موسي علي سبعين الفا من دهم الخيل سوي ما في جنده من مشية الخيل وخرج موسي حتي اذا قلبه البحر لو عده
হযরত আবদুল্লাহ বিন সদ্দাদ বিন আল-হাদ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন- আমার

কাছে বর্ণনা করা হয়েছে- যখন ফেরাউন সত্তর হাজার কালো ঘোড়া ও সৈন্য সামন্ত নিয়ে হযরত মূসা (আ.)-এর অনুসন্ধানে বের হয় এবং হযরত মূসা (আ.)-এর পিছু ধাওয়া করে, তখন মূসা সমুদ্রের নিকট পৌছেন তারা সেখান থেকে পিছনে আসা সম্ভব ছিলনা কারণ, পিছনে ফিরআউনের সৈন্য ছিল। মুসা (আ.)-এর অনুসারীগণ বললেন আমরা তো ধরা পড়ে যাব। মুসা (আ.) বললেন কখনো না। আমার রব আমার সাথে আছেন। তিনি অবশ্যই পথ দেখিয়ে দিবেন।
হযরত ইবনে ইসহাক (র.) বলেন- আল্লাহ তায়ালা সমুদ্রের নিকট সংবাদ পাঠিয়েছিলেন- যখন হযরত মূসা (আ.) তার লাঠি দিয়ে মারবেন তখন তুমি ফেটে যেও। মূসা (আ.)-কে আল্লাহ তায়ালা বলেন- তুমি সমুদ্রে লাঠি দিয়ে আঘাত কর। তখন মূসা (আ.) সমুদ্রে লাঠি দিয়ে আঘাত করেছিলেন। এর মধ্যে রয়েছে আল্লাহরই রাজত্ব যা আল্লাহ তায়ালাই দান করেছেন। তখন সমুদ্র ফেটে গেল পর্বতসম উঁচু সুড়ঙ্গ দিয়ে রাস্তা হয়ে গেল এবং তা জমিনের মতো শুকনো ছিল। তখন মুসা (আ.) বনী ইসরাইলসহ পার হয়ে গেলেন। অপর দিকে ফেরাউন তার সৈন্য সামন্ত নিয়ে হযরত মূসার পথ অনুসরণ করল (রাস্তার মাঝখানে পৌছতেই দু'দিক থেকে পানি এসে ডুবিয়ে মারল।)
হযরত আবদুল্লাহ বিন সাদ্দাদ বিন আলহাদ আল লাইসী (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন- আমাকে হাদীস বর্ণনা করা হয়। যখন বনি ইসরাইল সমুদ্রে প্রবেশ করলেন, ফেরাউন তাদের অনুসরণ করল। সেই সময় ফেরাউন নর ঘোড়ার উপর আরোহণ অবস্থায় ছিল। তার ঘোড়া সমুদ্রের তীরে গিয়ে দাঁড়িয়ে রইল, সামনে যেতে চাচ্ছিল না। এমন অবস্থায় হযরত জিব্রাইল (আ.) একটি মাদী ঘোড়ার উপর আরোহন করে ফেরাউনের ঘোড়ার সামনে আসলেন। নর ঘোড়া মাদী ঘোড়াকে দেখে সমুদ্রের রাস্তার ভিতর প্রবেশ করল। যখন ফেরাউনের সৈন্যরা দেখল ফেরাউন প্রবেশ করেছে- তখন সৈন্যরাও প্রবেশ করল। হযরত জিব্রাইল (আ.) তাদের সামনে ছিলেন আর হযরত মিকাঈল (আ.) ঘোড়ার উপর সওয়ার হয়ে এদের পিছনে ছিলেন, যেন তারা পিছনে না আসতে পারে। যখন জিব্রাইল (আ.) সমুদ্র হতে বের হয়ে গেলেন, তখন দু'দিক থেকেই পানি এসে পড়ল তাদের উপর। তখন মিকাঈল ছিলেন নদীর অপর তীরে। তখন কোন উপায় না দেখে ফেরাউন বলল, আমি ঈমান আনলাম সেই মাবুদের উপর, যার উপর বনি ইসরাইল ঈমান এনেছে। আর আমি মুসলমানদের অন্তর্ভুক্ত হলাম।
وعن عمر وبن ميمون الاودي في قوله واذا فرقنا بكم البحر الاية قال لما قال معمر قال قتادة كان مع موسي ستمائة الف واتبعه فرعون علي الف الف ومأئة الف حصان ـ
হযরত আমর বিন মাইমুন (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি আল্লাহ তায়ালার বাণী وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ الاية সম্পর্কে বলেন- যখন হযরত মূসা (আ.) বনী ইসরাইলকে সাথে নিয়ে বের হয়ে পড়লেন। এখবর ফেরাউনের নিকট পৌছল। ফেরাউন বলল, আমরা এখন তাদেরকে ধরার জন্যে তাদেরকে অনুসরণ করব না। মোরগ সকালে ডাকা পর্যন্ত অপেক্ষা করব। মোরগ সকালে ডাকলেই আমরা তাদের অনুসরণ করব। কিন্তু আল্লাহ তায়ালার নির্দেশেই চলে এ বিশ্ব। কীট-পতঙ্গ সবই তো আল্লাহ তায়ালার হুকুমের তাবেদার। এ রহস্য বুঝা অতীব সহজ ঐ লোকের জন্য, যাকে আল্লাহ তায়ালা সেই গুণে গুণান্বিত করেছেন- সেদিন সকাল হওয়ার আগে মোরগ আর ডাকল না। ফেরাউন একটি ছাগল জবেহ করল। আর বলল- এ ছাগলের কলিজা

Scanned with CamScanner

খেতে না খেতেই যেন কিবতী সম্প্রদায় হতে ছয় লক্ষ লোকের সমাবেশ ঘটে। কথা মত কিবতী সম্প্রদায় হতে ছয় লক্ষ লোক হাজির হল। অতঃপর এ লোকদেরকে নিয়ে হযরত মূসা (আ.)-এর পিছু ধাওয়া করল। হযরত মূসা (আ.) যখন সমুদ্রের নিকটবর্তী পৌছলেন, তখন তার সঙ্গীদের থেকে একজন লোক বললেন- তার নাম ছিল 'ইউশা বিন নুন মূসা। আপনার রব আপনাকে কী নির্দেশ দিয়েছেন? যেহেতু সামনে সমুদ্র নজরে আসছে। মূসা (আ.) সমুদ্রের দিকে ইশারা করে বললেন, সামনে অগ্রসর হও। ইউশা ঘোড়া নিয়ে সমুদ্রে ঢুকে পড়লেন। কিন্তু গভীর পানি। তাই ফিরে আসলেন। পুনরায় বললেন- হে মূসা আপনার রব আপনাকে কী নির্দেশ দিয়েছেন?- মূসা (আ.) শপথ করে বললেন- আল্লাহর শপথ, আমি মিথ্যা বলিনি, আমি মিথ্যা বলিনি। এরকমই আল্লাহর নির্দেশ। এ ভাবে তিন বার বলেন। (আল্লাহ্ তাঁর প্রিয় বান্দাহদের এভাবে ধৈর্যের মাত্রা দেখেন এবং তাঁর প্রতি বান্দার অগাধ বিশ্বাস দেখে অত্যন্ত খুশী হন।) অতঃপর আল্লাহ্ তায়ালা ওহী প্রেরণ করে। মূসা (আ.)-কে আদেশ দিলেন- 'তোমার লাঠি দিয়ে তুমি সমুদ্রে আঘাত কর। তারপর সমুদ্র ফেটে গিয়ে প্রত্যেক দলের জন্য পৃথক পৃথক পর্বতের ন্যায় উঁচু দু'দিকে পানি বিশিষ্ট প্রশস্ত রাস্তা হয়ে যায়। হযরত মূসা (আ.) তাঁর অনুসারীদেরকে নিয়ে চলে গেলেন। অপর দিকে ফেরাউন ও তার দল-বল নিয়ে হযরত মূসা (আ.)-কে অনুসরণ করল, কিন্তু দূর্ভাগ্য তাদের! পথিমধ্যে তাদের ঘুম এসে যায়, তারা ঘুমিয়ে পড়ে এবং দু'দিক থেকে পানি এসে তাদেরকে ডুবিয়ে মারে- এ ঘটনার প্রতি ইঙ্গিত দিয়েই মহান আল্লাহ বলেন- وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ আমি ফেরাউনের বংশধরকে পানিতে ডুবিয়ে মেরেছিলাম, যা তোমরা দেখেছ।

হযরত মামর (রা.) বলেন, হযরত কাতাদাহ্ (রা.) বলেছেন- হযরত মূসা (আ.)-এর সাথে ছয় লক্ষ লোক ছিল, অপর দিকে ফেরাউন দশ লক্ষ লোক এবং এক লক্ষ ঘোড়া নির্ধারণ করেছিল।

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন- আল্লাহ তায়ালা হযরত মূসা (আ.)-এর প্রতি ওহী পাঠালেন, যেন রাত্রে সাথীদের নিয়ে চলে যান। নিশ্চয় আপনাদেরকে অনুসরণ করা হবে। আল্লাহর নির্দেশ অনুযায়ী তিনি সাথীদেরকে নিয়ে বের হলেন। ফেরাউন ও তাদের পশ্চাদ অবলম্বন করল। তারা দশ লক্ষ লোক নিয়ে এবং শুধু পুরুষ ঘোড়া নিয়ে বের হয়ে গেল। হযরত মূসা (আ.) এর সাথে ছয় লক্ষের মত লোক ছিল। তা ফেরাউন দেখেছিল। এবং বলেছিল তাদের দল অতি ক্ষুদ্র এবং তারা আমাদের ক্রোধের উদ্রেক করেছে। আমাদের ভয় হয় কারণ মূসা (আ.) তো লোক খুবই রাগী ও সাহসী।

মূসা (আ.) বনি ইসরাইলকে সংগে নিয়ে বের হয়ে গেলেন, পথিমধ্যে সমুদ্র।

ফেরাউন এবং তার সৈন্যদল তথায় উপস্থিত হল, হযরত মূসা (আ.)-এর লোকেরা দেখল ফেরাউনের সওয়ার হতে আগুনের ঝিলিক বের হচ্ছে, তাতে হযরত মূসা (আ.)-এর লোকেরা ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ল। তারা হযরত মূসা (আ.)-কে বলল- হে মূসা! তুমি আমাদেরকে আগেও কষ্ট দিয়েছিলে এবং এখনও দিচ্ছ। ফেরাউন তো এখন আমাদের পেয়ে বসেছে। মূসা (আ.) বললেন অতি সত্বর তোমাদের- সৃষ্টিকর্তা তোমাদের দুশমনকে ধ্বংস করে দেবেন এবং, তোমাদেরকে যমিনে তাঁর প্রতিনিধি নিয়োগ করবেন। একটু অপেক্ষা কর- দেখ তিনি কিভাবে করেন। বর্ণনাকারী বলেন-

আল্লাহ্ তায়ালা হযরত মূসা (আ.)-এর কাছে ওহী পাঠালেন এবং লাঠি দিয়ে সমুদ্রে আঘাত করতে বললেন। এদিকে সমুদ্রকে নির্দেশ দিলেন, মুসার কথা শুনবে, তিনি যখন তোমায় আঘাত করবেন, তখন তুমি তার অনুগত হবে। এভাবে আল্লাহ্ তায়ালা বলেছেন, কিন্তু কোন দিক দিয়ে মারতে হবে তা মূসা (আ.)-কে বলা হয়নি মূসা (আ.) চিন্তা করলে ইউশা মূসা (আ.)-কে বলেন- আপনাকে কী নির্দেশ দেয়া হয়েছে। হযরত মূসা (আ.) বলেন- আমাকে সমুদ্রে আঘাত করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। ইউশা বলেন- তাহলে আঘাত করুন। তখন হযরত মূসা (আ.) তার লাঠি দ্বারা আঘাত করলেন, এবং সংগে সংগে সমুদ্র ফেটে গিয়ে দুদিকে পর্বতের ন্যায় উঁচু পানি হয়ে মধ্যখানে শুকনা রাস্তা হয়ে গেল- বারটি দলের জন্য পৃথক পৃথক বারটি রাস্তা হয়ে গল। তারা এভাবে রাস্তা পার হতে লাগল যে, একদল অন্যদলকে দেখতে পায় না। এব্যাপারে তারা হযরত মূসা (আ.)-এর নিকট অভিযোগ করল। তারা বলল, আমরা সন্তুষ্ট হবনা, যতক্ষণ আমরা একদল অন্যদলকে দেখব না। হযরত সুফিয়ান (রা.) এবং আম্মার আল দাহনী (রা.) বলেন- তখন হযরত মূসা (আ.) আল্লাহ্ তায়ালার দরবারে একান্ত মনে ফরিয়াদ করলেন। হযরত মূসা (আ.) বলেন- اللهم اعني اخلافهم السيئة "হে আল্লাহ! এদের খারাপ চরিত্রের ব্যাপারে আমাকে সাহায্য করুন।" আল্লাহ্ তায়ালা তাঁকে ওহী দ্বারা অবহিত করলেন। লাঠি দিয়ে পানিতে আঘাত কর। বর্ণনাকারী ইবরাহীম (রা.) তখন হাত দিয়ে ইশারা করেন এবং বুঝাতে চান লাঠি কীভাবে সমুদ্রের উপর পরিচালনা করা হয়েছিল। (ইবরাহীম হচ্ছে বর্ণনাকারী হযরত সুফিয়ানের নাম।) হযরত মূসা (আ.) নির্দেশ অনুযায়ী লাঠি দিয়ে দেয়ালে আঘাত করলেন এবং এতে দেয়ালে ছিদ্র হয়ে গেল এ ছিদ্রের ভিতর দিয়ে তারা এক দল অন্য দলকে দেখতে লাগলেন। হযরত সুফিয়ান (রা.) হযরত আবু সাইদ (রা.) তা হযরত ইকরামা (রা.) হতে এবং হযরত ইকরামা হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন, হযরত মূসা (আ.)-এর লোকেরা সমুদ্র পার হয়ে গেল। হযরত মূসা (আ.)-এর শেষ দল যখন সমুদ্র পার হতে লাগল, ফেরাউন তার দল বল সহ সমুদ্রে ঝাঁপিয়ে পড়ল। তখন ফেরাউন ঘোড়ার উপর সওয়ার ছিল। ফেরাউনের ঘোড়া সমুদ্রের পানি দেখে ভয় পেয়ে গেল। (কিন্তু আল্লাহর ইচ্ছের বাইরে তো কিছুই হয় না।) এ ঘোড়া ছিল নর ঘোড়া। আল্লাহর হুকুমে হযরত জিবরাইল (আ.) একটি মাদি ঘোড়া নিয়ে পুরুষ ঘোড়ার সম্মুখে হাজির হলেই পুরুষ ঘোড়া সমুদ্রে লাফ দিয়ে পড়ল। মুসা (আ.)-কে বলা হল, আপনি ধীর গতিতে সাগর অতিক্রম করুন। এ ভাবে ফেরাউনের শেষদল সমুদ্রে প্রবেশ করল এবং ইতোমধ্যে হযরত মূসা (আ.)-এর শেষদলও সমুদ্র অতিক্রম করে ফেলল। এ'ভাবে হযরত মূসা (আ.)-এর সকল লোক পার হয়ে যাওয়ার পর এবং ফেরাউনের সকল লোক সমুদ্রে প্রবেশ করার পর দুদিক থেকে পানি এসে ফেরাউন ও তার সকল লোককে ডুবিয়ে মারলো।

হযরত সুদ্দী (রা.) উপরোক্ত আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসংগে বলেন- সমুদ্রের পানিতে ডুবিয়ে মারার পর হযরত মূসা (আ.) এবং হযরত হারুন (আ.) রাত্রে বের হয়ে তাদের সম্প্রদায়কে খোঁজতে লাগলেন। তারা কিবতীদের অনেক পুরুষ তরুণকে মৃত অবস্থায় পেলেন। হযরত মূসা (আ.) ও হযরত হারুন তাদেরকে সারারাত এমন কি সূর্য উদয় হওয়া পর্যন্ত দাফন করেছিলেন। (হাদীস)

Scanned with CamScanner

যখন ফেরাউন এবং তার সঙ্গীরা সমুদ্রের নিকটবর্তী হয়েছিল, তখন ফেরাউন দেখল সমুদ্রে পথ হয়ে গেছে, এতে সে খুশী হয়ে বলল- দেখ, আমাদের জন্য রাস্তা তৈয়রী হয়ে আছে। এ সমুদ্র অতিক্রম করে সত্বর আমরা আমাদের শত্রুকে ধরতে ও হত্যা করতে সক্ষম হব। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তায়ালা বলেন, وَأَزْلَفْنَا ثَمَّ الْآخَرِينَ অর্থাৎ আমি সেথায় অপর দলকে পৌঁছিয়ে দিলাম। অপর দল মানে ফিরআউনের দল।

ফেরাউনের ঘোড়া সমুদ্রের ভিতর প্রবেশ করতে চাইল না। কিন্তু আল্লাহ্ তায়ালা হযরত জিব্রাইল (আ.)-কে একটি মাদী ঘোড়া দিয়ে অবতরণ করালেন। মাদি ঘোড়ার দেখে ফেরাউনের পুরুষ ঘোড়া সমুদ্রের অতল গহব্বরে ঝাঁপিয়ে পড়ল। সাথে ফেরাউনের সাথীরা ও হারিয়ে গেল জীবনের তরে, দু'দিকের পানি এসে ডুবিয়ে দিল, পানিতে হাবুডুবু খেতে খেতে তারা শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করল। এমনিভাবে অন্যায়ের চির অবসান হয়ে থাকে। হযরত ইবনে যায়দ (আ.) বলেন- মূসা (আ.)-এর সম্প্রদায় বা লোকেরা যখন ফেরাউনের লোকদেরকে সমুদ্রে প্রবেশ করতে দেখেছিল তখন ভয়ে বলেছিল এ মুহূর্তে তো এরা আমাদেরকে পেয়ে বসবে, তখন উত্তরে হযরত মূসা (আ.) বলেছিলেন তা কখনো হতে পারেনা। আল্লাহ তায়ালা আমাদের সাথে আছেন, তিনি আমাদেরকে পথ নির্দেশ দেবেন।

وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ

আল্লাহ তায়ালা বলেন- আর যখন আমি মূসা (আ.)-কে ওয়াদা দিয়েছিলাম। আল্লাহ তায়ালা হযরত মূসা (আ.)-কে তূর পাহাড়ে সাক্ষাৎ দেয়ার ওয়াদা দিয়েছিলেন। وعده বলা হয় এমন প্রতিশ্রুতি যা وعيد এর বিপরীত।

কিবতী ভাষায় 'মূসা' দুটি শব্দ দিয়ে গঠিত। ১. مو যার অর্থ পানি- ২. سا যার অর্থ বৃক্ষ। এভাবে নাম রাখার কারণ হচ্ছে- যখন হযরত মূসা (আ.) এর মাতা ফেরাউনের ভয়ে হযরত মূসা (আ.) ভূমিষ্ট হওয়ার পর একটি বাক্সের ভিতর ঢুকিয়ে সমুদ্রের মধ্যে ভাসিয়ে দিয়েছিলেন- যেমনিভাবে তাকে ইলহামের মাধ্যমে জানানো হয়েছিল, তখন নীল সমুদ্রের উত্তাল তরঙ্গ এ বাক্স ফেরাউনের ঘরের পাশে যেই বৃক্ষরাজি রয়েছে এর মধ্যে প্রবেশ করিয়ে দিয়েছিল। এদিকে ফেরাউনের স্ত্রী আসিয়ার প্রতিবেশী এক মহিলা নদীতে গোসল করতে গিয়ে ঐ বাক্সটি দেখে এবং বাক্সের ভিতর হতে মূসা (আ.)-কে নিয়ে আসে। যেই জায়গায় মূসা (আ.)কে পাওয়া গিয়েছিল সেইখানে পানি আর বৃক্ষরাজি ছিল যাকে কিবতী ভাষায় موسي বলা হতো। সেই অনুসারে এ শিশুর নাম রাখা হয়েছিল موسي মূসা।

أَرْبَعِينَ لَيْلَةً

হযরত আবু আল-আলীয়া (রা.) এ আয়াতের ব্যাখ্যা প্রদান করতে গিয়ে বলেন- আল্লাহ তায়ালার বাণী وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً এ সময়টুকু ছিল পুরো জিলকদ মাস এবং জিলহজ্জ মাসের দশ তারিখ পর্যন্ত পুরো চল্লিশ রাত। তখন হযরত মূসা (আ.) তাঁর সাথীদের থেকে অনুপস্থিত ছিলেন এবং হারুন (আ.)-কে তাঁর খলিফা নিযুক্ত করে দিয়েছিলেন। তিনি চল্লিশ রাত তূর পাহাড়ে অবস্থান করেন। আল্লাহ তায়ালা হযরত মূসা (আ.)-এর উপর তখতায় লিখে ইঞ্জিল কিতাব অবতীর্ণ করেন। এর আয়াতগুলো মনি-মুক্তা দিয়ে লিখিত ছিল। আল্লাহ হযরত মূসা (আ.)-এর নিকটবর্তী হলেন এবং মূসা (আ.) আল্লাহ্ তায়ালার সাথে কথা বলেন। তিনি কলমের লিখার আওয়াজ শ্রবণ করলেন। এভাবে হযরত মূসা (আ.) কারো সাথে

কথা না বলে চল্লিশ রাত অতিবাহিত করলেন এবং চল্লিশ দিন পর তূর পাহাড় হতে অবতরণ করলেন।

হযরত ইবনে ইসহাক (র.) বলেন- আল্লাহ্ তায়ালা ফিরআউন ও তার সম্প্রদায়কে ধ্বংস এবং মূসা (আ.)-কে মুক্তি দানের পর তার সাথে ত্রিশ দিনের ওয়াদা করেন। তারপর আরো দশদিন পূরা করেন। এ ভাবে আল্লাহ তায়ালার চল্লিশ দিনের নির্ধারিত সময় পূরণ করেন। আল-হাদীস।

হযরত হারুন (আ.)-কে বনি ইসরাইলের মধ্যে রেখে গেলেন এবং তার সাথে সামেরীও ছিল। সে বনী ইসরাঈলকে নিয়ে হযরত মূসা (আ.)-এর পেছনে বের হয়েছিল মূসা (আ.)-এ সাথে তাদের সাক্ষাৎ করিয়ে দেয়ার জন্য।

ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ

তারপর তোমরা- হযরত মূসা (আ.) চলে যাওয়ার পর গরুর বাছুরকে উপাস্য বানিয়েছিলে। আর এ কাজ দ্বারা তোমরা সীমালঙ্ঘনকারীতে পরিণত হয়েছ। অর্থাৎ যখন হযরত মূসা (আ.) তোমাদের থেকে ওয়াদাকৃত দিনগুলো পালনের জন্য দূরে গিয়েছিলেন, তখন তোমরা গাভীর বাচ্চাকে রব বানিয়েছিলে। একথা বলে আল্লাহ তায়ালা তাদের পূর্ববর্তীদের অপকর্মের কথা সাক্ষাত করিয়ে দিচ্ছেন।

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন- যখন ফেরাউন তার সাথীদেরকে নিয়ে সমুদ্রে ঝাঁপিয়ে পড়ল সে সময় সামেরী হযরত জিবরাইল (আ.)-কে চিনতে পারে। কারণ তার মা সামেরী ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর ফেরাউনের ভয়ে সামেরীকে জন্মের পরক্ষণেই একটি গর্তের ভিতর লুকিয়ে গর্ত আবৃত করে রেখেছিল। হযরত জিবরাইল (আ.) ঐ গর্তে আসতেন এবং স্বীয় আঙ্গুল দ্বারা তাকে খাবার খাওয়াতেন। হযরত জিবরাইল (আ.)-এর কোন আঙ্গুল হতে দুধ বের হত, কোনটি হতে মধু, কখনো ঘি বের হত। এভাবে সে বড় হওয়া পর্যন্ত খাওয়াতে থাকেন। এজন্য যখন সামেরী হযরত জিবরাইল (আ.)-কে সমুদ্রে দেখল, তখন সে তাঁকে চিনে ফেলল। তখনই হযরত জিবরাইল (আ.)-এর ঘোড়ার পায়ের ক্ষুর যেখানে পড়েছে, সে জায়গা হতে এক মুঠো মাটি নিয়ে নিল। হযরত সুফিয়ান (রা.) বলেন, হযরত ইবনে মাসউদ (রা.) فَقَبَضَ قَبْضَةً مِنْ أَثَرِ الرَّسُولِ । আয়াতকে এভাবে পড়তেন- فَقَبَضَ قَبْضَةً مِنْ أَثَرِ فَرَسِ الرَّسُولِ

হযরত আবু সাঈদ বলেন, হযরত ইকরামা (রা.) বলেন, হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত- সামেরীর অন্তরে এ কথা ঢেলে দেয়া হয়েছিল যে, তুমি যে কোন বস্তুতে এ মাটি সামান্য দিয়ে "এটি হয়ে যাও, সেটি হয়ে যাও" বললেই তৎক্ষনাৎ তা হয়ে যাবে। এজন্যে সে এ মাটি সর্বদা তার সাথেই হাতের ভিতর রাখত। শেষ পর্যন্ত হযরত মূসা (আ.) এবং বনি ইসরাইল সমুদ্র অতিক্রম করল এবং আল্লাহ্ তায়ালা ফেরাউনের বংশধরকে ডুবিয়ে মারলেন। হযরত মূসা (আ.) আল্লাহ তায়ালার ওয়াদা পালন করার জন্যে চলে যাবেন, তাই তিনি তাঁর ভাই হযরত হারুন (আ.)-কে তাঁর লোকদেরকে পরিচালনা করার লক্ষ্যে, সংশোধন করার লক্ষ্যে তাঁর স্থলাভিষিক্ত করলেন। মূসা (আ.) তাঁর প্রতিপালকের সান্নিধ্যে চলে গেলেন। ফিরাউনের বংশধরদের কিছু গহনা ও অলংকার বনি ইসরাঈলদের নিকট ছিল। এগুলো তারা বনি ইসরাঈলের নিকট থেকে ধার এনেছিল। তারা এগুলো জ্বালিয়ে দেয়ার জন্য এক

Scanned with CamScanner

স্থানে জমা করল। সামেরী তার হাত হতে এক মুষ্ঠি মাটি তাতে দিয়ে বলেছিল, আওয়াজ বিশিষ্ট একটি বাছুর হয়ে যাও। সাথে সাথে একটি বাছুর তৈরী হয়ে গেল এবং হামবা হামবা রব বা আওয়াজ করতে লাগল। বাছুরের পিছনের দিকে বাতাস প্রবেশ করত এবং বাছুরের মুখ দিয়ে সেই বাতাস বের হত। এর আওয়াজ শুনা যেত। সামেরী লোকদেরকে বলেছিল- এ বাছুর হচ্ছে তোমাদের মাবুদ এবং মূসার মাবুদ। তোমরা এ মাবুদের এবাদত কর। তারা এর উপাসনা শুরু করে দিল। তখন হযরত হারুন (আ.) বলেন- হে আমার কওম! এ ভাবে করলে তোমরা ফেৎনায় পড়বে। অবশ্যই তোমাদের পরওয়ারদেগার হচ্ছেন رحمان সুতরাং আমার অনুসরণ কর এবং আমার নির্দেশের আনুগত্য কর। লোকেরা বলে- আমরা মূসা (আ.) আসা পর্যন্ত কখনো অপেক্ষা করব না।

হযরত সুদ্দী (রা.) হতে বর্ণিত, আল্লাহ্ তায়ালা হযরত মূসা (আ.)-কে নির্দেশ প্রদান করলেন যেন বনি ইসরাইলগণ মিশরের জমিন হতে বের হয়ে যায়। আল্লাহ্ তায়ালার নির্দেশ পালনার্থে হযরত মূসা (আ.) বনি ইসরাইলকে বের হয়ে যাওয়ার জন্যে বললেন, সংগে কিবতীদের নিকট হতে গহনা ইত্যাদিও নিয়ে যাওয়ার জন্য আদেশ দিলেন। অবশেষে যখন হযরত মূসা (আ.) এবং বনি ইসরাইল হতে যারা হযরত মূসা (আ.)-কে অনুসরণ করত তাদেরকে আল্লাহ্ তায়ালা নাজাত দিলেন এবং পরিণামে ফেরাউন আর ফেরাউনের বংশধর ও অনুসারীদেরকে সমুদ্রের অতল গহব্বরে ডুবিয়ে মারলেন। সে সময় হযরত জিবরাইল (আ.) ঘোড়া নিয়ে হযরত মূসা (আ.)-কে নিতে এসেছিলেন। সামেরী হযরত জিবরাইল (আ.)-কে চিনে ফেলে এবং বলে এ ঘোড়ার কোন মৃত্যু নেই। এটি দেখে সে বলল- নিশ্চয় এর একটি আলাদা বৈশিষ্ট্য আছে। সামেরী তাড়াতাড়ি ঘোড়ার ক্ষুর যে জায়গায় পড়েছিল, সেই জায়গা হতে মাটি নিয়ে নিল। অতঃপর হযরত মূসা (আ.) হযরত হারুন (আ.)-কে বনি ইসরাইলের উপর তাঁর প্রতিনিধি করে চলে গেলেন এবং তিনি তাদের সাথে ত্রিশ দিনের ওয়াদা করেছিলেন। আল্লাহ্ তায়ালা আরো দশদিন বাড়িয়ে দিয়ে চল্লিশ দিন পূর্ণ করেছিলেন। হযরত হারুন (আ.) তাদেরকে বলেন- হে বনি ইসরাঈল! গনিমত তোমাদের জন্য হালাল নয়, আর কিবতীদের অলংকার যা তোমাদের কাছে আছে, এগুলো হচ্ছে গনিমত। সুতরাং তোমরা এসব জিনিষ একটি গর্তের মধ্যে জমা কর। হযরত মূসা (আ.) প্রত্যাবর্তন করলে তিনি তা হালাল ঘোষণা করলে তা তোমরা নিও। অন্যথায় তা খুবই খারাপ হবে। তোমরা তা খেয়না না। হযরত হারুন (আ.) এ কথা বলার পর সকলেই এ সব গহনাপাতি একটি গর্তের মধ্যে জমা করলেন। সামেরী ও মুঠোর ভিতর রক্ষিত মাটি এই গর্তে ফেলে দিল। আল্লাহ্ তায়ালা এ সব গহনাপাতি থেকে গাভীর বাছুর বানিয়ে দিলেন, যে বাছুর হামবা হামবা শব্দ করতে লাগল। অপর দিকে বনি ইসরাইল হযরত মূসা (আ.)-এর দেয়া প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী দিন রাত গননা করতে লাগল। তারা দিনকে একদিন এবং রাতকে আরেক দিন এভাবে হিসাব করতে লাগল। গাভীর বাছুর হয়েছিল হযরত মূসা (আ.) যাওয়ার বিশ দিন পর। এ বাছুরকে দেখার পর সামেরী বলতে লাগল এটাই তোমাদের মাবুদ এবং মূসার মাবুদ। সামেরী সব কিছু ভুলে গিয়ে বলতে শুরু করল যে, মূসার মাবুদ মূসাকে ত্যাগ করে এখানে এসেছেন আর মূসা চলে গেছেন তাকে

তালাশ করতে। তার কথায় সকলেই বিশ্বাস করে এ বাছুরের পূজা করতে লাগল। বাছুরটি হামবা হামবা রব করত এবং চলা ফেরা করত।

হযরত হারুন (আ.) তাদেরকে বললেন, হে বনী ইসরাঈলগণ! তোমরা ফাসাদে পড়েছ। আল্লাহ তায়ালা তোমাদেরকে এ বাছুরের মাধ্যমে পরীক্ষা করছেন। প্রকৃত পক্ষে তোমাদের রবতো رحمن দয়াবান আল্লাহ। এ ভাবে হযরত হারুন (আ.) এবং বনী ইসরাইলের মধ্যে যারা তার অনুসারী ছিল, তাঁরা বুঝাতে লাগলেন। হযরত মূসা (আ.) আল্লাহ্ তায়ালার নিকট গেলেন তাঁর সাথে কথা বলার জন্য। আল্লাহ্ তায়ালা হযরত মূসা (আ.)-কে জিজ্ঞেস করলেন। হে মূসা, কী ব্যাপার? এতো তাড়াতাড়ি আসলে! হযরত মূসা (আ.) বলেন- আল্লাহ! এই তো তারা আমার পিছনে আসছে এবং আমি তাড়াতাড়ি তোমার কাছে আসলাম, যাতে তুমি সন্তুষ্ট হও। আল্লাহ্ তায়ালা বলেন- তুমি তোমার কাওম হতে চলে আসার পর আমি তাদের থেকে পরীক্ষা নিয়েছিলাম। তাদেরকে সামেরী গোমরাহ করেছে। অতঃপর আল্লাহ তায়ালা মুসা (আ.)-কে তাদের অবস্থা অবগত করলেন হযরত মূসা (আ.) বলেন- ইয়া আল্লাহ! সামেরী তাদেরকে গাভীর বাছুরের ইবাদত করার জন্যে বলেছিল। এ বাছুরের ভিতর প্রাণ কে দিয়েছিল? আল্লাহ তায়ালা বলেন, গাভীর বাছুরের ভিতর রূহ আমি দিয়েছিলাম। হযরত মূসা (আ.) বলেন, হে রব! তাহলে আপনিই কী তাদেরকে গোমরা করেছিলেন?

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন- সামেরী বাজরমা সম্প্রদায়ের লোক ছিল। এ সম্প্রদায় গাভীর ইবাদত করত। সামেরীর অন্তরে গাভীর ইবাদতের প্রতি আকর্ষণ ছিল। বনী ইসরাইলের মধ্যে ইসলামের আবির্ভাব হলো ইতোমধ্যে হযরত হারুন (আ.) বনি ইসরাইলের সাথে রইলেন এবং হযরত মূসা (আ.) আল্লাহ্ তায়ালার নিকট চলে গেলেন। হযরত হারুন (আ.) বনী ইসরাইলকে বলেন, তোমরা আসার সময় ফিরআউন সম্প্রদায়ের যে সকল অলংকারও সামগ্রী নিয়ে এসেছ, তা তোমাদের জন্য হালাল নয়। এ সব কিছু অপবিত্র ও নাপাক। অতপর তিনি আগুন প্রজ্জলিত করলেন এবং বললেন, তা তোমরা আগুনে ফেলে দাও। এ কথায় তারা সম্মত হয়ে সব কিছু ফেলে দিল এবং গহনাপাতি ভেংগে ফেলল। সামেরী হযরত জিব্রাইল (আ.)-কে দেখেছিল এবং জিব্রাইলের ঘোড়ার ক্ষুর হতে মাটি নিয়েছিল। সে আগুনের কাছে আসল এবং হযরত হারুন (আ.)-কে বলল হে আল্লাহর নবী, আমার হাতে যা আছে তা আমি ঢেলে দেই। হযরত হারুন বলেন। হ্যাঁ, ঢেলে দাও। হযরত হারুন (আ.) জানতেন না যে গহনা-পত্র ছাড়া তার হাতে আর কিছু থাকতে পারে। অনুমতি পেয়ে সে ঐ মাটি অলংকারের মধ্যে ছেড়ে দিল এবং বলল হাম্বা রব বিশিষ্ট বাছুর হয়ে যা। এরপর এ মাটি হতেই বাছুর সৃষ্টি হয় এবং হামবা রব করতে থাকে, যা তাদের জন্য মুসিবত এবং ফাসাদের কারণ হয়েছিল। সামেরী বলল, এ বাছুর তোমাদের মাবুদ এবং হযরত মূসা (আ.)-এর মাবুদ। তারা এ বাছুরের ইবাদত করতে লাগল এবং তারা এ বাছুরকে এমন মুহব্বত করত, অন্য কিছুকে অনুরূপ করত না। আল্লাহ্ তায়ালা বলেন- সে ভুলে গিয়েছিল। অর্থাৎ সামেরী ইসলামের কথা ভুলে গিয়েছিল। আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন, তারা কি দেখেনা যে, এটা তাদের কোন কথার উত্তর দেয় না এবং তাদের ক্ষতি বা উপকার করার ও ক্ষমতা রাখেনা।

Scanned with CamScanner

সামেরীর নাম ছিল মূসা বিন যাফর। মিশরের অধিবাসী ছিল। সে বনী ইসরাঈলে প্রবেশ করেছিল। হযরত হারুন (আ.) যখন তাদের এ অবস্থা দেখেছিলেন, তখন বললেন, হে কাওম! এটা তোমাদের জন্য পরীক্ষা। তোমাদের পরওয়ারদেগার হচ্ছেন- الرحمن আল্লাহ। তোমরা আমার অনুসরন কর, আমার আদেশ মান্য কর। তারা বলল মূসা (আ.) প্রত্যাবর্তন না করা পর্যন্ত আমরা এভাবে থাকব। তখন হযরত হারুন (আ.) তাঁর সাথে যে সকল মুসলমান ফিতনায় পতিত হয়নি, তাদেরকে নিয়ে বাছুর পূজাকারীদের বিরুদ্ধে দাঁড়ালেন। শেষ পর্যন্ত যারা মুসলমান ছিল, তাদেরকে নিয়ে হারুন (আ.) চলে যেতে চাইলেন কিন্তু পরে আশংকা করলেন যে, হযরত মূসা (আ.) এসে হয়ত বলবেন-তুমি বনী ইসরাঈলের মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টি করেছ। وانتم ظالمون অর্থাৎ তোমরা এমন কিছুর ইবাদত করেছ যা ইবাদতের যোগ্য নয় বা ইবাদতের জায়গা নয়।

ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُمْ مِّنْ بَعْدِ ذٰلِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ

এরপরও আমি তোমাদেরকে ক্ষমা করে দিয়েছি। যেন তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ বা শোকরিয়া আদায় কর। অর্থাৎ তোমরা বাছুর বানানোর পরও ক্ষমা করে দিলাম, যেন তোমরা শোকরিয়া আদায় করতে থাক। কারণ যারা জ্ঞানী তারা ক্ষমা পেলে শোকরিয়া আদায় করা আবশ্যক মনে করেন।

وَاِذْ اٰتَيْنَا مُوْسَى الْكِتٰبَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُوْنَ

আর যখন আমি হযরত মূসা (আ.)-এর প্রতি তৌরাত আর ফুরকান অবতীর্ন করলাম- এ প্রত্যাশায় যে, তোমরা ইসলামী জীবন বিধান গ্রহণ করবে। এখানে ফুরকান শব্দের অর্থ হচ্ছে- الفارق بين الحق والباطل হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন- তৌরাত ইঞ্জিল এবং জবুরের সমষ্টিগত নাম হচ্ছে فرقان। হযরত আবু জাফর (র.) বলেন, প্রথম ব্যাখ্যাই উত্তম। কারণ এটি তৌরাত কিতাবের গুণবাচক শব্দ। অর্থাৎ যখন সত্য আর মিথ্যা পার্থক্য হয়ে গেল- তোমাদের উচিত সত্যের অনুসরণ করা, যেহেতু জ্ঞান ও সু-বুদ্ধিমত্তা এটাই চায়।

وَاِذْ قَالَ مُوْسٰى لِقَوْمِهٖ يٰقَوْمِ اِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ اَنْفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوْبُوْٓا اِلٰى بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوْٓا اَنْفُسَكُمْ ؕ ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ عِنْدَ بَارِئِكُمْ ؕ فَتَابَ عَلَيْكُمْ اِنَّهٗ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ ﴿٥٤﴾ وَاِذْ قُلْتُمْ يٰمُوْسٰى لَنْ نُّؤْمِنَ لَكَ حَتّٰى نَرَى اللّٰهَ جَهْرَةً فَاَخَذَتْكُمُ الصّٰعِقَةُ وَاَنْتُمْ تَنْظُرُوْنَ ﴿٥٥﴾ ثُمَّ بَعَثْنٰكُمْ مِّنْ بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ ﴿٥٦﴾ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَاَنْزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ

وَالسَّلْوٰى ؕ كُلُوْا مِنْ طَيِّبٰتِ مَا رَزَقْنٰكُمْ ؕ وَمَا ظَلَمُوْنَا وَلٰكِنْ كَانُوْٓا اَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُوْنَ ﴿٥٧﴾ وَاِذْ قُلْنَا ادْخُلُوْا هٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوْا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَّادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَّقُوْلُوْا حِطَّةٌ نَّغْفِرْ لَكُمْ خَطٰيٰكُمْ ؕ وَسَنَزِيْدُ الْمُحْسِنِيْنَ ﴿٥٨﴾ فَبَدَّلَ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِيْ قِيْلَ لَهُمْ فَاَنْزَلْنَا عَلَى الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا رِجْزًا مِّنَ السَّمَآءِ بِمَا كَانُوْا يَفْسُقُوْنَ ﴿٥٩﴾

৫৪. আর যখন মূসা আপন সম্প্রদায়ের লোককে বলল হে আমার সম্প্রদায়! গো-বৎসকে উপাস্যরূপে গ্রহণ করে তোমরা নিজেদের প্রতি ঘোর অত্যাচার করেছ, সুতরাং তোমরা তোমাদের স্রষ্টার পানে ফিরে যাও এবং তোমরা নিজদেরকে হত্যা কর। তোমাদের স্রষ্টার নিকট এটাই শ্রেয়। তিনি তোমাদের প্রতি ক্ষমাপরবশ হবেন। তিনি অত্যন্ত ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

৫৫. যখন তোমরা বলেছিলে, হে মূসা! আমরা আল্লাহকে প্রত্যক্ষভাবে না দেখা পর্যন্ত তোমাকে কখনও বিশ্বাস করব না, তখন তোমরা বজ্রাহত হয়েছিলে আর তা তোমরা নিজেরাই দেখছিলে।

৫৬. অতঃপর তোমাদের মৃত্যুর পর আমি তোমাদেরকে পুনর্জীবিত করলাম যাতে তোমরা কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কর।

৫৭. আমি মেঘ দ্বারা তোমাদের উপর ছায়া বিস্তার করলাম এবং তোমাদের নিকট মান্না ও সালওয়া প্রেরণ করলাম। বলেছিলাম, তোমাদেরকে ভাল যা দান করেছি তা হতে আহার কর। তারা আমার প্রতি কোন যুলুম করেনি, বরং তারা তাদের নিজেদের প্রতিই যুলুম করেছে।

৫৮. স্মরণ কর, যখন আমি বললাম, এই জনপদে প্রবেশ কর, যথেচ্ছা স্বচ্ছন্দে আহার কর, নতশিরে প্রবেশ কর দ্বার দিয়ে এবং বলঃ ক্ষমা চাই। আমি তোমাদের অপরাধ ক্ষমা করব এবং সৎকর্মপরায়ণ লোকদের প্রতি আমার দান বৃদ্ধি করব।

৫৯. কিন্তু যারা অন্যায় করেছিল তারা তাদেরকে যা বলা হয়েছিল তার পরিবর্তে অন্য কথা বলল। সুতরাং অনাচারীদের প্রতি আমি আকাশ হতে শাস্তি প্রেরণ করলাম; কারণ তারা সত্য ত্যাগ করেছিল।

وَاِذْ قَالَ مُوْسٰى لِقَوْمِهٖ يٰقَوْمِ اِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ اَنْفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ

Scanned with CamScanner

فَتُوْبُوْا اِلٰى بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ عِنْدَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ اِنَّهٗ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ-

তোমরা বাছুর বানিয়ে নিজের নফছ এর উপর জুলুম করেছ। কারণ কাজের কর্তা যখন শাস্তির উপযুক্ত হয় তখন সে জালিম হিসেবে পরিগণিত হয়, এখানে এ সব লোকেরা বাছুরকে রব বানিয়েছে, যার কারণে তারা মুরতাদ হয়ে গেছে। আর মুরতাদের হুকুম হচ্ছে কাতল করে ফেলা। তাই তাদেরকে কাতল এর মাধ্যমে তওবা করার সুযোগ দেয়া হয়েছিল।

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত, হযরত মূসা (আ.) আল্লাহ তায়ালার পক্ষ হতে আদেশ পেয়ে কাওমকে বললেন- তোমরা একজন অপরজনকে হত্যা কর। (অর্থাৎ যারা বাছুর পূজা করেনি, তাঁরা যারা বাছুর পূজা করেছে তাদেরকে হত্যা করবে।) হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন- একথা বলার পর যারা বাছুর পূজা করেছিল তারা লুকিয়ে গেল এবং বসে থাকল। যারা বাছুর পূজা করেনি তারা হাতে খঞ্জর বা তলোয়ার নিয়ে বের হল, তখন তাদের উপর ঘোর অন্ধকার নেমে আসল। তারা একে অপরকে হত্যা করল এরপর তাদের উপর থেকে অন্ধকার বিদুরিত হল। সত্তর হাজার লোককে হত্যা করা হল এবং এটিই তাদের জন্যে তওবা ছিল যারা বাকী ছিল তাদের জন্যও তা তওবা হয়ে গেল। بَارِئِ শব্দের অর্থ সৃষ্টিকর্তা নেওয়াটাই সঠিক।

হযরত ইবনে জুরাইয (র.) বলেন- হত্যার কারণ হচ্ছে এই, একদল বাছুর পূজা অপছন্দ করত এবং তা যে অসত্য তা জানা সত্ত্বেও যুদ্ধ বেঁধে যাওয়ার ভয়ে নিষেধ করত না এজন্য আল্লাহ তায়ালা নির্দেশ দেন পরস্পর পরস্পরকে হত্যা করার জন্য।

হযরত সুদ্দী (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন- যখন হযরত মূসা (আ.) তাঁর কওমের নিকট প্রত্যাবর্তন করলেন এবং বললেন, হে কওম! তোমাদের প্রতিপালক কি তোমাদের সাথে উত্তম প্রতিশ্রুতি দেন নাই? অতপর মূসা (আ.) তৌরাতের ফলক ফেলে দিলেন এবং তার ভাই এর মাথা ধরে তাঁর দিকে টান দিলেন। হারুন (আ.) বললেন, "হে আমার মায়ের ছেলে, আমার শ্মশ্রু ও মাথার চুল ধরে টান দিবেন না। আমি আশংকা করতাম যে আপনি ফিরে এসে বলবেন তুমি বনি ইসরাঈলের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করেছ। আর আমার কথা স্মরন রাখনি। এতে মূসা (আ.) হারুন (আ.) কে ছেড়ে দিলেন এবং ছামেরীকে ধরলেন। তাকে জিজ্ঞেস করলেন, সামেরী তোমার ব্যাপার কি? সে বলল, "ثُمَّ لَنَنْسِفَنَّهٗ فِي الْيَمِّ نَسْفًا" অতপর তাকে বিক্ষিপ্ত করে সাগরে নিক্ষেপ করবোই। (সূরা ঃ ত্বা-হা-৯৭)

অতপর এটাকে জবেহ করে আগুন দিয়ে জ্বালিয়ে দেয়া হল। এবং ছাই সাগরে নিক্ষেপ করা হল। তৎকালীন সময়ে প্রবাহিত সকল সাগরেই তার একটি অংশ গিয়ে পতিত হল। একথার প্রতি ইঙ্গিত করেই আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন, তাদের কুফরীর কারণে গো-বৎসের প্রেম তাদের অন্তরে ঢেলে দেয়া হয়েছিল, মূসা (আ.)-এর প্রত্যাবর্তনের পর যখন তারা দেখল যে, নিশ্চয় তারা পথ ভ্রষ্ট হয়ে গেছে, তখন তারা বলল আল্লাহ তায়ালা আমাদেরকে দয়া না করলে, ক্ষমা না করলে আমরা ধ্বংস প্রাপ্ত হয়ে যাব। আল্লাহ তায়ালা বনী ইসরাঈলের তওবা কবুল করতে অস্বীকৃতি জানিয়েছিলেন। যেহেতু তাদেরকে হত্যার মাধ্যমে তওবা করার জন্যে বলা

হয়েছিল কিন্তু তা তাদের পছন্দ হয়নি। তখন হযরত মূসা (আ.) তাদেরকে বলেছিলেন- হে কওম! তোমরা বাছুরকে মাবুদ প্রতিষ্ঠা করার কারণে তোমরা নিজেই নিজের ক্ষতি করেছ। তাই, তোমাদেরকে তোমাদের সৃষ্টিকর্তার নিকট তওবা করতে হবে। তওবার প্রক্রিয়া হচ্ছে-যারা বাছুরের পূজা করেনি, তারা যারা পূজা করেছে তাদেরকে হত্যা করবে। হযরত মূসা (আ.) দুই সারিতে শ্রেণীবদ্ধ হওয়ার জন্য বলেন। দুটি সারি হয়ে গেল। এক সারির লোক অর্থাৎ যারা বাছুরের পূজা করেনি তারা তলোয়ার নিয়ে দাঁড়িয়ে গেলেন এবং হত্যা করতে লাগলেন- এভাবে সত্তর হাজার পর্যন্ত হত্যা করা হল। শেষ পর্যন্ত হযরত মূসা (আ.) ও হযরত হারুন (আ.) আল্লাহ তায়ালার দরবারে দুআ করলেন- হে আমাদের পরওয়ারদেগার! বনী ইসরাঈল ধ্বংস হয়ে গেছে। হে পরোয়ারদেগার! যারা বাকী আছে, তারা যেন বাকী থাকে। তখন আল্লাহ তায়ালা তাদের দুআ কবুল করে তাদেরকে অস্ত্র রেখে দেয়ার জন্যে বলেন। আল্লাহ তায়ালা তাদের তওবা কবুল করলেন। যারা নিহত হলেন তারা শহীদ হলেন এবং যাঁরা বেঁচে থাকল তাদেরকে ক্ষমা করা হল। এটা আল্লাহ তায়ালার বানী- فَتَابَ عَلَيْهِ اِنَّهٗ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ এর মর্মার্থ।

وَاِذْ قُلْتُمْ يٰمُوْسٰى لَنْ نُّؤْمِنَ لَكَ حَتّٰى نَرَى اللّٰهَ جَهْرَةً

আর যখন তোমরা বলতে- হে মূসা! আমরা কখনো বিশ্বাস করব না আপনার কথায়, যতক্ষণ না আমরা আল্লাহ্ তায়ালাকে প্রকাশ্য দেখব।

فَاَخَذَتْكُمُ الصّٰعِقَةُ وَاَنْتُمْ تَنْظُرُوْنَ

তারপর একটি শব্দ তোমাদেরকে ঘিরে ফেলল। যা তোমরা দেখছিলে। صعقة শব্দের কয়েক অর্থ উল্লেখ রয়েছে। হযরত কাতাদাহ্ (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন صعقة শব্দের অর্থ মৃত্যু। আর হযরত রবি (রা.) বলেন صعقة শব্দের অর্থ এমন আওয়াজ যা শুনলে মারা যায়। আর হযরত সুদ্দী (রা.) বলেন- صعقة শব্দের অর্থ আগুন।

হযরত ইবনে ইসহাক (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন- তাদের কাছে একটি কম্পন পৌছেছিল এবং সেই কম্পনে তারা সকলেই মারা গিয়েছিল। প্রকৃতপক্ষে صاعقة বলা হয় প্রত্যেক ভয়ংকর জিনিষকে। তারা এ صاعقة দেখেছিল, পর্যবেক্ষণ করেছিল, তাদের কাছে এ ভয়ংকর বস্তু পৌছেছিল। শেষ পর্যন্ত এ ভয়ংকর বস্তুর কারণে তাদের মৃত্যু হয়েছিল। অথবা এটা তাদের জ্ঞান লোপ করে দিয়েছিল, বুদ্ধি ঢেকে দিয়েছিল, অথবা শরীরের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ হারিয়ে দিয়েছিল। صاعقة শব্দের অর্থ আগুন, ভূমিকম্প মৃত্যু এসব ব্যবহার হয়। صاعقا শব্দের অন্য অর্থ বেহুশ হওয়া কিন্তু মৃত্যু নয়, যার উপর এ কথা ইংগিত দেয়- خر موسى صعقا অর্থাৎ মূসা (আ.) বেহুশ হয়ে গিয়েছিলেন। صعقة শব্দের অর্থ এখানে মৃত্যু। কারণ পরবর্তী আয়াতে মৃত্যুর কথা আছে।

ثُمَّ بَعَثْنٰكُمْ مِّنْ بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ

তোমাদের মৃত্যুর পর আমি তোমাদেরকে জীবিত করেছিলাম, যাতে তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে পার।

হযরত মুহাম্মদ বিন ইসহাক হতে বর্ণিত, তিনি বলেন- যখন হযরত মূসা (আ.) তাঁর কওমের কাছে প্রত্যাবর্তন করলেন- তখন তাদেরকে বাছুরের পূজা করা অবস্থায় দেখলেন। তখন হযরত মূসা (আ.) তাঁর ভাই ও সামেরীকে যা বলার বললেন-

Scanned with CamScanner

অতপর বাছুরকে রেত দিয়ে টুকরো টুকরো করে কাটলেন এবং সে কর্তিত অংশ সমুদ্রের মধ্যে ফেলে দিলেন। হযরত মূসা (আ.) তাদের মধ্য হতে সত্তর জন ভাল লোক নির্বাচিত করলেন এবং তাদেরকে বললেন, তোমরা আল্লাহ তায়ালার দরবারে চল এবং যে অপরাধ করেছ তার জন্য। তওবা কর, তোমরা রোজা রাখ, পবিত্র হও, কাপড় পরিষ্কার কর। হযরত মূসা (আ.) তাদেরকে নিয়ে নির্দিষ্ট কর্মসূচী অনুযায়ী তূর পাহাড়ের উদ্দেশ্যে বের হয়ে গেলেন। ওখানে পৌঁছে তারা হযরত মূসা (আ.)-কে বলেন- হে মূসা! আপনি আপনার পরওয়ারদেগারের কাছে আমাদের জন্য আবেদন করুন, যেন আমরা আমাদের পরওয়ারদেগারের কথা শুনি। অতঃপর হযরত মূসা (আ.) বলেন, আমি করব। যখন হযরত মূসা (আ.) পাহাড়ের নিকটবর্তী হলেন, তাঁর উপর মেঘ আসল এবং পাহাড়কে সম্পূর্ণভাবে আবৃত করে ফেলল। হযরত মূসা (আ.) পাহাড়ের ভিতর ঢুকে পড়লেন। হযরত মূসা (আ.) যখন তাঁর পরওয়ারদেগারের সাথে কথা বলতেন, তখন তার কপালে আলোকচ্ছটা পড়ত। বনী আদমের মধ্যে কেউ তাকে দেখার শক্তি রাখে না এজন্য আল্লাহ তাদের মধ্যখানে পর্দা রাখলেন। কাওম আরো নিকটবর্তী হলেন- শেষ পর্যন্ত তারাও মেঘের মধ্যে প্রবেশ করলেন, সিজদা ও রুকু করতঃ প্রবেশ করলেন। তাঁরা আল্লাহ্ তায়ালার কথা শুনলেন। তিনি মূসা (আ.)-এর সাথে কথা বলতে আরম্ভ করেন। হযরত মূসা (আ.)-কে হুকুম করছেন এটা কর, ওটা করনা। হযরত মূসা (আ.) কাজ শেষ করার সাথে সাথে মেঘ সরে গেল এবং হযরত মূসা (আ.) তাদের নিকট আসলেন। তারা হযরত মূসা (আ.)-কে বলেন, আমরা কখনো বিশ্বাস করব না যতক্ষণ না আমরা আল্লাহ তায়ালাকে খোলাখুলিভাবে দর্শন করি। তখন তাদেরকে কম্পন আক্রান্ত করল। তাই হচ্ছে صاعقة । তারা সকলেই মারা গেল। হযরত মূসা (আ.)-কে তার পরওয়ারদেগার হিদায়ত করেন, তিনি আল্লাহ তায়ালাকে আহবান করেন। তিনি বলেন- হে রব! আপনি ইচ্ছে করলে সবার আগেই আমাকে এবং তাদেরকে ধ্বংস করে দিতে পারতেন। ওরা নির্বুদ্ধিতার কাজ করেছে। আল্লাহ, আপনি কী এ নির্বোধ লোকদের কার্যাবলীর কারনে বনী ইসরাঈলকে ধ্বংস করবেন? এটাই তাদের জন্য ধ্বংস। আমি তাদের থেকে সত্তরজন ভাল লোক নির্বাচন করেছি। আশা করি কল্যাণ ও মঙ্গল নিয়ে তাদের প্রতি প্রত্যাবর্তন করব। অথচ এখন তাদের মধ্যে কেউ আমার সাথে নেই। তা হলে কে আমাকে সত্য প্রমাণ করবে। শেষ পর্যন্ত হযরত মূসা (আ.) বনী ইসরাঈলের তওবা কবুল করার জন্য আল্লাহ তায়ালার দরবারে আবেদন করেন। উত্তরে আল্লাহ তায়ালা বলেন, হত্যা করা ছাড়া তাদের তওবা কবুল হবে না।

হযরত সুদ্দী (রা.) বলেন, ثم بعثناكم এর অর্থ হচ্ছে আমি তোমাদেরকে মৃত্যুর পর জীবিত করেই নবুয়ত দান করেছি অর্থাৎ নবী বানিয়ে প্রেরণ করেছি। এজন্য আল্লাহ্ তায়ালা বলেন, ثُمَّ بَعَثْنَاكُمْ مِنْ بَعْدِ مَوْتِكُمْ । এ প্রসঙ্গে হযরত সুদ্দী (রা.)-এর বর্ণনার শেষে একথাটুকু আছে- তাদেরকে মৃত্যু থেকে জীবিত করার পর তারা বলতে লাগল- يا موسي انت تدعو الله فما تساله شيا الا اعطاك فادعه يجعلنا انبياء فدعا الله تعالي অর্থাৎ হে মূসা! তুমি আল্লাহ্ তায়ালার নিকট দুআ কর। তুমি তার কাছে কোন কিছু প্রার্থনা করলে তোমাকে তা প্রদান করা হয়। সুতরাং আমাদেরকে যেন নবী বানান, সে জন্য দুআ করেন। তিনি আল্লাহ তায়ালার নিকট দুআ করেন এবং তাদেরকে নবী বানানো হয়।

وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ

এবং আমি তোমাদেরকে মেঘমালা দিয়ে ছায়া দিয়েছিলাম। غمام শব্দটি বহুবচন غمة শব্দের। এটি এমন এক জিনিষ যা আসমানকে ঢেকে রাখে এবং বাহ্যিক দৃষ্টি দিয়ে দেখা যায় না। আরবগণ এ অবস্থাকে مغموم নামে অভিহিত করেন। কেউ কেউ বলেন- যে غمام বনি ইসরাঈলকে ছায়া দিয়েছিল, তা মেঘমালা ছিল না।

وَأَنْزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَى

হযরত মুজাহিদ (রা.) হতে বর্ণিত, المن হল আঠালো জিনিষ। হযরত কাতাদাহ (রা.) হতে উল্লেখ আছে তিনি বলতেন, তাদের উপর মান্ন من বরফের ন্যায় অবতীর্ণ হত। কেউ কেউ বলেন- তা এক প্রকার পানি জাতীয় খাবার। হযরত রবি বিন আনাস (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, من পানীয় খাবার, যা মধুর মতো। তাদের উপর অবতীর্ণ হত এবং এর ভেতরে পানি ছিল। তা তারা পান করত। অন্য একদল বলেন 'মান্ন' মধুই ছিল। হযরত ইবনে যায়েদ (র.) বলেন, মান্না হচ্ছে মধু। হযরত জাবের (রা.) হযরত আমির হতে বর্ণিত, তিনি বলেন- পার্থিব মধু হচ্ছে মান্নার সত্তর অংশের এক অংশ। অর্থাৎ 'মান্নার' মধ্যে সত্তর ধরনের জিনিষ ছিল- তার মধ্যে মধুর অংশই তাদেরকে দেয়া হত। অনারা বলেন- মান্না একটি নরম ও পাতলা বস্তু। হযরত ওহব (র.)-কে প্রশ্ন করা হল মান্না কী? তিনি বলেন- তা নরম জিনিষ যা গমের ন্যায়। হযরত সুদ্দী (রা.) হতে বর্ণিত 'মান্না' তুরঞ্জাবীন গাছের উপর পড়ত, তা থেকে তারা খেত। হযরত ইবনে জুরাইয (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন- হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন- মান্না গাছের উপর পড়ত এবং তারা গাছের উপর বসে ইচ্ছে মতো খেত।

سلوى এক প্রকার পাখীর নাম যা দেখতে টিয়ার মতো। এক বচন এবং বহুবচন উভয় ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়। অনুরূপভাবে سمانى ও একবচন এবং বহুবচন উভয় ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়। আসমানী পাখী 'সালওয়া' সম্পর্কে কতেক ইমাম বলেন, যেমন হযরত আবদুল্লাহ বিন মাসউদ, আদী, কাতদাহ্ ইবনে আবু নজীহ (রা.) হযরত মুজাহিদ (রা.) হতে বর্ণনা করেন এবং হযরত ইবনে ওহাব (র.) ও বলেন, উহা কবুতরের মত ছিল। আর হযরত দ্বিহাক (র.) বলেন, سمانى হচ্ছে সালওয়া। হযরত আবু জাফর (র.) বলেন, বনী ইসরাইলের উপর মেঘের ছায়া এবং মান্ন ও সালওয়া অবতীর্ণ হওয়ার কারণ সম্পর্কে আলিমদের মধ্যে মতবিরোধ রয়েছে। আমার কাছে যা আছে তা উপস্থাপন করছি। হযরত মূসা বিন হারুন, হাদীস বর্ণনা করেন, তিনি হযরত হাম্মাদ (র.) হতে, তিনি আসবাত ইবনে নসর তিনি হযরত সুদ্দী (র.) হতে হাদীস বর্ণনা করেন। আল্লাহ্ তায়ালা মূসা (আ.)-এর কওমের তওবা কবুল করেন এবং যারা মৃত্যু বরন করেছিলেন তাদের মধ্য হতে সত্তর জনকে জীবিত করলেন। এ সত্তরজন যাদেরকে হযরত মূসা (আ.) নির্বাচিত করেছিলেন। আল্লাহ্ তায়ালা আরীহা নামক জায়গায় চলে যাওয়ার জন্য তাদেরকে নির্দেশ দিলেন। আরীহা হচ্ছে বায়তুল মুকাদ্দাসের একটি জায়গা। তারা তথায় সফর করলেন এবং তারা সেখানে পৌঁছার নিকটবর্তী হলেই হযরত মূসা (আ.) আরো বারটি গোত্র প্রেরণ করেন। তাদেরকে নির্দেশ দেয়া হল جبارين দের সাথে যুদ্ধ করতে। তারা হযরত মূসা (আ.)-কে বলল, আপনি ও আপনার প্রতিপালক গিয়ে তাদের সাথে যুদ্ধ করুন। আমরা এখানে বসে থাকব। তাদের এ কথায় হযরত মূসা (আ.)-এর রাগ আসে।

Scanned with CamScanner

রাগের বশে হযরত মূসা (আ.) আল্লাহ তায়ালার সমীপে দুআ করে বলেন, ইয়া আল্লাহ! আমি আমার এবং আমার ভাই এর দায়িত্ব ছাড়া আর কারো দায়িত্ব নিতে পারিনা। আল্লাহ! আমাদের ও ফাসিক কাওমের মধ্যে পার্থক্য করে দিন। এটাই ছিল হযরত মূসা (আ.)-এর অধৈর্যের কারণ। আল্লাহ তায়ালা হযরত মূসা (আ.)-এর প্রার্থনা মঞ্জুর করলেন এবং তীহ নামক এক জায়গায় পাঠিয়ে দিলেন যেখানে তারা চল্লিশ বৎসর ঘুরতে থাকে। এতে হযরত মূসা (আ.) লজ্জিত হলেন। হযরত মূসা (আ.)-এর নিকট তাঁর অনুসারীরা এসে বলেন-মূসা (আ.) এটা আপনি কী করলেন? এ কথায় হযরত মূসা (আ.) ও লজ্জিত হলেন। আল্লাহ তায়ালা হযরত মূসা (আ.)-এর নিকট ওহী পাঠালেন এবং বললেন তুমি ফাসিক কওমের জন্য আফসোস করনা। অর্থাৎ তোমার ভাষায় যাদেরকে তুমি ফাসিক নামে আখ্যায়িত করেছ, তাদেরকে নিয়ে চিন্তা করো না। তিনি তাদের চিন্তা ছেড়ে দিলেন। এরপর তারা হযরত মূসা (আ.)-কে বলেন এখানে আমরা কীভাবে পানি পেতে পারি, কীভাবে খাবার পেতে পারি? তখনই আল্লাহ্ তায়ালা "মান্ন" এবং "ছালওয়া" পাঠালেন তাদের খাবার হিসেবে। এগুলো লেবু গাছের উপর পতিত হত। আর সালওয়া হচ্ছে এক প্রকার পাখি যা সামানী এর সদৃশ। বনী ইসরাঈলের কাছে পাখিগুলো আসত তখন তারা দেখত এগুলো মোটা-তাজা কিনা? যদি হত তাহলে তা জবেহ করত, অন্যথায় তা ছেড়ে দিত। তারা এগুলো পেয়ে বলল এটাতো খাবার, পানিয় কোথায়? আল্লাহ তায়ালা হযরত মূসা (আ.)-কে নির্দেশ দিলেন- পাথরে লাঠি দিয়ে আঘাত করার জন্য। নির্দেশ অনুযায়ী হযরত মূসা (আ.) আঘাত করলে সাথে সাথে বারটি নাহার বা ঝরনা প্রবাহিত হয়। প্রত্যেক গোত্র পৃথক পৃথক ঝরনা হতে তৃপ্তি সহকারে পানি পানি করেন। তখন আবারও তারা বলল, খাবার ও পানিয় পাওয়া গেল, ছায়া কোথায়? এরপর তাদেরকে মেঘ দিয়ে ছায়া দেয়া হয়, তখন তারা বলল, তাহলে পোশাক কোথায় পাওয়া যাবে? এরপর কাপড় প্রেরণ করা হয়। তারা লম্বা হওয়ার সাথে সাথে এ কাপড়গুলো লম্বা হয়ে যেত যেমনি ভাবে শিশুরা দিন দিন লম্বা হত। তাদের এ কাপড় ছিড়ত ও না। একথার প্রতি ইঙ্গিত করে আল্লাহ্ তায়ালার নিম্নোক্ত বাণী-

وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنْزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوٰى এবং وَإِذِ اسْتَسْقٰى مُوسٰى لِقَوْمِهٖ فَقُلْنَا اضْرِبْ بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ ۖ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا ۖ قَدْ عَلِمَ كُلُّ اُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ ۔

"তীহ" হচ্ছে মিশর এবং সিরিয়ার মাঝখানে একটি জায়গা। যেখানে বনী ইসরাঈল চল্লিশ বৎসর পর্যন্ত ছিল। হযরত রবি বিন আনস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ এর ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেন- তীহ নামক জায়গায় তাদেরকে মেঘরাশি দিয়ে ছায়া দেয়া হয়। তারা ঐ জায়গায় সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত পাঁচ-ছয় মাইল হাঁটতে থাকত। প্রত্যেক সকালে একই জায়গায় হতে রওয়ানা হয়ে সন্ধ্যা পর্যন্ত চলতে থাকত এবং সন্ধ্যা হলে ঐ জায়গার ফিরে যেত এবং পরের দিন সকালে ঐ জায়গা হতে আবার বের হতো। এভাবে তারা চল্লিশ বছর পর্যন্ত ছিল। এ অবস্থায় তাদেরকে মান্ন ও ছালওয়া পাঠানো হত। তাদের কাপড় পুরাতন হতনা। তাদের সাথে তুর পাহাড়ের একটা পাথর ছিল। ঐ পাথর তাদের সাথে ছিল। যখন ঐ লোক তীহ শহরে পৌছল তখন হযরত মূসা (আ.)-তাতে তাঁর লাঠি দিয়ে আঘাত করলেন, সাথে সাথে বারটি নহর প্রবাহিত হয়। হযরত ওহাব (রা.)-এর রিওয়ায়তেও এ রকম

আছে, শুধু এটুকু অতিরিক্ত আছে।

قالوا فينا او لادفمانكسوا هم قال ثوب الصغير يثب معه وقالوا فيمان بصر تغشانا الظلمة فضرلهم عمورا من نود في وسط عسكرهم اضاء عسكرهم كله (الحديث)

অর্থাৎ বনী ইসরাঈলগণ বলল, আমাদের সন্তান আছে তাদেরকে কি পরাব? আল্লাহ বললেন, ছোট ছোট সন্তানদের পোশাক তাদের বড় হওয়ার সাথে সাথে বড় হয়ে যাবে। তারা বলল, অন্ধকার আমাদেরকে ঢেকে দিলে আমরা দেখব কি করে? তখন তাদের সৈন্যদলের মধ্যখানে আলোর একটি স্তম্ভ দেয়া হয় যার ফলে তাদের চতুর্দিক আলোকিত হয়ে যায়।

হযরত ইবনে জুরাইয (রা.) বলেন سلوى ও من একদিনের প্রয়োজনীয় পরিমাণের চেয়ে বেশী রেখে দিলে তা নষ্ট হয়ে যেত, তবে শনিবারের খাবার শুক্রবারে সংগ্রহ করে রাখা যেত, নষ্ট হত না।

كُلُوْا مِنْ طَيِّبٰتِ مَا رَزَقْنٰكُمْ

আমি যেই সমস্ত পবিত্র জিনিষ হতে রিযিক দান করেছি তা থেকে খাও। অর্থাৎ طيبات দ্বারা স্বাদ বুঝানো হচ্ছে।

وَمَا ظَلَمُوْنَا وَلٰكِنْ كَانُوْٓا اَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُوْنَ

আমি যা বললাম, তারা তার বিরোধীতা করলো। জুলুম শব্দের অর্থ وضع الشيء في غير موضعه যেই জিনিষকে যেই জায়গায় রাখা প্রয়োজন ও অপরিহার্য, সেই জিনিষকে সেই জায়গায় না রেখে অন্য জায়গায় রাখার নাম হচ্ছে ظلم। আল্লাহ তায়ালা একথা বলার রহস্য হচ্ছে এই যে, আল্লাহ তায়ালার আদেশ নিষেধ পালন না করলে, তাতে আল্লাহ্ তায়ালার কিছু আসে যায় না। কারণ এতে আল্লাহ তায়ালার কোন ক্ষতি হয় না, কোন অত্যাচারী অত্যাচার করলে আল্লাহ তায়ালার ভান্ডারে কোন কমতি আসেনা, অনুগতদের আনুগত্য দ্বারা এবং ইনসাফকারীর ইনসাফ দ্বারা আল্লাহ্ তায়ালার রাজত্বে কোন কিছু বৃদ্ধি হয় না বরং যালিম নিজের উপর নিজেই যুলুম করে বসে।

وَاِذْ قُلْنَا ادْخُلُوْا هٰذِهِ الْقَرْيَةَ

এখানে قرية শব্দের অর্থ হচ্ছে বায়তুল মুকাদ্দাস। এ অর্থ সম্পর্কে হযরত কাতাদাহ, সুদ্দী এবং রবি (রা.) একমত। কিন্তু হযরত ইবনে যায়েদ (রা.) বলেন- কারিয়াহ জায়গাটি বায়তুল মুকাদ্দাস এর নিকটবর্তী স্থানে অবস্থিত। আল্লাহ তায়ালা বলেন- যখন আমি বললাম তোমরা এ কারিয়ায় অর্থাৎ বায়তুল মুকাদ্দাসে প্রবেশ কর।

فَكُلُوْا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَّادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا

খাও এখান হতে যা ইচ্ছে স্বাচ্ছন্দ্যে বেহিসাব এবং সিজদারত অবস্থায় দরজা দিয়ে প্রবেশ কর। এখানে দরজা শব্দ বলে উদ্দেশ্য করা হয়েছে বায়তুল মুকাদ্দসের দরজা। এ উক্তি হচ্ছে হযরত মুজাহিদ (রা.) এবং হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর। কিন্তু তাঁদের আরও একটি উক্তি রয়েছে। তাঁরা বলেন باب শব্দের অর্থ الصغير অর্থাৎ সংকীর্ণ দরজা। আর সিজদা শব্দের অর্থ এখানে নেয়া হয়েছে রুকু রুকুতেও মাথা ঝুকাতে হয়। যদিও বা সিজদায় বেশী ঝুকাতে হয়। সংক্ষেপে কথা হচ্ছে সম্মান প্রদর্শন করে যে কোন মাথা নতকারীকে সিজদাকারী বলা হয়।

Scanned with CamScanner

وَقُوْلُوْا حِطَّةٌ

তারা বলেন, হে আল্লাহ্ তায়ালা আমাদের গোনাহসমূহ আমাদের থেকে লাঘব করে দিন। এটি হচ্ছে হযরত কাতাদাহ (রা.)-এর উক্তি। আর হযরত ইবনে যায়েদ (রা.) বলেন- حـــــطة অর্থ আল্লাহ্ তায়ালা তোমাদের ছোট-বড় সকল গোনাহ মিটিয়ে দিবেন।

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত, এভাবে হযরত রবি থেকেও বর্ণিত, হযরত ইবনে জুরাইয (রা.) হযরত ইকরামা (রা.) হতে বর্ণিত وقولوا حطة- অর্থ قولوا لا اله الـــه হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত, وقولوا حطة এর অর্থ امروا ان يستغفروا অর্থাৎ তাদের গোনাহ মাফ চাওয়ার জন্য নির্দেশ দেয়া হল।

نَغْفِرْلَكُمْ

আমি তোমাদেরকে ক্ষমা করে দিব আমার রহমতের বদৌলতে। অর্থাৎ আমার রহমত দিয়ে তোমাদের পাপকে ঢেকে দিব। তোমাদেরকে শাস্তি দেয়া হবে না। প্রকৃতপক্ষে, ক্ষমা অর্থ হল কোন কিছু ঢেকে দেয়া। সুতরাং যে কোন কিছু ঢেকে দেবে তাকেই غافر বলা হয়।

خَطٰيٰكُمْ

অর্থাৎ আপনি তাদেরকে বলে দিন আমি তোমাদের গোনাহ ক্ষমা করে দেব।

وَسَنَزِيْدُ الْمُحْسِنِيْنَ

অর্থাৎ আমি শীঘ্রই গোনাহকারীকে ক্ষমা করে দেব এবং যারা ইহসানকারী এবং সৎকর্মশীল তাদের ইহসান আরো বৃদ্ধি করব।

فَبَدَّلَ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِيْ قِيْلَ لَهُمْ

অতঃপর অন্যায়কারীরা পরিবর্তন করেছে ঐসব কথামালা, যা তাদেরকে বলা হয়েছিল। হযরত আবু হুরাইরা (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছিলেন- আল্লাহ তায়ালা বনী ইসরাইলকে বলেছিলেন- তোমরা সিজদাবনত হয়ে দরজা দিয়ে প্রবেশ কর। আমি তোমাদের অপরাধগুলো ক্ষমা করে দেব। তারা নির্দেশ পরিবর্তন করে গোড়ালীর উপর ভর দিয়ে শষ্য, গম ইত্যাদি বলে দরজা দিয়ে প্রবেশ করে। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতে ও এভাবে উল্লেখ রয়েছে। অর্থাৎ তারা আল্লাহ্ তায়ালার বলা শব্দগুলোকে অন্য শব্দের মাধ্যমে পরিবর্তন করেছিল। ســـجدا শব্দকে বদলিয়ে তারা নিতম্বের উপর ভর দিয়ে প্রবেশ করেছিল এবং حـــــطة শব্দকে حـــــنطة দিয়ে পরিবর্তন করেছিল।

فَاَنْزَلْنَا عَلَى الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا رِجْزًا مِّنَ السَّمَآءِ

তারপর আমি যালিমদের উপর আসমান হতে আযাব অবতীর্ণ করেছিলাম যেমন ঃ প্লেগ, পেটের, ব্যথা এবং অন্যান্য অসুখ।

بِمَا كَانُوْا يَفْسُقُوْنَ

যেহেতু তারা আল্লাহ তায়ালার অবাধ্য ছিল এবং আল্লাহ্ তায়ালার নাফরমানী করত। আল্লাহ্ তায়ালার অনুসরণ না করা এবং গোনাহের কাজের ঝোঁক থাকার নামই فسق এবং যারা একাজ করে তাদেরকে ফাসিক বলা হয়।

وَاِذِ اسْتَسْقٰى مُوْسٰى لِقَوْمِهٖ فَقُلْنَا اضْرِبْ بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ ؕ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا ؕ قَدْ عَلِمَ كُلُّ اُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ ؕ كُلُوْا وَاشْرَبُوْا مِنْ رِّزْقِ اللّٰهِ وَلَا تَعْثَوْا فِى الْاَرْضِ مُفْسِدِيْنَ ﴿٦٠﴾ وَاِذْ قُلْتُمْ يٰمُوْسٰى لَنْ نَّصْبِرَ عَلٰى طَعَامٍ وَّاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنْۢبِتُ الْاَرْضُ مِنْۢ بَقْلِهَا وَقِثَّآئِهَا وَفُوْمِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا ؕ قَالَ اَتَسْتَبْدِلُوْنَ الَّذِىْ هُوَ اَدْنٰى بِالَّذِىْ هُوَ خَيْرٌ ؕ اِهْبِطُوْا مِصْرًا فَاِنَّ لَكُمْ مَّا سَاَلْتُمْ ؕ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ ۗ وَبَآءُوْ بِغَضَبٍ مِّنَ اللّٰهِ ؕ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ كَانُوْا يَكْفُرُوْنَ بِاٰيٰتِ اللّٰهِ وَيَقْتُلُوْنَ النَّبِيّٖنَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ؕ ذٰلِكَ بِمَا عَصَوْا وَّكَانُوْا يَعْتَدُوْنَ ﴿٦١﴾

৬০. স্মরণ কর, যখন মূসা তার সম্প্রদায়ের জন্য পানি প্রার্থনা করলেন, আমি বললাম, তোমার লাঠি দ্বারা পাথরে আঘাত কর, ফলে তা হতে বারটি প্রস্রবণ প্রবাহিত হল। প্রত্যেক গোত্র নিজ নিজ পান-স্থান চিনে নিল। বললাম, আল্লাহ প্রদত্ত জীবিকা হতে তোমরা পানাহার কর এবং দুষ্কৃতকারীরূপে পৃথিবীতে অনর্থ সৃষ্টি করে বেড়াবে না।

৬১. যখন তোমরা বলেছিলে, হে মূসা! আমরা একই রকম খাদ্যে কখনও ধৈর্য্য ধারণ করব না। সুতরাং তুমি তোমার প্রতিপালকের নিকট আমাদের জন্য প্রার্থনা কর- তিনি যেন ভূমিজাত দ্রব্য, শাক-সব্জি-কাঁকুড়, গম, মসুর ও পেঁয়াজ আমাদের জন্য উৎপাদন করেন। মূসা বললেন, তোমরা কি উৎকৃষ্টতর বস্তুকে নিকৃষ্টতর বস্তুর সহিত বদল করতে চাও? তবে কোন নগরে অবতরণ কর। তোমরা যা চাও তা সেখানে আছে। তারা লাঞ্ছনা ও দারিদ্র্যগ্রস্ত হলো এবং তারা আল্লাহর ক্রোধের পাত্র হল। এটা এজন্য যে, তারা আল্লাহর আয়াতকে অস্বীকার করত এবং নবীগণকে অন্যায়ভাবে হত্যা করত। অবাধ্যতা ও সীমালংঘন করার কারনেই তাদের এই পরিণতি হয়েছিল।

Scanned with CamScanner

وَإِذِ اسْتَسْقٰى مُوْسٰى لِقَوْمِهٖ فَقُلْنَا اضْرِبْ بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ ۚ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا ۚ قَدْ عَلِمَ كُلُّ اُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ

আল্লাহ তায়ালার নিকট হযরত মূসা (আ.) পানি কামনা করেছিলেন, তাঁর কাওমকে পান করানোর উদ্দেশ্যে। যখন তারা তীহ শহরে পিপাসার্ত হয়ে পড়েছিল, তখন আল্লাহ্ তায়ালা হযরত মূসা (আ.)-কে বলেন, তুমি স্বীয় লাঠি দিয়ে পাথরে আঘাত কর। যখন হযরত মূসা (আ.) পাথরে আঘাত করলেন, তখন পাথর হতে বারটি নহর বা ঝরনা প্রবাহিত হয়েছিল যেহেতু বনি ইসরাইল এর মধ্যে বারটি গোত্রের লোক ছিল। প্রত্যেক গোত্রের লোকেরা নিজ নিজ ঝরনা চিনতে পেরেছিল। হাদীস শরীফে আছে-

عن ابن عباسؓ قال ذالك في التية ظلل عليهم الغمام وانزل عليهم المن والسلوي وجعل لهم ثيابا لا تبلي ولا تنسخ وجعل بين ظهر انيهم حجر مربع وامر موسي فضرب بعصاه الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا في كل ناحية منه ثلاث عيون لكل سبط عين ولا يرتحلو منقلة الا وجدوا ذالك الحجر معهم بالمكان التي كان به معهم في المنزل الاول ـ

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, এ ঘটনাটি ঘটেছিল তীহ প্রান্তরে। তাদের উপর মেঘ ছাঁয়া প্রদান করত এবং তাদের জন্য মান ও সালওয়া প্রেরণ করা হয়েছিল। তাদেরকে দেয়া হয়েছিল এক প্রকার কাপড় যা পুরনো হতনা এবং ছিড়েও যেতনা। তাদের সাথে ছিল একটি চম্পকোন পাথর। হযরত মূসা (আ.)-কে নির্দেশ দেয়া হল, তিনি লাঠি দিয়ে পাথরে আঘাত করলেন। তার থেকে বারটি ঝর্ণা প্রবাহিত হল। তাদের প্রতিটি দলের জন্য ছিল এক একটি ঝর্ণা। তারা যেখানেই যেত সেখানেই তাদের সাথে ঐ পাথরটি পেত, যা প্রথম অবতরণস্থানে তাদের সাথে ছিল।

অন্য হাদীসে হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন- হযরত ইয়াকুব (আ.)-এর বার সন্তান ছিল। প্রত্যেক সন্তান হতে এক একটি গোত্র এবং এক একটি উম্মত হয়েছে।

হযরত আবু জাফর (রা.) বলেন। আমাকে হযরত ইউনুস বিন আবদে আলা বলেন আমাদেরকে ইবনে ওহাব বলেন, তাঁকে হযরত ইবনে যায়িদ বলেন। হযরত মূসা (আ.) যখন তাঁর কওমসহ তীহ প্রান্তরে ছিলেন, তখন তিনি তাদের জন্য পানি প্রার্থনা করলেন। তারা যাওয়ার সময় ছাগলের মাথার মত একটা পাথর থলের ভিতর করে নিয়ে গিয়েছিল। হযরত মূসা (আ.) লাঠি দিয়ে সেই পাথরকে আঘাত করলে পাথর হতে প্রত্যেক গোত্রের জন্য বারটি ঝরনা প্রবাহিত হয়। বনী ইসরাইল এঝরণা হতে পানি পান করেন। কেউ কেউ বলেন- তাদেরকে বলা হয়েছিল থলের মধ্যে পাথরটি নিয়ে যেতে। যখন কোন স্থানে অবস্থান করতেন তখন তা বের করে নিক্ষেপ করতেন। হযরত মূসা (আ.) লাঠি দিয়ে আঘাত করতেন এবং সংগে সংগে নহর বা ঝরনা প্রবাহিত হত। এক একটি নাহার সমুদ্র সম ছিল।

كُلُوْا وَاشْرَبُوْا مِنْ رِّزْقِ اللّٰهِ

অর্থাৎ আল্লাহ্ তায়ালা তীহ প্রান্তরে মান্ন এবং সালওয়া প্রেরণ করেন। এসব খাওয়ার কথাই বলা হয়েছিল এবং পাথর হতে যেই প্রস্রবন বা নাহার প্রবাহিত করেছিলেন, তা হতে পান করার কথা বলা হয়েছিল।

وَلَا تَعْثَوْا فِي الْاَرْضِ مُفْسِدِيْنَ

অর্থাৎ তোমরা জমিনে ফিৎনা-ফ্যাসাদ করে চলা-ফেরা করনা।

وَاِذْ قُلْتُمْ يٰمُوْسٰى لَنْ نَّصْبِرَ عَلٰى طَعَامٍ وَّاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ

يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنْۢبِتُ الْاَرْضُ مِنْۢ بَقْلِهَا وَقِثَّآئِهَا وَفُوْمِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا

আর যখন তোমরা বললে হে মূসা! আর আমরা কখনো ধৈর্য্য ধারণ করব না-এক প্রকারের খাবারের উপর। সুতরাং তুমি তোমার রবের কাছে আমাদের খাদ্যের জন্যে দুআ কর, যা জমিন হতে উৎপাদন হয়। যেমন- শাক, কাঁকড়, গম বা রসূন, ডাল এবং পিয়াজ। অর্থাৎ তিহ প্রান্তরে বনি ইসরাইলকে খাওয়ার জন্যে "সালওয়া" এবং পান করার জন্যে "মান্ন" পাঠানো হয়েছিল, মেঘমালা দিয়ে ছায়া প্রদান করা হয়েছিল, শেষ পর্যন্ত এ'সব লোক বিরক্ত বোধ করে হযরত মূসা (আ.) এর নিকট প্রার্থনা করে-ঐসব খাদ্যের, যা তারা মিশর দেশে খেয়েছিল।

فوم শব্দের অর্থ রুটি। এ অর্থ নিয়েছেন হযরত আতা মুজাহিদ (রাহ.)। অপরদিকে হযরত কতাদাহ এবং হাসান বলেন الفوم هو الحب الذي تختبزه الناس অর্থাৎ ফুম হচ্ছে এক প্রকার দানা যা দিয়ে মানুষ রুটি তৈয়ার করে।

হযরত আবু- মালিক এবং হযরত সুদ্দী (রা.) বলেন فوم শব্দের অর্থ গম। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন فوم শব্দের অর্থ গম এবং রুটি দুটোই। তা ছাড়া তিনি আরও বলেন فوم শব্দের অর্থ বনি হাশেমের পরিভাষায় حنطة এবং অন্য এক দল বলেন فوم শব্দের অর্থ রসূন। হযরত মুজাহিদ রবি (র.) ও একই কথা বলেন। হযরত ইবনে মাসউদ (রা.)-এর কিরাতে فوم এর জায়গায় ثوم ছিল।

اِهْبِطُوْا مِصْرًا فَاِنَّ لَكُمْ مَّا سَاَلْتُمْ

অর্থাৎ তোমরা মিশরে অবতরণ কর। সেখানে তোমরা যা চাও তা অবশ্যই পাবে। অর্থাৎ হযরত মূসা (আ.) দুআ করেছিলেন, আল্লাহ তায়ালা তা কবুল করেন এবং নির্দেশ দেন- اِهْبِطُوْا مِصْرًا -অপর একদল, যেমন হযরত কাতাদাহ, সুদ্দী মুজাহিদ (রা.) বলেন اِهْبِطُوْا مِصْرًا অর্থ مصرا من الامصار শহর সমূহের মধ্য হতে যে কোন শহরে অবতরণ কর। পক্ষান্তরে হযরত আবুল আলিয়া এবং হযরত রবি (রা.) বলেন- মিশর বলতে এখানে ফিরাউনের মিশরকে বুঝানো হয়েছে। আর যারা مصرا من الامصار বলেছেন অর্থাৎ ফিরাউনের মিশর নয় বরং যে কোন শহর, তারা দলিল পেশ করে বলেন- আল্লাহ্ তায়ালা সিরিয়াকে বনী ইসরাঈলদের জন্য আবাসস্থল বানিয়েছিলেন মিশর থেকে বের করার পর। তাদেরকে তীহ-এ রেখে পরীক্ষা নেয়া হয়। কারণ তারা হযরত মূসা (আ.)-এর সাথে জব্বারীনদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা থেকে বিরত থাকে। যখন হযরত মূসা (আ.) তাদেরকে বলেন, হে আমার কাওম! তোমরা বায়তুল মুকাদ্দাসের যমীনে প্রবেশ কর, যা আল্লাহ্ তায়ালা তোমাদের জন্য নির্ধারণ করে রেখেছেন, তোমরা ফিরে যেওনা, কিন্তু তারা তাতে সম্মত না হয়ে বরং বলে, হে মূসা! আমরা যাব না যেহেতু ওখানে কাওমে জব্বারীন আছে। যতক্ষণ ওরা থাকবে আমরা যাব না- তুমি আর তোমার রব যাও। তাদের সাথে যুদ্ধ কর। আমরা এখানে বসে থাকব। এজন্য আল্লাহ্ তায়ালা তাদের উপর অসন্তুষ্ট হন এবং তীহ শহরে চল্লিশ বৎসর ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে রেখে দেন। তারপর তাদের বংশধরকে সিরিয়ায় অবতরণ করান এবং তারা তথায় অর্থাৎ পবিত্র জমিনে অবস্থান করেন। তাদের হাতেই মুসা (আ.)-এর ইন্তিকালের পর ইউশা বিন নূন এর নেতৃত্বে জাব্বারিনদের পতন ঘটেছিল।

Scanned with CamScanner

আল্লাহ্ তায়ালা তাদেরকে এভাবে অবহিত করেন- انـه كتب لهم الارض المقدسة তাদের জন্য পবিত্র জায়গা নির্ধারণ করা হয়েছে। অথচ এরকম বলা হয়নি যে, বনী ইসরাঈলকে মিশর হতে বের করার পর দ্বিতীয়বার মিশরে প্রবেশ করানো হবে। তাই, আমাদের জন্য মিশর দ্বারা সিরিয়া অর্থ নেয়া জায়িয। আর যারা ফিরাউনের মিশর অর্থ নেন, তারা দলীল পেশ করেন- আল্লাহ্ তায়ালার বাণী-

فَاَخْرَجْنٰهُمْ مِّنْ جَنّٰتٍ وَّعُيُوْنٍ ـ وَّكُنُوْزٍ وَّمَقَامٍ كَرِيْمٍ ـ كَذٰلِكَ وَاَوْرَثْنٰهَا بَنِيْٓ اِسْرَآئِيْلَ

"আমি তাদেরকে বাগানসমূহ ও ঝর্ণা হতে এবং ধন ভান্ডার ও সুউচ্চ স্থান হতে বের করলাম। এমনিভাবে তা ঘটেছিল। আর আমি বনী ইসরাঈলকে এসবের অধিকারী করেছিলাম।" (সূরা ঃ শুআ'রা-৫৭-৫৯)

এ আয়াতের জবাবে বলা যায় যে, আল্লাহ্ তাদেরকে মিশরের ওয়ারিশ অর্থাৎ মালিক বানিয়েছেন। কিন্তু তাদেরকে মিশরে প্রত্যাবর্তন করান এবং তাদের বাসস্থান সিরিয়া বানিয়েছেন। কারণ মালিকানার জন্য অবস্থান বা বাসস্থান হওয়া প্রয়োজন নয়। বরং অবকাশ রয়েছে যে, পরবর্তীদের মধ্য হতে কতেক মিশরে প্রবেশ করেন। কারণ অন্য একটি আয়াত তৎপ্রতি ইংগিত দেয় যেমন-

كَمْ تَرَكُوْا مِنْ جَنّٰتٍ وَّعُيُوْنٍ وَّزُرُوْعٍ وَّمَقَامٍ كَرِيْمٍ وَّنَعْمَةٍ كَانُوْا فِيْهَا فٰكِهِيْنَ كَذٰلِكَ وَاَوْرَثْنٰهَا قَوْمًا اٰخَرِيْنَ ـ

"তারা ত্যাগ করেছিল অনেক বাগান, নাহার, ক্ষেত, সম্মানিত জায়গা এবং নিয়ামত যার মধ্যে অনেক ফলমূল ছিল আবার কতেককে আমি ঐ জায়গার ওয়ারিশ বানিয়েছি।" (সূরা দুখান-২৫-২৮)

মোট কথা এ দুটো কথার মধ্যে কোনটি সঠিক এ ব্যাপারে কুরআনে পাকের কোন আয়াত ইশারা দেয় না এবং হযরত মুহাম্মদ (সা.) হতে অকাট্য কোন হাদিস পাওয়া যায় না। সুতরাং সঠিক হচ্ছে এ-ই, হযরত মূসা (আ.) আল্লাহ্ তায়ালার সমীপে আরজ করেছিলেন, তাঁর কওম জমিন হতে উৎপাদিত যেসব জিনিষ চেয়েছিলেন তা দেয়ার জন্য, তখন তারা তীহ শহরে অবস্থান করছিলেন, যেভাবে আল্লাহ্ তায়ালা নিজ কিতাবে বর্ণনা করেন। আল্লাহ্ তায়ালা হযরত মূসা (আ.)-এর প্রার্থনা কবুল করেন এবং তাঁকে আদেশ দেন, তার কওমকে সংগে নিয়ে যে দেশে এসব উদ্ভিদ উৎপন্ন হয়, সে জায়গায় চলে যাওয়ার জন্য, যখন তারা সে জায়গায় যায়, তথায় আল্লাহ্ তায়ালা তাদেরকে সে সব জিনিষ দেন। এখানে সম্ভাবনা রয়েছে যে, সে জায়গা মিশরও হতে পারে আবার সিরিয়াও হতে পারে। কিন্তু مصرا শব্দকে আলিফ ও দুই জবর ছাড়া পড়া জায়িয নেই। কারণ অন্যরকম পড়লে ইজমার খেলাপ হয়।

وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ

অর্থাৎ আমি তাদের উপর বেইজ্জতী এবং মুখাপেক্ষী অবশ্যাম্ভবী করে দিয়েছি। হযরত হাসান এবং কাতাদাহ (রা.) থেকে উল্লেখ রয়েছে- الذلة শব্দের সার কথা হচ্ছে, তাদেরকে কর দিতে হতো অথচ তাদের সামর্থ্য ছিল না। আর مسكنة শব্দের অর্থ মুখাপেক্ষী হয়ে থাকা এবং না খেয়ে থাকা। হযরত আবু আলীয়া (রা.) বলেন, مسكنة শব্দের অর্থ ক্ষুধার্ত এবং হযরত সুদ্দী (রা.) বলেন, مسكنة অর্থ হচ্ছে তাদের উপর লাঞ্ছনা ও প্রবঞ্চনা অপরিহার্য করা হয়েছে।

وَبَآءُوْا بِغَضَبٍ مِّنَ اللّٰهِ

অর্থাৎ এসব লোক আল্লাহ তায়ালার ক্রোধের হকদার হয়েছে।

ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ كَانُوْا يَكْفُرُوْنَ بِاٰيٰتِ اللّٰهِ وَيَقْتُلُوْنَ النَّبِيّٖنَ بِغَيْرِ الْحَقِّ

এ লাঞ্ছনা এ জন্যে যে, এ সব লোকেরা আল্লাহ তায়ালার আয়াত সমূহকে অস্বীকার এবং নবীদেরকে অন্যায়ভাবে হত্যা করে।

ذٰلِكَ بِمَا عَصَوْا وَّكَانُوْا يَعْتَدُوْنَ

তাদেরকে এ শাস্তি এ জন্যে দেয়া হয়েছে, যেহেতু তারা নাফরমান আর তাঁরা সীমা লঙ্ঘন করেছে।

اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَالَّذِيْنَ هَادُوْا وَالنَّصٰرٰى وَالصّٰبِئِيْنَ مَنْ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُمْ اَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ ۚ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ ﴿٦٢﴾ وَاِذْ اَخَذْنَا مِيْثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّوْرَ ۭ خُذُوْا مَآ اٰتَيْنٰكُمْ بِقُوَّةٍ وَّاذْكُرُوْا مَا فِيْهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ ﴿٦٣﴾ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ مِّنْ بَعْدِ ذٰلِكَ ۚ فَلَوْلَا فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهٗ لَكُنْتُمْ مِّنَ الْخٰسِرِيْنَ ﴿٦٤﴾ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِيْنَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُوْنُوْا قِرَدَةً خٰسِئِيْنَ ﴿٦٥﴾ فَجَعَلْنٰهَا نَكَالًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِيْنَ ﴿٦٦﴾

৬২. নিশ্চয়ই যারা ঈমান এনেছে, যারা ইয়াহুদী হয়েছে এবং খৃস্টান ও সাবিঈন- যারা আল্লাহ ও আখিরাতে ঈমান আনে ও সৎকাজ করে, তাদের জন্য পুরস্কার আছে তাদের প্রতিপালকের নিকট। তাদের কোন ভয় নেই এবং তারা দুঃখিতও হবে না।

৬৩. স্মরণ কর, যখন তোমাদের অঙ্গীকার নিয়েছিলাম এবং তূর-কে তোমাদের উর্ধ্বে উত্তোলন করেছিলাম; বলেছিলাম আমি যা দিলাম দৃঢ়তার সাথে গ্রহণ কর এবং তাতে যা আছে তা স্মরণ রাখ, যাতে তোমরা সাবধান হয়ে চলতে পার।

৬৪. এরপরও তোমরা মুখ ফিরালে! আল্লাহর অনুগ্রহ এবং অনুকম্পা তোমাদের প্রতি না থাকলে তোমরা অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্ত হতে।

৬৫. তোমাদের মধ্যে যারা শনিবার সম্পর্কে সীমালংঘন করেছিল।

Scanned with CamScanner

তাদেরকে তোমরা নিশ্চিতভাবে জান। আমি তাদেরকে বলেছিলাম, তোমরা ঘৃণিত বানর হও।

৬৬. আমি এটা তাদের সমসাময়িক ও পরবর্তীগণের শিক্ষাগ্রহণের জন্য দৃষ্টান্ত ও মুত্তাকীদের জন্য উপদেশ স্বরূপ করেছি।

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالنَّصَارَىٰ

অবশ্যই যারা ঈমান এনেছেন, এবং যারা ইহুদী বা নাসারা হয়েছে। ঈমানদার বলতে বুঝায় এমন লোক, যে আল্লাহর পক্ষ থেকে রাসূল যা নিয়ে এসেছেন তার প্রতি বিশ্বাস রাখে। ইহুদী ঐসব লোক যারা হিদায়তপ্রাপ্ত অর্থাৎ যারা তওবা করেছে। তাদেরকে ইহুদী বলার কারণ হচ্ছে তারা নিজেরাই বলত, আমাদেরকে হেদায়াত করা হয়েছে। النصاري এটি বহু বচন, যার একবচন হচ্ছে نصران । তাদেরকে নাসরান এজন্য বলা হয়, যেহেতু তারা পরস্পর পরস্পরকে সাহায্য করে। কেউ কেউ বলেন, তাদেরকে نصاري এ জন্য বলা হয় যেহেতু তারা এমন এক জায়গায় ছিল সেই জায়গার নাম ছিল নাসারা। কেউ কেউ انصاري الى الله থেকে নাসারা বলা হয় বলে মনে করেন। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত। نصاري কে نصاري এ জন্যে বলা হয়, যেহেতু হযরত ঈসা বিন মরিয়ম এর গ্রামের নাম নাসেরা ছিল। সেই গ্রামের অধিবাসীকে নাসেরীন বলা হত এবং ঈসা (আ.)-কে নাসেরী বলা হত।

وَالصَّابِئِينَ

এবং সাবেঈন। সাবেঈন হল নিজের ধর্ম ছেড়ে অন্য ধর্মের প্রবর্তক। যেমন ইসলাম ধর্ম ছেড়ে অন্য ধর্ম প্রবর্তন করে যখন, তখন তাকে মুরতাদ বলা হয়। যে নিজ ধর্ম হতে বের হয়ে যায় তাকে মুরতাদ বলা হয়। হযরত মুজাহিদ বলেন, সাবেঈন ইহুদীও না, আবার নাসারাও নয়। তাদের ধর্ম বলতে কিছুই নেই। ইহুদী এবং মজুস এর মধ্যবর্তী স্থানে তাদের অবস্থান। তারা কিছু জবেহ করলে তা খাওয়া জায়িয নেই এবং তাদের মহিলাকে বিবাহ করা জায়িয নেই। অনুরূপ বলেছেন হযরত কাতাদাহ, হাসান, আবু জুরাইয ইবনে জরীহ এবং ইবনে ওহাব (রা.)। হযরত ইবনে যায়েদ (রা.) সাবেঈন সম্পর্কে বলেন- সাবেঈনরা শুধু বলে لا اله الا الله তাদের কোন কিতাব নেই, কোন নবী নেই, তারা রাসূলুল্লাহ (সা.)-কে বিশ্বাস করেনা। এ জন্যে মুশরিকরা রাসূলুল্লাহ (সা.) এবং তাঁর আসহাবকে সাবেঈনদের সাথে তুলনা দিয়ে বলত هو لاء الصابئين অন্য একদল বলেন- তারা ফেরেশতাদের পূজা করত এবং কিবলার দিকে হয়ে নামায পড়ত। যেমন হযরত যিয়াদ হতে উল্লেখ আছে, সাবেঈন কিবলার দিকে হয়ে নামায পড়ে। হযরত যিয়াদ বলেন, ইচ্ছে ছিল তাদের টাক্স ক্ষমা করে দেব বা কর দেয়া হতে অব্যাহতি দেব কিন্তু খবর পেলাম তারা ফিরিশতাকে পূজা করে। হযরত কাতাদাহ হতে অনুরূপ বর্ণিত, পার্থক্য শুধু এত টুকু, তাঁর বর্ণনায় আছে তারা কিবলার দিকে নামায আদায় করে এবং জবুর কিতাব পাঠ করে। হযরত আবু জাফর রাজী (রা.) বলেন- সাবী এমন এক গোত্র, যারা ফিরিশতার পূজা করে, যবুর কিতাব পাঠ করে, কিবলার প্রতি নামায আদায় করে। হযরত সুদ্দী (রা.) বলেন- সাবেঈন আহলে কিতাবের একটি দল।

مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ

যারা আল্লাহ এবং আখেরাতের দিবসের উপর ঈমান এনেছেন এবং সৎকাজ করেছেন,

তাদের জন্য এর প্রতিদান রয়েছে তাদের পরওয়ারদেগারের কাছে। এখন যদি বলা যায়, মুমিন কিভাবে ঈমান আনবে? এর এক জওয়াব হচ্ছে যে এক ধর্মের উপর ঈমান এনেছিল, সে অন্য ধর্মের উপর ঈমান আনবে। যেমন- হযরত ঈসা (আ.)-এর উপর ঈমান আনয়নকারী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর উপর ঈমান আনবে এবং তার সত্যতা মেনে নেবে। কিন্তু মুমিনের ঈমান আনার দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে মুমিন হওয়ার পর ঈমানের উপর দৃঢ় থাকা। কিন্তু ইহুদী, নাসারা এবং সাবেঈন এর ঈমান আনার মর্মকথা হচ্ছে, হযরত মুহাম্মদ (সা.)-কে বিশ্বাস করা। সুতরাং যে ব্যক্তি হযরত মুহাম্মদ ও আখিরাতের দিবসের উপর ঈমান আনে এবং সৎকর্ম করে তার জন্যে তার রবের কাছে পুরস্কার ও বিনিময় রয়েছে।

হযরত আবু জাফর (রা.) বলেন- হযরত মূসা বিন হারুন (রা.) আমাকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন- আমাদেরকে আসবাত বিন নসর হযরত সুদ্দী (রা.) থেকে রিওয়ায়াতে করেন। إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا الاية এ আয়াতটি হযরত সালমান ফারসী এর সাথীদের সম্পর্কে অবতীর্ন হয়েছিল। হযরত সালমান সৈনিক ছিলেন এবং অভিজাতদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। সে দেশের রাজকুমারের সাথে তাঁর গভীর বন্ধুত্ব ছিল। তারা পরস্পর পরামর্শ করেই যে কোন কাজ করতেন। একদা তারা শিকার করার জন্যে সওয়ার হয়ে বের হলেন। তারা একটা ঘর দেখলেন। তারা এ ঘরের নিকট গেলেন। সেখানে তারা একজন লোককে দেখলেন, তার হাতে একটা মুসহফ, তিনি তা পড়ছেন এবং ক্রন্দন করছেন। এরা দু'জনে তাকে জিজ্ঞেস করলেন বিষয় কী? সেই লোকটি উত্তর দিলেন। এটা তোমরা জানতে চাইলে, আমি জানাব। তোমরা নেমে আস এ কথা শুনে তারা দু'জন সওয়ার হতে নীচে অবতরণ করলেন যেন জানতে পারেন। সেই লোকটি তাদেরকে বলেন- এ কিতাব আল্লাহ তায়ালার পক্ষ হতে অবতীর্ন হয়েছে। এতে তিনি নির্দেশ দিয়েছেন তাঁর আনুগত্যের, নিষেধ করেছেন তার অবাধ্যতা হতে। এখানে বলা হয়েছে তোমরা জিনা করবেনা, চুরি করবে না,অন্য লোকের ধন-সম্পদ অন্যায়ভাবে অধিকার করবে না। লোকটি এ কিতাবে যা আছে তাদেরকে বর্ণনা করে শুনালেন। এ কিতাব হল ইঞ্জিল, যা হযরত ঈসা (আ.)-এর উপর অবতীর্ন হয়েছিল। এ কথা তাদের অন্তরে রেখাপাত করল, তারা এর অনুসরণ করলেন, এবং তাঁর ধর্ম গ্রহণ করলেন। তিনি তাদেরকে আরো বলেন- তোমাদের সম্প্রদায়ের জবেহ করা জন্তুর গুশত এখন তোমাদের জন্যে হারাম। তারা তার সংগে অবস্থান করতে লাগলেন। এভাবে তারা দুজন তার থেকে অনেক কিছু শিখলেন। একদা রাজার বাড়ীতে বিশেষ অনুষ্ঠান আয়োজন করা হল। অনেক ধরনের খাবারের ব্যবস্থা হল এবং অনেক লোকের সমাগম হল। রাজপুত্রের নিকট লোক পাঠানো হল, যেন মানুষের সাথে বসে খাবার খান। তিনি তা খেতে অস্বীকার করলেন। তিনি বললেন, আমি একটু কাজে ব্যস্ত। আপনি আপনার বন্ধু-বান্ধব নিয়ে খান। এ কথা রাজাকে অবহিত করা হল। তখন রাজা তার ছেলের নিকট কারণ জানার জন্য লোক প্রেরণ করলেন এবং তাঁকে ডাকলেন। তাঁকে বলা হল- কী ব্যাপার? আপনি খাচ্ছেন না কেন? উত্তরে তিনি বলেন- তোমাদের জবেহ করা প্রাণী আমি খেতে পারিনা। যেহেতু তোমরা কাফির। তোমাদের জবেহ আমার জন্য হালাল নয়। রাজা তাঁকে বলেন- তোমাকে ঐ সব বাজে কথা কে বলেছে? তিনি বলেন, পাদ্রী এ ব্যাপারে বলছেন। অতঃপর পাদ্রীকে তলব করা হল। পাদ্রীকে বলা হল- আমার ছেলে এসব কি বলছে? পাদ্রী উত্তরে বলেন, আপনার ছেলে সত্য

Scanned with CamScanner

বলছেন। তখন রাজা বলেন- আমাদের জন্য রক্তপাত যদি নিষিদ্ধ না হত তা হলে এক্ষুনি তোমাকে হত্যা করে ফেলতাম। তুমি এক্ষুনি এ দেশ হতে বের হয়ে যাও। তাকে নির্বাসন করা হল। সালমান বলেন, আমরা তার জন্য কাঁদতে লাগলাম। সালমান তাদেরকে বলেন তোমরা যদি সত্যবাদী হও, তা হলে আমরা ৬০ জন লোক মাওসিল নামক স্থানের একটি গীর্জায় উপাসনা করি। সেখানে চলে আস। এই বলে পাদ্রী বের হয়ে আসলেন এবং সালমান ও রাজপুত্র রয়ে গেলেন। সালমান ইবনে মালিককে বলেন, তুমি আমাদের সাথে চল। ইবনে মালেক তাতে রাজী হলেন। রাজপুত্র তার ধন-সম্পদ বিক্রি করে দিলেন এবং যাওয়ার জন্য তৈয়ার হয়ে গেলেন। আস্তে আস্তে হযরত সালমানের কাছে গেলেন, সালমান বের হয়ে মাওসিলের সেই গীর্জায় চলে গেলেন। তারা সেখানে গিয়ে গীর্জার মালিকের কাছে অবতরণ করলেন। গীর্জার অধিবাসী সকলেই ছিলেন সম্ভ্রান্ত পাদ্রী। সালমান সেখানে তাদের সাথে আল্লাহ তায়ালার ইবাদতে মশগুল হয়ে গেলেন। তাকে শেখ বললেন তুমি নতুন, আমার ভয় হয় অতিরিক্ত কার্য দেখে তুমি অক্ষম হয়ে পড়তে পার সুতরাং তোমার জন্য যতটুকু সম্ভব হয় ততটুকু কর, হালকাভাবে ইবাদত কর। তখন উত্তরে হযরত সালমান শেখকে বললেন, আপনি যা নির্দেশ দিচ্ছেন তা উত্তম? না আমি যা করছি তা উত্তম। শেখ বললেন, তুমি যা করছ তাই উত্তম। সালমান বললেন তাহলে আমাকে ছেড়ে দিন। অতঃপর গীর্জার মালিক তাঁকে ডেকে বললেন, তুমি কি জান যে এ গীর্জা হচ্ছে আমার এবং আমিই ইহার আধিক হকদার। আমি যদি চাই, এদেরকে এ গীর্জা হতে বের করে দিতে তবে পারব। কিন্তু আমি উপাসনার ক্ষেত্রে খুবই দুর্বল। আমি চাই এ গীর্জা ছেড়ে অন্য একটি গীর্জায় চলে যেতে। সেখানে এখান থেকে কম উপাসনা হয়। তুমি যদি এখানে থাকতে চাও থাক, আমার সাথে যদি চলে যেতে চাও, চল। তখন হযরত সালমান বলেন, দুই গীর্জার মধ্যে কোনটি উত্তম? উত্তরে শেখ বলেন এটি। সালমান বলেন তা হলে এ গীর্জার মধ্যে আমি থাকব। সালমান সেখানে রয়ে গেলেন। তাদের সাথে ইবাদত করতে লাগলেন। তারপর গীর্জার পাদ্রী বায়তুল মোকাদ্দাসে যাওয়ার ইচ্ছে পোষণ করলেন। তিনি সালমানকে বললেন, তুমি যদি আমার সাথে চলে যেতে চাও, তা হলে চলে আস। যদি থাকতে চাও থাক। সালমান বলেন, কোনটা উত্তম? আপনার সাথে যাওয়া, না এখানে থেকে যাওয়া? শেখ উত্তর দিলেন আমার সাথে চলে যাওয়াই উত্তম। হযরত সালমান তার সাথে চললেন। পথিমধ্যে তাঁরা একজন অবশ রোগীর পাশ দিয়ে গেলেন। তাদেরকে দেখে সে বলল, হে পাদ্রী-সম্রাট! আমার প্রতি একটু করুনা করুন আল্লাহ আপনার প্রতি করুনা করবেন। কিন্তু তিনি তার সাথে কথাও বললেন না। তার দিকে তাকালেনও না। তারা দু'জন চলতে চলতে বায়তুল মোকাদ্দস এসে পৌঁছলেন। শেখ সালমানকে বললেন। বের হও, এখানে বিদ্যা তালাশ কর। পৃথিবীর বিভিন্ন স্থান হতে আলিমগণ বিদ্যা অর্জনের জন্য এখানে আসেন। সালমান বের হলেন, তাদের থেকে অনেক কিছু শ্রবণ করতে লাগলেন, শিখতে লাগলেন। একদিন সালমানকে চিন্তিত দেখা গেল। তাকে শেখ বললেন, সালমান তোমার কী হয়েছে? সালমান উত্তর দিলেন। আমি দেখছি, আমাদের পূর্ববর্তী নবীগণ ও তাদের অনুসারীগণ সকল কল্যাণ নিয়ে গেছেন। শেখ তাকে বললেন, হে সালমান! চিন্তা করবে না। এখনো একজন নবী বাকী আছেন। এমন এক নবী আসবেন, যার চেয়ে উত্তম আর কোন

নবী হবেন না, তার অনুসারী হওয়ার চেয়ে নবী হওয়া উত্তম নয়। তার আগমনের সময় এসে গেছে। সেই জমানায় হয়ত আমি থাকবনা। তুমি জোয়ান, তুমি সেই নবীকে পেতে পার। তিনি আরব দেশেই আর্বিভূত হবেন। তুমি তাকে পেলে, তার উপর ঈমান আনবে এবং তাঁর অনুসরণ করবে। সালমান তাকে বললেন। তার কিছু চিহ্ন সম্পর্কে আমাকে অবহিত করুন। তিনি বললেন- হ্যাঁ, করছি। তাঁর পিঠে খতমে নবুওয়তের মোহর প্রদর্শিত হবে। তিনি হাদিয়া গ্রহণ করবেন, সদকা গ্রহণ করবেন না। অতঃপর তারা প্রত্যাবর্তন করলেন। আসার পথে তিনি আগের মতোই ঐ অবশ রোগীর পাশ দিয়ে আসলেন। যখন তাঁর কাছে পৌছলেন আগের মতোই ডাক শুনলেন। হে পাদ্রীদের নেতা। আমাদেরকে মেহেরবানী কর, আল্লাহ তোমাকে মেহেরবানী করবেন। যাওয়ার পথে তারা সেই আহবানে সাড়া না দিলেও এবার তাদের প্রতি দয়া পরবশ হয়ে এগিয়ে গেলেন। শেখের হাত আগাইয়া দিলেন এবং বললেন قم باذن الله আল্লাহর নির্দেশে দাঁড়িয়ে যাও। সে দাঁড়িয়ে গেল। এ অবস্থা দেখে সালমান আশ্চর্য হয়ে গেলেন। সালমান তৎপ্রতি লক্ষ্য করতে লাগলেন। ইতোমধ্যে পাদ্রী অদৃশ্য হয়ে গেলেন। সালমান এ দৃশ্য দেখে ভয় পেলেন। তিনি পাদ্রীকে তালাশ করতে লাগলেন। আরব দেশের কালিব গোত্রের দু'জন লোকের সাক্ষাৎ পেলেন। সালমান তাদেরকে রাহিব সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলেন এবং বললেন, তোমরা কি রাহিবকে দেখেছ? তাদের মধ্যে একজন তাঁর বাহন থামালেন এবং বললেন হ্যাঁ। তিনি তো উটের রাখাল। অতপর লোকটি তাঁকে তার বাহনে করে মদীনায় নিয়ে গেল। সালমান বলেন, এ সময় চিন্তা আমাকে এমনভাবে পেয়েছিল, আর কখনও এমনভাবে পায়নি। অতঃপর তাকে জুহাইনা সম্প্রদায়ের এক মহিলা খরিদ করল। তিনি এবং ঐ মাহিলাটির অন্য এক দাসের সাথে পালাক্রমে তাঁর ছাগল চরাতেন। সালমান সেখানে হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর সাক্ষাতের জন্য অপেক্ষা করতে লাগলেন এবং দিরহাম জমা করতে লাগলেন। এমতাবস্থায় একদিন সালমান ছাগল চরাচ্ছেন। ঠিক সে সময় তাঁর সঙ্গী লোকটি তাঁর কাছে এসে বলল, আপনি কি জানেন? আজ মদীনায় এমন এক লোক আগমন করেছেন, যিনি নিজেকে নবী বলে দাবী করেন। ইহা শুনে সালমান বললেন, তুমি ছাগলগুলো দেখ, আমি আসছি। এ বলে তিনি মদিনায় চলে গেলেন। তিনি নবী (সা.)-কে দেখলেন, তাঁর চারদিক প্রদক্ষিণ করলেন, যখন মহানবী (সা.) তাকে দেখলেন, তিনি তাঁর মনের ভাব বুঝতে পারলেন। তাই তাঁর কাপড় একটু উত্তোলন করলেন, তাতে তাঁর খতমে নবুয়ত (সা.) বের হয়ে পড়ল। তিনি তা দেখে মহানবী (সা.)-এর কাছে আসলেন এবং কথা বললেন অতপর চলে গেলেন।

ফিরে এসে দিনার বা টাকা দিয়ে কিছু ছাগলের গোশত এবং রুটি কিনলেন এবং তিনি তা হযরত (সা.)-কে খাওয়ার জন্যে পেশ করলেন। সালমান বললেন, এসব সদকা। রাসূলুল্লাহ (সা.) বললেন- আমার সদকার প্রয়োজন নেই। এসব নিয়ে যাও। অন্যান্য মুসলমানদেরকে খাওয়ার জন্য দিয়ে দাও। তারপর সালমান চলে আসলেন এবং দিনার দিয়ে আরও কিছু রুটি এবং গোশত খরিদ করলেন। তা আবার নবী (সা.)-এর খেদমতে পেশ করলেন। রাসূলুল্লাহ (সা.) বললেন, এসব কী? সালমান বললেন হাদিয়া। রাসূলুল্লাহ (সা.) কথা বলতে বলতে সবগুলো খেয়ে নিলেন। এক ফাঁকে হযরত মুহাম্মদ (সা.) সালমানের বন্ধু-বান্ধব সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি

Scanned with CamScanner

বলেন, তারা রোজা রাখেন, নামাজ পড়েন এবং আপনাকে বিশ্বাস করেন বা আপনার উপর ঈমান আনেন। এ কথার সাক্ষ্য দেন- আপনি শীঘ্রই নবী হয়ে প্রকাশ লাভ করবেন। সালমান যখন নবী (সা.)-এর প্রশংসা শেষ করলেন, তখন রাসূলুল্লাহ (সা.) তাকে বলেন- হে সালমান! তারা জাহান্নামী। এতে সালমান এর মনে আশংকা জাগল। তিনি বললেন, যদিও সে আপনাকে পায় আপনাকে সত্যায়ন করে এবং আপনার অনুসরণ করে, তবুও কি তারা জাহান্নামী হবে? তিনি আরো বললেন, তারা আপনাকে বিশ্বাস করে এবং আপনার অনুসরণ করে। সে সম্পর্কে এ আয়াত নাযিল হয়- اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَالَّذِيْنَ هَادُوْا وَالنَّصَارٰى وَالصَّابِئِيْنَ

ইহুদীরা ঈমানদার ছিল- তারা তৌরাত কিতাব ধারণ করেছিল এবং হযরত মূসা (আ.)-এর অনুসারী ছিল কিন্তু তারা হযরত ইসা (আ.)-কে পেল কিন্তু হযরত ইসা (আ.)-কে অনুসরণ করল না- তাহলে তারা নিজেই নিজকে ধ্বংস করল। এভাবে হযরত ইসা (আ.)-এর অনুসরণ করলো এবং ইঞ্জিল কিতাব ধারণ করলো বটে, কিন্তু হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর সাহচর্য পাওয়া সত্তেও তাঁকে অনুসরণ করলো না, তাহলে জেনে রাখ তারা নিজেই নিজেকে ধ্বংস করল।

হযরত মুজাহিদ হতে অন্য এক রিওয়ায়েত আছে اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَالَّذِيْنَ هَادُوْا এর মধ্যে সালমান ফারসী হযরত রাসূলুল্লাহ (সা.)-কে ঐসব নাসারাদের অবস্থা এবং অবস্থান সম্পর্কে বলেন। তখন তিনি বলেন- لم يموتوا على الاسلام তারা ইসলামের উপর মৃত্যুবরণ করেনি। সালমান বলেন- সেই সময় আমি জমিনকে অন্ধকার দেখি এবং তাদের পরিশ্রমকে স্মরণ করি। যখন এ আয়াত নাযিল হয়, রাসূলুল্লাহ (সা.) সালমানকে ডেকে বলেন- এ আয়াত তোমার আসহাব সম্পর্কে নাযিল হয়েছে।

قال النبي ﷺ من مات على دين عيسى ومات على الاسلام قبل ان سمع بي فهو على خير ومن سمع بي اليوم ولم يؤمن بي فقد هلك

হযরত রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন- যে ব্যক্তি হযরত ইসা (আ.)-এর ধর্মের উপর মারা গেল তার মৃত্যু এ অবস্থায় হয়েছে যখন ইসলামের আবির্ভাব হয়নি। তাহলে সে ভালভাবে মৃত্যু বরণ করল কিন্তু ইসলামের দাওয়াত পাওয়ার পর যে ব্যক্তি মুসলমান না হয়ে মারা গেল, সে ধ্বংস প্রাপ্ত হল।

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত- اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَالَّذِيْنَ هَادُوْا وَالنَّصَارٰى থেকে وَلَاهُمْ يَحْزَنُوْنَ পর্যন্ত অবতীর্ণ হয়। এর পর নাযিল হয়

وَمَنْ يَّبْتَغِ غَيْرَ الْاِسْلَامِ دِيْنًا فَلَنْ يُّقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْاٰخِرَةِ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ

"যে ইসলামকে বাদ দিয়ে কোন ধর্মের অন্বেষণ করবে তার কাছ থেকে তা গ্রহণ করা হবে না আর পরকালে সে ক্ষতিগ্রস্থদের অন্তর্ভুক্ত হবে।" (সূরা ঃ আলে-ইমরান-৮৫)

এ হাদীস হতে এ কথা স্পষ্ট হয়ে উঠে, হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) এর এটাই রায় ছিল যে, ইহুদী-নাসারা এবং সাবিয়ীনদের মধ্যে হতে যে-ই নিজ ধর্ম অনুযায়ী ভাল কাজ করবে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। পরে وَمَنْ يَّبْتَغِ غَيْرَ الْاِسْلَامِ دِيْنًا فَلَنْ يُّقْبَلَ مِنْهُ আয়াত দ্বারা তা রহিত হয়েছে।

وَاِذْ اَخَذْنَا مِيْثَاقَكُمْ

এখানে مِيْثَاق শব্দের প্রকৃত অর্থ হচ্ছে প্রতিশ্রুতি। যেমন আল্লাহ তায়ালা উল্লেখ করেন وَاِذْ اَخَذْنَا مِيْثَاقَ بَنِيْ اِسْرَائِيْلَ لَا تَعْبُدُوْنَ اِلَّا اللّٰهَ 'যখন আমি বনি ইসরাইল হতে

এ মর্মে ওয়াদা নিলাম- তারা আল্লাহ তায়ালা ছাড়া আর কারো 'ইবাদত করবে না এবং মাতা-পিতার সাথে ভাল ব্যবহার করবে।' আর তাদের থেকে ওয়াদা নেয়ার কারণ হল- হযরত ইবনে যায়িদ হতে বর্ণিত, যখন হযরত মূসা (আ.) তাওরাত কিতাব নিয়ে আল্লাহ তায়ালার দরবার হতে ফিরে আসলেন, তিনি তার কওম বনী ইসরাঈলকে বললেন- এই যে ফলক এটা আল্লাহ তায়ালার কিতাব। এখানে যে সব আদেশ ও নিদের্শমালা রয়েছে, তাই তিনি তোমাদেরকে আদেশ করেন এবং তার নিষেধাজ্ঞা সমূহও এখানে আছে। তারা বলে তোমার এসব কথা তুমি ছাড়া আর কে বিশ্বাস করবে? যতক্ষণ আমরা আল্লাহ তায়ালাকে স্পষ্ঠভাবে দেখব না, ততক্ষণ বিশ্বাস করব না। এমন কি, আল্লাহ আমাদের কে দেখা দিয়ে বলবেন, এটি আমার কিতাব, এটি গ্রহণ কর। তারা বলেন, আল্লাহ তায়ালা কেন আপনার সাথে যেমনি কথা বলেন, তেমনি আমাদের সাথে কথা বলেন না? তাদের এ রকম আচরণে আল্লাহ তায়ালার গজব নাযিল হল। এক ধরনের বিকট শব্দ হল। যার ফলে সকলেই মরে গেলেন। তাদের মৃত্যুর পর আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে জীবিত করলেন। তখন হযরত মূসা (আ.) তাদেরকে বলেন, আল্লাহ তায়ালার কিতাব গ্রহণ কর। তারা বলেন, না। মূসা (আ.) বললেন তোমাদের কি হয়েছিল? তারা বলল, আমরা মরে গিয়েছিলাম আবার জীবিত হয়েছি। হযরত মূসা (আ.) বলেন- এটি আল্লাহ তায়ালার প্রেরিত কিতাব, গ্রহণ কর। তারা বলে, 'না'। তাদের এ বাক বিতন্ডায় আল্লাহ তায়ালা নারাজ হয়ে ফেরেশতা পাঠালেন এবং তাদের উপর পাহাড় উঠিয়ে দিলেন। তাদেরকে বলা হল, তোমরা এটি কি জান? তারা বলেন হ্যাঁ! এটি তূর পাহাড়। হযরত মূসা (আ.) বলেন, আল্লাহ তায়ালার কিতাব গ্রহণ কর, না হয় এ পাহাড় আমি তোমাদের উপর উঠিয়ে দেব। এরপর তারা এটা গ্রহণ করার প্রতিশ্রুতি দিল। আল্লাহ বলেন তোমরা আল্লাহ ব্যতীত আর কারো ইবাদত করবেনা এবং মাতা-পিতার সাথে ভাল ব্যবহার করবে। তারা যদি প্রথমেই কিতাব গ্রহণ করতো, তা হলে ميثاق বা প্রতিশ্রুতি নেয়া হতো না।

وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّوْرَ

আরবীদের ভাষায় পাহাড়কে طـــور বলা হয়। তাছাড়া সুরয়ানী ভাষায় ও পাহাড়কে তূর বলা হয়। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন যেই পাহাড়ে বৃক্ষাদি জন্মে, উহাকে তূর বলে। আর যেই পাহাড়ে বৃক্ষাদি জন্মে না তাকে তূর বলে না। হযরত সুদ্দী (রা.)-এর একটি রেওয়ায়তে আছে- যখন আল্লাহ তায়ালা বনী ইসরাঈলকে বলেন, اُدْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَّقُوْلُوْا حِطَّةٌ তখন তারা সিজদা করতে অস্বীকৃতি জানাল। আল্লাহ তায়ালা পাহাড়কে নির্দেশ দিলেন। পাহাড় তখন তাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। যখন ঐ সমস্ত লোকেরা দেখল, পাহাড় তাদেরকে ঢেকে ফেলেছে। তখন তারা কপালের এক পাশ দিয়ে সিজদায় নত হয়ে পড়ল। এবং কপালের অন্য পাশ দিয়ে দেখতে লাগল। আল্লাহ তায়ালা তাদের উপর দয়া করলেন এবং তাদের থেকে মুসিবত দূর করলেন। এ জন্যে বলা হয় وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّوْرَ হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, الطور الجبل الذي نزلت عليه التورٰة يعني على موسى তূর ঐ পাহাড় যাতে হযরত মূসা (আ.) এর উপর তওরাত নাযিল হয়েছিল।

Scanned with CamScanner

خُذُوْا مَا اٰتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ

তোমরা শক্তভাবে ধর, যা আমি তোমাদেরকে দিয়েছি। অর্থাৎ হযরত মূসা (আ.) যে কিতাব এনেছেন, তা সত্য এবং যথাযথ তা জেনে এবং বিশ্বাস করে গ্রহণ কর। হযরত আবু জাফর (রা.) বলেন, আমাকে হযরত ইউনুস বিন আবদুল আলা বর্ণনা করেন, তিনি বলেন- আমাদেরকে ইবনে ওহব (রা.) অবহিত করেন। তিনি হযরত ইবনে যায়েদ (রা.)-কে আল্লাহ তায়ালার বানী- خُذُوْا مَا اٰتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছিলেন। তিনি উত্তরে বলেন-এর অর্থ হল হযরত মূসা (আ.) যা এনেছেন তা সত্য এবং হক জেনে গ্রহণ কর। এর ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেন خُذُوْا مَا اٰتَيْنٰكُمْ এর অর্থ এ কিতাবে যা কিছু কতর্ব্য বা ফরজ করা হয়েছে তা গ্রহণ কর এবং তা আদায় করতে যথাযথভাবে চেষ্টা কর। তাতে কম করনা এবং অলসতা করনা। এটাই হচ্ছে সঠিক অর্থ।

وَاذْكُرُوْا مَا فِيْهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ

অর্থাৎ এ কিতাবের মধ্যে যা আছে তা স্মরণ কর। যাতে করে তোমরা মুত্তাকী হতে পারবে। অর্থাৎ আমি যা কিছু কিতাবে দিয়েছি- যেমন ওয়াদা বা প্রতিশ্রুতি এবং وعـــد আজাবের কথা, প্রেরণা, ভয়-ভীতি-এসব বারবার স্মরণ কর, চিন্তা কর, এর থেকে শিক্ষা গ্রহণ কর। যখন এসব করবে তা থেকে তোমাদের মধ্যে তাকওয়া সৃষ্টি হবে এবং আমার আজাবকে ভয় কর, তা তোমাদেরকে গোমরাহী এবং নাফরমানী থেকে রক্ষা করবে।

ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ مِّنْ بَعْدِ ذٰلِكَ

কিন্তু তোমরা এরপর এ প্রতিশ্রুতি ভুলে গেলে অর্থাৎ তোমরা আমল করা ছেড়ে দিলে।

فَلَوْلَا فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهٗ لَكُنْتُمْ مِّنَ الْخٰسِرِيْنَ

যদি তোমাদের উপর আল্লাহ তায়ালার রহমত না হত, তা হলে তোমরা অনেক ক্ষতির সম্মুখীন হতে অর্থাৎ তোমাদের দুআ কবুল না করলে, তোমাদের দোষত্রুটি ক্ষমা না করলে এবং তোমাদেরকে রক্ষা না করলে তোমরা ধ্বংস হয়ে যেতে।

وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِيْنَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ

অবশ্যই তোমরা ঐ সমস্ত লোককে জান, যারা শনিবারে সীমা লংঘন করেছে। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, আল্লাহ তায়ালা এমন কোন নবী প্রেরণ করেননি, যাদেরকে জুমা সম্পর্কে নির্দেশ দেয়া হয়নি বরং তাদেরকে জুমার ফযীলত সম্পর্কে অবহিত করা হয়েছে। আর জুমার ফযীলত আসমানের ফেরেশতাদের নিকট প্রকাশ করা হয়। আর আল্লাহ এটাও বলে দিয়েছেন যে, কিয়ামত জুমাবারেই অনুষ্ঠিত হবে। অতীতের উম্মতগণের মধ্যে, যাঁরা নিজের নবীর অনুসরণ করেন যেমনিভাবে উম্মতে মুহাম্মদ (সা.) তাঁদের নবীর অনুসরণ করেন এবং জুমাকে কবুল করেন, নবীর অনুসরণ করেন, জুমার ফযীলত সম্পর্কে অবগত হয়েছেন এবং আল্লাহ ও তার রাসূলের আদেশের উপর দৃঢ় রয়েছেন তাঁরা তো অবশ্যই কল্যাণের মধ্যে রয়েছেন। পক্ষান্তরে যারা এরকম করেনি, তারা ঐ সকল লোকদের মত যাদের কথা আল্লাহ তায়ালা لَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِيْنَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُوْنُوْا قِرَدَةً خَاسِئِيْنَ আয়াতে উল্লেখ করেছেন। তারা সীমালংঘন করায় বানর হয়ে গিয়েছিল। তা এ জন্য যে, যখন হযরত মূসা (আ.) ইহুদীদেরকে জুমা সম্পর্কে আদেশ করেছিলেন এবং

জুমাবারের ফযীলত সম্পর্কে অবহিত করেছিলেন, তখন ইহুদীরা বলেছিল, হে মূসা! কীভাবে আমাদেরকে জুমার আদেশ করেন এবং জুমাবারকে অন্যান্য দিনের উপর মর্যাদা প্রদান করেন, অথচ শনিবার সকল দিনের মধ্যে উত্তম দিন। কারণ আল্লাহ তায়ালা আসমান, জমীন এবং দিবা-রাত্রি ছয় দিনে সৃষ্টি করেছেন এবং শনিবার আল্লাহ তায়ালার জন্য নির্ধারন করে রেখেছেন। আর প্রত্যেক বস্তু শনিবারের অনুগত। ছয় দিনের শেষ দিন শনিবার। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, এভাবে নাসারাগণকে যখন জুমার আদেশ দেয়া হয়েছিল, তখন তারা হযরত ঈসা (আ.)-কে বলেছিল نامرنا بالجمعة আমাদেরকে জুমা সম্পর্কে আদেশ দিন। উহা দিন সমূহের মধ্যে প্রথম দিন, সকল দিনের মধ্যে উত্তম এবং দিনসমূহের সরদার। যে প্রথম সেই সর্বোত্তম হয়ে থাকে। আল্লাহ এক, আর একই হচ্ছে প্রথম। আল্লাহ তায়ালা হযরত ঈসা (আ.)-কে বলেছিলেন, তুমি তাদেরকে একত্বের দাওয়াত দাও; কিন্তু তারা সে দাওয়াত কবুল করেনি। আল্লাহ তায়ালা তাদের এসব কাহিনী কিতাবের মধ্যে বর্ণনা করেন। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, এভাবে আল্লাহ তায়ালা হযরত মূসা (আ.)-কে বলেছিলেন, যখন ইহুদীরা তাঁকে শনিবার সম্পর্কে বলেছিল- তারা এদিন মাছ মিথার করবেনা তারা এদিন কোন কাজ করবেনা। বর্ণনাকারী বলেন, যখন তাদেরকে শনিবার দেয়া হল তখন দেখা গেল শনিবার মাছগুলো পানির উপর ভেসে উঠে কিন্তু অন্যান্য দিন অনুরূপ হয়না। যখন তারা তা দেখল তাদের লোভ হল, আবার শাস্থির ভয়ও হল। কেউ কেউ শনিবার মাছ ধরল আবার কেউ কেউ মূসা (আ.)-এর কথায় মাছ ধরলনা। দেখা গেল যারা শনিবারে মাছ ধরেছিল, তাদের কোন বিপদ হল না। এ অবস্থা দেখে অধিকাংশ লোকেই শনিবারে মাছ ধরতে শুরু করল। তারা হযরত মূসা (আ.)-এর কথার উপর আস্থা হারিয়ে ফেলল, এদিকে ইঙ্গিত করেই আল্লাহ তায়ালা বলেন- وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِيْنَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُوْنُوْا قِرَدَةً خَاسِئِيْنَ

আল্লাহ তায়ালা যারা শনিবারে মাছ ধরেছিল তাদেরকে বানর বানিয়ে দিয়েছিলেন, আল্লাহ তায়ালার নির্দেশ অমান্য করার কারণে। তারা জমিনে শুধু তিন দিন জীবিত ছিল। এ সময়ের মধ্যে তারা খেতেও পারেনি, পান করতে ও পারেনি, বংশ বিস্তার ও করতে পারেনি

আল্লাহ তায়ালা বানর, শুকর এবং সমস্ত সৃষ্টি ছয় দিনের মধ্যে সৃষ্টি করেছিলেন। যেমন আল্লাহ তায়ালা কুরআন শরীফে উল্লেখ করেছেন। আল্লাহ তায়ালা এ কওমকে বানরের আকৃতিতে পরিণত করেছিলেন। এটাই আল্লাহ তায়ালার মহত্ব। তিনি যাকে যেভাবে ইচ্ছে করেন, সেভাবে সৃষ্টি করেন এবং যেভাবে ইচ্ছা সেভাবে রূপান্তরিত করেন।

হযরত ইকরামা হতে বর্ণিত, তিনি হযরত ইবনে আব্বাসের (রা.) আযাদ করা গোলাম ছিলেন। তিনি বলেন হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেছিলেন, বনী ইসরাঈলদের উপর জুমাবার ফরজ করা হয়েছিল কিন্তু তারা তা প্রত্যাখ্যান করে শনিবারকে গ্রহণ করেছিল এবং শনিবারকে মর্যাদাবান মনে করেছিল। তাদেরকে যা যা নির্দেশ দেয়া হয়েছিল, তার উল্টোই তারা করেছিল।

যখন তারা অস্বীকার করল, শনিবারকেই তারা জরুরীভাবে গ্রহণ করল, তখন আল্লাহ তায়ালা তাদের পরীক্ষা গ্রহণের জন্য অন্যান্য দিন হালাল ছিল এমন বিষয়ও

Scanned with CamScanner

শনিবারে হারাম করে দিলেন। তারা ইলা এবং তুর এর মধ্যবর্তী স্থানে ছিল। যে স্থানকে মাদয়ান (হযরত শুয়াইব (আ.)-এর কওম) বলা হত। তাদের উপর শনিবার মাছ ধরা হারাম করা হল, এ সময় তাদের মধ্যে একজন ইচ্ছাকৃতভাবে শনিবারে গোপনে তীর মেরে মাছ ধরল। মাছটি সুতো দিয়ে বেঁধে পানিতে ছেড়ে দিল যেন যেতে না পারে এবং সে পরের দিন সেই মাছটি তুলে আনল। যেন শনিবারে মাছ মেরেছে, সেই অভিযোগ হতে রক্ষা পায়। যখন পরবর্তী শনিবার আসল, তখন ও সে এভাবে মাছ ধরে খেল। লোকে বলাবলি আরম্ভ করল, আমরা মাছের ঘ্রাণ পেয়েছি। তারপর তারা ঐ ব্যক্তির মাছ ধরার পদ্ধতি সম্পর্কে অবগত হল। তাকে অনুসরণ করে অন্য লোকেরা ও মাছ ধরতে শুরু করল এবং গোপনে এভাবে অনেক দিন ধরে মাছ খেতে লাগল। তাদের উপর আল্লাহ তায়ালার নিকট হতে কোন শাস্তি আসল না। তাই তারা নির্ভয়ে প্রকাশ্যে মাছ ধরতে শুরু করল, এমন কি বাজারে বিক্রি করতে লাগল। তাদের মধ্যে থেকে খোদা ভীরু এক দল লোক বললেন, তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং তারা যেন আল্লাহ্ তায়ালার নিষিদ্ধ কাজ না করে, যা তারা করছিল তা থেকে বিরত থাকতে বললেন। আর একটি দল ছিল যারা নিজে মাছ খায় নাই এবং অন্যদেরকে বাধা ও দেয় নাই। তারা প্রথম দলকে উদ্দেশ্য করে বলেছিলেন, আল্লাহ্ যাদেরকে ধ্বংস করে দিবেন অথবা কঠোর শাস্তি প্রদান করবেন, তাদের কে কেন তোমরা উপদেশ প্রদান করছ? তারা জবাব দিলেন আমরা এটা করছি তোমাদের প্রতিপালকের কাছে কৈফিয়ত প্রদানের উদ্দেশ্যে। তাদের কাজ আমাদেরকে অসন্তুষ্ট করেছে। আর আমরা এটা করেছি যাতে করে তারা আল্লাহকে ভয় করে। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন- তারা রাত্রে ঘরে ঢুকেছিল। সকালে আর বের হয়নি। অন্যান্য লোকেরা খোঁজাখুঁজি করতে লাগল এরা কোথায় গেল। শেষ পর্যন্ত দেখা গেল তারা বানর হয়ে গেছে। পক্ষান্তরে, যারা নিষিদ্ধ এ কাজ হতে বিরত থাকার জন্যে বলেছিল তাঁরা এ শাস্তি হতে রক্ষা পেয়েছিলেন।

হযরত সুদ্দী (রা.) হতে বর্ণিত- وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِيْنَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُوْنُوْا قِرَدَةً خَاسِئِيْنَ এখানে যাদের কথা বলা হয়েছে তারা ইলা গোত্রের লোক ছিল। এটা সমুদ্র তীরবর্তী একটি গ্রামের নাম। তারা শনিবারে মাছ শিকার করত। আল্লাহ্ তায়ালা শনিবারে কোন কিছু করাটাকে ইহুদীদের উপর হারাম করেছিলেন। সেদিন সমুদ্রের একটি মাছ ও বের না হয়ে থাকত না। এমনকি পানি হতে কাঁকড়াও বের হতে লাগল। রবিবারে মাছ দেখা যেত না, সব মাছ সমুদ্রের তলদেশে অবস্থান করত। শনিবারের পূর্ব পর্যন্ত আর বের হত না। তাদের মধ্যে কিছু কিছু লোক মাছ শিকারের ইচ্ছে প্রকাশ করত। এক ব্যক্তি সমুদ্রের সাথে একটা নহর তৈরী করলো। শনিবার নহর খুলে দিত। সমুদ্রের স্রোতে মাছ নাহারে ঢুকে যেত এবং নহরের বিভিন্ন গর্তে আশ্রয় নিত। সমুদ্রে ভাটা পড়লে মাছ আর বের হতে পারত না। রবিবার ঐ নহরে আটকে পড়া মাছগুলো ধরে নিত এবং ভুনে খেত। তার প্রতিবেশীরা মাছের ঘ্রাণ পেল। তারা তাকে কীভাবে মাছ ধরে তা জিজ্ঞেস করল, সে পদ্ধতি বলে দিল। তার প্রতিবেশীরা তার পথ অবলম্বন করে মাছ ধরতে লাগল। অতঃপর তারা যে মাছ খাচ্ছে তা প্রকাশ হয়ে গেল। তখন তাদের উলামা সম্প্রদায় তাদেরকে বললো-

তোমাদেরকে শনিবারে মাছ শিকার না করতে বলা হয়েছে। তা তোমাদের জন্য হালাল হবেনা। উত্তরে তারা বললেন, আমরা শনিবারে মাছ শিকার করিনা আমরা তো রবিবারেই মাছ ধরি। ফকীহগণ বললেন না, তোমরা শনিবারেই মাছ শিকার

কর, তোমরা নহর খুলে দাও, মাছ নহরের ভিতর প্রবেশ করে। এভাবে করাটা অবাধ্য হওয়ার মত, তোমরা এ ধরনের কাজ হতে বিরত থাক। তারা মাছ ধরা থেকে বিরত থাকতে অস্বীকার করল। তাদের মধ্যে অপর একদল বাধা দানকারীদেরকে বলত- আল্লাহ্ তায়ালা ধ্বংস করবে এমন সম্প্রদায়কে তোমরা কেন নসীহত করছ। আরো বলত তাদেরকে কেন নসীহত করছ? তাদেরকে যে নসীহত করছ অথচ তারা তো তোমাদের কথা মেনে চলেনি। তারা বলতেন আমাদের এ নিষেধ করার কারণ হচ্ছে যেন আল্লাহর কাছে কৈফিয়ত প্রদান করতে পারি এবং তারাও যাতে আল্লাহকে ভয় করে। মুসলমানরা বলল- আল্লাহর কসম! আমরা তোমাদের সাথে একই গ্রামে বাস করব না। গ্রামে দেয়াল দিয়ে তাদেরকে পৃথক করা হল। মুসলমানরা এক দরজা দিয়ে বের হয় এবং যারা সীমা লঙ্ঘন করে শনিবারে মাছ ধরে, তারা অপর দরজা দিয়ে বের হয়। অর্থাৎ মুসলমানদের জীবন যাত্রার পথ ভিন্ন এবং অবাধ্যকারীদের চলার পথ ভিন্ন। একদিন মুসলমানগণ বের হলেন, কিন্তু কাফেররা তাদের দরজা খুলল না। তাদের দরজা খুলতে দেরী দেখে মুসলমানরা দেয়ালের উপর দিয়ে তাদের অঞ্চলে প্রবেশ করলেন। গিয়ে দেখেন তারা সবাই বানর হয়ে একজন অপরজনের প্রতি তাকাচ্ছে। এর প্রতি ইঙ্গিত করেই আল্লাহ পাক ঘোষনা করেন-

لُعِنَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ بَنِيْ إِسْرَائِيْلَ عَلٰى لِسَانِ دَاوٗدَ وَعِيْسَى ابْنِ مَرْيَمَ

বনী ইসরাঈলের মধ্যে যারা কাফির হয়েছিল, তারা হযরত দাউদ (আ.) এবং হযরত ঈসা (আ.)-এর দুআর দ্বারা অভিশপ্ত হয়েছিল। (সূরা ঃ মায়িদা-৭৮)

سبت শব্দের অর্থ আরামে ও সাচ্ছন্দ্যে অবস্থান করা। এজন্য শান্তির সাথে নিদ্রিত ব্যক্তিকে বলা হয় مسبوت আল্লাহ্ তায়ালা বলেন, وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا ঘুম তোমাদের আরামের জন্য বানানো হয়েছে, তাতে তোমাদের শরীরে আরাম পৌছবে। কেউ কেউ বলেন- শনিবারকে سبت করে নামকরণ করা হয়, কারণ এদিনের আগে আল্লাহ্ তায়ালা সমস্ত সৃষ্টিকে সৃষ্টি করে এদিন অবসর গ্রহণ করেছিলেন। আর كُوْنُوْا قِرَدَةً خَاسِئِيْنَ এ আয়াতের অর্থ তোমরা কল্যাণ হতে অনেক দূরে, তোমাদের বেইজ্জতী ছাড়া আর কিছু নেই।

فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا

হযরত ইবনে আব্বাস বলেন- এখানে যমীর ها এর مرجع চার বিষয় হতে একটি বিষয় হওয়ার সম্ভাবনা রাখে। তা হল আযাব, মাছ, কারিয়া বা বানর। প্রথম অবস্থায় عبارة হবে- فجعلنا تلك العقوبة وهي المسخة نكالا আর نكال শব্দের অর্থ হল দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি প্রদান করা। এভাবে বাকী অর্থ হওয়ারও সম্ভাবনা রয়েছে।

لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا

অর্থাৎ আমি এই শাস্তিকে পরবর্তীদের জন্যও যেন দৃষ্টান্তমূলকও উপদেশমূলক হয়, সেভাবে করে দিয়েছি এবং যারা তাদের সাথে আছে তাদের জন্যও। কুরআনের উল্লেখিত এ আয়াতে তাফসীরকাদের মধ্যে বিতর্ক ও মতবিরোধ রয়েছে। এখানে হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর মত অনুযায়ী অর্থ উল্লেখ করা হয়েছে। হযরত রবি (রা.) বলেন بين يديها এর মর্মার্থ হচ্ছে- অতীতের গোনাহ্। আর خلفها শব্দের অর্থ হচ্ছে- অবশিষ্ট সমস্ত লোক। আর হযরত কাতাদাহ (রা.) বলেন, আল্লাহ্ তায়ালা বলেন- আমি তাদের কওমের গোনাহর কারণেই তাদেরকে এ শাস্তি দিয়েছি এবং তাদের পরবর্তীদেরকেও এ শাস্তি দেয়া হবে। হযরত মুজাহিদ (র.) বলেন- نَكَالًا لِّمَا

Scanned with CamScanner

بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا এর অর্থ হচ্ছে- তাদের আগের এবং পিছের গোনাহের কারণেই তাঁরা ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল। হযরত সুদ্দী (রা.) বলেন, بين يديها এর মর্মার্থ হচ্ছে তাদের পূর্ববর্তীদের আমলের কারণেই এবং ما خلفها এর মর্ম অর্থ তাদের পরবর্তীরা নাফরমানী করার কারণেই তাদেরকে আল্লাহ্ তায়ালা এ ধনের শাস্তি প্রদান করেন এবং এ অবস্থায় রাখেন। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতে অন্য একটি রিওয়ায়েত আছে, আয়াতের অর্থ হবে তাদের আগের ও পরের আমলের কারণেই তাদেরকে এ শাস্তি দেয়া হয়েছে। তবে, এসব ব্যাখ্যার মধ্যে হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর ব্যাখ্যাকেই প্রাধান্য দেয়া হয়

وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِيْنَ

এবং নসীহত ইত্যাদি খোদাভীরু লোকদের জন্যেই।

المتقي বলা হয় ঐ সকল মুমীনদেরকে, যারা শিরক থেকে বেঁচে থাকেন এবং আল্লাহ্ তায়ালার নির্দেশ অনুযায়ী আমল করেন। হযরত সুদ্দী (র.) বলেন, মুত্তাকী বলতে হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর উম্মতকেই বুঝায়!

وَإِذْ قَالَ مُوسٰى لِقَوْمِهٖٓ إِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذْبَحُوْا بَقَرَةً ۭ قَالُوْٓا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا ۭ قَالَ أَعُوْذُ بِاللّٰهِ أَنْ أَكُوْنَ مِنَ الْجٰهِلِيْنَ ﴿٦٧﴾ قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَّنَا مَا هِيَ ۭ قَالَ إِنَّهٗ يَقُوْلُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَّا فَارِضٌ وَّلَا بِكْرٌ ۭ عَوَانٌ بَيْنَ ذٰلِكَ ۭ فَافْعَلُوْا مَا تُؤْمَرُوْنَ ﴿٦٨﴾ قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَّنَا مَا لَوْنُهَا ۭ قَالَ إِنَّهٗ يَقُوْلُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ صَفْرَاءُ فَاقِعٌ لَّوْنُهَا تَسُرُّ النّٰظِرِيْنَ ﴿٦٩﴾ قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَّنَا مَا هِيَ ۙ إِنَّ الْبَقَرَ تَشٰبَهَ عَلَيْنَا ۭ وَإِنَّآ إِنْ شَآءَ اللّٰهُ لَمُهْتَدُوْنَ ﴿٧٠﴾ قَالَ إِنَّهٗ يَقُوْلُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَّا ذَلُوْلٌ تُثِيْرُ الْأَرْضَ وَلَا تَسْقِي الْحَرْثَ ۚ مُسَلَّمَةٌ لَّا شِيَةَ فِيْهَا ۭ قَالُوا الْـٰٔنَ جِئْتَ بِالْحَقِّ ۭ فَذَبَحُوْهَا وَمَا كَادُوْا يَفْعَلُوْنَ ﴿٧١﴾

৬৭. স্মরণ কর, যখন মূসা আপন সম্প্রদায়কে বলেছিলেন, আল্লাহ তোমাদেরকে একটি গরু যবেহ-এর আদেশ দিয়েছেন। তারা বলেছিল, তুমি কি আমাদের সঙ্গে ঠাট্টা করছো? মূসা বললেন আল্লাহর শরণ নিচ্ছি যাতে আমি অজ্ঞদের অন্তর্ভুক্ত না হই।

৬৮. তারা বলেন, আমাদের জন্য তোমার প্রতিপালককে স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিতে বল তা কিরূপ? মূসা বলেন, আল্লাহ বলছেন, তা এমন গরু যা বৃদ্ধও নয়, অল্পবয়স্কও নয় মধ্যবয়সী। সুতরাং তোমরা যা আদিষ্ট হয়েছ তা কর।

৬৯. তারা বলল, আমাদের জন্য তোমার প্রতিপালককে স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিতে বল তার রং কি? মূসা বললেন, আল্লাহ বলছেন, তা হলুদ বর্ণের গরু, তার রং উজ্জ্বল গাঢ়, যা দর্শকদের আনন্দ দেয়।

৭০. তারা বললেন, আমাদের জন্য তোমার প্রতিপালককে স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিতে বল তা কোনটি? আমরা গরু সম্পর্কে সন্দেহে পতিত হয়েছি এবং আল্লাহ ইচ্ছা করলে নিশ্চয় আমরা দিশা পাব।

৭১. মূসা বললেন, তিনি বলছেন, তা এমন এক গরু যা জমি চাষ ও ক্ষেতে পানি সেচের জন্য ব্যবহৃত হয়নি- সুস্থ নিখুঁত। তারা বলল, এখন তুমি সত্য এনেছ। যদিও তারা যবেহ করতে উদ্যত ছিল না তবুও তারা তাকে যবেহ করল।

وَإِذْ قَالَ مُوسٰى لِقَوْمِهٖٓ إِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذْبَحُوْا بَقَرَةً قَالُوْٓا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا

আর যখন হযরত মূসা (আ.) নিজের কওমকে বলেন, নিশ্চয় আল্লাহ্ তায়ালা তোমাদেরকে একটি গাভী জবেহ করার নির্দেশ দিচ্ছেন। তারা বলে তুমি কী আমাদেরকে নিয়ে ঠাট্টা করছ।

হযরত মূসা (আ.)-কে নির্দেশ দেয়ার কারণ প্রসঙ্গে হাদীসে বর্ণনা করা হয়েছে যে, হযরত ওবাইদা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন- বনি ইসরাইলের একজন নিঃসন্তান লোক ছিল। তার ওলি তাকে হত্যা করেছিল। মানুষ অন্য লোককে সন্দেহ করার জন্য অন্য এক গোত্রের কাছে নিয়ে মৃত দেহ ফেলে দেয়। এতে উভয় গোত্রের মধ্যে দ্বন্দ্ব লেগে গেল, এমন কি তারা অস্ত্র নিয়ে এল। তখন তাদের মধ্যে কতেক লোক বলল- তোমরা কেন মারামারি করছ? তোমাদের মধ্যে তো আল্লাহর রাসূল (সা.) আছেন। এ কথা শ্রবণ করে তারা হযরত মূসা (আ.)-এর কাছে আসলেন। হযরত মূসা (আ.) তাদের একটা গাভী জবেহ করতে বলেন। তারা হযরত মূসা (আ.)-কে বলেন, আপনি কি আমাদেরকে নিয়ে বিদ্রূপ করছেন। হযরত মূসা (সা.) উত্তরে বলেন, আমি আল্লাহ্ তায়ালার পানাহ চাই, মূর্খ লোকদের অন্তর্ভুক্ত হতে। তখন তারা বলেন- আপনি আমাদের জন্য আপনার রবের নিকট প্রার্থনা করুন। যেন গাভীর স্পষ্ট বর্ণনা প্রদান করেন। অতপর গাভী জবেহ করার পর উহার অংশ দিয়ে নিহত ব্যক্তিকে মারল, তখন গাভীটি জীবিত হয়ে হত্যাকারী সম্পর্কে অবহিত করল। উল্লেখ্য যে, এ গাভীর ওজন বরাবর স্বর্ণ দিয়েই খরিদ করা হয়েছিল। এর ফলে হত্যাকারী নিহত ব্যক্তির ওয়ারিশ হল না। হযরত আবুল আলীয়া (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি আল্লাহ্ তায়ালার বাণী- إِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذْبَحُوْا بَقَرَةً সম্পর্কে বলেন, বনী ইসরাঈলের একজন লোক খুবই ধনী ছিল। তার সন্তান ছিল না। তার এক

Scanned with CamScanner

প্রতিবেশী ছিল। সেই ধনী লোকের ওয়ারিশ হওয়ার কারণেই ঐ লোকটিকে হত্যা করেছিল। এরপর মানুষের সমাগম হয়- এ রকম তিন রাস্তার মাথায় ফেলে দিয়েছিল। অতঃপর হযরত মূসা (আ.)-এর কাছে এসে বলল, আমার এক আত্মীয় নিহত হয়েছে। এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার। আমি আপনাকে ছাড়া অন্য কাউকে খুঁজে পাচ্ছিনা যে আমাকে এ হত্যাকারীর ব্যাপারে অবহিত করবে। হে আল্লাহর নবী! মূসা (আ.) মানুষদের উদ্দেশ্যে বললেন, আল্লাহর কসম করে বলছি- কারো কাছে এ সম্পর্কে জ্ঞান থাকলে আমাদের বলুন। কিন্তু তাদের মধ্য হতে কেউই কিছু অবগত করলনা। তখন হত্যাকারী মূসা (আ.) কে উদ্দেশ্য করে বলে- আপনি আল্লাহর নবী- আপনি আপনার প্রতিপালককে এটি বর্ণনা করে দিতে বলুন। তখন হযরত মূসা (আ.) আল্লাহ্ তায়ালার দরবারে আবেদন করলেন এবং আল্লাহ্ তায়ালা যা জানালেন তা তাদেরকে বললেন। তিনি বললেন, আল্লাহ্ তায়ালা তোমাদেরকে গাভী জবেহ করার জন্যে নির্দেশ দিয়েছেন। এ কথা শ্রবণ করে তারা আশ্চর্য্য হয়ে গেল। তারা বলে- তুমি কী আমাদের সাথে ঠাট্টা করছ? হযরত মূসা (আ.) বলেন- আল্লাহ্ থেকে পানাহ চাচ্ছি। এরকম করলে আমি মূর্খ ও নির্বোধ লোক হব। তারা আবার বলে- হে মূসা আপনি আল্লাহ্ তায়ালার কাছে জিজ্ঞেস করুন গাভীটা কি রকম হবে? তখন হযরত মূসা (আ.) বলেন- আল্লাহ্ তায়ালা বলছেন- গাভী বেশী বয়স্কও হবে না, আর বেশী ছোটও হবে না, মধ্যম ধরনের হবে। তারা আবার বলে- আপনি আল্লাহ তায়ালার কাছে জিজ্ঞেস করুন গাভীর রং কি রকম হবে? তখন হযরত মূসা (আ.) বলেন- আল্লাহ্ তায়ালা বলছেন-গাভীর রঙ হবে হলুদ, এমন আকর্ষণীয় রঙ হবে লোক তা দেখে আশ্চর্য হবে। তারা আবার বলে, হে মূসা! আপনি আল্লাহ্ তায়ালাকে জিজ্ঞেস করুন এবং তারা আরো বলে- এটাই আমাদের শেষ প্রশ্ন ইনশাআল্লাহ্ আমরা হেদায়াত প্রাপ্ত হব। গাভীটি কেমন হবে? গাভিটি আমাদেরকে সন্দেহে পতিত করেছে। তখন হযরত মূসা (আ.) বলেন, তা ক্ষেত-খামারের জমিন চাষের কাজে ব্যবহার হয়েছে এমন হতে পারবে না। সকল ধরনের খুঁত হতে পবিত্র হবে এবং তাতে কোন খুত থাকবে না। তারপর তারা বলে- আপনি সত্য কথা বলেছেন। তারপর গাভী জবেহ করল এবং যেভাবে নির্দেশ ছিল সেভাবে করল। অথচ যদি তারা এ কথা না বলে- শুধু গরু জবেহ করে ফেলত, তা হলে এ ধরনের বৈশিষ্ট্য আরোপ করা হতো না। বেশী কথা বলেই তারা নিজের জন্য নিজে কঠোরতা সৃষ্টি করেছে। অতঃপর তারা গাভী খরিদ করল এবং গাভী জবেহ করল। হযরত মূসা (আ.) তাদেরকে আদেশ দেন গাভী হতে এক টুকরা হাড় নিয়ে নিহত ব্যক্তিকে মারার জন্যে। তারা তা করল এবং হাড় দিয়ে মারার পর মৃত ব্যক্তির শরীরের ভিতর রূহ আসল। সেই মৃত ব্যক্তি জীবিত হয়ে তাকে কে হত্যা করেছে তার নাম বলল এবং পুনরায় মরে গেল। সকলেই হত্যাকারীকে ধরে ফেলল। তাকে হযরত মূসা (আ.)-এর দরবারে নিয়ে আসল। সে ছিল সেই ব্যক্তি, যে হযরত মূসা (আ.)-এর কাছে এসে মামলা দায়ের করেছিল। এভাবে আল্লাহ্ তার মন্দ আমলের কারণে তাকে হত্যা করলেন।

হযরত সুদ্দী (রা.) وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذْبَحُوا بَقَرَةً এর তফসীর বর্ণনা করতঃ বলেন, বনি ইসরাইলের এক ব্যক্তি খুবই সম্পদশালী ছিল এবং তার একটা কন্যা ছিল আর তার ভাইয়ের এক ছেলে ছিল, সে গরীব ছিল। সেই ছেলে

তার চাচাত বোনকে বিয়ের প্রস্তাব দিয়েছিল কিন্তু তার চাচা অস্বীকৃতি জানিয়েছিল। এতে ঐ যুবক রাগান্বিত হয়েছিল এবং বলেছিল- আল্লাহর কসম, আমি আমার চাচাকে হত্যা করে ফেলব এবং তার মাল নিয়ে নেব, তার মেয়েকে বিবাহ করব এবং বদলা নেব। অতঃপর ঐ যুবক তার চাচার কাছে আসল এবং বলল-হে চাচা! ঐ গোত্রে কতেক ব্যবসায়ী এসেছে, আপনি আমার সাথে চলুন এবং তাদের থেকে কিছু মাল ব্যবসার জন্যে এনে দিন- এতে হয়তঃ আমি কিছু উপকৃত হতে পারব। কারণ ঐসব লোকেরা যখন তোমাকে আমার সাথে দেখবে, তখন মাল দিয়ে দেবে। এ কথায় রাজী হয়ে চাচা তার সাথে রাত্রে বের হল। চাচা যখন সেই গোত্রে পৌছল, তখন সেই যুবকটি চাচাকে হত্যা করল। এরপর ঐ যুবক নিজ ঘরে ফিরে আসল। যখন প্রভাত হল, সে যেন চাচার আপনজন হয়ে তালাশ করতে লাগল। চাচা কোথায় গেল? এখনো আসছেন না কেন? কোথায় গেলেন? এভাবে তালাশ করতে করতে যেই গোত্রের পাশে হত্যা করেছিল- সেখানে গেল এবং দেখে খুবই মায়া কান্না করতে লাগল এবং তার চাচার মৃতদেহের কাছে অনেক লোক একত্রিত পেল। তাদেরকে ধরে ফেলল এবং বলতে লাগল, তোমরাই আমার চাচাকে হত্যা করেছ। তার ক্ষতিপূরণ তোমরা আমাকে আদায় কর। মাটিতে পড়ে কান্নাকাটি করতে লাগল এবং বলতে লাগল চাচা-চাচা! এরপর তারা হযরত মূসা (আ.)-এর নিকট বিচার নিয়ে গেল। হযরত মূসা (আ.) ক্ষতিপুরণ দেয়ার নির্দেশ দিলেন। তখন তারা বলল- হে মূসা (আ.) আপনি দুআ করুন, যেন তার চাচার প্রকৃত অবস্থা সম্পর্কে অবহিত হওয়া যায়। তখনই বুঝা যাবে আসল দোষী কে? তাঁর ক্ষতিপূরণ দেয়া আমাদের জন্য সহজ কিন্তু আমাদের লজ্জা লাগছে কেন আমরা এ জন্যে দোষী হব। এ ঘটনা উল্লেখ করেই আল্লাহ তায়ালা বলেন- وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ এরপর হযরত মূসা (আ.) তাদেরকে বলেন, তোমরা গাভী জবেহ কর। তখন তারা বলে- আমরা আপনাকে এ নিহত ব্যক্তিকে কে হত্যাকে করল তা' উদঘাটন করার জন্য আল্লাহ্ তায়ালার কাছে দুআ করতে বলছি; আর আপনি আমাদেরকে গাভী জবেহ করার কথা বলছেন। আমাদের সাথে কি ঠাট্টা করছেন? তখনই হযরত মূসা (আ.) বলেন- أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ এরপর হযরত সুদ্দী (রা.) এ ঘটনার উপর দীর্ঘ হাদীস বর্ণনা করেন, যার শেষের অংশ এরকম-

অতঃপর তারা গাভীর সন্ধান করতে লাগল কিন্তু পাচ্ছিল না। বনি ইসরাঈলের একজন লোক তার পিতাকে বলল, আমাদের পাশ দিয়ে যে একজন লোক গেল, সে মুক্তা বিক্রি করে। এখন তার পিতা ঘুমাচ্ছে এবং তার পিতার মাথার নীচেই চাবি রয়েছে। অতঃপর লোকটি তাকে বলল আপনি সত্তর হাজার (টাকা) দিয়ে মুক্তা ক্রয় করে নিন। যুবকটি বলল, হয়তঃ আমার আব্বা ঘুম হতে উঠে আশি হাজার (টাকা) দিয়ে মুক্তা ক্রয় করবে। আব্বা ঘুম হতে জাগ্রত হোক। তাকে অন্য একজন লোক বলল, তোমার আব্বাকে জাগ্রত কর। তা হলে ষাট হাজারে (টাকায়) তুমি এটা পাবে। এভাবে ব্যবসায়ীরা দরকষাকষি করতে লাগল। শেষ পর্যন্ত তা ত্রিশ হাজারে নেমে আসল। অপরদিকে একজন তার পিতা জাগ্রত হওয়ার জন্য অপেক্ষা করতে লাগল। শেষ পর্যন্ত টেন্ডার একশত হাজার পর্যন্ত উঠল। যখন তারা তাকে চাপ দিতেই থাকল, সে বলল- খোদার কসম আমি তোমার থেকে কিছু ক্রয় করব না এবং তার পিতাকে ঘুম থেকে উঠাতে অস্বীকার করল। তার পিতার প্রতি এ আনুগত্য প্রদর্শনের কারণে এ মুক্তার বিনিময় আল্লাহ তায়ালা তাকে এভাবে দিলেন: বনি

Scanned with CamScanner

ইসরাইলের লোকেরা গাভীর তালাশ করতে লাগল এবং একজন ঐ লোকের নিকট গাভীটি দেখল। তারা প্রথমে একটি গাভীর বিনিময়ে গাভীটি তাদেরকে প্রদান করতে বলল। সে অস্বীকার করল আতঃপর দুটি দেয়ার কথা বলল তবুও সে অস্বীকার করল। এমনিভাবে দশটি পর্যন্ত দিতে রাজি হল। কিন্তু বিক্রয়কারী অস্বীকৃতি জানালো। তখন তারা বলল- খোদার কসম আমরা তোমাকে ছাড়ব না যতক্ষণ না তুমি তা আমাদেরকে দিবে, এ বলে তারা হযরত মূসা (আ.)-এর কাছে চলে গেল এবং বলল, হে আল্লাহর নবী আমরা এ লোকের কাছে গাভী পেয়েছি কিন্তু সে গাভী বিক্রি করতে চায় না অথচ মূল্য দেব বলেছিলাম। হযরত মূসা (আ.) গাভীর মালিককে বললেন, এদেরকে তোমার গাভীটা দাও। গাভীর মালিক উত্তরে বলল ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমিই আমার মালের হকদার। হযরত মূসা (আ.) বললেন- সত্য কথা। হযরত মূসা (আ.) এদেরকে বলেন-গাভীর মালিককে রাজী করতে চেষ্টা কর। শেষ পর্যন্ত গাভীর ওজনের দশগুণ সমান স্বর্ণ দিয়ে গাভী ক্রয় করল। হযরত মূসা (আ.) উহা জবেহ করতে বললেন- গাভী জবেহ করা হল এবং গাভীর এক টুকরা গোশত যা গরুর কাঁধের পার্শ্বে থাকে, সেইখান হতে গোশত নিয়ে নিহত ব্যক্তির শরীরে মারল এবং সাথে সাথে সে জীবিত হল। তাকে প্রশ্ন করা হল, কে তোমাকে হত্যা করেছে? উত্তরে সে বলল, আমার ভাই এর ছেলে। সে তার ধন-সম্পদ পাওয়ার জন্য এবং তার মেয়েকে বিয়ে করার জন্যই হত্যা করেছিল। সকলে তাকে ধরে ফেলল এবং তাকে মেরে ফেলল। কিন্তু কেউ কেউ বলেন, নিহত ব্যক্তির হত্যাকারী তার ভাই ছিল। আবার কেউ বলেন, তার ভাই এর ছেলে ছিল।

قَالَ أَعُوْذُ بِاللّٰهِ أَنْ أَكُوْنَ مِنَ الْجَاهِلِيْنَ

অর্থাৎ হযরত মূসা (আ.) বলেন, আল্লাহর নিকট পানাহ চাই। যদি এ রকম করি তা হলে আমি জাহিলদের মধ্য হতে হব। মূর্খতা বা جهل হচ্ছে حلم বা সহিষ্ণুতার উল্টো বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন শব্দ। তেমনিভাবে তা علم এর ও বিপরীত।

قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَّنَا مَا هِيَ: قَالَ إِنَّهُ يَقُوْلُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَّا فَارِضٌ وَّلَا بِكْرٌ ـ عَوَانٌ بَيْنَ ذٰلِكَ فَافْعَلُوْا مَا تُؤْمَرُوْنَ

তারা বলেন, হে মূসা! আপনি আমাদের জন্য আপনার রবের নিকট দু'আ করুন, যেন আমাদের জন্য ঐ গাভীর বর্ণনা বলে দেন, ঐ গাভী কী রকম হবে? মূসা (আ.) বললেন- সে গাভী মধ্যম ধরণের হবে বেশী বৃদ্ধা ও হবে না বেশী ছোট ও হবে না সুতরাং যেভাবে নির্দেশ দেয়া হয়েছে সেভাবে কর।

قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَّنَا مَا لَوْنُهَا

তারা বলল, আমাদের জন্য আপনি আপনার রবের দরবারে দুআ করুন। যেন আল্লাহ তায়ালা সেই গাভীর রঙ কী রকম হবে তা বলে দেন।

قَالَ إِنَّهُ يَقُوْلُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ صَفْرَاءُ فَاقِعٌ لَّوْنُهَا تَسُرُّ النَّاظِرِيْنَ

হযরত মূসা (আ.) বললেন, আমার পরওয়ারিদেগার বলেন, এ গাভীর রঙ হবে নিখুঁত গাঢ় হলুদ রঙ এবং শিং আর ক্ষুর হবে দৃষ্টি আকর্ষণকারী। যারাই দেখবে তারা পছন্দ করবে।

قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَّنَا مَا هِيَ إِنَّ الْبَقَرَ تَشَابَهَ عَلَيْنَا وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللّٰهُ لَمُهْتَدُوْنَ

অর্থাৎ বনি ইসরাইলের লোকেরা হযরত মূসা (আ.)-কে বলে আপনি আপনার রবের কাছে প্রার্থনা করুন যেন, আল্লাহ তায়ালা বলে দেন- এ গাভী কোন ধরণের হবে, যেহেতু আমাদের কাছে সকল গাভী একই ধরনের মনে হচ্ছে। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস- আল্লাহ তায়ালার ইচ্ছে হলেই আমরা সঠিক পথ খুঁজে পাব। এখানে تشابه শব্দের অর্থ মিশ্রিত হওয়া।

قَالَ إِنَّهُ يَقُوْلُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَّا ذَلُوْلٌ تُثِيْرُ الْأَرْضَ وَلَا تَسْقِي الْحَرْثَ

হযরত মূসা (আ.) বলেন অবশ্যই আমার পরওয়ারদেগার বলছেন- এ গাভী জমি চাষ বা জমিতে কৃষি কাজ করার জন্যে পানি বহন করেছে, এমনটি হবে না। অর্থাৎ এ গাভী দিয়ে কোন ভারী কাজ করানো হয়েছে এমন গাভী হবে না; আর খেত-খামারের জন্য পানি বহন করেছে এমনও হবে না।

مُسَلَّمَةٌ لَّا شِيَةَ فِيْهَا

সকল ত্রুটি হতে মুক্ত হতে হবে, অন্য কোন রঙ থাকতে পারবে না। গাভীর চামড়ার যে রঙ আছে তাছাড়া অন্য কোন রঙে হতে পারবে না এবং এটিই شية এর উত্তম অর্থ।

তা ছাড়া কোন সাদা রঙ হতে পারবেনা। কাল এবং সাদা মিশ্রিতও না। আর সাদা, কাল এবং লাল ও মিশ্রিত হবে না। এরূপ অর্থ বিভিন্ন রিওয়ায়তে উল্লেখ রয়েছে।

قَالُوا الْآنَ جِئْتَ بِالْحَقِّ فَذَبَحُوْهَا وَمَا كَادُوْا يَفْعَلُوْنَ

তারা বলেন, এখনই আপনি সত্য কথা এনেছেন। এখনই আপনি সত্য কথা বলেছেন। অর্থাৎ তারা এভাবে বলতে থাকলে এবং জিজ্ঞেস করতে থাকলে আরো অতিরিক্ত দাম হওয়ার কারণে গাভী জবেহ করতে পারত না। যতই প্রশ্ন করতো ততই গাভীর কঠিন কঠিন বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করা হতো এবং তা পাওয়া দুর্লভ হয়ে যেত।

وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادّٰرَأْتُمْ فِيْهَا ـ وَاللّٰهُ مُخْرِجٌ مَّا كُنْتُمْ تَكْتُمُوْنَ ﴿٧٢﴾ فَقُلْنَا اضْرِبُوْهُ بِبَعْضِهَا ـ كَذٰلِكَ يُحْيِ اللّٰهُ الْمَوْتٰى ـ وَيُرِيْكُمْ اٰيٰتِهٖ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُوْنَ ﴿٧٣﴾ ثُمَّ قَسَتْ قُلُوْبُكُمْ مِّنْ بَعْدِ ذٰلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً ـ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهٰرُ ـ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللّٰهِ ـ وَمَا اللّٰهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُوْنَ ﴿٧٤﴾ أَفَتَطْمَعُوْنَ أَنْ يُّؤْمِنُوْا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ

Scanned with CamScanner

فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُوْنَ كَلٰمَ اللّٰهِ ثُمَّ يُحَرِّفُوْنَهٗ مِنْ بَعْدِ مَا عَقَلُوْهُ وَهُمْ يَعْلَمُوْنَ ﴿٧٥﴾ وَاِذَا لَقُوا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا قَالُوْٓا اٰمَنَّا ۚ وَاِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ اِلٰى بَعْضٍ قَالُوْٓا اَتُحَدِّثُوْنَهُمْ بِمَا فَتَحَ اللّٰهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَآجُّوْكُمْ بِهٖ عِنْدَ رَبِّكُمْ ۗ اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ ﴿٧٦﴾ اَوَلَا يَعْلَمُوْنَ اَنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّوْنَ وَمَا يُعْلِنُوْنَ ﴿٧٧﴾

৭২. স্মরণ কর, যখন তোমরা এক ব্যক্তিকে হত্যা করেছিলে এবং একে অন্যের প্রতি দোষারোপ করছিলে। তোমরা যা গোপন রেখেছ আল্লাহ তা ব্যক্ত করছেন।

৭৩. আমি বললাম, এর কোন অংশ দ্বারা তাকে আঘাত কর। এ ভাবে আল্লাহ মৃতকে জীবিত করেন এবং তার নিদর্শন তোমাদেরকে দেখিয়ে থাকেন, যাতে তোমরা অনুধাবন করতে পার।

৭৪. এরপরও তোমাদের হৃদয় কঠিন হয়ে গেল, তা পাষাণ কিংবা তার চেয়ে কঠিন। পাথরও কতক এমন যে, তা হতে নদী-নালা প্রবাহিত হয় এবং কতক এরূপ যে, বিদীর্ণ হওয়ার পর তা হতে পানি নির্গত হয়, আবার কতক এমন যা আল্লাহর ভয়ে ধ্বসে পড়ে এবং তোমরা যা কর আল্লাহ সে সম্বন্ধে অনবহিত নন।

৭৫. তোমরা কি এ আশা কর যে, তারা তোমাদের কথায় ঈমান আনবে- যখন তাদের একদল আল্লাহর বাণী শ্রবণ করে অতঃপর তারা তা বিকৃত করে, অথচ তারা জানে।

৭৬. তারা যখন মুমিনদের সংস্পর্শে আসে তখন বলে, আমরা ঈমান এনেছি, আবার যখন তারা নিভৃতে একে অন্যের সাথে মিলিত হয় তখন বলে, আল্লাহ তোমাদের কাছে যা ব্যক্ত করেছেন তোমরা কি তা তাদেরকে বলে দাও? এর দ্বারা তারা তোমার প্রতিপালকের সম্মুখে তোমাদের বিরুদ্ধে যুক্তি পেশ করবে, তোমরা কি অনুধাবন কর না?

৭৭. তারা কি জানে না যে, যা তারা গোপন রাখে কিংবা ঘোষণা করে নিশ্চিতভাবে আল্লাহ তা জানেন?

وَاِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادّٰرَاْتُمْ فِيْهَا

فَادّٰرَاْتُمْ প্রকৃতপক্ষে فَتَدَارَاْتُمْ ছিল ت কে د করা হয়েছে এবং একই ধরনের দুটি হরফে সহীহ এক জায়গায় হওয়ার কারণে আরবী ব্যাকরণের নিয়ম অনুসারে একটা দালকে অপর দালের মধ্যে ইদগাম করানো হয়েছে। কারণ দুটিই একই জায়গা হতে বের হয়। فَادّٰرَاْتُمْ শব্দের অর্থ خَاصَمْتُم অর্থাৎ তোমরা ঝগড়া ও তর্ক করেছিলে।

কেউ কেউ বলেন, فَادّٰرَاْتُمْ শব্দের অর্থ خَاصَمْتُم অর্থাৎ পরস্পর বিরোধ করছিলে।

وَاللّٰهُ مُخْرِجٌ مَّا كُنْتُمْ تَكْتُمُوْنَ

অর্থাৎ আল্লাহ্ তায়ালা ঐসব জিনিষ উদ্‌ঘাটন করেন, যা তোমরা লুকিয়ে রাখতে চাও। অর্থাৎ তোমাদের গুপ্ত হত্যা আল্লাহ্ তায়ালা প্রকাশ করে দিয়েছেন।

فَقُلْنَا اضْرِبُوْهُ بِبَعْضِهَا

অতঃপর আমি তাদেরকে গাভীর কোন অংশ নিয়ে নিহত ব্যক্তির শরীরের কোন অংশে– মারার জন্য বলছিলাম।

এখানে কোন অংশ দিয়ে মারা হয়েছিল তা নিয়ে মতবিরোধ রয়েছে। এক দল বলেন, গাভীর রান। হযরত মুজাহিদ এবং ইকরামা (রা.) ও একথা বলেন। হযরত উবায়েদ (রা.) বলেন, গাভীর যে কোন এক অংশের গোশত দিয়ে আঘাত করা হয়। হযরত কাতাদাহ (রা.) বলেন- তারা গাভীর রানের অংশ নিয়ে মেরেছিল। হযরত সুদ্দী (রা.) বলেন, গাভীর দুই কাঁধের মধ্যের গোশত নিয়ে মেরেছিল। হযরত আবুল-আলীয়া (রা.) বলেন, গাভীর হাড় নিয়ে নিহত ব্যক্তিকে মেরেছিল। হযরত ইবনে যায়েদ (রা.) বলেন, গাভীর অনির্দিষ্ট এক অংশ নিয়ে নিহত ব্যক্তিকে মেরেছিল। হযরত আবু জাফর (রা.) বলেন, কুরআনে করীমে এবং হাদীসে যখন কোন নির্দিষ্ট অংশের কথা উল্লেখ নেই, তখন নির্দিষ্ট না করাটাই উত্তম (এবং উসুলের ও নীতি হচ্ছে اَلْمُطْلَقُ يُطْلَقُ عَلَى الْاِطْلَاقِ অর্থাৎ মতলক মতকই থাকবে। যখন কোন কিছু অনির্ধারিত থাকবে তাকে বিভিন্ন ধরনের তাবীল করে মুকাইয়দ বা নির্দিষ্ট করা চলে না।)

وَكَذٰلِكَ يُحْيِ اللّٰهُ الْمَوْتٰى وَيُرِيْكُمْ اٰيٰتِهٖ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُوْنَ

আল্লাহ এ ভাবেই মৃত ব্যক্তিকে জীবিত করেন এবং স্বীয় স্বকীয়তার নিদর্শন সমূহ প্রদর্শন করেন, যেন তোমরা বুঝতে পার। যেভাবে আল্লাহ্ তায়ালা বনী ইসরাইলের মৃত ব্যক্তিদেরকে জীবিত করেন, এভাবে মৃত ব্যক্তিদেরকে পুনরায় জীবিত করবেন। এভাবে তোমাদেরকে নবুয়তের সত্যতা দেখানো হচ্ছে, যেন তোমরা একথা উপলব্ধি করতে পার যে, হযরত মূসা (আ.) সত্য সত্য আল্লাহ তায়ালার নবী।

ثُمَّ قَسَتْ قُلُوْبُكُمْ مِّنْۢ بَعْدِ ذٰلِكَ

কিন্তু নিহত ব্যক্তি জীবিত হওয়ার পর তোমাদের অন্তর কঠিন হয়ে গেল। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, যখন গাভীর কিছু গোশত নিয়ে নিহিত ব্যক্তিকে মারা হল, তখন সে উঠে বসল। তাকে জিজ্ঞেস করা হল কে তোমাকে নিহত করেছে? সে উত্তরে বলল- আমার ভাইয়ের ছেলেরা। অতঃপর যখন লোকটি মরে গেল, তখন তারা আবার বলল- আল্লাহর কসম, আমি হত্যা করিনি। এভাবে সত্যকে সে মিথ্যা বলেছে। এ মিথ্যা বলাটাকেই আল্লাহ্ তায়ালা ثُمَّ قَسَتْ قُلُوْبُكُمْ বলেছেন অর্থাৎ তোমাদের নিকট সত্য প্রকাশ হওয়ার পরও, তোমাদের অন্তর পাথরের চেয়ে বেশী কঠিন হয়েছিল- সত্যকে মিথ্যা বলতে তোমাদের অন্তর বিন্দুমাত্র কম্পিত হয়নি। হযরত কাতাদাহ্ (রা.) হতেও এভাবে বর্ণিত আছে।

Scanned with CamScanner

فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً

তাদের অন্তর পাথরের মত কঠিন। বা পাথরের চেয়েও বেশী কঠিন। শব্দ أَوْ হরফে عطف হতে যে সন্দেহের সৃষ্টি হয় তা আল্লাহ্ তায়ালার কাছে নয় বরং তা যাদেরকে সম্বোধন করে বলা হয়েছে তাদের কাছে।

وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ

কারণ পাথরের মধ্যে এমন পাথরও রয়েছে যার থেকে পানি বের হয়, ঐ সকল পাথরের সাথে তুলনা করে বলা হয়েছে তাদের অন্তর পাথরের চেয়েও কঠিন।

وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ

কখনো পাথরকে ভাংগা বা টুকরা করা হলে তার থেকে পানি বের হয়।

وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ

কছু পাথর এমনও রয়েছে আল্লাহর ভয়ে ধসে পড়ে। অর্থাৎ বনি-ইসরাইলকে আল্লাহ্ তায়ালা নবুয়তের দলিল প্রমাণ প্রদর্শনের পরও তাদের অন্তর শক্ত ও কঠিন হয়ে গিয়েছিল; অথচ তাদের অন্তরে এ সম্পর্কে অনুধাবন ও উপলব্ধি আছে। পক্ষান্তরে পাথরের কোন ইন্দ্রিয় শক্তি না থাকা সত্ত্বেও পানি বের হয়। কোন কোন পাথর ভাঙ্গলে পানি বের হয়, আবার কোন কোন পাথর আল্লাহ্ তায়ালার ভয়-ভীতিতে খসে পড়ে। এজন্যই আল্লাহ্ তায়ালা বলেন, তাদের অন্তরের চেয়েও নরম অনেক পাথর রয়েছে। হযরত মুজাহিদ (রা.) বলেন, আল্লাহ্ তায়ালার বাণী- ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَٰلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً এর অর্থ হচ্ছে যে সকল পাথর থেকে পানি প্রবাহিত হয় এবং যে সকল পাথর পর্বত শৃঙ্গ হতে নীচে নেমে পড়ে তা আল্লাহ্ তায়ালার ভয়-ভীতিতে হয়ে থাকে।

হযরত ইবনে জরীর (রা.) বলেন, অনেক পাথরকে আল্লাহ্ তায়ালা ইন্দ্রিয় শক্তি দান করতঃ বুঝার এবং উপলব্ধি করার শক্তি দান করেন এবং পাথর তা উপলব্ধি করে আল্লাহ্ তায়ালার আদেশ পালন করে। এ কথার প্রমাণ হিসেবে গাছের ডালের ক্রন্দনের ঘটনা বর্ণনা করেন। হযরত নবী করীম (সা.)-এর নিম্নোক্ত হাদীস বর্ণনা করেন।

عن النبي صلي الله عليه وسلم انه قال ان حجرا كان يسلم علي في الجاهلية اني لا عرفه الان ـ

অর্থাৎ জাহলিয়তের যুগে একটি পাথর আমাকে সালাম করত এবং তা এখনও আমি চিনি। একথা থেকে বুঝা যায় আল্লাহ্ তায়ালার ভয়ে পাথর হতে পানি প্রবাহিত হওয়া সম্ভব। অন্য একদল লোক বলেন, এর দ্বারা ঐ পাহাড়কে বুঝানো হচ্ছে যা আল্লাহ্ তায়ালার নূর পতিত হওয়ায় অবনত হয়ে গিয়েছিল।

وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ

আল্লাহ্ তায়ালা তোমরা যে কার্যকলাপ করছ, তা থেকে বেখবর নন। অর্থাৎ তোমাদের কাজ সম্পর্কে অবগত রয়েছেন।

أَفَتَطْمَعُونَ أَنْ يُؤْمِنُوا لَكُمْ

এরপরও কী তোমরা আশা কর যে, এরা ঈমানের আলোকে আলোকিত হবে। অর্থাৎ হে মুহাম্মদ (সা.) তুমি কী আশা কর যে, বনী ইসরাঈলের ইহুদীরা তোমাকে বিশ্বাস করবে।

وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِنْ بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ

এখানে فريق শব্দটি বহুবচন, এর কোন একবচন নেই- তায়েফা শব্দের ন্যায়। আর يحرفونه শব্দ দ্বারা উদ্দেশ্য করা হয়েছে বনি ইসরাঈলের উলামা সম্প্রদায় এবং সর্বনাম দিয়ে উদ্দেশ্য করা হয়েছে তৌরাত কিতাব।

অর্থাৎ আল্লাহ্ তায়ালা বলেন, হে উম্মতে মুহাম্মদ (সা.)! বনী ইসরাঈলের ইহুদীগণ তোমাদের কথায় বিশ্বাস করবে তা কী তোমরা মনে কর? অথচ তাদের মধ্যে একদল আল্লাহ্ তায়ালার বাণী সরাসরি শ্রবণ করে এবং তা ভাল করে উপলব্ধি ও অনুধাবন করার পর তা বিকৃত করত। পক্ষান্তরে, এখনতো তারা আল্লাহ্ তায়ালার কথা শ্রবণ করছে না বরং তোমাদের থেকে শ্রবণ করছে মাত্র।

সুতরাং এক্ষেত্রে এ'সত্য অতীব লক্ষনীয় যে, যেখানে তারা স্বয়ং নিজ কানে আল্লাহ তায়ালার বাণী শ্রবণ করার পরও হযরত মূসা (আ.)-এর উপর ঈমান আনেনি, সে ক্ষেত্রে তারা নিজ কানে না শুনে, শুধু তোমাদের মুখ নিসৃত আল্লাহর বাণী শ্রবণ করে ঈমান আনবে কি?

এ বিষয়ে একটি রিওয়ায়াত রয়েছে-

হযরত মুহাম্মদ বিন ইসহাক হতে বর্ণিত, তিনি বলেন কিছু সংখ্যক বিদ্বান ব্যক্তি হযরত মূসা (আ.)-এর খিদমতে হাজির হয়ে বলেন, হে মূসা! আমরা যেন আল্লাহ তায়ালার দর্শন লাভ করতে পারি এবং তাঁর বাণী শ্রবণ করতে পারি, যখন তুমি আল্লাহ্ তায়ালার সাথে কথা বল। এ জন্যে হযরত মূসা (আ.) আল্লাহ্ তায়ালার দরবারে ফরিয়াদ করলেন। আল্লাহ্ তায়ালা তাতে সম্মতি জানিয়ে বলেন- ঠিক আছে, তাদেরকে নিয়ে আস এবং তাদেরকে বল যেন পাক-সাফ হয়, তাদের কাপড় যেন পবিত্র রাখে এবং রোযা রাখে। একথা হযরত মূসা (আ.) তাদেরকে বলার পর তারা তা করল। অতঃপর হযরত মূসা (আ.) তাদেরকে নিয়ে তূর পাহাড় অভিমুখে রওয়ানা দিলেন এবং তূর পাহাড়ের পাদদেশে পৌছলেন। তাদেরকে মেঘ ঢেকে ফেলল। হযরত মূসা (আ.) তাদেরকে সিজদায় পড়ার নির্দেশ দিলেন এবং হযরত মূসা (আ.) আল্লাহ তায়ালার সাথে কথা বললেন। সেই কথোপোথন তারা শ্রবণ করল, তাদেরকে কিছু কিছু কাজ করার আদেশ দেয়া হল এবং কতেক কাজ হতে বিরত থাকার নির্দেশ দেয়া হল। তারা যা শ্রবণ করেছিল, তা বুঝেছিল। অতঃপর তারা বনি ইসরাঈলের নিকট প্রত্যাবর্তন করল। তারা তথায় ফিরে আসার পর যা তাদেরকে করতে বলা হয়েছিল, তাতে তারা বিকৃতি সৃষ্টি করল। যখন হযরত মূসা (আ.) তাদেরকে বললেন, আল্লাহ্ তায়ালা তোমাদেরকে একাজ করার আদেশ দিয়েছেন, তখন তারা বিকৃতভাবে বলতে আরম্ভ করল এবং বলল, আল্লাহ্ তায়ালা এরকম বলেননি। তাদের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে আল্লাহ্ তায়ালা হযরত মুহাম্মদ (সা.)-কে বলেন, হে মুহাম্মদ (সা.) তুমি কী আশা করছ, তারা ঈমান আনবে? অথচ তারা সেই ইহুদী, যারা নিজ কানে শ্রবণ করার পরও তাদেরকে যা করতে বলা হয়েছিল তা করেনি এবং যে সব কিছু হতে বিরত থাকার জন্যে নির্দেশ দেয়া হয়েছিল তা থেকে বিরত থাকেনি; বরং তাতে তাদের মনগড়া অনেক কিছু সংযোজন করতঃ বিকৃত করেছে। অথচ আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে এমন অদৃশ্য ও অজানা কথা

Scanned with CamScanner

বলেছিলেন, যা সম্পর্কে তারা জানত না এবং যা তারা ইতিপূর্বে দেখেনি। অথচ এসব সত্বেও তারা ঈমান আনেনি এবং তাদের বংশধররাও ঈমান আনবে না বরং অস্বীকার করবে। আপনি তাদেরকে সত্য পথে আনতে পারবেন না কারণ যে ক্ষেত্রে আল্লাহ্ তায়ালার কথা মানেনি, সেই ক্ষেত্রে তোমাদের কথা কীভাবে মেনে চলবে? হযরত মুহাম্মদ (সা.) শেষ নবী এবং সেই ব্যাপারে তাদের কিতাব তওরাতে স্পষ্টত বর্ণনা রয়েছে এবং হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর বৈশিষ্ট্যও গুণাগুণ বর্ণনা করা হয়েছে। তাতেও তারা পরিবর্তন করার নিকটবর্তী হয়ে গিয়েছিল।

وَإِذَا لَقُوا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا قَالُوْا اٰمَنَّا

তারা মুমীনদের সাথে মিললে তাদেরকে খুশী করার জন্য বলত আমরা ঈমান এনেছি। অর্থাৎ ইহুদীদের একটি দল মুমীনদের সাথে মদীনায় প্রবেশ করেছিল, তারা বলত- তোমরা যেমন হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর উপর ঈমান এনেছ, অনুরূপ আমরাও এনেছি। এখন আল্লাহ তায়ালা মুমীনদেরকে সতর্ক করে দিয়ে বলেন, তোমরা তাদের কথায় বিশ্বাস করনা, প্রকৃতপক্ষে তারা মুনাফিক। তাদের মুখের কথা আর অন্তরের কথা এক নয়।

وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلٰى بَعْضٍ قَالُوْا أَتُحَدِّثُوْنَهُمْ بِمَا فَتَحَ اللّٰهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوْكُمْ بِهٖ عِنْدَ رَبِّكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُوْنَ

অথচ তারা যখন তাদের সম্প্রদায়ের সাথে পরস্পরায় একা একা মিলিত হত, তখন তারা বলত, আল্লাহ তোমাদের কাছে যা ব্যক্ত করেছেন তোমরা কী তাদের নিকট তা বলে দিচ্ছ? তাতে যেন তারা তোমাদের রবের কাছে দলিল হিসেবে পেশ করতে পারে। অর্থাৎ ইহুদীরা যখন পরস্পর একা দেখা করত, তখন তারা একে অপরকে জিজ্ঞেস করত তোমরা কী তৌরাতে মুহাম্মদ (সা.) সম্পর্কে যেসব প্রশংসা সূচক কথা রয়েছে, তা তাদেরকে অর্থাৎ মুহাম্মদ (সা.)-এর অনুসারী মুমীনদেরকে বলেছ? সাবধান! তা বলনা, যেহেতু তা তারা দলীল হিসেবে পেশ করবে।)

হযরত মুজাহিদ (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি উপরোক্ত বাণী সম্পর্কে বলতে গিয়ে বলেন- একদা হযরত মুহাম্মদ (সা.) বনী কুরাইযার দূর্গের পাশে গিয়ে বলেন- হে বানরের ভাই, হে শূকুরের ভাই, হে নাফরমান। তখন তারা বলে, কে এসব কথা মুহাম্মদ (সা.) এর কাছে বলল? এসব কথাতো তাদের জন্য দলিল হয়ে যাবে। হযরত ইবনে জুরাইয (রা.) হযরত মুজাহিদ (রা.) হতে বর্ণনা করেন, যখন হযরত আলী (রা.)-কে তাদের কাছে প্রেরণ করা হয়েছিল, তখন তারা হযরত (সা.)-কে গালি দিয়েছিল।

হযরত সুদ্দী (রা.) বলেন, তারা পরস্পর জিজ্ঞেস করেছিল তোমরা কী তৌরাতে যে সব আযাব এবং শাস্তির কথা বলা হয়েছে তা তাদেরকে বলছ? যদি বলে থাক, তাহলে তা তারা তোমাদের রবের কাছে দলীল হিসেবে পেশ করবে। ঐসব লোক ছিল ইহুদী। যারা বলত ঈমান এনেছি, অথচ তারা মুনাফিক। তারা মুমীনদেরকে বলত তাদের প্রতি অবতীর্ণ আযাব সম্পর্কে; পক্ষান্তরে তারা পরস্পর মিলিত হলে- একে অপরকে জিজ্ঞেস করত তোমরা কী আল্লাহ্ তায়ালা যা বলেছেন তা বলে দিচ্ছ? বরং তারা একে অপরকে শিখিয়ে দিত তোমরা মুমীনদেরকে বলবে, আমরাই তোমাদের চেয়ে আল্লাহর কাছে প্রিয় ও সম্মানিত।

হযরত আবু জাফর (রা.) বলেন, আমাকে হযরত ইউনুস (রা.) বলেন, আমাদেরকে হযরত ইবনে ওহাব (রা.) অবহিত করেন। তিনি বলেন, হযরত ইবনে যায়েদ (রা.) إِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلٰى بَعْضٍ الخ সম্পর্কে বলেন, তাদেরকে যখন প্রশ্ন করা হত, তোমরা কী জান, তৌরাতে এ রকম আছে? তারা উত্তরে বলত হ্যাঁ। এরপর তারা যখন তাদের নেতাদের এবং বিদ্বান লোকদের কাছে ফিরে যেত- তারা তাদেরকে এসব কথা বলত। তাদের নেতারা তাদেরকে বলত- তোমরা কেন মুমিনদেরকে এসব বলে দিচ্ছ, যা আল্লাহ্ তায়ালা তোমাদের উপর অবতীর্ণ করেছেন? তা তাদের জন্য তোমাদের রবের কাছে দলীল হবে। তোমরা কী তা বুঝনা?

হযরত ইবনে যায়েদ (রা.) বলেন- রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন-মুমীন ছাড়া অন্য কেউ মদীনায় প্রবেশ করবে না। কাফির এবং মুনাফেক নেতারা তাদেরকে শিখিয়ে দিয়ে বলত- তোমরা মুমীনদের কাছে যাও এবং বল আমরা ঈমান এনেছি, (অথচ তারা কাফের) এবং যখন ফিরে আসবে তখন কাফের হয়ে যাবে। তিনি বলেন, তারা সকালে মদীনায় আসতো এবং আছরের পর ফিরে যেত। এরপর আল্লাহ তায়ালার নিম্নোক্ত বাণী পড়লেন।

وَقَالَتْ طَّائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ اٰمِنُوْا بِالَّذِيْ أُنْزِلَ عَلَى الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَجْهَ النَّهَارِ وَاكْفُرُوْا اٰخِرَهٗ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُوْنَ۔ (ال عمران۔٧٢)

"আহ্লে কিতাবের একদল বলল, যারা ঈমান এনেছে তাদের প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে তোমরা দিনের শুরুতে তা বিশ্বাস কর এবং দিনের শেষে তা প্রত্যাখ্যান কর যাতে তারা ফিরবে।"

তারা যখন মদীনায় প্রবেশ করত, তখন বলত আমরা মুসলমান। তাদের ভিতরের খবর সম্পর্কে অবহিত করার লক্ষে আল্লাহ তায়ালা এআয়াত অবতীর্ণ করেন। এসম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (সা.) অবগত হওয়ার পর তাদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করেন এবং তাদেরকে আর মদীনায় প্রবেশ করতে দেননি। রাসূলুল্লাহ (সা.) এর সাথে যারা ছিলেন, তারা মুমীন ছিলেন এবং তারাও তাদেরকে মুমীন মনে করত এবং তারা কাফেরদেরকে বলত আল্লাহ তায়ালা কী এ রকম বলেননি? তারা বলত হ্যাঁ! পক্ষান্তরে তারা যখন তাদের সম্প্রদায়ের নিকট ফিরে যেত- তখন কাফের হয়ে যেত। এর প্রতি ইঙ্গিত প্রদান করেই আল্লাহ্ তায়ালা বলেন- قَالُوْا أَتُحَدِّثُوْنَهُمْ بِمَا فَتَحَ اللّٰهُ عَلَيْكُمْ

আরবীদের দৃষ্টিতে فتح শব্দের অর্থ হল সাহায্য, রায় এবং আদেশ। মোটকথা بِمَا فَتَحَ اللّٰهُ عَلَيْكُمْ দ্বারা আল্লাহ তায়ালা তৌরাতে তার প্রিয়তম হযরত মুহাম্মদ (স.) এর যে বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করেছেন, তার প্রতি ইশারা করা হয়েছে।

أَوَلَا يَعْلَمُوْنَ أَنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّوْنَ وَمَا يُعْلِنُوْنَ

ওরা কী জানেনা এসত্য, যা কিছু চুপি চুপি করা হয় এবং প্রকাশ্যে করা হয়- সবই আল্লাহ তায়ালা জানেন। অর্থাৎ মুনাফিক ইহুদী কী জানেনা- তারা যে হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর বৈশিষ্ট্য লুকায় এবং চুপি চুপি কুফর করে আবার প্রকাশ্যে বলে আমরা ঈমান এনেছি- এসবই আল্লাহ্ তায়ালা জানেন?

Scanned with CamScanner

وَمِنْهُمْ أُمِّيُّوْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ الْكِتٰبَ اِلَّا اَمَانِيَّ وَاِنْ هُمْ اِلَّا يَظُنُّوْنَ ﴿٧٨﴾
فَوَيْلٌ لِّلَّذِيْنَ يَكْتُبُوْنَ الْكِتٰبَ بِاَيْدِيْهِمْ ثُمَّ يَقُوْلُوْنَ هٰذَا مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ
لِيَشْتَرُوْا بِهٖ ثَمَنًا قَلِيْلًا ؕ فَوَيْلٌ لَّهُمْ مِّمَّا كَتَبَتْ اَيْدِيْهِمْ وَوَيْلٌ لَّهُمْ
مِّمَّا يَكْسِبُوْنَ ﴿٧٩﴾ وَقَالُوْا لَنْ تَمَسَّنَا النَّارُ اِلَّا اَيَّامًا مَّعْدُوْدَةً ؕ قُلْ
اَتَّخَذْتُمْ عِنْدَ اللّٰهِ عَهْدًا فَلَنْ يُّخْلِفَ اللّٰهُ عَهْدَهٗ اَمْ تَقُوْلُوْنَ عَلَى اللّٰهِ
مَا لَا تَعْلَمُوْنَ ﴿٨٠﴾ بَلٰى مَنْ كَسَبَ سَيِّئَةً وَّاَحَاطَتْ بِهٖ خَطِيْٓئَتُهٗ
فَاُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ النَّارِ ۚ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ﴿٨١﴾ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا
وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ اُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ الْجَنَّةِ ۚ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ﴿٨٢﴾

৭৮. তাদের মধ্যে এমন কতক নিরক্ষর লোক আছে যাদের মিথ্যা আশা ব্যতীত কিতাব সম্বন্ধে কোন জ্ঞান নেই, তারা শুধু অমূলক ধারণা পোষণ করে।

৭৯. সুতরাং দুর্ভোগ তাদের জন্য যারা নিজ হাতে কিতাব রচনা করে এবং তুচ্ছ মূল্য প্রাপ্তির জন্য বলে, তা আল্লাহর নিকট হতে। তাদের হাত যা রচনা করেছে তার জন্য শাস্তি তাদের এবং যা তারা উপার্জন করে তার জন্য শাস্তি তাদের।

৮০. তারা বলে, দিন কতক ব্যতীত আগুন আমাদেরকে কখনও স্পর্শ করবে না। বল, তোমরা কি আল্লাহর নিকট হতে অঙ্গীকার নিয়েছ; অতএব আল্লাহ তার অঙ্গীকার কখনও ভঙ্গ করবেন না কিংবা আল্লাহ সম্বন্ধে এমন কিছু বলছো যা তোমরা জান না?

৮১. হ্যাঁ, যারা পাপ কার্য করে এবং যাদের পাপরাশি তাদেরকে পরিবেষ্টন করে তারাই অগ্নিবাসী, সেখানে তারা স্থায়ী হবে।

৮২. আর যারা ঈমান আনে ও সৎকার্য করে তারাই জান্নাতবাসী, তারা সেখানে স্থায়ী হবে।

وَمِنْهُمْ أُمِّيُّوْنَ

এবং তাদের মধ্য হতে কিছু কিছু লোক লেখা-পড়া জানতনা আর কিছু কিছু লোক করতে জানত না। এসব লোককেই امي উম্মী বলা হয়েছে।

لَا يَعْلَمُوْنَ الْكِتٰبَ اِلَّا اَمَانِيَّ

এসব লোকেরা লেখা-পড়া জানত না, তাই মন-গড়া কথা বলত।

وَاِنْ هُمْ اِلَّا يَظُنُّوْنَ

এসব উম্মী লোকেরা লেখা-পড়া না জানার কারণে অজ্ঞতা বশতঃ খেয়ালের বশবর্তী যথেচ্ছা কথা বলে আপনার নবুয়ত অস্বীকার করে।

فَوَيْلٌ

শাস্তি। ওয়ায়েল হচ্ছে জাহান্নামের ময়দান যেখানে দুষখীদের পূজ ইত্যাদি জমা হয়, যা জাহান্নামের নিম্নতম স্থান।

لِّلَّذِيْنَ يَكْتُبُوْنَ الْكِتٰبَ بِاَيْدِيْهِمْ ثُمَّ يَقُوْلُوْنَ هٰذَا مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ لِيَشْتَرُوْا بِهٖ ثَمَنًا قَلِيْلًا

সুতরাং শাস্তি ঐসব লোকদের জন্য যারা স্বীয় হাতে কিতাব লিখে বলে- এ কিতাব আল্লাহ্ তায়ালার পক্ষ হতে অবতীর্ণ হয়েছে যেন কম মূল্যে বিক্রি করতে পারে। অর্থাৎ বনী ইসরাঈলের কতেক ইহুদী লোক আল্লাহ্ তায়ালার কিতাব পরিবর্ধন ও পরিবর্জন করে এবং হযরত মূসা (আ.)-এর উপর যে আসল কিতাব নাযিল হয়েছে, তার বিপরীত ব্যাখ্যা সংযোজন করে যাদের কাছে তওরাতের ইলম নেই, তাদের কাছে বিক্রি করতো, অধিকন্তু তারা আল্লাহ্র কিতাব সম্পর্কে অজ্ঞ। তাদের সম্পর্কেই আল্লাহ তায়ালা বলেন-فَوَيْلٌ لَّهُمْ مِّمَّا كَتَبَتْ اَيْدِيْهِمْ وَوَيْلٌ لَّهُمْ مِّمَّا يَكْسِبُوْنَ হযরত সুদ্দী, হযরত ইবনে আব্বাস, মুজাহিদ এবং কাতাদাহ (রা.) ও এ বিষয়ে একমত পোষণ করেন।

فَوَيْلٌ لَّهُمْ مِّمَّا كَتَبَتْ اَيْدِيْهِمْ وَوَيْلٌ لَّهُمْ مِّمَّا يَكْسِبُوْنَ

তারা নিজে কিতাব লেখার কারণেই তাদের জন্যে সর্বনাশ ডেকে এনেছে- এ শাস্তি এবং সর্বনাশ তারা নিজেই অর্জন করেছে। অর্থাৎ জাহান্নামের মধ্যে নিম্নস্তরের জাহান্নামের ময়দান যেখানে দুষখীদের পূজ ইত্যাদি জমা হয়, সেখানে তাদেরকে শাস্তি দেয়া হবে। كسب শব্দের অর্থ নিজে কাজ করা অথবা অর্জন করা

وَقَالُوْا لَنْ تَمَسَّنَا النَّارُ اِلَّا اَيَّامًا مَّعْدُوْدَةً

তারা বিদ্রূপ করে করে বলত- আমাদেরকে দুষখের আগুন স্পর্শ করবে না, মাত্র কয়েক দিন ছাড়া। অর্থাৎ ইহুদী লোকেরা বলত- আমাদের শরীরকে আগুন স্পর্শ করবেনা। আমাদেরকে দুষখে প্রবিষ্ট করানো হবে না-শুধু চল্লিশ দিনের জন্যে দুষখে প্রবেশ করব যে দিনগুলোতে আমরা গাভীর বাচ্চার পূজা করেছিলাম। যখন এ চল্লিশ দিন পূর্ণ হয়ে যাবে, তখন আমাদেরকে দুষখ হতে বের করা হবে এবং শাস্তি উঠিয়ে নেয়া হবে। আল্লাহ তায়ালার ওয়াদাও এরূপ। কারণ আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে ঐ দিনগুলোতে শাস্তি দেবেন বলে শপথ নিয়েছিলেন। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতে এ রিওয়ায়াত বর্ণিত। এভাবে হযরত সুদ্দী এবং আবুল-আলীয়া রিওয়ায়ত করেন। হযরত ইকরামা (রা.) হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতে রিওয়ায়ত করেন। ইহুদীরা বলে- দুনিয়ার সময়সীমা হচ্ছে সাত হাজার বৎসর। কিয়ামতের একদিনের শাস্তি সমান দুনিয়ার এক হাজার বৎসরের শাস্তি হবে। সুতরাং মোটামুটি সাত দিন আজাব হবে তারপর আজাব বন্ধ হয়ে যাবে। এ প্রসংগে আল্লাহ তায়ালা বলেন- لَنْ تَمَسَّنَا النَّارُ اِلَّا اَيَّامًا مَّعْدُوْدَةً হযরত মুজাহিদ (রা.) এরূপ বর্ণনা করেন।

Scanned with CamScanner

قُلْ اَتَّخَذْتُمْ عِنْدَ اللّٰهِ عَهْدًا فَلَنْ يُّخْلِفَ اللّٰهُ عَهْدَهٗٓ اَمْ تَقُوْلُوْنَ عَلَى اللّٰهِ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ

হে মুহাম্মদ (স.)! আপনি তাদেরকে জিজ্ঞেস করুন- তোমরা কী (শাস্তি সম্পর্কে) আল্লাহ তায়ালা থেকে ওয়াদা নিয়েছ যে, আল্লাহ তায়ালা তাঁর ওয়াদার খেলাপ করবেন না? না কি তোমরা আল্লাহ্ তায়ালা সম্পর্কে না জেনে এসব মনগড়া কথা বলছ?- অর্থাৎ তোমরাতো আল্লাহ তায়ালা থেকে এমন কোন ওয়াদা নাওনি, যার খেলাপ আল্লাহ্ তায়ালা করবেন না।

بَلٰى مَنْ كَسَبَ سَيِّئَةً

হ্যাঁ, যে খারাপ ও অন্যায় কাজ করেছে। এখানে سيئة শব্দ দিয়ে অর্থ নেয়া হয়েছে 'শিরক' যেমন আহলে তাবীল, হযরত মুজাহিদ ও আতা (র.) বলেন-

وَّاَحَاطَتْ بِهٖ خَطِيْٓـَٔتُهٗ

তাদেরকে তাদের গোনাহ সমূহ বেষ্টন করে রেখেছে। অর্থাৎ তওবা করার আগেই তারা দুনিয়া হতে বিদায় নিয়েছে। হযরত ইসহাক (র.) এবং রবি বিন ইসহাক বলেন, اَحَاطَتْ بِهٖ خَطِيْٓـَٔتُهٗ এ বাক্যের অর্থ مات بذنبه গোনাহ নিয়েই মারা গেছে। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, তাদের কুফুর সমস্ত ভাল ও সৎ কাজকে পরিবেষ্টন করেছে।

فَاُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ النَّارِ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ

সুতরাং তারা দোজখের অধিবাসী, তারা সদা দুযখে অবস্থান করবে।

وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ اُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ

আর যারা ঈমানের নূরে আলোকিত হয়ে সৎকাজে নিবেদিত হয়েছে, তারাই হচ্ছে জান্নাতের বাসিন্দা এবং তারা জান্নাতে সর্বদা অবস্থান করবে। কারণ الثواب بالخير والشر مقيم على اهله ابدا لا انقطاع له ابدا সওয়াব হাছিল করা যায় ভাল কাজের দ্বারা এবং এর পরিণামও ভাল এবং পক্ষান্তরে খারাপের পরিণাম হচ্ছে খারাপ- যার উপর তারা সর্বদা থাকবে, কখনও ছিন্ন করা হবে না। এ ভাবেই হযরত ইবনে আব্বাস (র.) বলেন।

وَاِذْ اَخَذْنَا مِيْثَاقَ بَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ لَا تَعْبُدُوْنَ اِلَّا اللّٰهَ ز وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا وَّذِى الْقُرْبٰى وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسٰكِيْنِ وَقُوْلُوْا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَّاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ اِلَّا قَلِيْلًا مِّنْكُمْ وَاَنْتُمْ مُّعْرِضُوْنَ ﴿٨٣﴾ وَاِذْ اَخَذْنَا مِيْثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُوْنَ دِمَآءَكُمْ وَلَا

تُخْرِجُوْنَ اَنْفُسَكُمْ مِّنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ اَقْرَرْتُمْ وَاَنْتُمْ تَشْهَدُوْنَ ﴿٨٤﴾ ثُمَّ اَنْتُمْ هٰٓؤُلَآءِ تَقْتُلُوْنَ اَنْفُسَكُمْ وَتُخْرِجُوْنَ فَرِيْقًا مِّنْكُمْ مِّنْ دِيَارِهِمْ تَظٰهَرُوْنَ عَلَيْهِمْ بِالْاِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ط وَاِنْ يَّاْتُوْكُمْ اُسٰرٰى تُفٰدُوْهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ اِخْرَاجُهُمْ ط اَفَتُؤْمِنُوْنَ بِبَعْضِ الْكِتٰبِ وَتَكْفُرُوْنَ بِبَعْضٍ ج فَمَا جَزَآءُ مَنْ يَّفْعَلُ ذٰلِكَ مِنْكُمْ اِلَّا خِزْيٌ فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ج وَيَوْمَ الْقِيٰمَةِ يُرَدُّوْنَ اِلٰٓى اَشَدِّ الْعَذَابِ ط وَمَا اللّٰهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُوْنَ ﴿٨٥﴾ اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ اشْتَرَوُا الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا بِالْاٰخِرَةِ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنْصَرُوْنَ ﴿٨٦﴾

৮৩. স্মরণ কর, যখন ইসরাইল-সন্তানদের অঙ্গীকার নিয়েছিলাম যে, তোমরা আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারও ইবাদত করবে না, মাতা-পিতা, আত্মীয়-স্বজন, পিতৃহীন ও দরিদ্রদের প্রতি সদয় ব্যবহার করবে এবং মানুষের সাথে সদালাপ করবে, নামায কায়িম করবে ও যাকাত দেবে, কিন্তু স্বল্প সংখ্যক লোক ব্যতীত তোমরা বিরুদ্ধভাবাপন্ন হয়ে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিলে।

৮৪. যখন তোমাদের অঙ্গীকার নিয়েছিলাম যে, তোমরা পরস্পর রক্তপাত করবে না এবং আপনজনকে স্বদেশ হতে বহিষ্কার করবে না, অতঃপর তোমরা তা স্বীকার করেছিলে, আর এই বিষয়ে তোমরাই সাক্ষী।

৮৫. তোমরাই তারা যারা অতঃপর একে অন্যকে হত্যা করছ এবং তোমাদের এক দলকে স্বদেশ হতে বহিষ্কৃত করছ, তোমরা নিজেরা তাদের বিরুদ্ধে অন্যায় ও সীমালংঘন দ্বারা পরস্পরের পৃষ্ঠপোষকতা করছ এবং তারা যখন বন্দীরূপে তোমাদের নিকট উপস্থিত হয় তখন তোমরা মুক্তিপণ দাও; অথচ তাদের বহিষ্কারণই তোমাদের জন্য অবৈধ ছিল। তবে কি তোমরা কিতাবের কিছু অংশে বিশ্বাস কর এবং কিছু অংশকে প্রত্যাখ্যান কর? সুতরাং তোমাদের যারা এরূপ করে তাদের একমাত্র প্রতিফল পার্থিব জীবনে হীনতা এবং কিয়ামতের দিন তারা কঠিনতম শাস্তির দিকে নিক্ষিপ্ত হবে। তারা যা করে আল্লাহ সে সম্বন্ধে অনবহিত নন।

৮৬. তারাই আখিরাতের বিনিময়ে পার্থিব জীবন ক্রয় করে, সুতরাং তাদের শাস্তি লাঘব করা হবে না এবং তারা কোন সাহায্যপ্রাপ্ত হবে না।

Scanned with CamScanner

وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ

অর্থাৎ যখন আমি বনী ইসরাঈল হতে ওয়াদা নিয়েছিলাম যেন তারা আল্লাহ্ ছাড়া আর কারো ইবাদত না করে। উক্ত আয়াত সম্পর্কে হযরত রবি (রা.) বলেন- এ আয়াতের মর্মকথা হচ্ছে- তারা যেন শুধু আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য ইবাদত করে, আল্লাহ তায়ালা ব্যতীত যেন আরো কোন উদ্দেশ্যে ইবাদত না করে। হযরত আবুল আলীয়া ও এভাবে রিওয়ায়ত করেন।

وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا

এবং নিজ পিতা-মাতার সাথে সদাচরণ কর।

وَذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ

এবং আত্মীয়-স্বজন, প্রতিবেশীদের সাথে ভাল সম্পর্ক বজায় রাখ, ইয়াতীমদের সাথে ভাল এবং নম্র ব্যবহার কর এবং মিসকীনদের হক পরিশোধ কর-যা আল্লাহ্ তায়ালা তোমাদের উপর আবশ্যক করে দিয়েছেন।

وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا

এবং মানব সম্প্রদায়ের সাথে ভাল ব্যবহার কর এবং ভাল কথা বল।

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি وَقُولُوا لِلنَّاسِ সম্পর্কে বলেন- لا اله الا الله এর নির্দেশ দেয়ার নামই হল حسنا ভাল কথা। হযরত হাসান (রা.) বলেন- নম্র ও সুন্দর স্বভাবের নামই হল حسنا অর্থাৎ حسنا হচ্ছে সেই চরিত্র, যা আল্লাহ্ তায়ালার পছন্দ এবং যা দ্বারা আল্লাহ্ তায়ালার সন্তুষ্টি অর্জন করা যায়।

হযরত আবুল আলীয়া (রা.) বর্ণনা করেন- وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا বলে এ কথাই উদ্দেশ্য করা হয়েছে- তোমরা মানুষের সাথে ভাল ব্যবহার কর, তিনি আরও বলেন, হযরত মুহাম্মদ (স.) সম্পর্কে ভাল কথা বলা, সত্য কথা বলা। হযরত আবু জাফর (রা.) বলেন- আমাকে হযরত ইয়াজীদ বিন হারুন (রা.) বর্ণনা করেন, তিনি বলেন- আমি হযরত সুফিয়ান সওরী (রা.) হতে শ্রবণ করেছি, তিনি বলেন- قُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا এ বাক্যের মর্মার্থ হচ্ছে- মানুষকে ভাল কাজের আদেশ প্রদান করা এবং খারাপ কাজ হতে বিরত থাকার নির্দেশ দেওয়া।

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ

এবং নামাজ প্রতিষ্ঠা কর। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত-

واقامة الصلواة تمام الركوع والسجود والتلاوة والخشوع والاقبال عليها فيها ـ

অর্থাৎ পূর্ণভাবে রুকু, সিজদা আদায় করে, সুন্দর ও সহীহভাবে তিলাওয়াত করে এবং আল্লাহ তায়ালার ভয়-ভীতি অন্তরে পোষণ করে নামাজ আদায় করার নামই হচ্ছে اقامة الصلواة অর্থাৎ নামাজ প্রতিষ্ঠা।

وَآتُوا الزَّكَاةَ

এবং যাকাত আদায় কর। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন তাদের মালের উপর যাকাত ফরজ ছিল। কিন্তু তাদের যাকাত মকবুলিয়তের ব্যাপারে একটি প্রথা বিদ্যমান ছিল। তা হচ্ছে- তারা যখন যাকাত আদায় করত, তখন এক টুকরা আগুন এসে তা উঠিয়ে নিয়ে যেত। এটি ছিল যাকাত মকবুলিয়তের নিদর্শন। যাদের যাকাত এরূপ আগুনে নিয়ে যেত না এতে বুঝা যেত তাদের যাকাত কবুল করা হয়নি। এ জন্যে তারা যাকাত হালাল মাল হতে পরিশোধ করত।

ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِنْكُمْ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ

আল্লাহ তায়ালা ইহুদী সম্প্রদায়ের ওয়াদা রক্ষা না করার উপর তাদের কুৎসা বর্ণনা করে বলেন, হে বনি ইসরাইলের ইহুদীগণ! তোমাদের পূর্ববর্তীদের থেকে যে সমস্ত ওয়াদা নেয়া হয়েছিল তা পূরণ করা থেকে তারা মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিলে, শুধু মদীনার কিছু সংখ্যক ইহুদী ছাড়া বাকী সকলেই ওয়াদা পূরণ করা থেকে মুখ ফিরিয়ে রয়েছে।

وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنْفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ

আল্লাহ্ তায়ালা তাদের থেকে কি ওয়াদা নিয়েছিলেন তা স্মরণ করিয়ে বলছেন, তোমরা ঐ সময়কে স্মরণ কর, যখন আমি তোমাদের থেকে ওয়াদা নিয়েছিলাম যেন তোমরা অন্যায়ভাবে একজন অপরজনকে হত্যা না কর। তা হলে এর ক্ষতিপূরণ স্বরূপ হত্যাকারীকে হত্যা করা হবে। সুতরাং অপরজনকে হত্যা করার অর্থ হবে নিজকে হত্যা করার মত। তোমরা তোমাদের একই সম্প্রদায় বা একই পথের অনুসারী ভাইকে তার বাড়ী-ঘর হতে বের করে দিওনা। কারণ সে আর তুমি মর্যাদার দিক থেকে একই। যেহেতু রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন-

انما المؤمنون في ترا حمهم وتعاطفهم بينهم بمنزلة الجسد الواحد اذا اشتكي بعضه تداعي له سائر الجسد بالحمي والسهر

অর্থাৎ পরস্পরের মধ্যে আন্তরিকতাও হৃদ্যতার ক্ষেত্রে এক মুমীন অপর মুমীনের শরীরের অংশ বিশেষ। যেমন জ্বর হলে পূর্ণ শরীর ব্যাথা করে, তেমনি কোন মুমীনের দুঃখ হলে তাতে অন্য মুমিনের দুঃখবোধ করতে হবে।

ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ

তারপর তোমরা অঙ্গীকার করলে। অর্থাৎ তোমাদের থেকে যে ওয়াদা নেয়া হয়েছে, তোমরা তার অঙ্গীকার করেছ এবং পূর্ববর্তীদের অঙ্গীকারের উপর সাক্ষ্য প্রদান করেছ।

ثُمَّ أَنْتُمْ هَٰؤُلَاءِ تَقْتُلُونَ أَنْفُسَكُمْ وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِنْكُمْ مِنْ دِيَارِهِمْ تَظَاهَرُونَ عَلَيْهِمْ بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

অর্থাৎ হে বনী ইসরাঈলের ইহুদী সম্প্রদায়। তোমরা নিজকে নিজে হত্যা করেছ এবং তোমাদের মধ্য হতে একটি সম্প্রদায়কে তাদের ঘর হতে বের করেছ এবং তাদেরকে বের করার ব্যাপারে তোমরা সাহায্য করেছ, অথচ এসব গোনাহ এবং সীমালঙ্ঘন বৈ আর কিছুই নয়।

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) উপরোক্ত আয়াত প্রসংগে বলেন, যারা এ কাজে সম্পৃক্ত ছিল তারা হল মুশরিক। তোমরা রক্তপাত করতে, তাদেরকে দেশান্তর করতে। অথচ তৌরাতেই তা হারাম করা হয়েছিল, ফিদিয়া দিয়া তাদের কায়েদীকে মুক্ত করা তাদের উপর ফরজ ছিল। তারা দুটি সম্প্রদায়ে বিভক্ত ছিল। দু'টি গোত্রের মধ্যে একটি গোত্রের নাম হল বনী কাইনুকা, যারা খাযরাজ গোত্রের বন্ধু বা তাদের সাথে চুক্তিবদ্ধ ছিল। অপর গোত্র ছিল নযির ও কুরাইজা। এরা ছিল আউস গোত্রের বন্ধু বা তাদের সাথে চুক্তিবদ্ধ। এদিকে খাযরায এবং আউস গোত্রের মধ্যে যুদ্ধ বাধল। বনি

Scanned with CamScanner

কাইনুকা খাযরাজ গোত্রের পক্ষ অবলম্বন করে তাদেরকে সাহায্য করতে লাগল এবং অপরদিকে নযির ও কুরাইযা আউস গোত্রকে সাহায্য করতে লাগল। শেষ পর্যন্ত তারা রক্তপাত ঘটাল। অথচ তৌরাত তাদের কাছেই ছিল।

আউস এবং খযরাজ গোত্রদ্বয় হচ্ছে আহলে শিরক। তারা প্রতিমা পূজা করত, বেহশত দোজখ সম্পর্কে তাদের কোন ধারণা ছিল না, ধারণা ছিলনা মৃত্যুর পর পুনরায় জীবিত হওয়া সম্পর্কে, কিয়ামত সম্পর্কে, ধারণা ছিলনা কিতাব সম্পর্কে, হালাল ও হারাম সম্পর্কেও কোন ধারণা ছিল না। আউসের হাতে কোন ইহুদী বন্দী হয়ে আসলে বনী কাইনুকা তাদেরকে অর্থ দিয়ে মুক্ত করে নিত তওরাতের নির্দেশের প্রেক্ষিতে। অপরদিকে খাযরাজের কোন ইহুদী বন্দী হয়ে আসলে নযির ও কুরাইযা তাদেরকে অর্থ দিয়ে মুক্ত করে নিত। কারণ এভাবে ফিদিয়া দিয়ে মুক্ত করে নেয়ার ব্যাপারে তওরাতে উল্লেখ রয়েছে। অথচ রক্তপাত না করার কথা এবং বাড়ীঘর হতে বের করে না দেয়ার কথা ও তওরাতে উল্লেখ রয়েছে, কিন্তু তা তারা পালন করত না। তার প্রতি ইশারা করেই আল্লাহ্ তায়ালা বলেন- তোমরা কী কিতাবের কিছু অংশ মান এবং কিছু অংশ মাননা। এঘটনাই এখানে বিবৃত করা হয়েছে।

হযরত সুদ্দী (রা.) এ বিষয়ে বর্ণনা করেন। تظاهر আসলে تظاهر ছিল। ظ-تا এর নিকটবর্তী জায়গা হতে বের হয় বলে تا কে ظا দিয়ে বদল করা হয়েছে এবং ط কে ظ এর মধ্যে প্রবেশ করা হয়েছে। অপর এক কেরাতে দেখা যায় দ্বিতীয় تا কে উহ্য করা হয়েছে। এ দুটিই সঠিক।

وَإِنْ يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ تُفَادُوهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ

যদি তোমাদের কেউ কায়েদী হয়ে আসে, তাকে তোমরা অর্থ দিয়ে মুক্ত করে নাও অথচ তাদেরকে দেশান্তর করা তোমাদের উপর হারাম। তোমরা কী কিতাবের কিছু অংশের উপর ঈমান এনেছ এবং কিতাবের কিছু অংশের সাথে কুফর করছ। অর্থাৎ তোমাদের উপর আদেশ রয়েছে কেউ বন্দী হলে তাকে অর্থ দিয়ে মুক্ত করে নেয়া এবং তোমরা তা পালন করে আল্লাহর হুকুম পালন করছ। তদ্রূপ কোন লোককে দেশান্তর না করার কথা ও রয়েছে এমন কী তা ওয়াজিব। তা পালন না করার অর্থ তা অস্বীকার করা। এ কথাই আল্লাহ তায়ালা উল্লেখ করেন।

أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ

হযরত কাতাদাহ্ (রা.) বলেন, তাদেরকে দেশান্তর করা কুফর ছিল এবং অর্থ দিয়ে মুক্ত করাটা ঈমান ছিল। এ আয়াতের تفدو এবং تفادو দু' ধরনের কেরাত রয়েছে।

فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذَٰلِكَ مِنْكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ ۗ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ

তোমরা দুনিয়াতে যা করছ তার কোন বদলা বা বিনিময় পাবে না শুধু পৃথিবীতে বেইজ্জতি ছাড়া। কিয়ামতের দিন কঠিন শাস্তি প্রদান করা হবে এবং তোমরা যা করছ সেই সম্পর্কে আল্লাহ্ তায়ালা অবগত আছেন। অর্থাৎ "خزى" শব্দ দ্বারা কিসাস, جزية বনু নযীর-এর নির্বাসন ও বনু কুরাইযার যুদ্ধ বিগ্রহের দিকে ইংগিত করা হয়েছে।

أُولَٰئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ

এসব লোকেরা আখেরাতের পরিবর্তে দুনিয়াকে খরিদ করেছে। সুতরাং এজন্যে শাস্তি কম করা বা হালকা করা হবে না। এসব লোকদেরকে সাহায্যও করা হবেনা। অর্থাৎ তারা নিজ গোত্রের লোকদের মূর্খতা, দুর্বলতা এবং নির্বোধ হওয়ার সুবাদে তাদের ধন-দৌলত আহরণ করে পার্থিব সম্মানকে পরকালের সম্মান ও মর্যাদার উপর প্রধান্য দিয়েছে। হযরত কাতাদাহ (রা.) বলেন, استحبوا قليل الدنيا على كثير الاخرة তারা পার্থিব সামান্য জিনিষ আখিরাতের অধিক সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের মোকাবিলায় পছন্দ করেছে।

وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِنْ بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ ۖ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ ۗ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنْفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ ۖ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ ﴿٨٧﴾ وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ ۚ بَل لَّعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَّا يُؤْمِنُونَ ﴿٨٨﴾ وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا ۖ فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ ۚ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ ﴿٨٩﴾ بِئْسَمَا اشْتَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ أَن يَكْفُرُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ بَغْيًا أَن يُنَزِّلَ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ عَلَىٰ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ ۖ فَبَاءُو بِغَضَبٍ عَلَىٰ غَضَبٍ ۚ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ ﴿٩٠﴾ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ ۚ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَهُمْ ۗ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنبِيَاءَ اللَّهِ مِن قَبْلُ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ﴿٩١﴾ وَلَقَدْ جَاءَكُم مُّوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنتُمْ ظَالِمُونَ ﴿٩٢﴾

৮৭. এবং নিশ্চয় আমি মূসাকে কিতাব দিয়েছি এবং তার পরে পর্যায়ক্রমে

Scanned with CamScanner

রাসূলগণকে প্রেরণ করেছি, মারইয়াম পুত্র ঈসাকে স্পষ্ট প্রমাণ দিয়েছি এবং পবিত্র আত্মা দ্বারা তাকে শক্তিশালী করেছি। তবে কি যখনই কোন রাসূল তোমাদের নিকট এমন কিছু এনেছেন যা তোমাদের মনঃপূত নয় তখনই তোমরা অহংকার করেছ আর কতককে অস্বীকার করেছ এবং কতককে হত্যা করেছে?

৮৮. তরা বলেছিল, আমাদের হৃদয় আচ্ছাদিত; বরং কুফরীর জন্য আল্লাহ তাদেরকে লা'নত করেছেন। সুতরাং তাদের অল্প সংখ্যকই ঈমান আনে।

৮৯. তাদের নিকট যা আছে আল্লাহর নিকট হতে তার সমর্থক কিতাব আসল, যদিও পূর্বে সত্য প্রত্যাখ্যানকারীদের বিরুদ্ধে তারা এর সাহায্যে বিজয় প্রার্থনা করত, তবুও তারা যা জ্ঞাত ছিল তা যখন তাদের নিকট আসল তখন তারা তা প্রত্যাখ্যান করল। সুতরাং কাফিরদের প্রতি আল্লাহর লা'নত।

৯০. তা কত নিকৃষ্ট যার বিনিময়ে তারা তাদের আত্মাকে বিক্রয় করেছে- তা এই যে, আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন, জিদের বশবর্তী হয়ে তারা তাকে প্রত্যাখ্যান করত শুধু এ কারণে যে, আল্লাহ তার বান্দাদের মধ্য হতে যাকে ইচ্ছা অনুগ্রহ করেন। সুতরাং তারা ক্রোধের উপর ক্রোধের পাত্র হল। কাফিরদের জন্য লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি রয়েছে।

৯১. এবং যখন তাদেরকে বলা হয়, আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন তাতে ঈমান আনয়ন কর, তারা বলে, আমাদের প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে আমরা তাতে বিশ্বাস করি। অথচ তা ব্যতীত সব কিছুই তারা প্রত্যাখ্যান করে, যদিও তা সত্য এবং যা তাদের নিকট আছে তার সমর্থক। বল, যদি তোমরা মুমিন হতে তবে কেন তোমরা অতীতে আল্লাহর নবীগণকে হত্যা করেছিলে ?

৯২. এবং নিশ্চয় মূসা তোমাদের নিকট স্পষ্ট প্রমাণসহ এসেছেন, তার পরে তোমরা গো-বৎসকে উপাস্য রূপে গ্রহণ করেছিলে। আর তোমরা তো যালিম।

وَلَقَدْ اٰتَيْنَا مُوْسَى الْكِتٰبَ وَقَفَّيْنَا مِنْ بَعْدِهٖ بِالرُّسُلِ

অবশ্যই আমি মূসা (আ.)-কে কিতাব দিয়েছিলাম এবং ক্রমে ক্রমে আমি তার পরে রাসূলগণকে পাঠিয়েছিলাম। অর্থাৎ হযরত মূসা (আ.)-কে তৌরাত কিতাব প্রদান করার পর একই শরীয়তের ভিত্তিতে একে একে ক্রমান্বয়ে নবীদেরকে প্রেরণ করেন। কারণ হযরত মূসা হতে হযরত ইসা (আ.) আসার সময় পর্যন্ত যে সমস্ত নবী পাঠিয়েছেন, সকলের শরীয়তের রূপরেখা একই ছিল, তাই বলা হয়েছে- আমি হযরত মূসা (আ.)-কে তওরাত কিতাব দেয়ার পর তা বাস্তবায়ন করার জন্যে ক্রমান্বয়ে নবী পাঠিয়েছি। তাই তোমাদের উচিৎ তৌরাতের নিয়মাবলী বাস্তবায়ন করা এবং তদানুযায়ী আমল করা।

وَاٰتَيْنَا عِيْسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنٰتِ

আর আমি হযরত ঈসা বিন মরিয়ম (আ.)-কে নবুয়তের দলিলসমূহ দিয়েছি, যেন নবুয়তের সাক্ষ্য হিসেবে প্রমাণ করতে পারেন। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন- وَاٰتَيْنَا عِيْسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنٰتِ এর মর্মার্থ হচ্ছে- আল্লাহ্ তায়ালা তাঁকে মৃতকে জীবিত করার ক্ষমতা দিয়েছিলেন। তিনি মাটি দিয়ে পাখি তৈরী করেছিলেন এবং তাতে ফুঁক দেয়ার সাথে সাথে আল্লাহ্ তায়ালার নির্দেশে পাখি হয়ে গিয়েছিল। তিনি হাত বুলিয়ে দিলে কুষ্ঠ রোগে ভাল হয়ে যেত, অন্ধ লোক চোখে জ্যোতি ফিরে পেত। এ সবের দিকেই আল্লাহ্ তায়ালা ইশারা করেন।

وَاَيَّدْنٰهُ بِرُوْحِ الْقُدُسِ،

আর আমি হযরত ঈসা (আ.)-কে রুহুল কুদুস অর্থাৎ হযরত জিব্রাইল ফেরশতা দ্বারা সাহায্য করেছি এবং শক্তিশালী করেছি। এভাবেই হযরত কাতাদাহ (রা.) এবং হযরত সুদ্দী (রা.) হতে বর্ণিত।

হযরত ইবনে যায়েদ বলেন, এখানে رُوْحِ الْقُدُسِ এর মর্মকথা হলো ইনজিল। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, وَاَيَّدْنٰهُ بِرُوْحِ الْقُدُسِ বলে আল্লাহ্ তায়ালা হযরত ঈসা (আ.)-কে মৃতব্যক্তি জীবিত করার যে নাম শিক্ষা দিয়েছিলেন তৎপ্রতি ইঙ্গিত করেছেন। হযরত আবু জাফর (রা.) বলেন- সকল ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণের মধ্যে যেই ব্যাখ্যায় হযরত জিব্রাইল (আ.) অর্থ নেয়া হয়েছে তাই উত্তম। যেমন নিম্নোক্ত আয়াতে روح القدس দ্বারা জিব্রাইল (আ.)-কে বুঝানো হয়েছে।

اِذْ قَالَ اللّٰهُ يٰعِيْسَى ابْنَ مَرْيَمَ اذْكُرْ نِعْمَتِيْ عَلَيْكَ وَعَلٰى وَالِدَتِكَ اِذْ اَيَّدْتُّكَ بِرُوْحِ الْقُدُسِ تُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَاِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرٰةَ وَالْاِنْجِيْلَ -

"হে ঈসা বিন মরিয়ম, তুমি আমার ঐসব নিয়ামতের কথা স্মরণ কর যা তোমাকে এবং তোমার মাকে দেয়া হয়েছিল এবং ঐ সময়ও মুহূর্তের কথা স্মরণ কর যখন আমি তোমাকে রুহুল কুদুস দ্বারা সাহায্য করেছিলাম। তুমি দোলনা থেকেই কথা বলেছিলে। ঐ মুহূর্তকে স্মরণ কর যখন আমি তোমাকে কিতাব শিক্ষা দিয়েছিলাম, জ্ঞান দান করেছিলাম। তৌরাত এবং ইনজিল শিক্ষা দিয়েছিলাম।" (সূরা মায়িদা-১১০)

এখন কথা হল যদি روح القدس দিয়ে ইনজিল উদ্দেশ্য করা হয় তা হলে রুহুল কুদুস বলার পর পুনরায় ইনজিল বলার কোন অর্থ নেই, কারণ তা অনর্থক হয়ে যাবে যা আল্লাহর শানের খেলাপ। অপর একদল روح القدس দ্বারা আল্লাহ্ তায়ালার সত্তা বলে থাকেন। যেমন হযরত ইবনে যায়েদ (রা.)ও কা'ব (রা.) এরা বলে থাকেন।

اَفَكُلَّمَا جَآءَكُمْ رَسُوْلٌ بِمَا لَا تَهْوٰٓى اَنْفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ ۚ فَفَرِيْقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيْقًا تَقْتُلُوْنَ

এটা কি আশ্চর্যজনক নয়! যখন তোমাদের কাছে রাসূল এমন কিছু নিয়ে আগমন করলেন যা তোমাদের মনের চাওয়ার মতো নয়। যা নিয়ে তোমরা গৌরব করেছিলে। তখন তোমাদের মধ্য হতে এক দল অন্য দলকে মিথ্যা বলতে লাগল এবং আরেক দলকে হত্যা করল।

وَقَالُوْا قُلُوْبُنَا غُلْفٌ ۭ

এবং তারা বলত আমাদের অন্তর পর্দা দ্বারা সংরক্ষিত। হযরত হুজাইফা (রা.) বলেন

Scanned with CamScanner

আয়াতের অর্থ হবে قلوبنا اغطية আমাদের অন্তর পর্দার অন্তরালে। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন- আমাদের অন্তর ঢাকনা দ্বারা ঢেকে রাখা হয়েছে। এভাবে মুজাহিদ (র.) বলেন غلف অর্থ হল غشاوة। হযরত সুদ্দী (রা.) বলেন اغلاف এর অর্থ হচ্ছে পর্দা. হযরত আতীয়া (রা.) বলেন "قُلُوْبُنَا غُلْفٌ" শব্দের দ্বারা বলা হয়েছে আমাদের অন্তর ইলমে ভরপুর। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) আরো বলেন- قُلُوْبُنَا غُلْفٌ" বলে তারা প্রকাশ করতে চেয়েছে একথা যে, তাদের অন্তর বিদ্যায় ভরপুর। হযরত মুহাম্মদ (সা.) এবং অন্য কারো কাছে বিদ্যা অর্জনের জন্যে যাওয়ার প্রয়োজন তাদের নেই।

بَلْ لَّعَنَهُمُ اللّٰهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيْلًا مَّا يُؤْمِنُوْنَ

আল্লাহ তায়ালা তাদের কুফরের কারণে তাদেরকে লানৎ করেন। তাদের মধ্য হতে খুব কম সংখ্যক লোকই ঈমান রাখে অথবা খুব কম লোকই ঈমান আনবে। যেহেতু এ সব লোকেরা আল্লাহর একত্ববাদ, পুনরুত্থান, সওয়াব এবং শাস্তির কথা স্বীকার করে, কিন্তু হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর নবুওয়তের অস্বীকার করে। আপনার উপর ঈমান আনা তাদের কিতাবের ভাষ্য অনুযায়ী তাদের উপর ফরয ছিল। তারা কিতাবের কিছু অংশে ঈমান এনেছে। (আর এটা অংশে কম।) এবং কিছু অংশকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে। (এটা অংশে বেশী।)

وَلَمَّا جَآءَهُمْ كِتٰبٌ مِّنْ عِنْدِ اللّٰهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ

আর যখন আল্লাহ্ তায়ালার পক্ষ হতে কুরআন তাদের কাছে উপনীত হল যা তোমাদের কিতাব তওরাত ও ইনজিলকে স্বীকার করে ও প্রত্যয়ন করে। এখানে كتاب দ্বারা উদ্দেশ্য করা হয়েছে কুরআন এবং مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ দ্বারা বুঝানো হয়েছে তৌরাত এবং ইনজিল।

وَكَانُوْا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُوْنَ عَلَى الَّذِيْنَ كَفَرُوْا ۚ فَلَمَّا جَآءَهُمْ مَّا عَرَفُوْا كَفَرُوْا بِهٖ ۚ فَلَعْنَةُ اللّٰهِ عَلَى الْكٰفِرِيْنَ

অথচ তারা এর আগে কাফিরদের নিকট এ কুরআনের মাধ্যমে বিজয় কামনা করত অতঃপর যখন তাদের নিকট সেই পরিচিত কিতাব উপনীত হল-তখন তারা অস্বীকার করে বসল। সুতরাং আল্লাহ্ তায়ালার লানত হউক এসব কাফেরদের উপর।

অথবা তারা কাফিরদের মুকাবেলায় কাফিরদের উপর বিজয়ী হওয়ার জন্যে সাহায্য কামনা করত, অথচ তাদের সেই পরিচিত ব্যক্তি তাদের কাছে উপনীত হলে তারা তাঁকে অস্বীকার করে বসল।

হযরত আসিম বিন উমর বিন কাতাদা আল আনসারী (রা.) হতে বর্ণিত, উপরোক্ত আয়াতের মূল অর্থ হচ্ছে, যখন আল্লাহ্ তায়ালার নিকট তাদের তওরাত ও ইনজিলের সত্যতা স্বীকারকারী কিতাব কুরআন নাযিল করলেন, তখন তারা তা অস্বীকার করল অথচ এর আগে তারা কাফিরদের মুকাবিলায় বিজয় কামনা করে এবং কাফিররা যখন বলত আমরাই জাহিলিয়তের যুগে বিজয় লাভ করেছি, অথচ আমরা আহলে শিরক, আর তারা আহলে কিতাব। এসব কথার উত্তরে ইহুদীরা বলত, অবশ্যই নবী প্রেরিত হবেন, তখন আমরা তোমাদেরকে হত্যা করব যেভাবে আদ এবং ইরামকে হত্যা করা হয়েছিল। অতঃপর যখন হযরত মুহাম্মদ (সা.) আল্লাহর রাসূল হয়ে

প্রেরিত হলেন, তখন তারা হযরত মুহাম্মদ (সা.)-কে অস্বীকার করল। এ ঘটনার দিকে ইশারা করেই আল্লাহ তায়ালা বলেন- فَلَمَّا جَآءَهُمْ مَّا عَرَفُوْا كَفَرُوْا بِهٖ -এ মর্মের হাদীস হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতেও বর্ণিত রয়েছে।

হযরত কাতাদাহ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি উল্লেখিত আয়াত সম্পর্কে বলেন, ইহুদীরা কাফেরদের উপর বিজয় লাভের জন্য হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর সাহায্য কামনা করে আগে বলত, হে আল্লাহ! আপনি সে নবী মুহম্মদকে প্রেরণ করুন, যাঁর সম্পর্কে বর্ণনা আমরা তৌরাত কিতাবে পেয়েছি। যেন আমরা কাফিরদেরকে শাস্তি দিতে পারি, তাদের সাথে যুদ্ধ করতে পারি। অথচ যখন আল্লাহ তায়ালা হযরত মুহাম্মদ (স.)-কে প্রেরণ করলেন এবং তারা দেখল যে, তাকে কুরাইশ বংশ হতে পাঠানো হয়েছে, তাদের থেকে পাঠানো হয়নি। তখন তারা সত্য জেনে ও আরবদের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করে, হযরত মুহাম্মদ (সা.)-কে অস্বীকার করে বসল। এ রহস্যের প্রতি ইশারা করে আল্লাহ্ তায়ালা বলেন, فَلَمَّا جَآءَهُمْ مَّا عَرَفُوْا كَفَرُوْا بِهٖ

بِئْسَمَا اشْتَرَوْا بِهٖٓ اَنْفُسَهُمْ اَنْ يَّكْفُرُوْا بِمَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ بَغْيًا

তা কতই না নিকৃষ্ট যার বিনিময়ে তারা নিজকে বিক্রয় করে দিয়েছে। তা হচ্ছে তারা আল্লাহ্ তায়ালা যা নাযিল করেছেন তা অস্বীকার করেছে ইচ্ছাকৃতভাবে এবং প্রতিহিংসা পরায়ণ হয়ে। بئس আশ্চর্যজনক ক্রিয়া বা فعل تعجب যার অর্থ ساء অর্থাৎ খুবই খারাপ।

اَنْ يُّنَزِّلَ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖ عَلٰى مَنْ يَّشَآءُ مِنْ عِبَادِهٖ

আল্লাহ্ তায়ালা তার বান্দাহদের মধ্যে যাকে ইচ্ছে তাকে নিজ দয়া ও স্নেহ দিয়ে অভিভূত করেন। হযরত সুদ্দী (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, তারা বলে সকল নবী বা রাসূল তো বনী ইসরাইল থেকেই অবির্ভূত হয়েছেন। বনী ইসমাঈল থেকে কিভাবে এ নবীর আবির্ভাব হয়!

فَبَآءُوْ بِغَضَبٍ عَلٰى غَضَبٍ ۭ

সুতরাং তারা গযবের উপর গযবের অধিকারী হয়েছে। (কারণ কুফর করার দরুন একটা আযাবের অধিকারী ছিল, এখন মুসলমানদের প্রতি প্রতিহিংসা পরায়ণ হয়ে আর একটা আযাবের অধিকারী হল)

وَلِلْكٰفِرِيْنَ عَذَابٌ مُّهِيْنٌ

আর কাফেরদের জন্য নির্ধারিত রয়েছে লাঞ্ছনাময় আযাব।

وَاِذَا قِيْلَ لَهُمْ اٰمِنُوْا بِمَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ قَالُوْا نُؤْمِنُ بِمَآ اُنْزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُوْنَ بِمَا وَرَآءَهٗ

আর যখন তাদেরকে বলা হত তোমরা ঈমান আন, ঐসব জিনিষের উপর, যা আল্লাহ তায়ালা প্রেরণ করেছেন। উত্তরে তারা বলত, আমরা ঈমান আনব এমন সব জিনিষের উপর যা আমাদের উপর নাযিল করা হয়েছে এবং এ ছাড়া অন্য কিছুকে তারা অস্বীকার করে অর্থাৎ তারা বলত আমরা তৌরাত এর উপর ঈমান আনব। তৌরাত ছাড়া অন্যান্য কিতাব তারা অস্বীকার করত। হযরত সুদ্দী (রা.) বলেন- بما وراءه শব্দ দিয়ে 'কুরআন' শরীফ বুঝানো হয়েছে।

Scanned with CamScanner

وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَهُمْ

এ কুরআন করীম সত্য সত্য আল্লাহ প্রদত্ত। যা তাদের কিতাব তৌরাত এবং ইনজিলকে সত্যায়ন ও প্রত্যায়ন করে।

قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُوْنَ اَنْبِيَاءَ اللّٰهِ مِنْ قَبْلُ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ

হে মুহাম্মদ (সা.)! আপনি তাদেরকে জিজ্ঞেস করুন। কেন তোমরা পূর্ববর্তী নবীদেরকে হত্যা করেছ, যদি সত্যিই তোমরা মুমীন হয়ে থাক। অর্থাৎ যদি তারা তাদের দাবী بِمَا اُنْزِلَ عَلَيْنَا -এ দাবীতে সত্যবাদী হয়, তা হলে কেন তারা নবীদেরকে হত্যা করত? অথচ তোমাদের কাছে রক্ষিত আল্লাহ প্রদত্ত কিতাবে তো নবীদেরকে হত্যা করা হারাম বলা হয়েছে। বরং তোমাদেরকে তো বলা হয়েছে সেসব নবীদের অনুসরণ ও অনুকরণ কর। এ কথা এ জন্যে বলা হচ্ছে, যেহেতু তারা نُؤْمِنُ بِمَا اُنْزِلَ عَلَيْنَا এ উক্তির খেলাপ ছিল। যদিও তারা মুখে এ ধরনের কথা বলত বাস্তবে তারা তা পালন করত না। আর এখানে تَقْتُلُوْنَ এর অর্থ قَتَلْتُمْ অর্থাৎ مضارع উল্লেখ করে অতীতকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে। কুরআন শরীফে এর ব্যবহার অনেক রয়েছে। যেমন- وَاتَّبَعُوْا مَا تَتْلُوا الشَّيَاطِيْنُ তারা অনুসরণ করে যা শয়তানরা পাঠ করে। এখানে বনী ইসরাইলের ইয়াহুদীদেরকে সম্বোধন করে বলা হয়েছে। যারা রাসূলুল্লাহ (সা.)-কে পেয়েছিলেন। তাদের পূর্ববর্তীদের প্রতি ইহসান এবং তাদের কুফর সম্পর্কে বলা হয়েছে।

اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ শব্দ দ্বারা তাদেরকে সম্বোধন করা হয়েছে। কারণ তারা তাদের পূর্ববর্তীদের আচরণ, ক্রিয়া-কলাপের উপর সন্তুষ্ট ছিল। যদি তোমরা ঈমানের বলে বলীয়ান হতে, তাহলে কীভাবে তোমাদের পূর্ববর্তীদের আচরণে সন্তুষ্ট হতে?

وَلَقَدْ جَآءَكُمْ مُّوْسٰى بِالْبَيِّنٰتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهٖ وَاَنْتُمْ ظٰلِمُوْنَ

অবশ্যই হযরত মূসা (আ.) তোমাদের কাছে দলিলাদি নিয়ে এসেছিলেন; কিন্তু তোমরা এরপরও গাভীর বাছুরকে উপাস্য বানিয়েছিলে। সুতরাং তোমরা সীমালঙ্ঘনকারী। অর্থাৎ হযরত মূসা (আ.) তাঁর নবুওয়তের সত্যতা প্রমাণ করার লক্ষ্যে অনেক মু'জিযা নিয়ে এসেছিলেন। যেমন লাঠি, যা নির্দেশ অনুযায়ী অজগর সাপের আকার ধারণ করত। তার হাত পকেট হতে বের করলে উজ্জ্বল হয়ে যেত, সাগরের মধ্য দিয়ে শুকনো পথ, পঙ্গপাল, উকুন ব্যাঙসহ সকল নিদর্শন যা তাঁর নবুওয়তের সত্যতা প্রমাণ করে তা বুঝানো হয়েছে।

وَاِذْ اَخَذْنَا مِيْثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّوْرَ ط خُذُوْا مَا اٰتَيْنٰكُمْ بِقُوَّةٍ وَّاسْمَعُوْا ط قَالُوْا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا ز وَاُشْرِبُوْا فِيْ قُلُوْبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ ط قُلْ بِئْسَمَا يَاْمُرُكُمْ بِهٖٓ اِيْمَانُكُمْ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ﴿٩٣﴾ قُلْ اِنْ كَانَتْ لَكُمُ الدَّارُ الْاٰخِرَةُ عِنْدَ اللّٰهِ خَالِصَةً مِّنْ دُوْنِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ﴿٩٤﴾ وَلَنْ يَّتَمَنَّوْهُ اَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ اَيْدِيْهِمْ ط وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ بِالظّٰلِمِيْنَ ﴿٩٥﴾ وَلَتَجِدَنَّهُمْ اَحْرَصَ النَّاسِ عَلٰى حَيٰوةٍ ج وَّمِنَ الَّذِيْنَ اَشْرَكُوْا ج يَوَدُّ اَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ اَلْفَ سَنَةٍ ج وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهٖ مِنَ الْعَذَابِ اَنْ يُّعَمَّرَ ط وَاللّٰهُ بَصِيْرٌ بِمَا يَعْمَلُوْنَ ﴿٩٦﴾

৯৩. স্মরণ কর, যখন তোমাদের অঙ্গীকার নিয়েছিলাম এবং তূরকে তোমাদের উর্ধ্বে উত্তোলন করেছিলাম, বলেছিলাম, যা দিলাম দৃঢ়রূপে গ্রহণ কর এবং শ্রবণ কর। তারা বলেছিল, আমরা শ্রবণ করলাম ও অমান্য করলাম। কুফরীর কারনে তাদের হৃদয়ে গো-বৎস প্রীতি সিঞ্চিত হয়েছিল। বল, যদি তোমরা ঈমানদার হও, তবে তোমাদের ঈমান যা নির্দেশ দেয় তা কত নিকৃষ্ট।

৯৪. বল, যদি আল্লাহর নিকট আখিরাতের বাসস্থান অন্য লোক ব্যতীত বিশেষভাবে শুধু তোমাদের জন্যই হয় তবে তোমরা মৃত্যু কামনা কর-যদি সত্যবাদী হও।

৯৫. কিন্তু তাদের কৃতকর্মের জন্য তারা কখনও তা কামনা করবে না এবং আল্লাহ যালিমদের সম্বন্ধে অবহিত।

৯৬. তুমি নিশ্চয় তাদেরকে জীবনের প্রতি সমস্ত মানুষ, এমন কি মুশরিক অপেক্ষা অধিক লোভী দেখতে পাবে। তাদের প্রত্যেকে আকাঙ্খা করে যদি সহস্র বৎসর আয়ু দেওয়া হত, কিন্তু দীর্ঘায়ু তাকে শাস্তি হতে দূরে রাখতে পারবে না। তারা যা করে আল্লাহ তার দ্রষ্টা।

Scanned with CamScanner

وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا

আর যখন আমি তোমাদের থেকে ওয়াদা নিলাম এবং তোমাদের উপর তূর পাহাড় উঠালাম এবং বললাম তোমাদেরকে যা দিয়েছি, তা শক্ত করে ধর এবং আমল কর তদনুযায়ী, যা তোমরা শ্রবণ করেছ, আল্লাহ্ তায়ালার আনুগত্য কর। কিন্তু এর উত্তরে তোমরা বলেছ আমরা আপনার বক্তব্য শুনলাম কিন্তু আমরা আপনার কথা অমান্য করলাম। অর্থাৎ তাদেরকে যখন তাদের পূর্ববর্তীদের থেকে নেয়া ওয়াদা সম্পর্কে স্মরণ করিয়ে দেয়া হয়েছিল, তখন তারা বলেছিল سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا আমরা শ্রবণ করলাম কিন্তু তা মেনে নিলাম না।

وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ

তাদের কুফরের কারণে তাদের অন্তরে বাছুরের মুহাব্বত পান করানো হয়েছে।

قُلْ بِئْسَمَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ

হে মুহাম্মদ (সা.)! আপনি বলে দিন, তোমরা যদি সত্যিই মুমীন হয়ে থাক, তা হলে তোমাদের ঈমান কতইনা মন্দ নির্দেশ দিয়ে থাকে। যেভাবে তোমরা দাবী করছ, বলেছ نُؤْمِنُ بِمَا أُنْزِلَ عَلَيْنَا অর্থাৎ তৌরাতের উপর আমরা ঈমান এনেছি। অথচ তৌরাত তো নবীদেরকে হত্যা করতে এবং রাসূলদেরকে অস্বীকার করতে নিষেধ করেছে। এরপর যদি তোমরা নিষিদ্ধ কাজগুলো করে থাক, তা হলে এ কথা স্পষ্টতঃ বলতে হয়, এ সব নির্দেশ তোমাদের ঈমানের খুবই নিকৃষ্টতম নির্দেশ।

قُلْ إِنْ كَانَتْ لَكُمُ الدَّارُ الْآخِرَةُ عِنْدَ اللَّهِ خَالِصَةً مِنْ دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ـ

হে মুহাম্মদ (সা.)! আপনি তাদেরকে বলুন। তোমরা যে বলছ, আখেরাতের আনন্দ ও নিয়ামত শুধু তোমাদেরই জন্য নির্ধারিত। অন্য কোন লোকের অংশ গ্রহণ ছাড়া তোমরাই কেবল তা উপভোগ করবে, এ নিশ্চয়তা যদি তোমাদের থাকে, তা হলে তোমরা কেন মৃত্যুর প্রত্যাশা করছ না? হে নবী (সা.) যদি তাদের দাবীতে তারা সত্যি হয় তা হলে তাদেরকে বলুন তোমরা মৃত্যু কামনা করব। যেন তোমরা এ পৃথিবীর দুঃখ-কষ্ট, লাঞ্ছনা হতে মুক্ত হয়ে স্বাদ ও আনন্দ উপভোগ করতে পারবে। যেমন হযরত মুহাম্মদ (সা.) নাসারাদের সাথে মুবাহালা করে ফয়সালা করেছিলেন। তখন ইহুদীরা মৃত্যু কামনা হতে বিরত থাকল। কারণ তারা জানে যে, মৃত্যু চাইলেই তারা মরে যাবে। যেমনিভাবে নাসারাগণ চ্যালেঞ্জ করা থেকে বিরত ছিল। কারণ নাসারাগণ চ্যালেঞ্জ করলেই এ পৃথিবীতে একটা নাসারাও থাকত না, সকলেই মরে যেত।

عن ابن عباس قال لو تمنوه يوم قال لهم ذالك ما بقي علي ظهرالارض يهود الامات

অর্থাৎ হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, যদি সেদিন তারা মৃত্যু কামনা করত, তাহলে যমীনের পিঠে একটা ইয়াহুদীও থাকত না, সকলেই মরে যেত। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতে অপর রেওয়ায়তে আছে ادعوا بالموت علي اي الفريقين اكذب তোমরা মৃত্যু কামনা কর, তখন সত্য প্রতিভাত হবে, দু দলের

মধ্যে কে সত্যবাদী, কে মিথ্যাবাদী?

হযরত কাতাদাহ (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন এ আয়াতের মর্ম হচ্ছে- তোমরা যদি তোমাদের দাবীতে সত্যবাদী হও যেমন তোমরা বলে থাক, ইয়াহুদী এবং নাসারা ছাড়া আর কেউ বেহেশতে প্রবেশ করবে না এবং আরো বল- তোমরা আল্লাহর সন্তান, আল্লাহ্ তায়ালা আমাদেরকে পছন্দ করেন- তা হলে তোমরা আল্লাহ্ সাক্ষাৎ পাওয়ার লক্ষে, তাড়াতাড়ি জান্নাত পাওয়ার লক্ষে মৃত্যু কামনা কর।

وَلَنْ يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ ـ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ

তারা তাদের গোনাহের এবং কর্মের কারণে তারা মৃত্যুর জন্যে কখনও প্রার্থনা করবেনা। আল্লাহ্ তায়ালা সীমা লঙ্ঘনকারীকে ভালভাবে জানেন। অর্থাৎ তারা জানে হযরত মুহাম্মদ (সা.) সত্য, তারা যদি মৃত্যুর জন্যে প্রার্থনা করে, মৃত্যু এসে যাবে এবং মৃত্যুর পর তারা শাস্তির মধ্যে নিমজ্জিত হয়ে যাবে; কারণ তারা তৌরাত কিতাব অনুযায়ী আমল করেনি।

وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ

হে মুহাম্মদ (স.)! আপনি অবশ্যই তাদের (ইহুদীদের) কে দুনিয়ার জীবনের প্রতি সবচেয়ে বেশী লোভী মানুষ হিসেবে পাবেন। এমনকি ঐ সমস্ত লোকদেরকে চেয়েও, যারা শিরক করে। তারা কামনা করবে আহ্! যদি আমাদের বয়স এক হাজার বৎসর হত। অথচ মুশরিকরা মৃত্যুর পর যে আবার জীবিত হবে তা বিশ্বাস করেনা। পক্ষান্তরে ইয়াহুদীরা মৃত্যুর পর যে আবার জীবিত হবে এবং কিয়ামত যে হবে তা বিশ্বাস করে। তথাপি তাদের অসৎ ক্রিয়াকালাপের জন্য যে শাস্তি ভোগ করতে হবে, সেই ভয়ে মৃত্যু কামনা করেনা বরং দীর্ঘায়ু কামনা করে। হযরত সাঈদ বিন জুবাইর (রা.) এ আয়াতের তফসীরে বলেন- يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ এ বাক্যটি মুশরিক সম্পর্কে বলা হয়েছে। তারা বলত যদি এক হাজার বৎসর বয়স হত। আবার কেউ কেউ বলেন- হাঁচির জওয়াবে তারা বলত- এক হাজার বৎসর জীবিত থাকুন।

وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَنْ يُعَمَّرَ ـ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ

আর তাদের দীর্ঘায়ু তো আমার আযাব হতে তাদেরকে রক্ষা করতে পারবে না এবং আল্লাহ্ তায়ালা তাদের ক্রিয়া-কলাপ পর্যবেক্ষণ করেন।

قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدًى وَبُشْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ ﴿٩٧﴾ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِلَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيكَالَ فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِلْكَافِرِينَ ﴿٩٨﴾ وَلَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ ﴿٩٩﴾ أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِنْهُمْ ۚ بَلْ

Scanned with CamScanner

أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿١٠٠﴾ وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ
مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ كِتَابَ اللَّهِ
وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿١٠١﴾

৯৭. বল, যে কেউ জিবরীলের শত্রু হবে এ জন্য যে, তিনি আল্লাহর নির্দেশে আপনার হৃদয়ে কুরআন পৌঁছে দিয়েছেন, যা তার পূর্ববর্তী কিতাবের সমর্থক এবং যা মুমিনদের জন্য পথপ্রদর্শক ও সু-সংবাদ।

৯৮. যে কেউ আল্লাহর, তাঁর ফিরিশতাগণের, তাঁর রাসূলগণের এবং জিবরীল ও মীকাঈলের শত্রু, সে জেনে রাখুক, আল্লাহ নিশ্চয় কাফিরদের শত্রু।

৯৯. এবং নিশ্চয় আমি তোমার প্রতি স্পষ্ট নিদর্শন অবতীর্ণ করেছি। ফাসিকরা ব্যতীত অন্য কেউ তা প্রত্যাখান করে না।

১০০. তবে কি যখনই তারা অঙ্গীকারাবদ্ধ হয়েছে তখনই তাদের কোন একদল তা ভঙ্গ করেছে? বরং তাদের অধিকাংশই বিশ্বাস করে না।

১০১. যখন আল্লাহর পক্ষ হতে তাদের নিকট রাসূল আসলেন, যে তাদের নিকট যা রয়েছে, তার সমর্থক, তখন যাদেরকে কিতাব দেয়া হয়েছিল তাদের একদল আল্লাহর কিতাবটিকে পশ্চাতে নিক্ষেপ করল, যেন তারা জানে না।

قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِّجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ

হে মুহাম্মদ (স.)! আপনি বলে দিন, যে ব্যক্তি জিবরাইল (আ.)-এর সাথে শত্রুতা পোষণ করে একারণে যে, তিনি আল্লাহর নির্দেশে আপনার অন্তরে পবিত্র কুরআন অবতীর্ণ করেন। বনী ইসরাঈলের ইহুদী লোকেরা হযরত জিব্রাইল (আ.)-কে শত্রু মনে করত এবং হযরত মিকাইল (আ.)-কে বন্ধু মনে করত। এ আয়াত নাযিল হওয়ার অন্য একটি কারণ লেখা হয়- তা হলো ইহুদী এবং হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর মধ্যে একটি বিতর্ক সংগঠিত হয়। যার বিস্তারিত বর্ণনা হাদীস শরীফে উল্লেখ রয়েছে-

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ (স.)-এর দরবারে ইয়াহুদীদের একটি জামাত উপস্থিত হল। অতঃপর তারা হযরত মুহাম্মদ (স.)-কে সম্বোধন করে বলল- হে আবুল কাসিম! আমাদেরকে এমন কতেক জিনিষ সম্পর্কে বলুন যা একজন নবী ছাড়া অন্য কারো পক্ষে বলা সম্ভব নয়। রাসূলুল্লাহ (স.) বলেন- প্রশ্ন কর, যা তোমাদের ইচ্ছে। তবে এ কথার ওয়াদা গ্রহণ কর, যা ইয়াকুব (আ.) তার সন্তানের নিকট হতে নিয়েছিল। আর তা হল আমি যা বলব তা যদি সঠিক হয়, তখন আমার অনুসরণ করবে? অর্থাৎ তখন ইসলামের অনুসরণ করবে? তারা উত্তরে বলে, হ্যাঁ তাই হবে। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (স.) বলেন-

তোমাদের যা ইচ্ছে সওয়াল কর। তারা বলে- আমাদেরকে চারটি বিষয়ে বলুন।
১. আমাদেরকে বলুন, তৌরাত নাযিল হওয়ার আগে বনী ইসরাঈল কোন খাবারটি নিজের উপর হারাম করেছিলেন?
২. মেয়েলোক এবং পুরুষ লোকের বীর্য সম্পর্কে বলুন। কেন মহিলা কখনো ছেলে সন্তান আবার কখনো মেয়ে সন্তান প্রসব করে।
৩. আমাদেরকে অবহিত করুন এ উম্মী নবীর ঘুমের অবস্থা সম্পর্কে।
৪. ফিরিশতাগণের মধ্য হতে কে এ নবীর বন্ধু?
উত্তরে রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন, আল্লাহ তায়ালার ওয়াদা পূরণ করা তোমাদের উপর ওয়াজিব। আমি যদি তোমাদেরকে অবগত করি, অবশ্যই তোমরা আমার অনুসরণ করবে। হযরত মুহাম্মদ (সা.) বলেন, হযরত মুসা (আ.)-এর উপর যিনি তাওরাত অবতীর্ণ করেছেন তার নামে শপথ করে বলছি, ইসরাঈল অর্থাৎ ইয়াকুব (আ.)-এর ভীষণ অসুখ হয়েছিলেন। তখন তিনি ভাল হওয়ার জন্য বলেছিল- আল্লাহ্ তাকে আরোগ্য দান করলে, তিনি তার প্রিয় খাদ্য ত্যাগ করবেন। এ কথার উপর তিনি প্রিয় খাবার উটের গোশত এবং হযরত আবু জাফর (রা.) বলেন, পানীয় জাতীয়ের মধ্যে দুধ ছিল প্রিয়- এ দুটি জিনিষ হারাম করেছিলেন।
তারা বলল, হ্যাঁ ঠিক আছে। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (স.) বলেন- পুরুষের বীর্য সাদা ও গাঢ় এবং মহিলার বীর্য হলুদ এবং হালকা। এ দুয়ের সংমিশ্রনে আল্লাহ তায়ালার নির্দেশে সন্তান হয়। পুরুষের বীর্য মহিলার বীর্যের চেয়ে বেশী হলে আল্লাহর হুকুমে ছেলে সন্তান হয়। পক্ষান্তরে মহিলার বীর্য পুরুষের বীর্যের উপর বিজয়ী হলে তখন আল্লাহর নির্দেশে মেয়ে সন্তান হয়।
তারা বলল হ্যাঁ ঠিক আছে। মহানবী (সা.) এরশাদ করলেন, হে আল্লাহ! আপনি সাক্ষী থাকুন। আমি আরও তাওরাত অবতরণকারী আল্লাহর শপথ করে বলছি, নবীয়ে উম্মীর চোখ ঘুমালেও কলব জাগ্রত থাকে। তারপর তারা বলে, সত্য বলেছেন। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন, হে আল্লাহ! সাক্ষী থাকুন।
তারা বলে, এখন আমাদেরকে বলুন ফেরেশতাদের মধ্যে কে আপনার দোস্ত। রাসূলুল্লাহ (স.) বলেন, হযরত জিব্রাইল। আল্লাহ তায়ালা হযরত জিব্রাইল (আ.)-কে দোস্ত বানানো ছাড়া কোন নবী কখনো প্রেরণ করেননি। তারা বলে, আপনি সত্যিই বলেছেন, কিন্তু জিব্রাইল (আ.) আপনার দোস্ত হওয়ার কারণেই আমরা আপনার অনুসরণ করতে পারছিনা। কারণ জিব্রাইল আমাদের শত্রু। এ ঘটনার প্রতি ইংগিত করেই আল্লাহ তায়ালা এ আয়াত নাযিল করেন।
হযরত কাতাদাহ (রা.)-এ আয়াত সম্পর্কে বলেন, ইহুদীরা বলেছিল জিবরাইল আমাদের শত্রু, যেহেতু সে কঠোরতা যুদ্ধ এবং দুর্ভিক্ষ নিয়ে আসে; পক্ষান্তরে মিকাইল ফিরিশতা দয়া নিয়ে আসেন, মেঘ এবং সুস্থতা নিয়ে আসেন- তাই মিকাইল আমাদের দোস্ত। জিবরাইল আমাদের শত্রু। এ কথার প্রতি ইংগিত করেই আল্লাহ তায়ালা বলেন, مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِّجِبْرِيلَ হযরত আবদুল্লাহ বিন আল-হারিস বলেন- ইবরানী ভাষায় ايل বলে আল্লাহকে।

عن علي بن حسن قال اسم جبريل عبد الله واسم ميكائل عبيد الله واسم اسرافيل عبد الرحمن وكل معبد بايل فهو عبد الله

অর্থাৎ হযরত আলী বিন হাসান বলেন, জিবরাইল শব্দের অর্থ আল্লাহর বান্দাহ এবং

Scanned with CamScanner

মিকাইল শব্দের অর্থ আল্লাহ তায়ালার ছোট বান্দাহ। ইসরাফিল শব্দের অর্থ عبد الرحمن মোটামুটি যেখানেই ايل শব্দ মিশ্রিত থাকবে তার অর্থ আল্লাহর বান্দাহ।

مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ

এ কুরআন তওরাত, ইনজিল এবং অন্যান্য কিতাবকে সত্য বলে প্রত্যয়নকারী।

وَهُدًى وَبُشْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ

এবং এ কুরআন হচ্ছে মুমীনদের জন্যে পথ প্রদর্শনকারী, সুসংবাদ প্রদানকারী।

مَن كَانَ عَدُوًّا لِّلَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيكَالَ فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِّلْكَافِرِينَ

যে লোক আল্লাহ তায়ালার, ফেরেশতাগণের, আল্লাহ তায়ালার প্রেরিত কিতাবসমূহের, তার রাসূলদের, জিবরাইল এবং মিকাইলের শত্রু, (তা হলে জেনে রাখ) আল্লাহ্ তায়ালা অবশ্যই তার বা তাদের শত্রু। আল্লাহ তায়ালা অবশ্যই কাফিরদের দুশমন। সুতরাং যে জিবরাইল (আ.)-এর সাথে দুশমনী রাখে, সে আল্লাহ্ তায়ালার দুশমন, আর যে আল্লাহ্ তায়ালার দুশমন সে আল্লাহ তায়ালার সমস্ত আওলিয়াদের দুশমন। আওলিয়া বলতে ফেরেশতা এবং রাসূলগণ উদ্দে। এজন্য এদের কথা আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে। তাছাড়া হাদীসে আছে, যে আল্লাহ তায়ালার সাথে দুশমনী করে, আল্লাহ্ তায়ালা তার সাথে দুশমনী করেন, এমন কি, তার সাথে যুদ্ধ ঘোষণা করেন।

কুরাইশের একজন লোক হতে বর্ণিত, তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ (স.) এক ইহুদীকে জিজ্ঞেস করলেন আমি আপনাকে আপনার কিতাব হতে কিছু কথা জিজ্ঞেস করতে চাই। তোমরা যেই কিতাব পাঠ কর তাতে কী ঈসা বিন মরিয়ম আমার সম্পর্কে এ সংবাদ দিয়েছেন যে, অবশ্যই তোমাদের নিকট আল্লাহ তায়ালার একজন রাসূল আসবেন, যার নাম হবে আহমদ? তারা বলল- হ্যাঁ, আমরা আমাদের কিতাবে পেয়েছি, তবে আমরা তোমাকে ঘৃণা করি, কারণ তুমি অপরের ধন সম্পদ হালাল বল এবং রক্তপাত কর। তার একথার প্রেক্ষিতে আল্লাহ তায়ালা এ আয়াত নাযিল করেন।

এখানে আল্লাহ তায়ালা ফেরেশতাগণের উল্লেখ করার পর জিব্রাঈল এবং মিকাঈলের কথা উল্লেখ করেন। আমের পরেই খাছের উল্লেখ করা হয়েছে যাতে ইহুদীরা একথা বলতে না পারে যে, আমরা তো ফেরেশতাদের সাথে দুশমনী রাখি না শুধু জিবরাইলের সাথেই আমাদের শত্রুতা। তাই আল্লাহ্ তায়ালা আগে ملائكة বলে, সকল ফেরেশতাকে আমভাবে উল্লেখ করেছেন এবং পরে জিবরাইল এবং মিকাইলের কথা পৃথকভাবে উল্লেখ করেছেন। তাই আমের পর খাছ উল্লেখ করা হয়েছে।

وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ

হে মুহাম্মদ (স.)! আমি আপনার প্রতি স্পষ্ট নিদর্শন সমূহ নাযিল করেছি, যা আপনার নবুয়তের সত্যতা প্রমাণ করে। ইহা দ্বারা আল্লাহ তায়ালা ইশারা করেছেন- ইহুদীদের গোপন ইলম এবং তাদের গোপন সংবাদের প্রতি। যেমন তাদের পূর্ববর্তীদের সংবাদ, যা তাদের কিতাবে ছিল এবং তা তাদের উলামা ছাড়া আর কেউ

জানতেন না। তাদের পূর্ববর্তীরা কিতাবে পরিবর্তন সাধন করেছে। তারা কোন ধরণের আদেশ ও নিষেধের পরিবর্তন করেছে, তা আল্লাহ তায়ালা কুরআনে করীমের মাধ্যমে তাঁর হাবীব হযরত মুহাম্মদ (স.)-কে জানিয়ে দিয়েছেন। অথচ তিনি কোন কিতাব পড়েননি এবং কোন পাদ্রীর সাথে তাঁর যোগসূত্রও ছিলনা।

وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ

ফাসিক শব্দের অর্থ ধর্মচ্যুত ব্যক্তি, আল্লাহ তায়ালা বলেন- যারা ধর্মের বাহিরে এবং ধর্মচ্যুত, তারাই এ আয়াতসমূহকে অস্বীকার করে।

أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَّبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُم بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ

অর্থাৎ যখনই তারা কোন প্রতিশ্রুতি দিয়ে থাকে, তাদের কোন না কোন একদল তা ভঙ্গ করে ফেলে। পরন্তু তাদের মধ্যে অধিকাংশ লোকই বেঈমান।

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, মহানবী (সা.)-এর নবুয়ত প্রাপ্তির পর যখন তিনি আহলে কিতাবদের নিকট হতে আল্লাহ তায়ালার গৃহীত ওয়াদা ও প্রতিশ্রুতির কথা উল্লেখ করলেন, তখন মালিক বিন সাইফ বলল, আল্লাহর শপথ, মুহাম্মদ (সা.) প্রসঙ্গে আল্লাহ তায়ালা আমাদের কাছ থেকে কোন ওয়াদা গ্রহণ করেননি। এ কথার প্রতি ইংগিত দিয়েই أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَّبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُم بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ আয়াত নাযিল হয়। فريق শব্দটি বহু বচন-এর একবচন নেই।

وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ كِتَابَ اللَّهِ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ

যখন তাদের কাছে আল্লাহ তায়ালার পক্ষ হতে এমন কিতাব আসল, যা তাদের কাছে রক্ষিত কিতাবের সত্যতা বর্ণনা করে, তখন আহলে কিতাবদের একদল অর্থাৎ ইয়াহুদীগণ ওয়াদা ভংগ করল এবং কিতাব পিছনে ফেলে দিল, যেন তারা কিছুই জানে না। অর্থাৎ প্রথমে ইয়াহুদীরা তাওরাত নিয়ে হযরত মুহাম্মদ (স.) এর সাথে তর্ক-বিতর্ক করত। যখন তাওরাত আর কুরআন এক হয়ে গেল, তখন তারা তাওরাত ত্যাগ করল। পরন্তু তারা আসিফ বিন বরখিয়ার কিতাব, হারুত মারুতের যাদুর পুস্তককে গ্রহণ করল। তাওরাতে হযরত মুহাম্মদ (স.)-কে অনুসরণ করার যে কথা আছে, তারা এ ভাবে আচরণ করত যেন তারা তা জানে না। হযরত সুদ্দী (রা.) হতে অনুরূপ বর্ণনা রয়েছে।

وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُوا الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ ۖ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَٰكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ ۗ وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ ۚ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّىٰ يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ ۖ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ

Scanned with CamScanner

بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ ۚ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ ۚ
وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ ۚ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا
لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ ۚ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنْفُسَهُمْ ۚ لَوْ كَانُوا
يَعْلَمُونَ ﴿١٠٢﴾ وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ خَيْرٌ ۚ
لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ﴿١٠٣﴾

১০২. এবং সুলায়মানের রাজত্বে শয়তানরা যা আবৃত্তি করত তারা তা অনুসরণ করত। সুলায়মান কুফরী করেন নি। কিন্তু শয়তানই কুফরী করেছিল। তারা মানুষকে যাদু শিক্ষা দিত এবং যা বাবিল শহরে হারূত ও মারূত ফিরিশতাদ্বয়ের উপর অবতীর্ণ হয়েছিল। তারা কাউকেও শিক্ষা দিত না এই কথা না বলে যে, আমরা পরীক্ষাস্বরূপ, সুতরাং তুমি কুফরী কর না। তারা উভয়ের নিকট হতে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে যা বিচ্ছেদ সৃষ্টি করে তা শিক্ষা করত, অথচ আল্লাহর নির্দেশ ব্যতীত তারা কারও কোন ক্ষতি সাধন করতে পারত না। তারা যা শিক্ষা করত তা তাদের ক্ষতি সাধন করত এবং কোন উপকারে আসত না। আর তারা নিশ্চিতভাবে জানত যে, যে কেউ তা ক্রয় করে পরকালে তার কোন অংশ নেই। তা কত নিকৃষ্ট যার বিনিময়ে তারা স্বীয় আত্মাকে বিক্রয় করেছে, যদি তারা জানত!

১০৩. যদি তারা ঈমান আনয়ন করত ও মুত্তাকী হত, তবে নিশ্চিতভাবে তাদের প্রতিফল আল্লাহর নিকট অধিক কল্যাণকর হত, যদি তারা জানত।

وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُوا الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ

অর্থাৎ তারা অনুসরণ করল এমন জিনিষের, যা শয়তান হযরত সুলাইমানের রাজত্বকালে পাঠ করেছিল। যখন ইহুদীরা দেখল যে, তওরাতে হযরত মুহাম্মদ (স.)-কে অনুসরণ করার কথা রয়েছে, তখন তারা তওরাত ছেড়ে দিয়ে এমন কিতাবের অনুসরণ করতে লাগল, যা শয়তানরা সুলাইমানের রাজত্বকালে তিলাওয়াত করত। এ ঘটনাটি হাদীসে নিম্নরূপ উল্লেখ রয়েছে-

হযরত সুদ্দী হতে বর্ণিত, তিনি এ আয়াত সম্পর্কে বলেন, শয়তানরা আসমানে উঠত, ওখানে বসে ফেরেশতারা নিজেদের মধ্যে যে সব কথা বার্তা বলতেন, তারা সে সব কথা শ্রবণ করত। যেমন মৃত্যু, অদৃশ্যমূলক কথা-বার্তা। এ সব কিছু শুনে তারা দুনিয়াতে এসে ঐসব কথা জ্যোতিষদেরকে বলত, মানুষ তাদের কথা মত তা সত্য হতে দেখত। এ জন্য তারা গণকদের উপর ঈমান আনত এবং গণকরা শয়তানের উপর ঈমান আনত। তারা যা শুনত তার সাথে আরো সত্তরটি শব্দ সংযোজন করে কিতাব আকারে প্রকাশ করল। ফলে বনী ইসরাঈলের মাঝে প্রচার হয়ে গেল যে,

জ্বীনরা অদৃশ্য সম্পর্কে জ্ঞান রাখে। তখন হযরত সুলাইমান (আ.)-কে প্রেরণ করা হয়। তিনি লোক সমাজ থেকে ঐ কিতাবগুলো সংগ্রহ করে একটি সিন্দুকে রাখেন এবং তা তাঁর সিংহাসনের নীচে মাটির নীচে পুঁতে রাখেন। কোন শয়তান এ সিংহাসনের নিকটবর্তী হলেই জ্বলে যেত। তিনি সুলাইমান (আ.) বলেন, এর পর শয়তান গায়িব এর সংবাদ জানে- এরূপ কাউকে বলতে শুনলেই তাকে হত্যা করব। অতঃপর যখন হযরত সুলাইমান (আ.) ইনতিকাল করলেন, উলামা সমাজ ও চলে গেলেন- যারা হযরত সুলাইমানের একাজ সম্পর্কে অবগত ছিলেন, তখন শয়তান মানুষের আকৃতি ধারন করে বনী ইসরাঈলের এক দলের কাছে আসল এবং বলল তোমাদেরকে কী এমন এক জিনিষ সম্পর্কে বলব, যা তোমরা কোন দিন খাওনি। সকলেই বলল বলুন! সে বলল, তোমরা সকলেই সিংহাসনের কাছে উপস্থিত হও। সেও তাদের সাথে গেল এবং ঐ জায়গাটি দেখিয়ে দিল। সে ঐ জায়গাটি খোদাই করতে বলল। আরো বলল এখানে কিছু না পেলে আমাকে হত্যা কর। এরপর খোদাই করে ঐ কিতাব পেল এবং তা বের করে আনা হল। তখন শয়তান বলল- হযরত সুলাইমান (আ.) এ কিতাবের যাদুর দ্বারা মানুষ, শয়তান এবং পাখীর উপর রাজত্ব করেছিলেন। এরপর সে উড়ে চলে গেল। মানুষের মাঝে প্রচার হয়ে গেল যে, হযরত সুলাইমান (আ.) যাদুকর ছিলেন। বনী ইসরাঈল এ কিতাব গ্রহণ করেছিল। যখন হযরত মুহাম্মদ (স.) তাদের কাছে আসলেন, তারা তা নিয়ে ঝগড়া করল। তখনই এ আয়াত অবতীর্ণ হয়। وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَٰكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, যখন সুলাইমান (আ.) কে আল্লাহর পক্ষ হতে পরীক্ষা করা হয়েছিল, তখন শয়তানরা সেখানে গেল। তারা যাদু ও কুফরী সম্পর্কে একটি কিতাব লিখে তা সিংহাসনের নিচে পুতে রাখল। সুলাইমান (আ.) এর ইনতিকালের পর তারা সেই কিতাব বের করে নিয়েছিল এবং মানব সমাজে প্রচার করেছিল।

تتلوا শব্দের অর্থ تتبعه যেমন تلوت فلانا বলা হয় যখন কারও পেছনে পেছনে কেউ চলে তখন। যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন- هُنَالِكَ تَتْلُوا كُلُّ نَفْسٍ مَّا أَسْلَفَتْ অর্থাৎ এ ভাবে পিছু চলত পূর্ববর্তীদের। تلاوة-এর অন্য অর্থ قرأة মানে পাঠ করা।

وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَٰكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ হযরত সুলাইমান (আ.) কুফর করেন নি বরং শয়তানরা মানুষকে যাদু বিদ্যা শিখিয়ে শিখিয়ে কুফর করেছিল। যেহেতু উল্লেখিত যাদুর কিতাব হযরত সুলাইমান (আ.)-এর মৃত্যুর পর শয়তানের পরামর্শ অনুসারে হিসংহাসনের নীচে পুঁতে রাখা মাটির ভিতর হতে বের করা হয়েছিল তখন শয়তান জনগণকে বলতে লাগল হযরত সুলাইমান (আ.)-এ কিতাবের দ্বারা মানুষ, জীন, শয়তান এবং সমস্ত সৃষ্টিজীবকে বাধ্য করে রেখেছিলেন। এমনকি একথা মানুষের মাঝে প্রশিদ্ধ লাভ করল। এ অভিযোগ প্রতিহত করার লক্ষ্যে আল্লাহ তায়ালা তাঁর হাবীব হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর জবান মুবারকের মাধ্যমে তা পরিস্কার করেন, وَاتَّبَعُوا হতে يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ পর্যন্ত নাযিল হয়।

হযরত ইবনে আব্বাস হতে বর্ণিত, হযরত সুলাইমান (আ.) যখন পায়খানায় প্রবেশ করার মনস্থ করতেন অথবা তার কোন স্ত্রীর কাছে যেতে চাইতেন তখন, আংটিটি জারাদা নাম্নী তাঁর এক দাসীর কাছে রেখে যেতেন। আল্লাহ তায়ালা হযরত সুলাইমান (আ.)-কে পরীক্ষা করার ইচ্ছে করেছিলেন। তাই, একদিন তিনি আংটি রেখে গেছেন, এমন সময় শয়তান হযরত সুলাইমান (আ.)-এর আকার ধারণ করে এসে জারাদার কাছে আংটি চেয়ে নিয়ে গিয়েছিল। এদিকে সুলাইমান (আ.) এসে

Scanned with CamScanner

তার কাছে আংটি চাইলেন। জারাদা বলেন- আপনি কেন মিথ্যা বলছেন? আপনাকে তো আংটি দিয়ে ফেলেছি। তখন হযরত সুলাইমান (আ.) বুঝতে পারলেন। আল্লাহ তায়ালা তাকে পরীক্ষায় ফেলেছেন। বর্ণনাকারী বলেন, শয়তান আংটি নিয়ে চলে গেল। সে যখন তা পরিধান করল তখন শয়তান, জ্বীন, মানুষ এসে তার কাছে জমায়েত হল। শয়তান ঐ সময়ে জাদু ও কুফরী সংক্রান্ত অনেক বই লিখে সিংহাসনের নিচে পুতে রাখল। সুলাইমান (আ.)-এর ইন্তেকালের পর তা বের করে মানুষের সামনে পড়ে শুনাল এবং বলল, এই কিতাবের দ্বারাই সুলাইমান (আ.) মানুষের উপর প্রভাব বিস্তার করতেন। ইহা শুনে লোকেরা সুলাইমান (আ.) হতে সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন করে দিল এবং তাঁর সাথে কুফরী করল। এ কাহিনীর প্রতি ইঙ্গিত করতঃ আল্লাহ তায়ালা এ আয়াত নাযিল করেন। হযরত ইবনে ইসহাক (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি এ আয়াতের তফসীর করতঃ রিওয়ায়ত করেন- যখন রাসূলুল্লাহ (সা.) আম্বিয়া এবং রাসূলদের মধ্যে হতে হযরত সুলাইমান বিন দাউদ এর কথা উল্লেখ করেন- তখন ইহুদীদের কিছু কিছু পাদ্রী বলে- তোমরা কি আশ্চর্য হব না একথা শুনে যে, হযরত মুহাম্মদ (সা.) ইবনে দাউদকে নবী মনে করেন? আল্লাহর কসম, তিনি নবী ছিলেন না। সেই সময় এ আয়াত নাযিল হয় وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلٰكِنَّ الشَّيَاطِيْنَ كَفَرُوْا কিছু লোকের দাবী এ যে, যাদুর চর্চা হযরত সুলাইমান (আ.)-এর রাজত্বকালে শয়তানের দ্বারা আবিষ্কৃত হয়েছে- একথা ঠিক নয়। কারণ যাদু ফিরাউনের সময় ছিল এবং ফিরাউন সুলাইমান (আ.)-এর আগে ছিল। অধিকন্তু হযরত নূহ (আ.)-এর জামানায় ও যাদু ছিল।

وَمَا أُنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوْتَ وَمَارُوْتَ

এ আয়াতের তফসীরে মতানৈক্য রয়েছে। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) এবং রবি ইবনে আনাস (রা.) এ আয়াতে যে ما আছে তা نافية হিসেবে নিচ্ছেন। তখন এর অর্থ হবে। সুলাইমান (আ.)-এর রাজত্বকালে যাদু সম্পর্কে যা কিছু শয়তান পাঠ করত তার অনুসরণ তারা করেছিল। আর হযরত সুলাইমান (আ.) কুফর করেন নি এবং দু ফেরেশতা অর্থাৎ হযরত জিবরাইল এবং মিকাইল (আ.)-এর মাধ্যমে আল্লাহ তায়ালা যাদু নাযিল করেননি। কারণ ইয়াহুদীরা ধারণা করত আল্লাহ তায়ালা হযরত জিবরাঈল এবং হযরত মিকাঈল (আ.)-এর জবান এর মাধ্যমে সুলাইমান বিন দাউদকে যাদু শিখিয়েছেন। তাদের এ অবান্তর ধারনাকে মিথ্যা বলে আখ্যায়িত করে মহান আল্লাহ তায়ালা এ ব্যাপারে তাঁর প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ (স.)-কে অবহিত করেন। হযরত জিবরাইল (আ.) এবং মিকাইল (আ.)-কে যাদু দিয়ে কখনো প্রেরণ করা হয়নি। বরং শয়তানরা কুফরী করে মানুষকে যাদু শিখাচ্ছে- যা হারুত এবং মারুতকে বাবেল নামক জায়গায় দেয়া হয়েছিল। সুতরাং এ ভাবে হযরত সুলাইমান (আ.)-কে কলুষমুক্ত করা হয়েছিল। বরং আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে জানিয়ে তিয়ে ছিলেন এভাবে যে, যাদু বিদ্যা শয়তানের কাজ, তা শিক্ষা দেয়া হত মানুষকে বাবেল নামক জায়গায় এবং তারা ছিল দু'জন ফিরিশতা-তাদের মধ্যে একজনের নাম ছিল হারুত এবং অপর জনের নাম হল মারুত।

হযরত মা'মর, কাতাদাহ এবং জুহরী (রা.) হযরত আবদুল্লাহ (রা.) হতে বর্ণনা করেন। বাবেল নামক জায়গায় হারুত এবং মারুত নামক দুজন ফেরেশতাকে আল্লাহ মানুষের মাঝে ন্যায়-বিচার করার লক্ষ্যে পাঠালেন। এটা এ কারণে হয়েছিল যে, ফিরিশতাগণ পৃথিবীতে বনী আদমের আহকাম নিয়ে বিদ্রুপ করতেন। তখন

আল্লাহ তায়ালা দু'জন ফিরিশতাকে ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠার জন্য পৃথিবীতে পাঠালেন। একদিন এক মহিলা তাদের কাছে বিচার চাইলে তারা তার সাথে ঝগড়া করে আকাশে চলে গেলেন। তখন আল্লাহ তাদেরকে দুনিয়া অথবা আখিরাতের আযাবের একটি গ্রহণকরার নির্দেশ দিলে তারা দুনিয়ার আযাবকে গ্রহণ করলেন। কাতাদাহ বলেন- তারাই মানুষকে যাদু শিক্ষা দিতেন। আসল কথা হচ্ছে তারা যাদু বিদ্যা শিক্ষা দিতেন না বরং যাদু সম্পর্কে মানুষকে বোঝাতেন। কারণ বাবেল শহরে যাদুর প্রভাব ছিল বেশী। যার কারণে তারা নবীর মুজিযাও যাদুর পার্থক্য বুঝতে পারত না। তারা এমন যাদু শিক্ষা করত, যার দ্বারা স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে পার্থক্য ঘটাতে পারত। মানুষ যাদুর প্রতি ঝোঁকে পড়েছিল এবং যাদুকরের অনুসরণ করছিল। তা থেকে বিরত রাখার জন্যই হারুত এবং মারুতকে প্রেরণ করা হয়েছিল।

হযরত আবু জাফর (রা.) বলেন, আল্লাহ তায়ালাই ভাল-মন্দ সব নাযিল করেন এবং এসব কিছুই আল্লাহ তায়ালা তাঁর বান্দাদের জন্য বর্ণনা করে দিয়েছেন। অতঃপর তিনি তার রাসূলদের প্রতি ওহী প্রেরণ করেন, সৃষ্টি জীবকে শিক্ষা প্রদানের জন্য নির্দেশ দেন। কোন জিনিষ হালাল এবং কোন জিনিষ হারাম ঐ পরিচয় করিয়ে দেন। এমনকি জিনা, চুরি এবং সমস্ত গোনাহ সমূহ পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন। এ গোনাহ সমূহের মধ্যে যাদুও হচ্ছে এক প্রকার গোনাহ। তাই, যাদু করা হতে বিরত থাকার জন্যে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। কিন্তু তারা বলত যাদু বিদ্যা শিক্ষা গোনাহের কাজ নয়। যেমন মদ বানানো, মূর্তি বানানো, তাসখিলা এবং খেলার সরঞ্জাম বানানো গোনাহ নয়, তেমনি যাদু বিদ্যা শিক্ষায় গোনাহ হয় না বরং এর উপর আমল করা গোনাহ। যার ক্ষতি করা ঠিক নয়, যাদু দিয়ে তার ক্ষতি করাই গুনাহ। এর প্রতি ইশারা করেই আল্লাহ তায়ালা এ আয়াত নাযিল করেন। কেউ কেউ ما কে الذي এর অর্থে ব্যবহার করেন। অর্থাৎ হারুত ও মারুত বাবেল শহরে যে যাদু শিখাতেন তা শুধু স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যে পার্থক্য করার যাদু।

হযরত সুদ্দী (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি হারুত এবং মারুত সম্পর্কে বলেন- তারা দুজনই পৃথিবীবাসী সম্পর্কে বিরুপ মন্তব্য করেছিলেন। এ কারণেই দুজনকে বলা হয়েছিল আমি বনী আদমকে কামনার (شهوات) দশটি জিনিষ দান করেছি। এ কারণেই তারা আমার নাফরমানী করছে। তখন হারুত ও মারুত ফেরেশতাদ্বয় বলেন, হে আমাদের রব, আপনি সে জিনিষগুলো আমাদেরকে দিয়ে তারপর পৃথিবীতে পাঠালে আমরা কিন্তু পৃথিবীতে ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করব। এতে আল্লাহ তায়ালা বলেন- তোমরা দুজন অবতরণ কর, আমি তোমাদেরকে ঐ শাহাওয়াতগুলো দিলাম, তোমরা দু'জনেই মানুষের মধ্যে ন্যায় ইনসাফ প্রতিষ্ঠা কর এবং সত্যের নির্দেশ কর। ফেরেশতা দু'জন বাবেল শহরে অবতরণ করেন। তারা সত্যের হুকুম করতে লাগলেন। বিকেলে তারা উঠে যেতেন এবং সকালে আবার অবতরণ করতেন। এভাবে করতে থাকলেন। একদিন একজন মহিলা আসল। সে তার স্বামী সাথে ঝগড়া করেছে। এ মহিলার সৌন্দর্য তাদেরকে বিমোহিত করল। এ মহিলার নাম আরবী ভাষায় ছিল জুহরা অর্থাৎ ফুটন্ত ফুল, ফারসী ভাষায় ছিল "আনাহীজ"। ফেরেশতা দু'জনের মধ্য হতে একজন বললেন এমহিলার সৌন্দর্য আমাকে ভীষণভাবে আকৃষ্ট করেছে। তখন অপরজন বলেন আমিও এটা তোমাকে বলতে চাচ্ছিলাম, কিন্তু লজ্জায় বলছি না। অপরজন বলেন- আমি তাকে যিনার প্রস্তাব দেব? তখন সে বলে হ্যাঁ। কিন্তু আমি আল্লাহর আজাবের ভয় করছি। অপরজন বলেন-

Scanned with CamScanner

আমি আল্লাহ তায়ালার রহমতের আশা করছি। এরপর একদিন ঐ মহিলা এসে বলল, সে তার স্বামীর সাথে ঝগড়া করেছে। তাঁরা যেন তাঁর স্বামীর বিরুদ্ধে তার পক্ষে রায় প্রদান করেন। তারা মহিলাকে কু-প্রস্তাব দেন। মহিলাটি বলে আমার বিচার করে না দেয়া পর্যন্ত আমি তাতে রাজী হবনা। তাঁরা তাই করলেন। এরপর সে তাঁদের সাথে একটি নির্জন স্থানের মিলিত হওয়ার জন্য প্রতিশ্রুতি দিল। তাঁরা দুজনই নির্ধারিত স্থানে গেলেন। যখন তাঁরা প্রায় অপকর্মে লিপ্ত হতে যাচ্ছিলেন, এমন সময় মহিলাটি বলে উঠল, আমি এ কাজে রাজী হব না যতক্ষণ না তোমরা আমাকে সে বাক্য সম্পর্কে বলবে, যা বলে তোমরা আকাশে আরোহন কর এবং আকাশ হতে অবতরণ কর। তাঁরা তাকে এটা বললেন। সাথে সাথে মহিলাটি সে বাক্য উচ্চারণ করে আকাশে উঠে গেল। অতঃপর আকাশ থেকে অবতরণের বাক্যটি আল্লাহ তাকে ভুলিয়ে দিলেন। ফলে সে আকাশেই রয়ে গেল। আল্লাহ তায়ালা তাকে একটি তারকায় রূপান্তরিত করে দিলেন। হযরত আবদুল্লাহ বিন উমর যখনই তাকে দেখতেন, লানৎ দিতেন এবং বলতেন, এটি হচ্ছে ঐ মেয়ে, যে হারুত ও মারুত (আ.)-কে ফিতনায় ফেলেছিল। অতঃপর যখন রাতে তারা আসমানে উঠতে চেয়েছিলেন আর উঠতে পারেনি। তাঁরা উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন- তাঁদের পদস্খলনের কথা। তাদেরকে বলা হল তারা কী দুনিয়ার শাস্তি চান, না আখিরাতের? তারা দুনিয়ার শাস্তি চেয়েছিলেন। তাদেরকে বাবেল শহরে ঝুলিয়ে রাখা হল।

হযরত রবী (রা.) হতে বর্ণিত- হযরত আদম (আ.)-এর পর যখন মানবকুল গোনাহ করতে লাগল এবং আল্লাহকে অস্বীকার করতে লাগল। আসমানের ফেরেশতারা আল্লাহ তায়ালার নিকট অভিযোগ করে বলতে লাগলেন হে রব! আপনি তো মানুষ সৃষ্টি করেছেন আপনার ইবাদত করার জন্যে, আপনার অনুসরণ করার জন্য- অথচ তারা তো এর উল্টা কুফরী করছে, হত্যা করছে, হারাম খাচ্ছে, চুরি করছে, যিনা করছে, মদ পান করছে। কিন্তু তাদেরকে ছেড়ে দেয়া হচ্ছে। তখন ফেরেশতাদেরকে বলা হয়, তারা আমাকে দেখছে না তাই এ রকম করছে। তারা এ অযুহাত মেনে নিলেন না। তখন তাদেরকে বলা হল তোমাদের মধ্য হতে দু'জন ফেরেশতা মনোনীত কর, যাদের প্রতি আমার নির্দেশ থাকবে পাপাচার হতে বিরত থাকার। অতঃপর ফেরেশতাগণ হারুত ও মারুত (আ.)-কে নির্বাচন করলেন। তারা জমিনে অবতরণ করেছিলেন, তাদেরকে বনী আদমের মত নফসানী শাহওয়ত প্রদান করা হয়েছিল এবং তাদেরকে বলা হয়েছিল, যেন আল্লাহ্ তায়ালার ইবাদত করেন, আল্লাহ তায়ালার সাথে যেন কোন কিছুকে শরীক না করেন, নিষেধ করা হয়েছিল অন্যায় ভাবে মানুষ হত্যা করতে, হারাম পন্থায় মাল খাওয়া, চুরি, জিনা করা, মদ পান নিষিদ্ধ করা হয়েছিল। তারা জমিনে কিছুকাল অবস্থান করে মানুষকে সত্যের দাওয়াত দিতে থাকেন। তা ছিল হযরত ইদ্রিস (আ.)-এর জামানায়। সেই যুগে সারা দুনিয়ার মহিলাদের মধ্যে সবচেয়ে সুন্দরী এক মহিলা ছিল, যেমনি সমস্ত তারকারাজির মধ্যে সুন্দর ছিল জুহরা। ঐ মেয়েটি তাদের কাছে আসল, ফেরেশতারা ঐ মহিলার প্রতি আসক্ত হলেন। তারা মহিলাকে মন্দ প্রস্তাব দিলেন, মহিলা বলল, আমি রাজী হবনা, যতক্ষণ তোমরা আমার ধর্মগ্রহণ না করবে। তারা দু'জন মহিলাটিকে তার ধর্ম সম্পর্কে প্রশ্ন করলেন। সে একটি মূর্তি বের করে দিয়ে বলল, আমি এটির উপাসনা করি। তারা বললেন আমরা তা করতে পারিনা। এই বলে তারা

চলে গেলেন। পরদিন আবার তাদের দেখা হল তারা পুনরায় প্রস্তাব দিলেন। সেই মহিলা বলেছিল তোমরা তিনটি জিনিষের যে কোন একটি কাজ করলে- তোমাদের সাথে আমার মিলন হবে। সেই তিনটি কাজ হল মূর্তিপূজা করা, মানুষ হত্যা করা, মদ পান করা। তারা চিন্তা ভাবনা করে দেখলেন মদ পান করা সহজ তারা মদ পান করে নিলেন। মদ পান করায় তাদের বিবেক লোপ পেল। তার ঐ মহিলাটির সাথে অপরাধে লিপ্ত হলেন। এমন সময় তাদের পাশ দিয়ে একজন লোক যাচ্ছিল তারা মনে করলেন ঐ লোকটি তাঁদের অপকর্ম প্রকাশ করে দেবে, তাই তাকে তারা হত্যা করলেন। যখন তাদের থেকে নেশা চলে গেল তারা তাদের অপরাধ বুঝতে পারলেন। আসমানে উঠতে চাইলেন কিন্তু উঠতে সক্ষম হলেন না। তাদের মধ্যে ও আসমানবাসীদের মধ্যে যে পর্দা ছিল তা তুলে ফেলা হল। ফেরেশতারা এ সব ঘটনা অবলোকন করলেন। এ ঘটনা দেখে সকলেই আশ্চর্য হয়ে গেলেন। এ সব কিছু শ্রবণ করার পর তারা যমীন বাসীদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করতে লাগল। অতঃপর তাদেরকে বলা হল- তোমরা কী দুনিয়ার শাস্তি পছন্দ কর, না আখেরাতের আযাব? উত্তরে তারা বললেন- দুনিয়ার আযাব, কারণ দুনিয়ার আযাব শেষ হয়ে যাবে কিন্তু আখেরাতের আযাব তো সর্বদা থাকবে, শেষ হবে না। অতঃপর তাদেরকে বাবেল শহরে আযাব দেয়া হল। হযরত মুজাহিদ (রা.) কিছু বাড়িয়ে বলেন। ঐ মহিলা যখন ফিরে আসল তখন তারা মহিলার কাছে আসলেন এবং তাদের সতর খুললেন এবং ফিতনায় পতিত হলেন। এরপর জুহরা উড়ে গেল এবং তাদের ইচ্ছে নিস্ফল হল। ধারণা করা হয় তাদেরকে লোহার জিঞ্জির দিয়ে ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে।

হযরত আয়শা সিদ্দীকা (রা.) হতে এ ঘটনা এভাবে বর্ণিত হয়েছে- এক মহিলা মদীনায় এসেছিল। সে বলল- সে ইরাকের বাবেলে গিয়েছিল। সে হারুত ও মারুত হতে যাদু শিখেছিল। এর বিস্তারিত বর্ণনা نور البصر নামক কিতাবে আছে। প্রকৃত যাদু নিয়ে বিতর্ক রয়েছে। একদল বলেন, যাদু দ্বারা আসল জিনিষের পরিবর্তন হয় না শুধু ধোঁকা দেয়া যায়। শুধু যাদুকর যাকে যাদু করে তার ধ্যানের মধ্যে একটা পরিবর্তন আনতে পারে। যেমন মরিচিকা দূর হতে পানির মতো মনে হয়। রাত্রে ভ্রমণকারীর মনে হয় চাঁদ তার সাথে সাথে চলছে।

হযরত আয়শা (রা.) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা.)-কে যখন যাদু করা হয়েছিল তখন অনেক সময় তার খেয়াল হত কোন কাজটি করে নিয়েছেন, অথচ তা করা হয়নি। হযরত ইবনে শিহাব হতে বর্ণিত, তিনি বলেন- হযরত উরওয়া বিন যুবায়ের এবং ঈসা বিন আল মুসাইয়ব দু জনেই বলেন- বনী যুরাইক-এর ইহুদী রাসুলুল্লাহ (স.)-কে গিরা মেরে ছিল যাদু করে এবং তা হাজম (কোন জায়গায় হাম কূপ, কোন জায়গা জরওয়ান কূপ) কূপে পুঁতে রেখেছিল। এমনকি কোন কোন সময় রাসূলুল্লাহ (সা.) সামনে বিদ্যমান মান কোন কিছু ও দেখতেন না, আল্লাহ্ তায়ালা তাঁকে দেখিয়েছিলেন তারা কি যে করেছে। তখন রাসূলুল্লাহ (সা.) তা হাযম কূপ হতে বের করে নিয়েছিলেন। রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেন, বনী জুরাইক-এর ইহুদী আমাকে যাদু করেছিল। এ হাদীস হতে একদল এ কথা প্রমাণ করেন যে, যাদুকর যাদু করে প্রকৃত জিনিষে পরিবর্তন ঘটাতে পারেনা শুধু ধ্যান-ধারণার একটা পরিবর্তন আনতে পারে। কারণ যাদুকর যদি তা করতে পারত, তা হলে কিভাবে সত্য এবং মিথ্যার মধ্যে পার্থক্য হত?

Scanned with CamScanner

হযরত আয়শা (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, দুমাতুল জানদাল গোত্রের এক মহিলা আমার নিকট এসে হযরত মুহাম্মদ (সা.) কে তালাশ করল কিন্তু তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা.) এদুনিয়াতে ছিলেন না। মহিলাটি যাদু সম্পর্কে জিজ্ঞেস করতে চেয়েছিল। হযরত আয়শা (রা.) হযরত উরওয়া (রা.) কে বললেন, হে আমার বোনের ছেলে! আমি দেখলাম, মহিলাটি রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-কে না পেয়ে কেঁদে দিয়েছিল। এতে আমার অন্তরে দয়ার সৃষ্টি হয়। সে আমাকে বলল আমার ভয় হচ্ছে আমি ধ্বংস হয়ে যাব। আমার স্বামী অনেক দিন হতে হারিয়ে গিয়ে ছিলেন। আমি জানতাম না তিনি কোথায় গেছেন। এমন সময় আমার কাছে এক বৃদ্ধা আসল। আমি তার কাছে বিষয়টি বললাম। সে বলল, যদি আমি যা নির্দেশ করি তা পুরোপুরি মেনে চল তাহলে আমি এমন কাজ করব, যে তোমার স্বামী তোমার কাছে ফিরে আসবেন। আমি রাজি হলাম। সে রাত্রে বৃদ্ধা দুটি কুকুর নিয়ে আমার কাছে আসল। একটিতে সে আরোহণ করল এবং আর একটিতে আমি আরোহন করলাম। এর উপর আরোহন করে বাবেল শহরে গিয়ে অবস্থান করলাম। দেখলাম ওখানে দুইজন লোককে ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে। তারা আমাকে বলল, কিজন্য এসেছ? আমি বললাম আমি যাদু শিখব। ঐ দু'জন লোক আমাকে বলেন- আমরা আল্লাহ্ তায়ালার পক্ষ হতে পরীক্ষা স্বরূপ অবতীর্ণ হয়েছি। তুমি কুফর করনা। তুমি ফিরে যাও। আমি ফিরে আসতে অসম্মতি জানালাম। আমি বললাম 'না'। এর পর ঐ দু'জন লোক আমাকে বলে তা হলে ঐ চুলোর দিকে যাও। এর মধ্যে পেশাব কর। আমি গেলাম কিন্তু সেখানে গিয়ে ভয় পেয়ে গেলাম, তাই পেশাব না করেই ফিরে আসলাম। ঐ দু'জন লোক বলল, তুমি কি পেশাব করে এসেছে? আমি বললাম হ্যাঁ। ঐ দু'জন লোক আমাকে জিজ্ঞেস করে, কি দেখেছ? আমি উত্তর দিলাম, কিছুই দেখিনি। এরা দু'জন আবার আমাকে বলে, তুমি প্রশ্রাব কর নাই সুতরাং তুমি তোমার দেশে চলে যাও এবং কুফর করনা। আমি ফিরে যেতে অস্বীকৃতি জানালাম। এরা দু'জন আবার ও আমাকে ঐ চুলোর নিকট যেতে বলে এবং সেখানে পেশাব করতে বলে। আমি সেখানে গেলাম এবং ভয় পেলাম। তারপর আবার ফিরে গেলাম। আমি তাদেরকে বললাম আমি তা করে এসেছি। তারা আমাকে জিজ্ঞেস করে, কি দেখেছ? আমি বললাম কিছুই দেখিনি। তারা বলে তুমি মিথ্যা বলছ। তুমি পেশাব করনি, তোমার দেশে চলে যাও এবং কুফর কর না। তুমি তোমার কাজে সোজা চলে যাও। আমি অস্বীকৃতি জানালাম। তারা আবারও বলে, যাদু শিখতে হলে ঐ চুলার কাছে যাও এবং ওখানে পেশাব কর। তারপর আমি গেলাম এবং পেশাব করলাম। এর পর দেখলাম একজন অশ্বারোহী লোহার লাগাম পরা অবস্থায় আমার মধ্য থেকে বের হয়ে আসমানের দিকে চলে গেল। শেষ পর্যন্ত আমার থেকে অদৃশ্য হয়ে গেল, আর দেখলাম না। এর পর আমি তাদের কাছে আসলাম, যা ঘটে গেল আমি তা তাদেরকে বললাম,। তখন এরা দু'জন আমাকে বলে সত্য বলছ। ঐ অশ্বারোহী হল তোমার ঈমান, তোমার থেকে বের হয়ে গেছে- তুমি চলে যাও।মহিলাটি বলল, এর পর আমি আমার সাথের বৃদ্ধ মহিলাটিকে বললাম, আল্লাহর কসম আমি তো কিছুই শিখলামনা; আর তারা ও আমাকে এর বেশী কিছু বলেনি। মহিলাটি বলল হ্যাঁ এখন তুমি যা চাইবে তাই হয়ে যাবে। এই গমগুলো নাও এবং তা যমীনে বপণ কর, আমি যমীনে বপণ করলাম, এরপর বললাম, ফসলে পূর্ণ হয়ে যাও, অমনি তা ফসলে পূর্ণ

হয়েগেল, এরপর বললাম মাড়াই হয়ে যাও, অমনি তা হয়ে গেল। এরপর বললাম, শুকিয়ে যাও, অমনি তা শুকিয়ে গেল, আমি বললাম পিষা হয়ে যাও, সাথে সাথে পিষা হয়ে গেল, আমি বললাম রুটি তৈরী হয়ে যাও, অমনি রুটি তৈরী হয়ে গেল। আমি দেখলাম আমি যা চাই আমার হাতে তাই হয়ে যায়। এতে আমি লজ্জিত হলাম। আল্লাহর কসম! হে উম্মুল মোমেনীন! আল্লাহর কসম আমি কখনো জাদু করিনি এবং করবও না।

এ হাদীস হতে বোঝা যায় জাদুকর জাদুর মাধ্যমে বস্তুর পরিবর্তন করে দিতে সক্ষম। স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যে পার্থক্য করাটা চোখের ধাঁ ধাঁ নয় বরং তা বাস্তব।

وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتّٰى يَقُوْلَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ

অর্থাৎ এরা দু'জন স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যে পার্থক্য হওয়ার যাদু আর কাউকে শিখাত না বরং তারা বলত-আমরা একটা পরীক্ষা। তোমার কুফর করনা। কারণ যাদু হচ্ছে কুফর।

হযরত সুদ্দী হতে বর্ণিত, তিনি বলেন-যখন হারুত এবং মারুত এর নিকট কোন লোক আসত এবং যাদু শিখার ইচ্ছে প্রকাশ করত, তখন এরা দুজনই যাদু শিখার ইচ্ছে প্রকাশকারীকে বলত-কুফর করনা আমরা পরীক্ষা বৈ আর কিছুই নই। ঐ লোক যদি তা সত্বেও যাদু শিখার ইচ্ছে করত, তখন তারা যাদু শিক্ষার্থীকে বলত ঐ বালুর স্তূপের কাছে যাও এবং সেখানে প্রশ্রাব কর। যখন সেখানে লোকটি প্রশ্রাব করত তখন দেখত একটা আলোর ঝলক তার থেকে বের হয়ে উপরের দিকে উঠে আসমানে প্রবেশ করত, যা হচ্ছে তার 'ঈমান'। কোন কোন বর্ণনায় আছে, সে দেখতে পেত কাল রঙের ধোয়ার মত কোন বস্তু তার কান দিয়ে প্রবেশ করছে। এটা প্রকৃত পক্ষে আল্লাহর ক্রোধ। যখন ঐ শিক্ষার্থী ব্যক্তি হারুত মারুতকে এ সংবাদ প্রদান করত, তখনই তাঁরা দুজন তাকে যাদু শিক্ষা দিতেন। ঐ দিকে ইশারা করে আল্লাহ্ তায়ালা বলেন-এরা দুজন কাউকে কোন যাদু শিক্ষা দিতনা বরং বলত আমরা পরীক্ষা। তুমি কাফির হয়োনা। এখানে ফিতনা অর্থ পরীক্ষা।

فَيَتَعَلَّمُوْنَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُوْنَ بِهٖ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهٖ
وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتّٰى يَقُوْلَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ

এই বাক্যের মূল বক্তব্য হচ্ছে কেউ হারুত ও মারুত এর কাছ থেকে যাদু শিখতে চাইলে তারা যাদু শিখাতে অস্বীকার করত; কিন্তু মানুষ অর্থাৎ যাদু শিক্ষার্থীগণ তা মানত না বরং এমন যাদু শিখত যা দ্বারা স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টি হয়। যাদুর দ্বারা স্বামী ও স্ত্রীর অন্তরে বিভিন্ন ধরনের হিংসা ও বিদ্বেষ সৃষ্টি হতো, যার দরুন তাদের মধ্যে কলহ লেগে থাকত। এমন কি শেষ পর্যন্ত পরস্পর পৃথক হয়ে যেত।

وَمَا هُمْ بِضَارِّيْنَ بِهٖ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللّٰهِ

ঐ সব লোকেরা যাদু দ্বারা কোন লোকের ক্ষতি করতে পারত না তবে আল্লাহ্ তায়ালার হুকুম ছাড়া।

وَيَتَعَلَّمُوْنَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ

অর্থাৎ তারা শিখত এমন কিছু যা তাদের ক্ষতির কারণ হতো, বিন্দু মাত্রও তাদের কল্যাণ হতো না।

Scanned with CamScanner

وَلَقَدْ عَلِمُوْا لَمَنِ اشْتَرٰهُ مَا لَهٗ فِي الْاٰخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ

আর অবশ্যই তারা জানে, যারা যাদুবিদ্যা ক্রয় করেছে তাদের জন্য আখিরাতে কোন কিছু নেই অর্থাৎ- ইহুদীদের মধ্যে যারা আল্লাহ্ তায়ালার কিতাব বাদ দিয়ে যাদু শিখেছে, তারা আখিরাতের নিয়ামত হতে বঞ্চিত হবে।

হযরত কাতাদাহ (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন- আহলে কিতাব জানত যাদু শিক্ষার্থীদের সম্পর্কে আল্লাহর আল্লাহ্ তায়ালার প্রতিজ্ঞা مَا لَهٗ فِي الْاٰخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ সম্পর্কে তা ছাড়াও হযরত সুদ্দী এবং মুজাহিদ ঐ বিষয়ে হাদীস শরীফ হতে বর্ণনা করেন- আর হযরত ইবনে যায়েদ (রা.) বলেন- উপরোক্ত আয়াত একথার প্রতি ইশারা করছে, ইহুদীরা তাওরাত ছেড়ে যাদু শিখেছিল, তাদের ঠিকানা হল দুযখ। خلاق শব্দের অর্থ অংশ- এ অর্থই অধিক গ্রহণযোগ্য।

وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهٖٓ اَنْفُسَهُمْ لَوْ كَانُوْا يَعْلَمُوْنَ

যে সব সামগ্রীর বিনিময়ে তারা নিজের প্রাণ বিক্রি করে দিয়েছে, তা নিশ্চিত খুবই খারাপ জিনিষ। হায়! তারা যদি জানত-অর্থাৎ যাদুকর যদি তার নিকৃষ্ট পরিনাম সম্পর্কে অবগত হত। কারণ তারা তাওরাত কিতাবকে পেছনে ফেলে দিয়েছে যেন তারা কিছুই জানেনা। তারা হযরত সুলাইমান (আ.)-কে শয়তানরা যা পাঠ করে শুনিয়েছিল, তার অনুসরণ করেছে এবং দু'জন ফেরেশতার উপর অবতীর্ন করা হয়নি কোন কিছু। বস্তুত তাদেরকে বলা হয়েছিল যারা যাদু শিখবে, আখিরাতে তাদের জন্য কিছুই নেই।

وَلَوْ اَنَّهُمْ اٰمَنُوْا وَاتَّقَوْا لَمَثُوْبَةٌ مِّنْ عِنْدِ اللّٰهِ خَيْرٌ لَّوْ كَانُوْا يَعْلَمُوْنَ

অর্থাৎ আর যদি তারা ঈমান আনত, আর আল্লাহ তায়ালাকে ভয় করত, তাহলে আল্লাহ্ তায়ালার পক্ষ হতে উত্তম পরিনাম দেওয়া হত। হায়! তা যদি তারা জানত। যদি তারা ঈমানের আলোতে আলোকিত হত, তাহলে আল্লাহ্ তায়ালার পক্ষ হতে যে পরিনাম পাওয়া যেত তা যাদু শিক্ষা এবং তাদের উপার্জন হতে অনেক উত্তম হত। আফ্সোস! তা যদি তারা জানত। مثوبة শব্দের অর্থ সওয়াব।

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَقُوْلُوْا رَاعِنَا وَقُوْلُوا انْظُرْنَا وَاسْمَعُوْا ؕ وَلِلْكٰفِرِيْنَ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ﴿١٠٤﴾ مَا يَوَدُّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ وَلَا الْمُشْرِكِيْنَ اَنْ يُّنَزَّلَ عَلَيْكُمْ مِّنْ خَيْرٍ مِّنْ رَّبِّكُمْ ؕ وَاللّٰهُ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهٖ مَنْ يَّشَآءُ ؕ وَاللّٰهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيْمِ ﴿١٠٥﴾ مَا نَنْسَخْ مِنْ اٰيَةٍ اَوْ نُنْسِهَا نَاْتِ بِخَيْرٍ مِّنْهَآ اَوْ مِثْلِهَا ؕ اَلَمْ تَعْلَمْ اَنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ﴿١٠٦﴾ اَلَمْ تَعْلَمْ اَنَّ اللّٰهَ لَهٗ مُلْكُ

السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ؕ وَمَا لَكُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ مِنْ وَّلِيٍّ وَّلَا نَصِيْرٍ ﴿١٠٧﴾ اَمْ تُرِيْدُوْنَ اَنْ تَسْـَٔلُوْا رَسُوْلَكُمْ كَمَا سُئِلَ مُوْسٰى مِنْ قَبْلُ ؕ وَمَنْ يَّتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْاِيْمَانِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَآءَ السَّبِيْلِ ﴿١٠٨﴾

১০৪. হে মুমিনগণ! 'রাইনা' বলো না, বরং উনজুরনা বলো এবং শুনে রাখ, কাফিরদের জন্য মর্মন্তুদ শাস্তি রয়েছে।

১০৫. কিতাবীদের কধ্যে যারা কুফরী করেছে তারা এবং মুশরিকরা তা চায়না যে, তোমাদের প্রতিপালকের নিকট হতে তোমাদের প্রতি কোন কল্যাণ অবতীর্ণ হউক। অথচ আল্লাহ যাকে ইচ্ছা নিজ রহমতের জন্য বিশেষরূপে মনোনীত করেন এবং আল্লাহ মহা অনুগ্রহশীল।

১০৬. আমি কোন আয়াত রহিত করলে কিংবা বিস্মৃত হতে দিলে তা হতে উত্তম কিংবা তার সমতুল্য কোন আয়াত আনয়ন করি। তুমি কি জান না যে, আল্লাহই সর্ব বিষয়ে সর্বশক্তিমান।

১০৭. তুমি কি জান না, আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সার্বভৌমত্ব একমাত্র আল্লাহরই? এবং আল্লাহ ছাড়া তোমাদের কোন অভিভাবকও নেই, সাহায্যকারীও নেই।

১০৮. তোমরা কি তোমাদের রাসূলকে সেরূপ প্রশ্ন করতে চাও যেরূপ পূর্বে মূসাকে প্রশ্ন করা হয়েছিল? এবং যে কেউ ঈমানের পরিবর্তে কুফরী গ্রহণ করে নিশ্চিতভাবে সে সরল পথ হারায়।

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَقُوْلُوْا رَاعِنَا

আল্লাহ্ তায়ালা মুমীনদেরকে সম্বোধন করে বলেন- হে মুমীনগণ! তোমরা راعنا বলনা। হযরত আতা (রা.)-এর দৃষ্টিতে راعنا শব্দের অর্থ আমাদের প্রতি আপনার মনোযোগ নিবিষ্ট করুন এবং মুজাহিদ (রা.) হতে বর্ণিত, راعنا এর অর্থ আমরা আপনার কথা বুঝিনি। হযরত মুজাহিদ (রা.) হতে বর্ণিত لَا تَقُوْلُوْا رَاعِنَا শব্দের অর্থ- আপনি আমাদের কথা শুনুন তা হলে আমরা আপনার কথা শুনব। কোন কোন মুফাসসির বলেন-ঐ শব্দটি ইহুদীর শব্দ। তারা ঐ শব্দটি স্ত্রীকে গালি দেয়ার ক্ষেত্রে ব্যবহার করত বা বিদ্রূপ করে ব্যবহার করত। এ জন্যে আল্লাহ্ তায়ালা মুমীনদেরকে এ কথা বলতে নিষেধ করেন। হযরত কাতাদা এবং হযরত আতীয়া (রা.) ও ঐ অর্থ গ্রহন করেছেন। আর হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) راعنا শব্দের অর্থ বলেন, আমাদেরকে মেহেরবানী কর। হযরত ইবনে যায়েদ (রা.) হতে বর্ণিত راعنا শব্দ দিয়ে ইহুদীরা বোঝাত- আমরা শ্রবণ করেছি বটে কিন্তু সেই অনুযায়ী চলব না। তাই আল্লাহ্ তায়ালা মুমীনদেরকে ঐ শব্দ ব্যবহার করতে নিষেধ করেছেন। কারণ راعن শব্দটি দোষের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়।

Scanned with CamScanner

تاويل اهل এর একটি দল বলেন- জাহিলিয়তের সময় ঐ শব্দটি আনসারগণ ব্যবহার করতেন। আল্লাহ্ তায়ালা ইসলামী যুগে তা ব্যবহার করতে নিষেধ করেন। হযরত আতা এবং আবু আলিয়া (রা.) ঐ ভাবে বর্ণনা করেন। হযরত সুদ্দী (রা.) বলেন- ইহুদীরা ঐ শব্দটি গালি হিসেবে ব্যবহার করত। হযরত আবূ জাফর (রা.) বলেন- আল্লাহ্ তায়ালা ঐ শব্দটি পছন্দ করেন না। যেমন রাসূলুল্লাহ্ (রা.) عنب শব্দের প্রতিশব্দ كرم এবং দাসের ক্ষেত্রে عبدي বলা পছন্দ করতেন না। তিনি عنب শব্দের পরিবর্তে حبلة এবং عبدي শব্দের পরিবর্তে فتاي শব্দ ব্যবহার করতেন। ঐ ভাবে আল্লাহ্ তায়ালার নিকট অপছন্দ হওয়ার কারণে মুমীনদেরকে আল্লাহ্ তায়ালার নবীর শানে راعنا ব্যবহার করতে নিষেধ করেন। مراعات শব্দের অর্থ আমি আপনার কথা শ্রবণ করার- জন্য অবসর গ্রহণ করেছি। তাই আল্লাহ্ তায়ালা নবীর সাম্মানার্থে এ শব্দ ব্যবহার করতে নিষেধ করেছেন যেমন তার আওয়াজের উপর স্বর উঁচু করে কথা বলতে নিষেধ করেছেন। এমনিভাবে রাসূল (সা.)-কে আহ্বান করার ব্যবপারে সুন্দর শব্দ ব্যবহার করতে বলেছেন। راعنا শব্দটি এই অর্থেরও সম্ভাবনা রাখে যে, আপনি আমাদের দেখা শুনা করুন, আমরাও আপনার তত্ত্বাবধান করব, কারণ باب مفاعلة এর বৈশিষ্ট্য হচ্ছে مشاركة অর্থাৎ পরস্পর কিছু করা। আবার কখনো رعونة শব্দের থেকে راعنا ব্যবহৃত হয়- যার অর্থ বুদ্ধিহীন ও মুর্খ। এ কারণে আল্লাহ তায়ালা এ শব্দ নবীর শানে ব্যবহার করতে নিষেধ করেছেন।

وَقُوْلُوا انْظُرْنَا وَاسْمَعُوْا وَلِلْكٰفِرِيْنَ عَذَابٌ اَلِيْمٌ

হে ঈমানদার ব্যক্তিগণ! তোমরা راعنا বলবে না। বরং বলবে আমাদের প্রতি দৃষ্টিপাত করুন এবং তোমাদেরকে যা বলা হচ্ছে তা শ্রবণ কর। আর কাফেরদের জন্যে যন্ত্রনাময় আজাব রয়েছে। হযরত মুজাহিদ (রা.) বলেন- انظرنا অর্থাৎ আমাদেরকে বোঝান এবং আমাদের জন্যে বর্ণনা করুন। اسمعوا অর্থ তোমাদেরকে যা বলা হচ্ছে তা শ্রবণ কর। তোমাদের কাছে যা কিছু তোমাদের রবের কিতাব হতে পাঠ করা হয়, তা মনে রাখ এবং উপলব্ধি কর।

হযরত সুদ্দী (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, উক্ত আয়াতের অর্থ হচ্ছে- নবী তোমাদেরকে যা বলেন, তা শ্রবণ কর। হে মুমিনগণ তোমরা নবী (সা.)-কে এমন বল না, আপনি আপনার কানকে আমাদের দিকে ঝুকিয়ে দিন; আমাদেরকে অবসর হতে দিন যাতে আমরা আপনার কথা বুঝতে পারি। আর যা বলছেন তা আমাদেরকে বুঝিয়ে। বরং তোমরা বলবে, হে রাসূল (সা.)। আপনি আমাদের প্রতি একটু দেখুন, যাতে আমরা আপনার বাণী বুঝতে পারি, যা আপনি আমাদেরকে বর্ণনা করছেন ও শিক্ষা প্রদান করছেন। আর তিনি তোমাদেরকে যা বলেন,তা শুন। এরপর আল্লাহ বলেন, তোমরা যদি নবীর আদেশের খেলাফ কর, তাকে অস্বীকার কর, তাঁকে আল্লাহ্ তায়ালার রাসূল হওয়া সম্পর্কে সন্দেহ পোষণ কর- তা হলে জেনে রাখ-আখিরাতে তোমাদের জন্য যন্ত্রনাময় আযাব রয়েছে।

مَا يَوَدُّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ وَلَا الْمُشْرِكِيْنَ اَنْ يُّنَزَّلَ عَلَيْكُمْ مِّنْ خَيْرٍ مِّنْ رَّبِّكُمْ

আহলে কিতাব হতে যারা কাফির এবং মুশরিকগণ আল্লাহ্ তায়ালার পক্ষ হতে

আপনার উপর কুরআন আবতীর্ন হওয়া পছন্দ করে না।

وَاللّٰهُ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهٖ مَنْ يَّشَآءُ وَاللّٰهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيْمِ

আল্লাহ যাকে ইচ্ছে করেন-স্বীয় রহমতের দ্বারা আবৃত করে রাখেন। আল্লাহ্ ব্যাপক মেহেরবানীর অধিকারী। আল্লাহ্ তায়ালা যাকে ইচ্ছে করেন, তাকে নবুওয়াত দান করে সম্মানিত করেন। আল্লাহ্ তায়ালা ঈমানের মাধ্যমে যাকে ইচ্ছে ফযীলত দান করেন।

مَا نَنْسَخْ مِنْ اٰيَةٍ اَوْ نُنْسِهَا

আল্লাহ তায়ালা বলেন- আমি কোন আয়াত পরিবর্তনও করিনা এবং কোন আয়াত ছেড়েও দিইনা।

অর্থাৎ হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন- ما ننسخ আয়াতের অর্থ আমি কোন আয়াত পরিবর্তন করিনা। হযরত রবি হতে বর্ণিত, তিনি বলেন - ما ننسخ من اية او ننسها শব্দের অর্থ এ আয়াতগুলো উঠিয়ে নেয়ার আগে আল্লাহর তায়ালা আরো ভাল নির্দেশ অবতীর্ণ করেন এবং ننسها শব্দের অর্থ অন্যত্র বলা হয়েছে-ننسها উভয় অর্থ গ্রহণের পক্ষে বিভিন্ন রিওয়ায়ত রয়েছে। অন্য বর্ণনায় ما نبدل من اية او ننسها এর অর্থ نؤخرها বলা হয়েছে। তা হলে ব্যাখ্যা-এ রকম হবে- انزلنا ها اليك يا محمد ﷺ او مثلها

অর্থাৎ হে মুহাম্মদ! (সা.) আমি যা কিছু আপনার নিকট প্রেরণ করেছি তার হুকুম এবং কিরাত বাতিল করিনি যতক্ষন না এর চেয়ে ভাল বা এর মত তোমার কাছে অন্য আয়াত প্রেরণ করিনি।

হযরত কাতাদাহ্ (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন- আমাদেরকে হযরত অনাস বিন মালিক হাদিস বর্ণনা করেন। তিনি বলেন- الذين قتلوا بئر معونة আয়াত অবতীর্ণ হয়েছিল অতঃপর তা রহিত হয়ে গেল بلغوا عنا قومنا انا لقينا ربنا فرضي عنا وارضانا আয়াত দ্বারা। এরপর এ আয়াত ও রহিত হয়ে গেল। হযরত আবু মুসা আশআরী (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন- আমরা একটি আয়াত তিলাওয়াত করতাম لو ان لابن ادم واديين من مال لابتغي ليهما ثالثا ولا يملا جوف ابن ادم الا التراب ويتوب الله على من تاب এরপর আয়াতখানা রহিত হয়ে যায়। এমনিভাবে অনেক আয়াত রহিত হওয়ার হাদীস রয়েছে যে এগুলো সব উল্লেখ করলে তালিকা অনেক দীর্ঘ হয়ে যাবে।

আল্লাহ তায়ালার বাণী لَئِنْ شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِيْ অর্থাৎ যদি আমি ইচ্ছা করি, তা হলে যা নাযিল করেছি সব নিয়ে যেতে পারি। একথার অর্থ অবশ্য এটি নয় যে, তিনি নিয়ে যাবেনই। বরং তিনি কেবল এমন আয়াতই রহিত করেছেন, যেগুলোতে মানুষের কোন প্রয়োজন নেই। যেমন আল্লাহ বলেন سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسٰى اِلَّا مَا شَآءَ اللّٰهُ। নিশ্চয়ই আমি আপনাকে পাঠ করাব, ফলে আপনি ভুলবেন না। (সূরা ঃ আ'লা-৬)

نَاْتِ بِخَيْرٍ مِّنْهَا اَوْ مِثْلِهَا

আল্লাহ্ তায়ালা বলেন- আমি তার চেয়ে উত্তম বা মনসূখকৃত আয়াত সমূহের মত অন্য কোন আয়াত তোমার কাছে প্রেরণ করব। অর্থাৎ মনসূখ আয়াতের চেয়ে কল্যাণময় ও সহজ আয়াত তোমার কাছে প্রেরণ করব। এমত হচ্ছে হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) এর। হযরত কাতাদাহ বলেন- نَاْتِ بِخَيْرٍ مِّنْهَا اَوْ مِثْلِهَا এর অর্থ হচ্ছে

Scanned with CamScanner

আমি এমন আয়াত অবতীর্ণ করব যাতে রয়েছে রহমত, নির্দেশ ও নিষেধ।

হযরত সুদ্দী (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন আয়াতের অর্থ হবে আমি যে সকল আয়াত মনসূখ করি, তার থেকে উত্তম কোন বিধান অবতীর্ণ করি, আর তা না হলে অন্তত নসখকৃত আয়াতের সমান কোন আয়াত অবতীর্ণ করি। এখানে هـــا যমীর দুইটি পূর্ববর্তী اية শব্দের প্রতি সম্পৃক্ত।

হযরত মুজাহিদ (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, হযরত উবাইদ বিন উমর বলতেন, তোমাদের থেকে যেসকল আয়াত মনসূখ করা হয়েছে, তার চেয়ে উত্তম বা তদনুযায়ী আয়াত আমি অবতীর্ণ করব। হযরত রবী এবং ইবনে মাসউদ হতেও এ রকম বর্ণনা পাওয়া যায়।

হযরত আবূ জাফর (রা.) বলেন- আমার দৃষ্টিতে এ আয়াতের সঠিক অর্থ হচ্ছে- যেসব আয়াতের আদেশ বা হুকুম আমি পরিবর্তন করি, তার পর ও তা পাঠ করা হয় কিন্তু তার পরিবর্তে এর চেয়ে উত্তম আদেশের আয়াত নাযিল করি। কোন আয়াত পরিবর্তনের মধ্যে হয়ত তাৎক্ষণিক সহজতা থাকে; নয়ত দেরীতে উহার সহজতা উপলব্ধি করা যায়। তাৎক্ষণিক সহজতার উদাহরণ- যেমন রাত্রে উঠে নামায পড়া আগে ফরয ছিল, পরবর্তীতে তাবাতিল করা হয়। যার কারণে মুমীনদের এ কষ্ট লাঘব হল। দেরীতে সহজতার উদাহরণ- যেমন পূর্বে বৎসরে বিভিন্ন সময় রোযা রাখতে হত কিন্তু তা বাদ দিয়ে পরপর রোযা রাখা ফরয কর হল। এ একমাস রোযা রাখা যদিও বেশী কষ্টকর, কিন্তু সওয়াব বৎসরের বিভিন্ন সময় রোযা রেখে যা পাওয়া যেত, তাঁর চেয়ে বেশী সওয়াব পাওয়া যাবে। এই হচ্ছে- نَأْتِ بِخَيْرٍ مِّنْهَا أَوْ مِثْلِهَا এ আয়াতের অর্থ।

مثلها শব্দের উদহারণ- যেমন বায়তুল মুকদ্দাস এর প্রতি মুখ করে নামায আদায় করা বাতিল করে বায়তুল হারাম এর প্রতি মুখ করে নামায আদায় করা ফরয করা হয়েছে। কারণ উভয় দিকে নামায আদায় করার মধ্যে কোন পার্থক্য নেই।

أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ

অর্থাৎ আপনি কি জানেন না? আল্লাহ্ তায়ালা অবশ্যই প্রত্যেক বিষয়ে সর্ব শক্তিমান। পরিবর্তন ও পরিবর্ধন এমন কি সর্ব বিষয়ে আল্লাহ তায়ালা ক্ষমতাধর।

أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللّٰهَ لَهٗ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ وَمَا لَكُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ مِنْ وَّلِيٍّ وَّلَا نَصِيْرٍ

এখানে সম্বোধন যদিও এক বচনের প্রতি কিন্তু আসলে সম্বোধন সকলের প্রতি। এ ধরনের সম্বোধন কুরআন শরীফের মধ্যে অনেক রয়েছে। আরবের প্রথানুযায়ী এ ধরনের ব্যবহার করা হয়। একজনকে সম্বোধন করে উদ্দেশ্য করা হয় এক জামআতকে। الم تعلم এ আয়াতে যাদেরকে সম্বোধন করা হয়েছে لا تقولو راعنا এর দ্বারা ও একই লোকদেরকে সম্বোধন করা হয়েছে। অর্থাৎ হে মুমীনগণ! তোমরা কি জাননা, আসমান এবং জমিনের মালিক আল্লাহ্, আল্লাহ্ ছাড়া তোমাদের জন্যে কোন অভিভাবক এবং সাহায্যকারী নেই?

أَمْ تُرِيْدُوْنَ أَنْ تَسْئَلُوْا رَسُوْلَكُمْ كَمَا سُئِلَ مُوْسٰى مِنْ قَبْلُ

এ আয়াতের শানে নযুল সম্পর্কে ভিন্নমত রয়েছে। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)

হতে বর্ণিত, তিনি বলেন রাফে বিন হুরমালা এবং ওহব বিন যায়েদ রাসূলল্লাহ্ (সা.)-কে বলল, আপনি আকাশ থেকে একটি কিতাব নিয়ে আসুন তা হলে আমরা তার অনুসরণ করব। আর আমাদের জন্য নহর সমূহ প্রবাহিত করুন। তাহলে আমরা আপনাকে সত্য বলে বিশ্বাস করব। তখন আল্লাহ্ তায়ালা এআয়াত নাযিল করেন। তোমরা কি তোমাদের রাসূলকে সেরূপ প্রশ্ন করতে চাও যেইভাবে মূসা (আ.) কে প্রশ্ন করা হয়েছিল?

হযরত মুজাহিদ (রা.) বলেন- কুরাইশরা হযরত মাহাম্মদ (সা.)-কে বলে তাদের জন্য সাফা পাহাড়কে সোনায় পরিবর্তন করে দিতে। মহানবী (সা.) বললেন, হ্যাঁ তবে তোমরা যদি এরপরও কুফরী কর, তা হলে তোমাদের পরিনাম হবে মায়িদা অবতরণের পর বনী ইসরাঈলের যে পরিনাম হয়েছিল অনুরূপ। তখন আল্লাহ্ তায়ালা এ আয়াত অবতীর্ন করেন।

হযরত আবূ আলিয়্যা হতে বর্ণিত, তিনি বলেন- এক ব্যক্তি রাসুল (সা.)-কে বলল, ইয়া রাসূলুল্লাহ্ (সা.)! আমাদের কাফফরা যদি বনী ইসরাইলদের কাফফারার মত হত। তখন রাসূল্লাহ্ (সা.) বলেন-আমি তোমাদের জন্য ঐ সব জিনিষ চাইব না, কারণ বনী ইসরাঈলকে যা দেওয়া হয়েছে, তা থেকে তোমাদেরকে যা দেয়া হয়েছে তা উত্তম। যেমন বনী ইসরাইলের কেউ গোনাহ করলে তা তাদের ঘরের দরজায় লেখা হয়ে যেত। যদি সে কাফফারা আদায় করত, তাহলে দুনিয়ার লাঞ্ছনা ভোগ করতে হত। যদি ও আখেরাতের লাঞ্ছনা হতে মুক্তি পেত; আর কাফফারা আদায় না করলে পরকালের লাঞ্ছনা ভোগ করত। তোমাদেরকে আল্লাহ্ তায়ালা বনী ইসরাঈলের চেয়ে উত্তম জিনিষ দান করেছেন। তা হচ্ছে যে কেউ খারাপ কাজ করলে বা নিজের উপর অত্যাচার করলে এবং এরপর আল্লাহ্ তায়ালার দরবারে ক্ষমা প্রার্থনা করলে আল্লাহ্ তায়ালা তা ক্ষমা করে দেন। কারণ আল্লাহ্ ক্ষমাশীল ও দয়াময়। বর্ণনাকারী বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেন-পাঁচ ওয়াক্ত নামায এবং জুমআ অপর জুমআ ও পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের সময় পর্যন্ত যে দোষত্রুটি হয় তার জন্য কাফ্ফারা স্বরূপ। মহানবী (সা.) ইরশাদ করেন- (তোমাদের আরও উত্তম বৈশিষ্ট্য হচ্ছে) যে কোন ভাল কাজের ইচ্ছা পোষন করে, কাজটি সম্পন্ন করার পূর্বেই তার জন্য একটি নেকী লিখে দেয়া হয়। আর কাজটি করার পর তার জন্য দশটি নেকী লিখে দেয়া হয়। এরপর আল্লাহ্ তায়ালা আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ করেন।

ام শব্দ জিজ্ঞাসা বা প্রশ্নকে প্রত্যাখান করছে। যেমন কবির কথা الـلاى منكن ام ليلى من البشر লায়লা কি তোমাদের মধ্য হতে, না কি মানুষের মধ্যে হতে একজন! যেহেতু ইহা বেশীর ভাগ স্থানে প্রশ্নবোধক الف এর পরেই ব্যবহৃত হয়।

وَمَنْ يَّتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيْمَانِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيْلِ

অর্থাৎ যে ঈমানের পরিবর্তে কুফর গ্রহণ করল সে পথভ্রষ্ট হল। এখানে কুফর শব্দের অর্থ কঠিন এবং ঈমান শব্দ দ্বারা সহজ অর্থ নেয়া হয়েছে। এখানে سَوَاءَ السَّبِيْلِ বলে صراط المستقيم যা সূরা ফাতিহায় উল্লেখ করা হয়েছে, তা বুঝানো হয়েছে।

Scanned with CamScanner

وَدَّ كَثِيْرٌ "مِّنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ لَوْ يَرُدُّوْنَكُمْ مِّنْ بَعْدِ اِيْمَانِكُمْ كُفَّارًا ج
حَسَدًا مِّنْ عِنْدِ اَنْفُسِهِمْ مِّنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ ج فَاعْفُوْا
وَاصْفَحُوْا حَتّٰى يَاْتِيَ اللّٰهُ بِاَمْرِهٖ ط اِنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ "
﴿١٠٩﴾ وَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ وَمَا تُقَدِّمُوْا لِاَنْفُسِكُمْ مِّنْ
خَيْرٍ تَجِدُوْهُ عِنْدَ اللّٰهِ ط اِنَّ اللّٰهَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ " ﴿١١٠﴾ وَقَالُوْا لَنْ
يَّدْخُلَ الْجَنَّةَ اِلَّا مَنْ كَانَ هُوْدًا اَوْ نَصٰرٰى ط تِلْكَ اَمَانِيُّهُمْ ط قُلْ
هَاتُوْا بُرْهَانَكُمْ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ﴿١١١﴾ بَلٰى ج مَنْ اَسْلَمَ وَجْهَهٗ لِلّٰهِ
وَهُوَ مُحْسِنٌ "فَلَهٗ اَجْرُهٗ عِنْدَ رَبِّهٖ ج وَلَا خَوْفٌ "عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ
يَحْزَنُوْنَ ﴿١١٢﴾

১০৯. তাদের নিকট সত্য প্রকাশিত হওয়ার পরও, কিতাবীদের মধ্যে অনেকেই তোমাদের ঈমান আনবার পর ঈর্ষা মূলক মনোভাব বশতঃ আবার তোমাদেরকে কাফিররূপে ফিরে পাওয়ার আকাঙ্খা করে। অতএব তোমরা ক্ষমা কর ও উপেক্ষা কর যতক্ষণ না আল্লাহ কোন নির্দেশ দেন- নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্ব বিষয়ে সর্বশক্তিমান।

১১০. তোমরা নামায কায়িম করো ও যাকাত দাও। তোমরা উত্তম কাজের যা কিছু নিজেদের জন্য পূর্বে প্রেরণ করবে আল্লাহর নিকট তা পাবে। তোমরা যা কর আল্লাহ তার দ্রষ্টা।

১১১. এবং তারা বলে, ইয়াহুদী বা খৃস্টান ছাড়া অন্য কেউ জান্নাতে প্রবেশ করবে না। তা তাদের মিথ্যা আশা। বল যদি তোমরা সত্যবাদী হও তবে তোমাদের প্রমাণ পেশ কর।

১১২. হ্যা, যে কেউ আল্লাহর নিকট সম্পূর্ণরূপে আত্মসমর্পণ করে এবং সৎকর্মপরায়ণ হয় তার ফল তার প্রতিপালকের নিকট রয়েছে এবং তাদের কোন ভয় নেই ও তারা দুঃখিত হবে না।

وَدَّ كَثِيْرٌ "مِّنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ لَوْ يَرُدُّوْنَكُمْ مِّنْ بَعْدِ اِيْمَانِكُمْ كُفَّارًا

আহলে কিতাব হতে অনেকেই তোমরা ঈমান আনার পর তোমাদেরকে কাফের করার চেষ্টায় আছে। অর্থাৎ ইহুদী এবং মুশরিকদের মধ্যে অনেকেই তোমাদের মঙ্গলার্থে যেই সকল আয়াত অবতীর্ন হচ্ছে তা সহ্য করতে পারছেনা। তারা তোমাদের এবং নবী মুহাম্মদ (সা.)-কে সহ্য করতে পারছে না। যেহেতু সত্য প্রকাশ

হয়ে গেছে, কারণ তাদের কিতাবে মুহাম্মদ (সা.) সম্পর্কে বলা হয়েছে। وَدَّ كَثِيْرٌ "مِّنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ দ্বারা উদ্দেশ্য করা হয়েছে كعب بن الاشرف -এ কথা হযরত যুহরী এবং কাতাদা (রা.) হতে বর্ণনা করা হয়েছে। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, ইহুদীদের মধ্যে হুয়াই ইবনে আখতাব আরবদেরকে সবচেয়ে বেশী হিংসা করত। যখন আল্লাহ্ তায়ালা আরবদের মধ্যে হতে আপন রাসূল প্রেরণ করলেন-তখন এদুজন লোক ইসলাম হতে মানুষকে ফিরিয়ে রাখার জন্যে যতদূর সম্ভব চেষ্টা করত। তাই, আল্লাহ্ তায়ালা তাদেরকে উদ্দেশ্য করে وَدَّ كَثِيْرٌ "مِّنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ لَوْ يَرُدُّوْنَكُمْ مِّنْ بَعْدِ اِيْمَانِكُمْ كُفَّارًا নাযিল করেন। ইহুদ উল্লেখ করে ব্যক্তি উদ্দেশ্য গ্রহণের কারণ প্রসঙ্গে বলা যায় নেতাকে উল্লেখ করে তার অনুসারীকে উদ্দেশ্য করা আরব দেশে প্রথা ছিল।

حَسَدًا مِّنْ عِنْدِ اَنْفُسِهِمْ مِّنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ

তারা অন্তর থেকে হিংসা করে 'হক' বা সত্য উদঘাটিত হওয়ার পরও। অর্থাৎ হযরত মুহাম্মদ (সা.) আল্লাহর রাসূল এবং ইসলাম আল্লাহ্ তায়ালার দ্বীন একথা স্পষ্ট হয়ে যাওয়ার পরও তার হিংসা করে। এভাবে হযরত কতাদাহ (রা.) বর্ণনা করেন। হযরত আবূ আলিয়্যা (রা.) বলেন- من بعد ما تبين لهم الحق يقول تبين لهم الحق অর্থাৎ যেভাবে তাদের তওরাত এবং ইনযিল কিতাবে লিখিত আছে সেভাবে হযরত মুহাম্মদ (সা.)-কে সত্য সত্য আল্লাহ্ তায়ালার রসূল পাওয়াতে তারা হিংসায় জ্বলে যাচ্ছে। এভাবে হযরত রবী (রা.) রিওয়ায়েত করেন- তিনি শুধু এতটুকু বাড়িয়ে বলেন, كفروا به حسدا و بغيا اذا كان من غيرهم তারা এ জন্য অস্বীকার, হিংসা ও অমান্য করে, যেহেতু রাসূল তাদের মধ্য হতে না এসে অন্য সম্প্রদায় থেকে এসেছেন। হযরত সুদ্দী এবং ইবনে যায়েদ (রা.) বলেন حق হক দ্বারা উদ্দেশ্য রাসূলুল্লাহ (সা.)! হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন- তাদের সামনে হক বা সত্য প্রকাশের পর তাদের কাছে আর কিছুই অজানা নেই, কিন্তু হিংসা তাদের উপর চড়ে বসেছে। যার কারণে তারা অধিক দুর্নাম করছে। হযরত আবু জাফর (রা.) ও এ রকম বর্ণনা করেন।

فَاعْفُوْا وَاصْفَحُوْا حَتّٰى يَاْتِيَ اللّٰهُ بِاَمْرِهٖ

তোমরা তাদেরকে ক্ষমা কর এবং উপেক্ষা কর, যতক্ষন না আল্লাহ্ স্বীয় নির্দেশ প্রদান করেন। অর্থাৎ তারা যে তোমাদের ধর্মও নবীকে অস্বীকার করছে, তোমাদেরকে মুরতাদ করতে চেয়েছে- এ সব দোষ ত্রুটি ক্ষমা করে দাও। অপেক্ষা কর যতক্ষণ না আল্লাহ তাদের ব্যাপারে ফয়সালা করবেন। অতঃপর আল্লাহ্ তায়ালা স্বীয় নবী এবং মুমীনকে নির্দেশ দিলেন-

قَاتِلُوا الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَلَا يُحَرِّمُوْنَ مَا حَرَّمَ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ

"যাদের প্রতি কিতাব অবতীর্ণ হয়েছে তাদের মধ্যে যারা আল্লাহর প্রতি এবং শেষ দিনের প্রতি ঈমান আনে না, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (সা.) যা হারাম করেছেন তা হারাম গন্য করে না, তাদের সাথে যুদ্ধ কর।" (সূরা ঃ তাওবা-২৯)

এ আয়াতে জিহাদের বিধান অবতীর্ণ করে فَاعْفُوْا وَاصْفَحُوْا এর নির্দেশ বাতিল করা হয়েছে। যতক্ষন না মুমীন এবং মুশরিকীনের কলিমা এক হবে বা মুশরিকগণ ট্যাক্স আদায় করবে ততক্ষণ জিহাদ করতে হবে। হযরত ইবনে আব্বাস, কাতাদাহ্ রবী এবং সুদ্দী (রা.) হতে এ ভাবেই বর্ণনা রয়েছে

Scanned with CamScanner

إِنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ

অবশ্যই আল্লাহ্ তায়ালা সর্ব-শক্তিমান। তিনি নাফরমান হতে বদলাও নিতে পারেন। আবার ইচ্ছে করলে হিদায়ত ও করতে পারেন।

وَأَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ وَمَا تُقَدِّمُوْا لِأَنْفُسِكُمْ مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوْهُ عِنْدَ اللّٰهِ إِنَّ اللّٰهَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ

তোমরা নামাজ প্রতিষ্ঠা কর, যাকাত আদায় কর। তোমরা যা কিছু তোমাদের কল্যাণের জন্য আল্লাহ্ তায়ালার দরবারে পেশ করেছ, তা অবশ্যই আল্লাহর কাছে পাবে। আল্লাহ্ তায়ালা অবশ্যই তোমরা যা কিছু করছ তা দেখছেন। এ আয়াতের মূল অর্থ হচ্ছে, তোমরা জীবিত থাকা অবস্থায় যে সব ভাল কাজ করে আল্লাহ্ তায়ালার দরবারে জমা করেছ, মৃত্যুর পর তা অবশ্যই পাবে। হযরত রবি (রা.) বলেন - والخير هو العمل الذي يرضاه الله অর্থাৎ خير বলতে ঐ সব আমল বা কার্যাবলী বোঝায়, যে কাজে আল্লাহ্ তায়ালা সন্তুষ্ট হন।

وَقَالُوْا لَنْ يَّدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُوْدًا

তারা বলে- বেহশতে ইহুদী বা নাসারা ছাড়া অন্য কেউ প্রবেশ করবেনা। অথচ এটা তাদের মিথ্যা আশা। ইহুদীরা বলে ইহুদী ছাড়া কেউ বেহেশতে প্রবেশ করতে পারবেনা। আবার নাসারাগণ বলে নাসারা ছাড়া কেউ বেহেশতে প্রবেশ করতে পারবে না। এটা তাদের মিথ্যা দাবী, যার কোন প্রমান নেই। হযরত কাতাদাহ্ এবং রবী এভাবে বর্ণনা করেন।

قُلْ هَاتُوْا بُرْهَانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ

হে মুহাম্মদ (সা.)! আপনি বলে দিন। তোমরা তোমাদের দাবীতে সত্য হলে দেখি তোমাদের দাবীর অনুকূলে দলিল নিয়ে আস। হযরত কাতাদাহ্, রবী এবং সুদ্দী (রা.) এভাবে বর্ণনা করেন,

بَلٰى مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهٗ لِلّٰهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ

তবে হ্যাঁ, যে আল্লাহ্ তায়ালার সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষ্যে ইসলাম গ্রহণ করেছে এবং যে, নেককার সে বেহেশতে প্রবেশ করবে। অর্থাৎ ইহুদী এবং নাসারাদের দাবীর পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ্ তায়ালা এ আয়াত নাযিল করেন এবং তাদের দাবী প্রত্যাখান করেন। যে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ আল্লাহ্ তায়ালার আনুগত্যে নিয়োজিত থাকার কারণে তাকে মুসলিম বলা হয়। আর وجهه শব্দ এজন্যে বলা হয়েছে যেহেতু মানুষের শরীরের সকল অংশের মধ্যে সর্বোৎকৃষ্ট অংশ চেহারা। তাই চেহারার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এক্ষেত্রে বালাগতের কায়দা ذكر الجزء ارادة الكل অর্থাৎ অংশ উল্লেখ করে পূর্ণ বস্তু উদ্দেশ্য করা। মুখে ইসলাম গ্রহণ করা মানে পূর্ণ শরীর আল্লাহ্কে সঁপে দেওয়া।

فَلَهٗ أَجْرُهٗ عِنْدَ رَبِّهٖ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ

তাঁর সৎকাজের পরিনাম ও বিনিময় আল্লাহ্ তায়ালার নিকট নিহিত রয়েছে। তাদের কোন ভয় ভীতি নেই এবং চিন্তাও নেই। দুনিয়াতেও তাদের নেক্ আমল ধুলিসাৎ হওয়ার কোন কারণ নেই।

وَقَالَتِ الْيَهُوْدُ لَيْسَتِ النَّصٰرٰى عَلٰى شَيْءٍ وَّقَالَتِ النَّصٰرٰى لَيْسَتِ الْيَهُوْدُ عَلٰى شَيْءٍ وَّهُمْ يَتْلُوْنَ الْكِتٰبَ ؕ كَذٰلِكَ قَالَ الَّذِيْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ ۚ فَاللّٰهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ فِيْمَا كَانُوْا فِيْهِ يَخْتَلِفُوْنَ ﴿١١٣﴾ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَّنَعَ مَسٰجِدَ اللّٰهِ أَنْ يُّذْكَرَ فِيْهَا اسْمُهٗ وَسَعٰى فِيْ خَرَابِهَا ؕ أُولٰئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَنْ يَّدْخُلُوْهَا إِلَّا خَائِفِيْنَ ؕ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَّلَهُمْ فِي الْأٰخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيْمٌ ﴿١١٤﴾ وَلِلّٰهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ ۚ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوْا فَثَمَّ وَجْهُ اللّٰهِ ؕ إِنَّ اللّٰهَ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ ﴿١١٥﴾ وَقَالُوا اتَّخَذَ اللّٰهُ وَلَدًا سُبْحٰنَهٗ ؕ بَلْ لَّهٗ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ ؕ كُلٌّ لَّهٗ قٰنِتُوْنَ ﴿١١٦﴾ بَدِيْعُ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ ؕ وَإِذَا قَضٰى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُوْلُ لَهٗ كُنْ فَيَكُوْنُ ﴿١١٧﴾

১১৩. ইয়াহুদীরা বলে, খৃস্টানদের কোন ভিত্তি নেই এবং খৃস্টানরা বলে, ইয়াহুদীদের কোন ভিত্তি নেই। অথচ তারা কিতাব পাঠ করে। এভাবে যারা কিছুই জানে না তারাও অনুরূপ কথা বলে। সুতরাং যে বিষয়ে তারা মতভেদ করত কিয়ামতের দিন আল্লাহ তার মীমাংসা করবেন।

১১৪. যে কেউ আল্লাহর মসজিদসমূহে তাঁর নাম স্মরণ করতে বাধা প্রদান করে এবং তাদের বিনাশ সাধনে প্রয়াসী হয় তার অপেক্ষা বড় যালিম কে হতে পারে? অথচ ভয়-বিহ্বল না হয়ে তাদের জন্য মসজিদে প্রবেশ করা সংগত ছিল না। পৃথিবীতে তাদের জন্য লাঞ্ছনা ভোগ ও পরকালে তাদের জন্য মহাশাস্তি রয়েছে।

১১৫. পূর্ব ও পশ্চিম আল্লাহরই, এবং যে দিকে তোমরা মুখ ফিরাও না কেন, সেদিকই আল্লাহর দিক। নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্বব্যাপী, সর্বজ্ঞ।

১১৬. এবং তারা বলে, আল্লাহ সন্তান গ্রহণ করেছেন, তিনি অতি পবিত্র। বরং আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে সব আল্লাহরই। সব কিছু তারই একান্ত অনুগত।

১১৭. আল্লাহ আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর স্রষ্টা এবং যখন তিনি কোন কিছু

Scanned with CamScanner

করতে সিদ্ধান্ত করেন, তখন তার জন্য শুধু বলেন, 'হও' আর তা হয়ে যায়।

وَقَالَتِ الْيَهُوْدُ لَيْسَتِ النَّصٰرٰى عَلٰى شَيْءٍ وَّقَالَتِ النَّصٰرٰى لَيْسَتِ الْيَهُوْدُ عَلٰى شَيْءٍ وَّهُمْ يَتْلُوْنَ الْكِتٰبَ

এআয়াত নাযিল হওয়ার কারণ হচ্ছে- হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত, নাযরানের কিছু সংখ্যক খ্রীষ্টান রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর খেদমতে হাজির হল, তথায় ইহুদীদের কিছু পাদ্রীও আসল। তারা মহানবী (সা.)-এর সামনে বিতর্কে লিপ্ত হল। ইহুদীদের পক্ষ হতে রাফে বিন হর মলা বলে, তোমাদের কোন ভিত্তি নেই, সে ঈসা বিন মরিয়মকে অস্বীকার করে, ইঞ্জিল কিতাবও অস্বীকার করে। অপর দিকে আহলে নাজরানের এক ব্যক্তি বলে-ইহুদীদের কোন ভিত্তি নেই, সে মূসা (আ.)-এর নবুয়ত অস্বীকার করে, তওরাতও অস্বীকার করে। এব্যাপারে তাদের মধ্যে যে বিরোধ ছিল, তার প্রেক্ষিতে আল্লাহ তায়ালা আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ করেন। وَهُمْ يَتْلُوْنَ الْكِتٰبَ এর আসল তত্ত্ব হচ্ছে-ইহুদীরা তৌরাত কিতাব তিলাওয়াত করত এবং এর মধ্যে হযরত ঈসা (আ.)-এর নবুওয়তের সত্যতা সম্পর্কে দলিল পেত। অপর দিকে নাসারাগণ ইঞ্জিল কিতাব তেলাওয়াত করত, সেখানে হযরত মূসা (আ.)-এর সত্যতা সম্পর্কে দলিল পেত।

كَذٰلِكَ قَالَ الَّذِيْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ

এ ভাবেই অজ্ঞ ব্যক্তিরা যাহেচ্ছা বলে বেড়াত। اَلَّذِيْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ বলে কাদেরকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে, তা নিয়ে তাফসীরকারীদের মধ্যে মত বিরোধ রয়েছে। এর মধ্যে অন্যান্য বক্তব্য ছেড়ে দিয়ে শুধু দু'টি বক্তব্য তুলে ধরা হল।

হযরত আবু জাফর (রা.) বলেন- আমাকে হযরত আবুল কাসিম হাদীস বর্ণনা করেন, তিনি বলেন- আমাকে আল-হুসাইন বলেন- তিনি বলেন- আমাকে হযরত হাজ্জাজ বলেন, তিনি বলেন- আমাকে ইবনে জুরাইজ বলেন- আমি হযরত আতা (রা.)-কে জিজ্ঞেস করলাম اَلَّذِيْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ দ্বারা কাদেরকে বোঝানো হয়েছে। তিনি উত্তর দিলেন, ঐ সব লোক যারা ইহুদী এবং নাসারাদের আগে ছিল। তৌরাত এবং ইঞ্জিলের আগে ছিল। কেউ কেউ বলেন। لَا يَعْلَمُوْنَ শব্দ দ্বারা আরবের মুশরিকদেরকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে, কারণ তারা আহলে কিতাব ছিল না। তাদের প্রতি মুর্খতার সম্বন্ধ করা হয়। হযরত সুদ্দী হতে বর্ণিত, তিনি বলেন- اَلَّذِيْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ দ্বারা আরবদের মধ্যে ঐ সব লোকদেরকে বোঝানো হয়েছে, যারা নিজের ইচ্ছে মত বলত- মুহাম্মদ (সা.)-এর কোন ধর্ম নেই।

فَاللّٰهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ فِيْمَا كَانُوْا فِيْهِ يَخْتَلِفُوْنَ

বস্তুতঃ আল্লাহ তায়ালাই কিয়ামতের দিন ফয়সালা করবেন- ঐ সব জিনিষের ব্যাপারে, যে ব্যাপারে তারা বিতর্ক করত। তাদের ধর্ম ও মতবাদের কোনটা সত্য এবং কোনটা মিথ্যা তা নিয়ে বিতর্ক করত।

وَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنْ مَّنَعَ مَسٰجِدَ اللّٰهِ اَنْ يُّذْكَرَ فِيْهَا اسْمُهٗ وَسَعٰى فِيْ خَرَابِهَا

আল্লাহ তায়ালার নির্দেশাবলীর বাস্তবায়নে বাধাকারী লোকের মধ্যে সে সবচেয়ে বেশী অত্যাচারী, যে মসজিদে আল্লাহ তায়ালার নাম উচ্চারণে বাঁধা প্রদান করে এবং মসজিদকে উজাড় করে দিতে ব্রতী হয়। مساجد হচ্ছে مسجد শব্দের বহু বচন। মসজিদ শব্দের অর্থ হচ্ছে প্রত্যেক ঐ স্থান যেখানে সিজদা করা হয়। আয়াতে مَنْ শব্দের অর্থ নাসারা এবং মসজিদ বলতে বায়তুল মোকাদ্দাসকে বোঝানো হয়েছে। যেমন হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বর্ণনা করেন। হযরত মুজাহিদ (রা.) বলেন سعي في خرابها এর মর্ম কথা হল- নাসারাগণ বায়তুল মুকদ্দাসে নোংরা বস্তু ছড়িয়ে রাখত এবং মুসল্লীগণকে সেখানে নামায আদায় করা হতে বিরত রাখত এমনকি বাঁধা দিত। হযরত কাতাদাহ (র.) বলেন, এ আয়াতে আলোচনা হচ্ছে আল্লাহ তায়ালার দুশমন নাসারা এবং ইহুদীদের কিছু সংখ্যক লোক সম্পর্কে।

কারো মতে এখানে কুরাইশের মুশরিক সম্পর্কে বলা হয়েছে, যারা রাসূলুল্লাহ (সা.)-কে মসজিদে হারামে নামায আদায় করা হতে বিরত রাখত- এ ঘটনা ঘটেছিল যখন রাসূলুল্লাহ (সা.)-কে হুদায়বিয়ায় মুশরিকগণ বাঁধা দিয়েছিল; যার কারণে তিনি 'যি-তোয়া' নামক স্থানে হাদী কুরবানী করেছিলেন। এমতাবস্থায় কাফেররা বলে- যারা বদরের যুদ্ধে আমাদের বাপ দাদাকে হত্যা করেছে, তাঁরা কিভাবে আমরা বেঁচে থাকতে মক্কায় প্রবেশ করতে পারে। তখন আল্লাহ তায়ালা এ আয়াত নাযিল করেন। হযরত আবু জাফর (রা.) বলেন, উপরোক্ত تأويل এর মধ্যে এটাই সঠিক যে, ممن منع مساجد لله দ্বারা উদ্দেশ্য করা হয়েছে নাসারাগণ। কারণ তারাই বখত নসর ফিরে যাওয়ার পর বনী ইসরাঈলের মুমীনদেরকে বায়তুল মোকাদ্দাসে নামায আদায় করতে নিষেধ করেছিল। যদিও মক্কার মুশরিকরা রাসূলুল্লাহ (র.)-কে বায়তুল হারামে নামায আদায় করতে বাঁধা দিয়েছিল কিন্তু বায়তুল হারাম ধ্বংস করার চেষ্টা করেনি।

اُولٰٓئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ اَنْ يَّدْخُلُوْهَا اِلَّا خَآئِفِيْنَ

এ মসজিদে নাসারাদের প্রবেশ করা সমীচীন নয় শুধু তারাই প্রবেশ করবে, যারা আল্লাহকে ভয় করে।

হযরত কাতাদাহ (রা.) বলেন, এ আয়াতে মসজিদে প্রবেশ করতে নিষেধ করা হয়েছে নাসারাকে, কারণ তারা শুধু চুরি করার জন্যেই মসজিদে প্রবেশ করত।

হযরত সুদ্দী (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন الا خائفين শব্দ দ্বারা ঐসব লোকদেরকে বোঝানো হয়েছে যারা নিহত হওয়া বা جزية আদায়ের ভয়ে মসজিদে প্রবেশ করতো।

হযরত আবু জাফর (রা.) বলেন, আমাকে হযরত ইউনুস (র.) বলেন, তিনি বলেন, আমাদেরকে হযরত ইবনে ওহব (রা.) বলেন, তিনি বলেন- হযরত ইবনে যায়েদ (রা.) বলেন, আল্লাহ তায়ালার বাণী اُولٰٓئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ اَنْ يَّدْخُلُوْهَا নাযিল হওয়ার কারণ হচ্ছে, রাসূলুল্লাহ (সা.) উচ্চ স্বরে ঘোষণা করেন- মুশরিকরা এ বৎসরের পর হজ্ব করবে না এবং উলঙ্গ অবস্থায় বায়তুল্লাহ প্রদক্ষিণ করবে না- তখন মুশরিকরা বলতে শুরু করে- হে আল্লাহ! আমাদেরকে নিষেধ করা হল তখন আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হয়।

Scanned with CamScanner

এখানে عن ব্যবহার না করে من ব্যবহার করা হয়েছে, কারণ من এক বচন হলেও বহু বচনের অর্থ প্রদান করে।

لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَّلَهُمْ فِي الْاٰخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيْمٌ

এ পার্থিব জগতে তারা বিষণ্নতার মাঝে থাকবে এবং পরকালে তাদের জন্যে রয়েছে কঠিন শাস্তি। এখানে خزي শব্দের অর্থ হল লজ্জা, মন্দ কাজে লিপ্ত থাকা, অসম্মানী হওয়া। তা হতে পারে হত্যা, বন্দী হওয়ার মাধ্যমে অথবা অপরাজিত ও জিযইয়া আদায়ের মাধ্যমে।

হযরত কাতাদাহ (রা.) বলেন- তাদেরকে টেক্স ও ক্ষতিপূরণ দিতে হত, যা তাদের লাঞ্ছনার কারণ ছিল।

হযরত সুদ্দী (রা.) বলেন, দুনিয়ার লাঞ্ছনা হল, যখন হিদায়ত প্রতিষ্ঠা হল এবং কনষ্টান্টিনোপল বিজয় হল-তখন তাদেরকে হত্যা করা হয়েছিল। এটাও তাদের জন্যে চিন্তার কারণ ছিল। পরকালে তাদের জন্যে বড় শাস্তি হচ্ছে জাহান্নামের আযাব। জাহান্নামের আযাব তাদের থেকে হালকা করা হবে না এবং শেষও হবেনা- এর মধ্যেই তারা ডুবে থাকবে।

وَلِلّٰهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَاَيْنَمَا تُوَلُّوْا فَثَمَّ وَجْهُ اللّٰهِ ـ

পূর্ব ও পশ্চিম সর্বদিকে আল্লাহ্ তায়ালার রাজত্ব বিরাজমান। যেদিকেই মুখ ফিরাবে সেই দিকেই আল্লাহ্ তায়ালার নিদর্শন অবলোকন করা যাবে। এ আয়াতের শানে নুযুলে মুফাসসিরীনগণের মধ্যে মতবিরোধ রয়েছে। একদল বলেন- আল্লাহ্ তায়ালার নির্দেশ অনুযায়ী হযরত মুহাম্মদ (স.) কিছুদিন বায়তুল মুক্বাদ্দাস এর প্রতি মুখ করে নামায আদায় করেন, এরপর আল্লাহ তায়ালার নির্দেশ অনুযায়ী কাবা শরীফের প্রতি মুখ করে নামায আদায় করতে লাগলেন। এ পরিবর্তনকে উপলক্ষে করে ইহুদীগণ বিদ্রুপ করে বলতে লাগল, মুসলমানগণ কেন এক সময় বায়তুল মুক্বাদ্দাস এবং আরেক সময় কাবার প্রতি মুখ করে নামায আদায় করছে? ইহুদীরা বলতে লাগল কিসে তাদেরকে তাদের কেবলা بَيْت المقدس হতে ফিরিয়ে দিয়েছে। আল্লাহ্ তায়ালা ইহুদীদের জওয়াবে বলেন وَلِلّٰهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ, পূর্ব ও পশ্চিম সবই আল্লাহ তায়ালার । আমার বান্দারা যেদিকে ইচ্ছে সেদিকে মুখ ফিরিয়ে নামায আদায় করবে।

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত, সর্ব প্রথম কুরআন শরীফে কিবলা সংক্রান্ত আয়াতখানি মনসূখ হয়। মহানবী (সা.) মক্কা হতে হিজরত করে মদীনায় আসার পর আল্লাহর নির্দেশ অনুসারে ষোল মাস এর চেয়ে কিছু বেশী সময় بيت المقدس কে কিবলা করে নামায আদায় করেন। এতে ইহুদীরা আনন্দিত হয়েছিল। অথচ রাসূলুল্লাহ্ (সা.) হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর কিবলা পছন্দ করতেন, এজন্যে হযরত মুহাম্মদ (আ.) আল্লাহ্ তায়ালার দরবারে প্রার্থনা করতেন এবং আসমানের দিকে চেয়ে চেয়ে অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করতেন। তখন আল্লাহ্ তায়ালা قَدْ نَرٰى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ আয়াত নাযিল করেন। এতে ইহুদীরা সন্দেহ করতে লাগল এবং বলল, তাদেরকে কে কিবলা থেকে ফিরিয়ে দিল? তখন আল্লাহ তায়ালা তাদের কথার দাঁত ভাঙ্গা জওয়াব প্রদান করে, قُلْ لِلّٰهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ এবং فَاَيْنَمَا تُوَلُّوْا فَثَمَّ وَجْهُ اللّٰهِ আয়াত নাযিল করেন। হযরত সুদ্দী (রা.) হতে একই ধরনের বর্ণনা পাওয়া

যায়।

অপর এক দল বলেন এ আয়াত নাযিল হয়েছিল بيت الحرام কে কিবলা নির্ধারণ করার পূর্বে। এখানে আল্লাহর শ্রেষ্ঠত্ব বুঝানো হয়েছে এই বলে যে, তোমরা যে দিকেই মুখ ফিরাও না কেন সেদিকেই আমার সামন দিক। কারণ পূর্ব পশ্চিম সকলই তাঁর। যখন بيت الحرام এর দিকে কিবলা করে নামায আদায় করা ফরয হল তখন এ আয়াত মনসূখ হয়ে যায়। হযরত কাতাদাহ (রা.) বলেন এ আয়াত মানসূখ হয়ে যায় যখন مسجد وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ নাযিল হয়। অর্থাৎ الحرام কে কিবলা নির্ধারন করার পর وَلِلّٰهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ আয়াতখানি মনসূখ হয়ে যায়। হযরত আবু জাফর (রা.) বলেন- আমাকে আল মুসান্না (র.) বলেন, তিনি বলেন- আমাদেরকে হযরত হাজ্জাজ বিন মিনহাল (র.) বলেন- আমাদেরকে হযরত হুমাম (রা.) বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আমাদেরকে হযরত ইয়াহইয়া (রা.) বলেন- তিনি বলেন, আমি হযরত কাতাদাহ (রা.) থেকে শুনেছি, তিনি আল্লাহ তায়ালার বাণী- فَاَيْنَمَا تُوَلُّوْا فَثَمَّ وَجْهُ اللّٰهِ সম্পর্কে বলেন, তাঁরা হিজরতের পুর্বে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর সাথে মক্কা শরীফে بيت المقدس এর দিকে নামায আদায় করতেন। হিযরতের পরে রাসূলুল্লাহ্ (সা.) ষোল মাস بيت المقدس বায়তুল মুকাদ্দাস এর দিকে কিবলা করে নামায আদায় করেন। অতঃপর তিনি بيت الحرم কে কিবলা করে নামায আরম্ভ করেন। এরপর আল্লাহ তায়ালা অন্য আয়াত فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا الاية দ্বারা উপরের আয়াত وَلِلّٰهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ কে মনসূখ করেন এবং বায়তুল হারামকে কিবলা নির্ধারণ করেন।

কেউ কেউ বলেন, এ আয়াত নবী করীম (সা.)-এর উপর অবতীর্ণ হয়েছিল শুধু অনুমতি প্রদানের জন্যে যে, নফল নামায যে কোন দিকে মুখ করে আদায় করতে পারবে। তাছাড়া রাসূলুল্লাহ্ (সা.) সফরের অবস্থায় যে কোন দিকে ইচ্ছে মুখ করে নামায আদায় করতে পারবেন। কিন্তু মুকীম অবস্থায় অবশ্যই بيت الحرام এর দিকে মুখ করে নামায আদায় করতে হবে। এ অনুমতি এ জন্যে দেয়া হয়েছিল, যেন সফরে তার জন্য সহজ হয়।

হযরত ইবনে উমর (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন- فَاَيْنَمَا تُوَلُّوْا فَثَمَّ وَجْهُ اللّٰهِ আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার কারণ হচ্ছে, যেন হযরত মুহাম্মদ (সা.) সফরের অবস্থায় যে কোন দিকে মুখ করে নামায আদায় করতে পারেন। যখন তিনি মক্কা হতে প্রত্যাবর্তণ করতেন, তখন তিনি বাহনের উপর মদীনার দিকে হয়ে নামায আদায় করতেন। অন্য একদল বলেন- একটি সম্প্রদায়, যারা কিবলা হারিয়ে ফেলেছিল- তাদের ব্যাপারে এ আয়াত নাযিল হয়েছিল। তারা বিভিন্ন দিকে নামায আদায় করে নিলেন। এজন্যে আল্লাহ্ তায়ালা তাদেরকে শান্তনা দিয়ে বলেন- তোমরা যেদিকে মুখ করনা কেন সে দিকেই আমি আছি এবং যে দিকেই নামায আদায় করেছ তাই কেবলা। সুতরাং তোমাদের নামায সঠিকভাবে আদায় হয়েছে।

হযরত আবদুল্লাহ বিন আমির বিন রবিয়া তাঁর পিতা হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন আমরা একদা গভীর রাতে রাসূলুল্লাহ (স.)-এর সাথে ছিলাম এবং নামায আদায় করেছিলাম। যখন ভোর হল, দেখা গেল আমরা কিবলা ছাড়া অন্য দিকে নামাজ আদায় করে নিয়েছি। রাসূলুল্লাহ (স.) বলেন, আমরা কিবলা ছাড়াই নামায আদায় করেছি। তখনই প্রশান্তিমূলক আল্লাহ্ তায়ালা وَلِلّٰهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَاَيْنَمَا تُوَلُّوْا فَثَمَّ

Scanned with CamScanner

وَجْهُ اللّٰهِ আয়াত নাযিল করেন। কেউ কেউ বলেন, এ আয়াত নাজ্জাশী সম্পর্কে নাযিল হয়েছে। কেননা বর্ণনা ভঙ্গী সেদিকেই ইঙ্গিত দেয়।

হযরত কাতাদাহ (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন- রাসূলুল্লাহ্ স্পষ্টত বলেন, তোমাদের ভাই নাজ্জাশী মারা গেছেন এবং তোমরা তার জানাজার নামায আদায় কর। তখন তারা বলেন, আমরা কি এমন লোকের জানাযার নামায আদায় করব, যে ব্যক্তি মুসলমান ছিল না? কাতাদাহ (রা.) বলেন- তখন এ আয়াত নাযিল হয়।

وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ خَاشِعِيْنَ

"আহ্লে কিতাবদের মধ্যে এমন লোক আছেন, যারা আল্লাহর প্রতি বিনয়ী হয়ে তার প্রতি এবং তিনি যা তোমাদের ও তাদের প্রতি অবতীর্ণ করেছেন তাতে ঈমান আনে।" (সূরা ঃ আলে-ইমরান-১৯৯)

হযরত কতাদাহ (রা.) বলেন, তখন সাহাবায়ে কিরাম (রা.) বলেন, কিন্তু সে কিবলা মুখী হয়ে নামায আদায় করতনা। তখনই আল্লাহ তায়ালা لِلّٰهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوْا فَثَمَّ وَجْهُ اللّٰهِ এ আয়াত নাযিল করেন।

হযরত মুজাহিদ (রা.) বলেন- যখন اُدْعُوْنِيْ أَسْتَجِبْ لَكُمْ এ আয়াত নাযিল হয়, তখন কাফিররা বলেছিল, তিনি কোথায় আছেন? তখনই আল্লাহ্ তায়ালা নাযিল করেন- فَأَيْنَمَا تُوَلُّوْا فَثَمَّ وَجْهُ اللّٰهِ যেদিকেই তোমরা মুখ ফিরাওনা কেন, সেখানেই আল্লাহ রয়েছেন।

হযরত আবু জাফর (রা.) বলেন, সঠিক কথা হল আয়াতের অর্থ আম। অর্থাৎ আয়াতের অর্থ হল তোমাদের সফরের সময়, নফল নামাযের সময়, শত্রুর মুকাবিলার সময় নফল ও ফরয ইবাদতের সময় যে দিকেই মুখ ফিরাওনা কেন সেদিকে আল্লাহর সামনের দিক।

হযরত আবু জাফর (রা.) সকল তাবীল এর মধ্যে এটাকে সঠিক তাবীল বলেছেন। যখনই সফরে থাকবে অথবা দুশমনের ভয় থাকে, তখন যেদিকে সম্ভব সেদিকে মুখ করে নামায আদায় করবে। হযরত ইবনে উমর ও অন্যান্যরা এ মত পোষন করেন।

إِنَّ اللّٰهَ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ

অবশ্যই আল্লাহ তায়ালা সর্বব্যাপী ও সর্বজ্ঞ। অর্থাৎ আল্লাহ্ তায়ালার সত্তার মধ্যেই প্রশস্থতা এবং জ্ঞাত হওয়ার মতো বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান রয়েছে। عليم اسم فاعل مبالغة অর্থাৎ আল্লাহ্ তায়ালা তার বন্দাহদের সব কিছুই জানেন। তাঁর জ্ঞানের পরিধি অকল্পনীয়ভাবে বিস্তৃত, যার থেকে কোন কিছু অদৃশ্য বা অজানা নেই।

وَقَالُوا اتَّخَذَ اللّٰهُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ بَلْ لَهُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ كُلٌّ لَهُ قَانِتُوْنَ

অর্থাৎ তারা বলে আল্লাহর ছেলে সন্তান আছে। অথচ আল্লাহ এ সব এমনকি, সমস্ত দোষ ও অপবাদ হতে মুক্ত বরং আসমানসমূহ এবং জমিনের মধ্যে যা কিছু রয়েছে সব কিছুর মালিকই হলেন আল্লাহ। সবকিছুই আল্লাহ্ তায়ালার নির্দেশে চলছে।

অর্থাৎ যারা আল্লাহ তায়ালার মসজিদ হতে লোকদেরকে বিরত রাখে, তারা অর্থাৎ নাসারাগণ বলে- আল্লাহ্ তায়ালা হযরত ঈসা (আ.)-কে সন্তান বানিয়ে নিয়েছেন। অথচ আল্লাহ্ তায়ালা এর থেকে পূত পবিত্র। তাঁর বৈশিষ্ট্য হচ্ছে لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُوْلَدْ কেউ

তাঁকে জন্ম দেননি এবং তিনি কাউকে জন্ম দেননি। তারই জন্যে সম্পূর্ণ রাজত্ব। আসমান এবং জমিন সব কিছুই তার আয়ত্বে। আল্লাহ্ তায়ালা তাদের এসব অপবাদ প্রত্যাখান করতঃ বলেন-

أَنْ دَعَوْا لِلرَّحْمٰنِ وَلَدًا وَمَا يَنْبَغِيْ لِلرَّحْمٰنِ أَنْ يَتَّخِذَ وَلَدًا إِنْ كُلُّ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا آتِي الرَّحْمٰنِ عَبْدًا

"যেহেতু তারা রহমানের প্রতি সন্তানের দাবী করে। অথচ সন্তান দাবী করা রহমানের জন্য শুভনীয় নয়। আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীতে এমন কেউ নেই যে দয়াময়ের নিকট বান্দাহ রূপে উপস্থিত হবে না।" (সূরা ঃ মারইয়াম-৯১-৯৩)

যেহেতু আসমান যমীনের সকল কিছু আল্লাহর অধীন, সুতরাং ঈসা (আ.) যমীনে অথবা আসমানে যেখানেই থাকুন না কেন আল্লাহর বান্দাহ হতে বাধ্য। আরবী ভাষায় قنوت শব্দের অর্থ অনেক রয়েছে। এর মধ্যে একটা হচ্ছে طاعة অনুসরণ ও অনুকরণ করা, অন্য অর্থ হচ্ছে- প্রতিষ্ঠা করা বা প্রতিষ্ঠিত হওয়া। তৃতীয় অর্থ হচ্ছে কথা বলা থেকে বিরত থাকা।

بَدِيْعُ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ

কোন পরিকল্পনা বা নকশা করা ছাড়াই আল্লাহ্ তায়ালা আসমানসমূহ ও পৃথিবীর সৃষ্টিকর্তা অর্থাৎ আল্লাহ্ তায়ালা যা কিছুই সৃষ্টি করেছেন, শুরুতে এদের মতো কোন সৃষ্টিজীব বা সৃষ্টি ছিল না- সুতরাং আল্লাহ্ তায়ালার সৃষ্টি কাজে কেউ শরীক নেই এবং ছিল না।

إِذَا قَضٰى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُوْلُ لَهُ كُنْ فَيَكُوْنُ

অর্থাৎ আল্লাহ্ তায়ালা যখন কোন কিছু সৃষ্টি করার ইচ্ছে পোষণ করেন শুধু এটুকুই বলেন 'হয়ে যাও'- নিমিষেই তা সত্তা রূপে প্রকাশ লাভ করে। অর্থাৎ যার অস্তিত্ব ছিলনা তা অস্তিত্বরূপে প্রকাশ লাভ করে।

وَقَالَ الَّذِيْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ لَوْلَا يُكَلِّمُنَا اللّٰهُ أَوْ تَأْتِيْنَا آيَةٌ ۚ كَذٰلِكَ قَالَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِثْلَ قَوْلِهِمْ ۚ تَشَابَهَتْ قُلُوْبُهُمْ ۚ قَدْ بَيَّنَّا الْآيٰتِ لِقَوْمٍ يُوْقِنُوْنَ ﴿١١٨﴾ إِنَّا أَرْسَلْنٰكَ بِالْحَقِّ بَشِيْرًا وَّنَذِيْرًا وَّلَا تُسْئَلُ عَنْ أَصْحٰبِ الْجَحِيْمِ ﴿١١٩﴾ وَلَنْ تَرْضٰى عَنْكَ الْيَهُوْدُ وَلَا النَّصٰرٰى حَتّٰى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ ۚ قُلْ إِنَّ هُدَى اللّٰهِ هُوَ الْهُدٰى ۚ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِيْ جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللّٰهِ مِنْ وَّلِيٍّ وَّلَا نَصِيْرٍ ﴿١٢٠﴾ الَّذِيْنَ آتَيْنٰهُمُ الْكِتٰبَ يَتْلُوْنَهُ حَقَّ تِلَاوَتِهِ ۚ أُولٰئِكَ يُؤْمِنُوْنَ بِهِ ۚ وَمَنْ يَّكْفُرْ بِهِ فَأُولٰئِكَ هُمُ الْخٰسِرُوْنَ ﴿١٢١﴾

Scanned with CamScanner

১১৮. এবং যারা কিছু জানে না তারা বলে আল্লাহ আমাদের সাথে কথা বলেন না কেন? কিংবা কোন নির্দশন আমাদের নিকট আসে না কেন? এ ভাবে তাদের পূর্ববর্তীরাও তাদের অনুরূপ কথা বলত। তাদের অন্তর এক রকম। আমি দৃঢ় প্রত্যয়শীলদের জন্য নিদর্শনাবলী স্পষ্টভাবে বিবৃত করেছি।

১১৯. আমি তোমাকে সত্যসহ শুভ সংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে প্রেরণ করেছি। জাহান্নামীদের সম্বন্ধে তোমাকে কোন প্রশ্ন করা হবে না।

১২০. ইয়াহুদী ও খৃস্টানগণ তোমার প্রতি কখনও সন্তুষ্ট হবে না, যতক্ষণ না তুমি তাদের ধর্মাদর্শ অনুসরণ কর। বল, আল্লাহর পথনির্দেশই প্রকৃত পথনির্দেশ। জ্ঞান প্রাপ্তির পর তুমি যদি তাদের খেয়াল-খুশীর অনুসরণ কর তবে আল্লাহর বিপক্ষে তোমার কোন অভিভাবক থাকবে না এবং কোন সাহায্যকারীও থাকবে না।

১২১. যাদেরকে আমি কিতাব দিয়েছি তাদের যারা যথাযথভাবে তা তিলাওয়াত করে তারাই এতে বিশ্বাস করে, আর যারা তা প্রত্যাখ্যান করে তারা ক্ষতিগ্রস্ত।

وَقَالَ الَّذِيْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ لَوْلَا يُكَلِّمُنَا اللّٰهُ اَوْ تَاْتِيْنَا اٰيَةٌ

হযরত মুজাহিদ (রা.) বলেন وَقَالَ الَّذِيْنَ শব্দের দ্বারা নাসারাদেরকে বোঝানো হয়েছে। অপর এক দল বলেন- এশব্দের দ্বারা ইহুদীদেরকে বোঝানো হয়েছে। যারা হযরত রাসূলুল্লাহ (স.) এর সময় উপস্থিত ছিল।

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন রাফে বিন হরীমলা রাসূলুল্লাহ (সা.)-কে বলে- আপনি যদি আল্লাহ্ তায়ালার পক্ষ হতে রাসূল হয়ে থাকেন, যেভাবে আপনি বলছেন, তা হলে আল্লাহ্ তায়ালাকে বলেন, আল্লাহ্ তায়ালা যেন আমাদের সাথে কথা বলেন, যেন আমরা আল্লাহ তায়ালার কথা শ্রবণ করতে পারি। তাদের এ সব অমূলক কথার জবাব প্রদান করতঃ আল্লাহ্ তায়ালা এ আয়াত নাযিল করেন।

হযরত কাতাদাহ, রবী এবং হযরত সুদ্দী (রা.) হতে বর্ণিত, তারা বলেন- لايعلمون শব্দের দ্বারা আরবের কাফিরদেরকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে। হযরত আবু জাফর (রা.) বলেন- উল্লেখিত উক্তিসমূহের মধ্যে সঠিক উক্তি হল لايعلمون শব্দের দ্বারা নাসারাদেরকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে। কেননা ভাষার ইশারা ইংগিত হতে তাই বোঝা যায়। اتخذ الله ولدا হতে এবং تاتينا اية দ্বারা তাই বোঝা যায়। তারা বলত- আল্লাহ্ তায়ালা নবীদের সাথে যেমন কথা বলেন, তেমনি আমাদের সাথে কেন কথা বলেন না? নবীদের নিকট যেমন মোজেযা প্রেরণ করেন, তেমনি কেন আমাদের নিকট মোজেযা প্রেরণ করেন না?

كَذٰلِكَ قَالَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِّثْلَ قَوْلِهِمْ تَشَابَهَتْ قُلُوْبُهُمْ

তাদের পূর্ববর্তী লোকেরাও তাদের ন্যায় কথা বলত। যেমনভাবে নাসারাগণ বলছে لَوْلَا يُكَلِّمُنَا اللّٰهُ اَوْ تَاْتِيْنَا اٰيَةٌ যদি আল্লাহ তায়ালা আমাদের সাথে কথা বলতেন বা কোন নিদর্শন প্রেরণ করতেন-এ ধরনের কথা ইহুদীরা বলত। ফলতঃ এ দুটি দলের

অন্তরের কথা একই রকম। তাদের কথার মধ্যে মিল রয়েছে।

হযরত মুজাহিদ (রা.) বলেন, الذين من قبلهم এ আয়াত দ্বারা ইহুদীদেরকে বুঝানো হয়েছে। হযরত কাতাদাহ (রা.) বলেন- উক্ত আয়াত দ্বারা ইহুদী, নাসারা এবং অপরাপর সকলকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে। হযরত সুদ্দী (রা.) বলেন- উক্ত আয়াত আরবদের প্রতি ইশারা করা হয়েছে। ইহুদী নাসারগণ পূর্বে যা বলত, রাসূল (সা.)-এর যুগে আরবরা তাই বলত। হযরত রবী (রা.) বলেন- উক্ত আয়াত দ্বারা ইহুদী এবং নাসারাকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে।

হযরত আবু জাফর (রা.) বলেন قَالَ الَّذِيْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ দ্বারা নাসারাদের প্রতি ইংগিত করা হয়েছে এবং مِنْ قَبْلِهِمْ বলে ইহুদীদের প্রতি ইংগিত প্রদান করা হয়েছে।

تَشَابَهَتْ قُلُوْبُهُمْ হযরত কাতাদাহ হতে বর্ণিত تَشَابَهَتْ قُلُوْبُهُمْ অর্থাৎ ইহুদী নাসারা এবং আরবদের এবং অন্যান্যদের অন্তরের মধ্যে মিল রয়েছে।

قَدْ بَيَّنَّا الْاٰيٰتِ لِقَوْمٍ يُّوْقِنُوْنَ

আল্লাহ্ তায়ালা বলেন, আমি স্পষ্ট করে দিয়েছি নিদর্শনসমূহ ঐ লোকেদের জন্য যারা দৃঢ়তার সাথে বিশ্বাস করে। অর্থাৎ সন্তুষ্টি ক্রোধ, রহমত, যিল্লতীর চিহ্নসমূহ প্রত্যেক সম্প্রদায়ের কাজের উপর নির্ভরশীল। নিদর্শন উপকারে আসবে ঐসব লোকদের বেলায়, যারা দৃঢ়চিত্তে বিশ্বাস করে। যারা সন্দেহ করে, তাদের কোন উপকারে আসবেনা আমার এ নিদর্শনসমূহ। কারণ ঈমান ছাড়া কিছু কাজে আসবেনা- আর ঈমানের পূর্ব শর্ত হচ্ছে ইয়াকীন يقين।

اِنَّا اَرْسَلْنٰكَ بِالْحَقِّ بَشِيْرًا وَّنَذِيْرًا

আমি অবশ্যই আপনাকে সত্যসহ প্রেরণ করেছি। যেন আপনি মানব সমাজকে সু-সংবাদ দিতে পারেন এবং খারাপ কাজের কারনে ভয়-ভীতি প্রদর্শন করতে পারেন।

অর্থাৎ হে মুহাম্মদ (সা.)! আমি আপনাকে দ্বীনে ইসলাম দিয়ে সু-সংবাদ প্রদানকারী এবং ভয় প্রদর্শনকারী হিসেবে প্রেরণ করেছি। যারা আপনার কথা মত চলবে, তারা দুনিয়ার প্রতি ক্ষেত্রে বিজয় লাভ করবে, আখিরাতে সওয়াব পাবে এবং স্থায়ী নিয়ামতের অধিকারী হবে। অপরদিকে, যে ব্যক্তি আপনার কথা অনুযায়ী চলবে না, সে দুনিয়াতে বেইজ্জত হবে এবং আখিরাতে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি ভোগ করতে হবে।

وَلَا تُسْئَلُ عَنْ اَصْحٰبِ الْجَحِيْمِ

হে মুহাম্মদ (স.)! আপনাকে দুযখীদের আমল সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হবেনা। অর্থাৎ আপনার দায়িত্ব হচ্ছে, যারা আপনার পথের অনুসারী শুধু তাদেরকে সু-সংবাদ দেওয়া এবং যারা আপনার কথা মত চলে না, তাদেরকে ভয় প্রদর্শন করা এবং যারা আপনাকে অমান্য করে সেসব জাহান্নামীদের আমল সম্পর্কে আপনাকে প্রশ্ন করা হবে না। এক দল لَا تَسْئَلْ শব্দের ت এর উপর জবর দিয়ে এবং ل এর উপর সাকিন দিয়ে পাঠ করেন। হযরত ইমাম আবু জাফর (রা.) বলেন- রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-কে দুযখের অধিবাসী সম্পর্কে প্রশ্ন করার ব্যাপারে নিষেধ করা যদি উদ্দেশ্য হতো, তা হলে, হরফ ব্যবহার না করে ن হরফ ব্যবহার করে لَا تَسْئَلْ বলতেন। তাছাড়া এ কিরাত সম্পর্কে কোন দলিলও নেই। তাই এ কিরাত প্রধান্য দেয়ার মত কোন কারণ নেই।

Scanned with CamScanner

وَلَنْ تَرْضٰى عَنْكَ الْيَهُوْدُ وَلَا النَّصٰرٰى حَتّٰى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَى اللّٰهِ هُوَ الْهُدٰى

হে মুহাম্মদ (স.)। ইহুদী এবং নাসারাগণ আপনার উপর সন্তুষ্ট হবে না যতক্ষন না আপনি তাদের ধর্মের অনুসরণ করেন। আপনি বলুন, এ বাস্তবতার মধ্যে কোন সন্দেহ নেই যে, হিদায়ত বা সত্য পথ হল আল্লাহ্ প্রদত্ত পথ। অর্থাৎ ইহুদিয়ত এবং নাসারানিয়ত দুটি পরস্পর বিরোধী মতবাদ-একটা অপরটাকে গ্রহণ করেনা। সুতরাং একই সময় একজন লোকের জন্যে দুটি মাযহাবের অনুসরণ করা অসম্ভব। তাছাড়া হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর জন্য ইসলাম ছাড়া অন্য মাযহাবের অনুসরণ করা সম্ভব নয়।

وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِيْ جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَالَكَ مِنَ اللّٰهِ مِنْ وَّلِيٍّ وَّلَا نَصِيْرٍ

অর্থাৎ হে মুহাম্মদ (স.)! আপনি ইহুদী এবং নাসারা সম্পর্কে অবগত হওয়ার পর ও যদি তাঁদের সন্তুষ্টির জন্য তাদের ইচ্ছে অনুযায়ী তাদের অনুসরণ করেন, তাহলে জেনে রাখুন আল্লাহর পক্ষ হতে আপনি অন্য কাউকে সাহায্যকারী এবং দোস্ত পাবেন না।

কেউ কেউ বলেন- ইহুদী এবং নাসারাগণ হযরত মুহাম্মদ (স.)-কে তাদের ধর্মের দাওয়াত পেশ করত। তাদের প্রত্যেক সম্প্রদায় বলত যে, আমরা সঠিক পথের উপর আছি। অন্যান্য সকল ধর্মের লোকই ভুলের উপর আছে। এ জন্যে আল্লাহ্ তায়ালা এ আয়াত নাযিল করে মুহাম্মদ (স.)-কে হুশিয়ার করে দেন এবং বলেন, মুহাম্মদ (স.) তোমাকে স্পষ্ট জ্ঞান দান করা হয়েছে যেই ব্যাপারে তারা দাবী করছে।

اَلَّذِيْنَ اٰتَيْنٰهُمُ الْكِتٰبَ يَتْلُوْنَهٗ حَقَّ تِلَاوَتِهٖ

যাদেরকে আমি কিতাব প্রদান করেছি। হযরত কাতাদাহ (রা.) বলেন- এ দ্বারা রাসূলুল্লাহ (স.)-এর সাহাবীদেরকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে। হযরত ইবনে যায়েদ (রা.) বলেন الذين اتينا هم الكتاب দ্বারা বনী ইসরাঈলের উলামাদেরকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে, যারা আল্লাহ এবং আল্লাহর রাসূলের উপর ঈমান এনেছিলেন। তাওরাতের নির্দেশ অনুযায়ী আমল করতেন। হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর উপর ঈমান এনেছেন এবং তাঁর অনুসরণ করেছেন- তাদেরকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে। হযরত ইমাম জাফর (র.) ইবনে যায়িদ (রা.) এ রিওয়ায়েতকে প্রধান্য দিয়ে থাকেন। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, এর অর্থ তারা যথাযথ অনুসরণ ও অনুকরণ করতেন। হযরত ইকরামা (রা.) হতেও এভাবে বর্ণনা আছে। হযরত সুদ্দী, আবু মালিক (রা.) হতে, তিনি হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতে অন্য এক রিওয়ায়েতে এ আয়াতের অর্থ এভাবে বর্ণনা করেন- আল্লাহ তায়ালা يتلونه حق تلاوته দ্বারা বোঝাতে চেয়েছেন- তারা হালালকে হালাল, হারামকে হারাম হিসেবে মেনে চলত এবং পরিবর্তনও পরিবর্ধন করত না।

হযরত আবু আলিয়া (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন- হযরত আবদুল্লাহ বিন মসউদ (রা.) বলেন, কসম ঐ সত্তার, যাঁর মুঠোয় আমার প্রাণ। حَقَّ تِلَاوَتِهٖ শব্দের দ্বারা আল্লাহ্ তায়ালা বুঝিয়েছেন যে, তারা হালালকে হালাল, এবং হারামকে হারাম

জানে। কুরআন সঠিকভাবে পাঠ করে যেভাবে আল্লাহ তায়ালা নাযিল করেছেন। কোন পরিবর্তন পরিবর্জন এবং পরিবর্ধন করে না। যা যেভাবে বিবৃত হয়েছে তা অনুরূপ মেনে নেয়। অপ্রাসাঙ্গিক ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ও মনগড়া কিছু করেনা। হযরত কায়স বিন সা'দ (রা.) হতে বর্ণিত- يَتْلُوْنَهٗ حَقَّ تِلَاوَتِهٖ আয়াতের অর্থ হচ্ছে তারা যথাযথ কুরআনের অনুসরণ করে। হযরত আতা (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন- এ আয়াতের অর্থ তারা যেভাবে অনুসরণ করা প্রয়োজন ঠিক তেমনিভাবে অনুসরণ করে। যেভাবে আমল করা প্রয়োজন সেভাবে আমল করে।

কেউ কেউ বলেন يَتْلُوْنَهٗ حَقَّ تِلَاوَتِهٖ অর্থ যেভাবে তিলাওয়াত করা প্রয়োজন, তারা ঠিক সেভাবে তিলাওয়াত করেন।

এ সব বক্তব্যের মধ্যে সঠিক বক্তব্য হল- তারা যথাযথ অনুসরণ করে। এব্যাপারে আহলে তাবীলগণের ইজমা ও সংগঠিত হয়েছে।

اَلَّذِيْنَ اٰتَيْنٰهُمُ الْكِتٰبَ এ আয়াতের অর্থ হবে, হে মুহাম্মদ (স.)! আহলে তওরাত হতে যাঁরা আপনার উপর ঈমান এনেছে এবং যা কিছু তুমি আমার পক্ষ হতে লাভ করেছ তার উপর ঈমান এনেছে, তারা অনুসরন করে আমার রাসূল মূসা (আ.)-এর উপর যেই কিতাব অবতীর্ণ করেছি তদানুযায়ী কিতাবের উপর ঈমান এনেছে, তওরাত কিতাবে তোমার যেইসব সিফাত বর্ণনা করা হয়েছে, তা অধ্যয়ন করে এবং বিশ্বাস করে। হে মুহাম্মদ (সা.)-তুমি আমার রাসূল! তোমার অনুসরণ করা ঈমানের সাথে আমার আনুগত্য তাদের উপর ফরয, তাদের উপর বিশ্বাস করা ফরয যা কিছু তুমি আমার পক্ষ হতে লাভ করেছ। তাদের জন্য যা কিছু হালাল করা হয়েছে সেই অনুযায়ী তারা আমল করে এবং যা হারাম করা হয়েছে, তা থেকে তারা বিরত থাকে। তারা কুরআনের আয়াত যেইভাবে নাযিল হয়েছে সেইভাবে আমল করে কোন পরিবর্তন, পরিবর্জন ও পরিবর্ধন করে না।

أُولٰٓئِكَ يُؤْمِنُوْنَ بِهٖ

এ সব লোকেরা তৌরাত এর উপর ঈমান আনে এবং তাওরাত এর নির্দেশ অনুযায়ী হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর উপর ঈমান আনে।

وَمَنْ يَّكْفُرْ بِهٖ فَأُولٰٓئِكَ هُمُ الْخٰسِرُوْنَ

আর যারা এ কিতাবের সাথে কুফরী করে অর্থাৎ তদনুযায়ী চলে না, তারা ক্ষতিগ্রস্থ বৈ আর কিছুই নয়।

يٰبَنِيْٓ إِسْرَآئِيْلَ اذْكُرُوْا نِعْمَتِيَ الَّتِيْٓ أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَنِّيْ فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعٰلَمِيْنَ ﴿١٠٢﴾ وَاتَّقُوْا يَوْمًا لَّا تَجْزِيْ نَفْسٌ عَنْ نَّفْسٍ شَيْئًا وَّلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ وَّلَا تَنْفَعُهَا شَفَاعَةٌ وَّلَا هُمْ يُنْصَرُوْنَ ﴿١٠٣﴾ وَإِذِ ابْتَلٰٓى إِبْرٰهِيْمَ رَبُّهٗ بِكَلِمٰتٍ فَأَتَمَّهُنَّ ۖ قَالَ إِنِّيْ جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا ۖ قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِيْ ۖ قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي

Scanned with CamScanner

الظّٰلِمِيْنَ ﴿١٢٤﴾ وَاِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِّلنَّاسِ وَاَمْنًا ۗ وَاتَّخِذُوْا
مِنْ مَّقَامِ اِبْرٰهِيْمَ مُصَلًّى ۗ وَعَهِدْنَآ اِلٰٓى اِبْرٰهِيْمَ وَاِسْمٰعِيْلَ اَنْ
طَهِّرَا بَيْتِىَ لِلطَّآئِفِيْنَ وَالْعٰكِفِيْنَ وَالرُّكَّعِ السُّجُوْدِ ﴿١٢٥﴾ وَاِذْ قَالَ
اِبْرٰهِيْمُ رَبِّ اجْعَلْ هٰذَا بَلَدًا اٰمِنًا وَّارْزُقْ اَهْلَهٗ مِنَ الثَّمَرٰتِ مَنْ
اٰمَنَ مِنْهُمْ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ۗ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَاُمَتِّعُهٗ قَلِيْلًا ثُمَّ
اَضْطَرُّهٗٓ اِلٰى عَذَابِ النَّارِ ۗ وَبِئْسَ الْمَصِيْرُ ﴿١٢٦﴾

১২২. হে ইসরাঈল-সন্তানগণ! আমার সেই অনুগ্রহকে স্মরণ কর যদ্বারা আমি তোমাদেরকে অনুগৃহীত করেছি এবং বিশ্বে সকলের উপরে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছি।

১২৩. এবং তোমরা সে দিনকে ভয় কর যেদিন কেউ কারও কোন উপকারে আসবে না, কারও নিকট হতে কোন বিনিময় গৃহীত হবে না এবং কোন সুপারিশ গৃহীত হবে না এবং কোন সুপারিশ কারও পক্ষে লাভজনক হবে না এবং তারা সাহায্য প্রাপ্তও হবে না।

১২৪. এবং স্মরণ কর, যখন ইবরাহীমকে তাঁর প্রতিপালক কয়েকটি কথা দ্বারা পরীক্ষা করেছিলেন এবং সেগুলি তিনি পূর্ণ করেছিলেন, আল্লাহ বলেন, আমি তোমাকে মানবজাতির নেতা করেছি। তিনি বললেন, আমার বংশধরগণের মধ্যে হতেও? আল্লাহ বললেন, আমার প্রতিশ্রুতি যালিমের প্রতি প্রযোজ্য নয়।

১২৫. এবং সে সময়কে স্মরণ কর, যখন কা'বাগৃহকে মানবাজাতির মিলনকেন্দ্র ও নিরাপত্তাস্থল করেছিলাম এবং বলেছিলাম তোমরা মাকামে ইবরাহীমকে নামাযের স্থানরূপে গ্রহণ কর। এবং ইবরাহীম ও ইসমাঈলকে তাওয়াফকারী, ইতিকাফকারীও রুকু সিজদাকারীদের জন্য আমার গৃহকে পবিত্র রাখতে আদেশ দিয়েছি।

১২৬. স্মরণ কর, যখন ইবরাহীম বলেছিলেন, হে আমার প্রতিপালক! এটাকে নিরাপদ শহর কর, আর তার অধিবাসীদের মধ্যে যারা আল্লাহ ও আখিরাতে ঈমান আনে তাদেরকে ফলমূল হতে জীবিকা প্রদান কর। তিনি বলেন, যে কউ কুফুরী করবে তাকেও কিছু কালের জন্য জীবনোপভোগ করতে দেব। অতঃপর তাকে জাহান্নামের শাস্তি ভোগ করতে বাধ্য করব এবং কত নিকৃষ্ট তাদের প্রত্যাবর্তনস্থল!

يٰبَنِيْٓ اِسْرَآئِيْلَ اذْكُرُوْا نِعْمَتِيَ الَّتِيْٓ اَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَاَنِّيْ
فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعٰلَمِيْنَ

হে ইয়াকুব (আ.)-এর সন্তানগণ! তোমরা ঐসব নিয়ামত এর কথা স্মরণ কর যা আমি তোমাদেরকে দান করেছি। যেমন ফেরাউন হতে নাজাত দেয়া হয়েছিল। মান্ন ও সালওয়া নাযিল করা হত। তোমরা অসম্মানিত হওয়া সত্বেও তোমাদেরকে দুনিয়াবাসীর উপর মর্যাদা দান করা হয়েছিল। অর্থাৎ তাদেরকে সমসাময়িক লোকদের উপর অধিক জ্ঞান দান করা হয়েছিল।

وَاتَّقُوْا يَوْمًا لَّا تَجْزِيْ نَفْسٌ عَنْ نَّفْسٍ شَيْئًا وَّلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ وَّلَا
تَنْفَعُهَا شَفَاعَةٌ وَّلَا هُمْ يُنْصَرُوْنَ-

তোমরা ঐ দিনকে ভয় কর, যেদিন কেউ কারো পক্ষে কোন কাজে আসবেন। কারো পক্ষ হতে কোন ক্ষতিপূরণ কবুল করা হবে না, কেউ সুপারিশ করলে তা গ্রহণ করা হবেনা। তাদেরকে কোন সাহায্য করা হবেনা। কোন বিনিময় গ্রহণ করা হবেনা। কারো সুপারিশ কোন উপকারে আসবেনা। কারণ সুপারিশ এবং সাহায্য মুমীনদের জন্যেই নির্ধারিত।

وَاِذِ ابْتَلٰٓى اِبْرٰهِيْمَ رَبُّهٗ بِكَلِمَاتٍ

ঐ সময়কে স্মরণ কর, যখন আল্লাহ্ তায়ালা হযরত ইবরাহীম (আ.)-কে কয়েকটি বিষয়ে পরীক্ষা করেছিলেন।

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন- ইবরাহীম (আ.) ছাড়া আর এমন কেউ নেই, যাকে ধর্মীয় বিষয়ে এতো পরীক্ষা গ্রহণ করা হয়েছে। আর তিনি সকল পরীক্ষায়ই উত্তীর্ণ হয়েছেন। আল্লাহ তায়ালা এ জন্য তাকে অব্যাহতি দেন। আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন- আর ইবরাহীম যিনি তাঁর প্রতিপালকের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছেন। সূরা বরাতে আল্লাহ তায়ালা তার দশটি বৈশিষ্ট্যের কথা উল্লেখ করেছেন- اَلتَّآئِبُوْنَ وَالْعَابِدُوْنَ আয়াতে। আরও দশটির কথা উল্লেখ করা হয়-সূরা আহযাবে المسلمون والمسلمات আয়াতে। আরও দশটির কথা উল্লেখ করা হয় সূরা আল-মুমিনীনের- وَالَّذِيْنَ هُمْ عَلٰى صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُوْنَ আয়াতে। আরও দশটির কথা উল্লেখ করা হয়-সাল সাইল সূরার- وَالَّذِيْنَ هُمْ عَلٰى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُوْنَ আয়াতে।

অন্য একদল বলেন, হযরত ইব্রাহীম (আ.)-কে ইসলামের দশটি বৈশিষ্ট্য নিয়ে পরীক্ষা করা হয়।

হযরত ইবনে তাউস তাঁর পিতা হতে, তিনি হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণনা করেন- আল্লাহ্ তায়ালা হযরত ইবরাহীম (আ.)-কে তাহারত বিষয়ে পরীক্ষা করেন। তন্মধ্যে পাঁচটি হচ্ছে মাথায় এবং পাঁচটি হচ্ছে শরীরে। মাথার পাঁচটি হচ্ছে গোঁফ ছোট করা, গড়গড়া করা, নাকে পানি দেওয়া, মিসওয়াক করা, মাথার চুল কাটা। শরীরের মধ্যে পাঁচটি হল- নখ কাটা, নাভীর নীচের চুল কাটা, খতনা করা, বগলের চুল পরিষ্কার করা, পেশাব করার পর পানি দিয়ে পরিষ্কার করা। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতে অন্য এক সনদে বর্ণিত, তিনি وَاِذِ ابْتَلٰٓى اِبْرٰهِيْمَ । এর তাবীল করতঃ বলেন, ছয়টি শরীরে এবং চারটি হজ্জের মধ্যে- শরীরের ছয়টি হচ্ছে- নাভীর নীচের চুল কাটা, খৎনা করা, বগলের চুল উঠিয়ে ফেলা, নখ কাটা, গোঁফ ছোট করা

Scanned with CamScanner

এবং জুমাবারে গোসল করা। হজ্জের মধ্যে চারটি হল তওয়াফ করা, সাফা ও মারওয়ার মধ্যখানে দৌড়ান, পাথর মারা এবং ইফাদা করা।

অন্য একদল বলেন إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا হতে وَإِذِ ابْتَلَى পর্যন্ত হজ্বের আহকাম নিয়ে বর্ণনা করা হয়েছে। হযরত উম্মে হানীর গোলাম হযরত আবু সালেহ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন- আল্লাহ্ তায়ালার উক্তি إِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ আয়াতে যে সকল বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে, তন্মধ্যে একটি হল إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا অন্য একটি হল হজ্ব সংক্রান্ত আয়াত وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ ।

হযরত মুজাহিদ (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন আল্লাহ তায়ালার বাণী إِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ এর অর্থ আল্লাহ্ তায়ালা হযরত ইবরাহীম (আ.)-কে মানবকুলের ইমাম বা নেতা বানানোর উদ্দেশ্যে কতেক বিষয়ে পরীক্ষা নেন। ইবরাহীম (আ.) পরীক্ষায় কৃতকার্য হন। তখন আল্লাহ তায়ালা তাঁকে বলেন, আমি তোমাকে একটি বিষয় পরীক্ষা করেছি এখন তোমাকে তাঁর ইহকালীন প্রতিদান দিতে চাই। তুমি কি চাও? হযরত ইবরাহীম (আ.) উত্তরে বলেন- আমাকে মানুষের ইমাম করে দিন, আল্লাহ বলেন, তাই হবে ইবরাহীম (আ.) বলেন- আমার বংশধর হতেও যেন এ ধারা জারী থাকে ইয়া আল্লাহ! -আল্লাহ তায়ালা উত্তরে বলেন- আমার এ প্রতিশ্রুতি অত্যাচারী ও সীমালঙ্ঘনকারীদের বেলায় কার্যকর হবে না। হযরত ইব্রাহীম (আ.) বলেন, আপনি কাবাগৃহকে মানুষের জন্য ইবাদতের জায়গা বানাবেন। আল্লাহ্ বলেন হ্যাঁ। মানুষের নিরাপত্তার স্থান বানাবেন। আল্লাহ তায়ালা বলেন হ্যাঁ। ইবরাহীম (আ.) বললেন ইয়া আল্লাহ! আপনি আমাদেরকে আপনার অনুগত করুন। আমার বংশধর হতে একটি দলকে আপনার অনুগত করুন। তিনি বলেন হ্যাঁ। ইবরাহীম (আ.) বলেন, আমাদের প্রতি কৃপার দৃষ্টি দিন। আল্লাহ তায়ালা বলেন হ্যাঁ। হযরত ইব্রাহীম আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করে বলেন- আল্লাহ! আপনি এ শহরকে নিরাপদ রাখুন। আল্লাহ্ বলেন হ্যাঁ। তিনি আবার বলেন, ইয়া আল্লাহ! আপনি এ শহরের বাসিন্দাকে ফল-মূল রিযিক হিসেবে দান করুন। আল্লাহ তায়ালা বলেন- কবুল করা হল।

হযরত রবী (রা.) বর্ণনা করেন, আল্লাহ তায়ালার বাণী- 'কালিমা' দ্বারা বুঝানো হয়েছে-

(١) إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا۔ (٢) وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا۔ (٣) وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى (٤) وَعَهِدْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ الاية (٥) وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ ۔ الاية۔

বর্ণনাকারী বলেন, আল্লাহর কালিমা সমূহের মধ্য হতে কয়েকটি কালিমা হচ্ছে উহা, যা দ্বারা আল্লাহ তায়ালা ইবরাহীম (আ.)-কে পরীক্ষা করেছিলেন।

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, إِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ দ্বারা হজ্বের আহকাম বোঝানো হয়েছে।

অন্য একদল বলেন, হযরত ইব্রাহীম (আ.)-কে কতেক বিষয়ের মাধ্যমে পরীক্ষা করা হয়। যার মধ্যে খৎনাও রয়েছে।

হযরত শাবী (রা.) হতে বর্ণিত, إِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ এর ভিতর খৎনাও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। অপর একদল তাবীলকারী বলেন, ছয়টি জিনিষের মাধ্যমে হযরত ইবরাহীম (সা.)-কে পরীক্ষা করা হয়। এগুলো হচ্ছে- তারা, চাঁদ, সূর্য, আগুন,

হিজরত, এবং খৎনা- তিনি এসব পরীক্ষায় ধৈর্য্য ধারণ করলেন। হযরত আবু রাজা হতে বর্ণিত, তিনি বলেন- আমি হযরত হাসান (রা.)-কে وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ আয়াত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বলেন, হযরত ইব্রাহীম (আ.)-কে পরীক্ষা করা হয় তারা, চাঁদ, সূর্য, আগুন, হিজরত এবং খৎনার মাধ্যমে।

হযরত কতাদাহ (রা.) হাসান (রা.) থেকে অনুরূপ রিওয়ায়েত করেন এবং এর সাথে এ ইবারত অতিরিক্ত আছে- عرف ان ربه دائم لا يزول فوجه وجهه للذي فطر السموات والارض حنيفا وما كان من المشركين الي ان قال فابتلاه الله بذبح ابنه وبالختان فصبر علي ذالك ۔

হযরত সুদ্দী (রা.) হতে বর্ণিত আল্লাহ্ তায়ালা যে সব কলিমা দ্বারা হযরত ইবরাহীমকে পরীক্ষা করেন তা হল-

رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ۔ رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ۔ رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ

হযরত আবু জাফর (রা.) বলেন كلمات শব্দের অর্থ উল্লেখিত জিনিষের উপর ভরসা করা বা তন্মধ্যে কিছু জিনিষের উপর ভরসা করা। এর মধ্যে সঠিক বক্তব্য হল- আল্লাহ্ তায়ালার বাণী, إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا وَعَهِدْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَنْ طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ ۔ এবং এর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ সকল আয়াত كلمات এর অন্তর্ভুক্ত, যে কলিমার কথা আল্লাহ তায়ালা ابتلي بهن ابراهيم فاتمهن আয়াতে বলেছেন আল্লাহ তায়ালার ঐসব নির্দেশাবলী, যা আল্লাহ তায়ালা নির্দেশ করেছেন।

قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا

অবশ্যই আমি তোমাকে লোকদের ইমাম বানাব।

قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي

ইবরাহীম (আ.) আল্লাহ্ তায়ালার দরবারে আবেদন করতঃ বলেন- আল্লাহ আমাকে যেই মর্যাদা ও পদ আমানতরূপে দান করেছেন, সে রকম আমার সন্তানদের মধ্য হতেও করুন।

قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ

আল্লাহ তায়ালা বলেন, আমার এ প্রতিশ্রুতি সীমালঙ্ঘনকারীদের জন্য নয়। অর্থাৎ যারা অত্যাচারী এবং শিরক করে, তারা নবুয়তের যোগ্য হতে পারে না। হযরত সুদ্দী (রা.) অনুরূপ মন্তব্য করেন। হযরত মুজাহিদ (রা.) বলেন- যালিম ইমাম হতে পারেনা, যার পিছনে একতেদা করা যায়। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহ্ তায়ালার বাণী- لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ ۔ এর অর্থ যালিমের সাথে কোন প্রতিশ্রুতি নেই, যদি কোন প্রতিশ্রুতি দিয়ে থাক তা হলে তা ভঙ্গ করে দাও।

হযরত মুজাহিদ হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণনা করেন, আল্লাহ্ তায়ালা যা ওয়াদা করেন তা পূরণ করেন, তবে যালিমদের বেলায় পূরণ করেন না। অপর একদল বলেন- এখানে عهد শব্দের অর্থ আমানত। আমার শত্রু আমার আমানতের যোগ্য নয় এবং আমার বান্দাহদের মধ্যে যারা অন্যায়কারী, তারাও আমার আমানতের যোগ্য নয়।

হযরত রবী (রা.) বলেন- عهد শব্দের অর্থ দ্বীন। যালিমের মধ্যে দ্বীনদারী থাকবে না। হযরত দ্বিহাক হতে বর্ণিত, তিনি বলেন- عهد শব্দের অর্থ নবুয়ত এবং ইমামত সৎকর্মশীল মানুষের জন্য। অর্থাৎ পৃথিবীতে তাদের অনুসরণ করা হবে।

Scanned with CamScanner

وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا

অর্থাৎ আর যখন আমি বায়তুল্লাহ শরীফকে মানুষের সম্মেলনস্থল ও নিরাপত্তাস্থল হিসেবে নির্ধারিত করলাম। অর্থাৎ আল্লাহর গৃহের প্রতি প্রত্যেক বৎসর মানুষ আগমন করবে এবং সেই গৃহে প্রত্যেক ব্যক্তি নিরাপদ থাকবে।

হযরত মুজাহিদ (রা.) বলেন- إِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ এর অর্থ এ গৃহে প্রবেশ করলে সওয়াব পাওয়া যায় এবং এ ঘর হতে কাউকেও বের করে দেয়া হয় না। হযরত সুদ্দী (রা.) হতে বর্ণিত, প্রত্যেক বৎসর লোকজন এ ঘরে সওয়াব হাসিলের উদ্দেশ্যে প্রবেশ করে এবং একবার দাখিল হলে তাঁকে সে ঘর ছেড়ে চলে যেতে বলা হয় না।

হযরত সাঈদ বিন জুবাইর (রা.) বর্ণনা করেন- আল্লাহ্ তায়ালার বাণী- مثابة للناس এর অর্থ তারা হজ্ব করবে এবং এ ঘরের প্রতি মানুষের প্রয়োজন কখনো ফুরিয়ে যাবে না।

امنا শব্দের অর্থ হচ্ছে নিরাপদ, এমন কি কোন লোক যদি তার ভাই এর হত্যাকারীর সাথে ও মিলিত হয় তবুও তাকে হত্যা করতে পারবেনা যতক্ষণ কাবা গৃহ হতে বের হবে না। যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন-أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا آمِنًا

"তারা কি দেখে না আমি হারাম শরীফকে নিরাপদ স্থান করেছি। (সূরা ঃ আনকাবুত-৬৭)" হযরত ইবনে যায়েদ, সুদ্দী, মুজাহিদ, রবী এবং ইবনে আব্বাস (রা.) ও এভাবে বলেন-

وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى

তোমরা মাকামে ইবরাহীমকে নামাযের জায়গা বানিয়ে নাও। হযরত আনাস বিন মালিক (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন- হযরত উমর বিন খাত্তাব (রা.) বলেন- আমি বললাম হে আল্লাহর রাসূল! মাকামে ইবরাহীমকে যদি নামাযের জায়গা নির্ধারণ করা যেত। তখন আল্লাহ তায়ালা উক্ত আয়াত নাযিল করেন। অন্য এক বর্ণনা আছে, হযরত ইবনে আবু- জাফর (রা.) তাঁর পিতা হতে রিওয়ায়ত করেন। তিনি বলেন, আল্লাহ তায়ালার বাণী- وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى আয়াতখানি ঐ সমস্ত কলিমার অন্তর্ভুক্ত, যা দিয়ে আল্লাহ তায়ালা ইবরাহীম (আ.)-কে পরীক্ষা করেছিলেন। আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে নির্দেশ দিলেন মাকামে ইবরাহীমকে নামাযের স্থান হিসেবে গ্রহণ করতে। তখন থেকে তারা মাকামের পিছনে নামায আদায় করতেন। অতঃপর আহলে তাবীলগণ উপরোক্ত আয়াতে মাকামে ইবরাহীম দ্বারা কি বুঝানো হয়েছে, তা নিয়ে বিভিন্ন মত পোষণ করে থাকেন। তাফসীরকারকদের, কেউ কেউ বলেন- পুরো হজ্বই হচ্ছে مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ ।

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) মাকামে ইবরাহীম সম্পর্কে বলেন- পুরো হজ্বই হচ্ছে মাকামে ইবরাহীম। হযরত মুজাহিদ (রা.)-এর বক্তব্যও একই রকম। অন্য একদল বলেন- মাকামে ইবরাহীম দ্বারা বোঝানো হয়েছে, আরাফাত, মুযদালিফা এবং পাথর নিক্ষেপ। হযরত আতা বিন আবু রাবাহ হতে বর্ণিত- অন্য এক রিওয়ায়াতে হযরত মুজাহিদ (রা.) হতে বর্ণিত, কেউ কেউ হারাম শরীফকেই মাকামে ইবরাহীম বলেন- যেমন হযরত মুজাহিদ (রা.) আল্লাহ তায়ালার বাণী وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى সম্পর্কে বলেন, হরম শরীফের পুরোটাই মাকামে ইবরাহীম। কেউ কেউ বলেন, মাকামে ইবরাহীম হচ্ছে একটি পাথর, যার উপর দাঁড়িয়ে হযরত ইবরাহীম (আ.)

কাবাগৃহ নির্মাণ করেন। দালানের কাজ যত উঁচুতে করতেন, পাথরখানা সমপরিমান উঁচু হয়ে যেত।

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত, হযরত ইবরাহীম (আ.) গৃহ তৈরী করতেন এবং হযরত ইসমাইল (আ.) পাথর যোগান দিতেন। তাঁরা দু'জনেই বলতেন- رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ যখন দালান উঁচু হল তখন (হযরত ইবরাহীম (আ.) শেখ একটি পাথর আনলেন যেন এর উপর দাঁড়িয়ে নির্মাণ কাজ করতে পারেন। এ পাথরই হল- 'মাকামে ইবরাহীম।'

হযরত কাতাদাহ (রা.) হতে বর্ণিত- অনেকই আমার কাছে একথা বলেছেন যে, ঐ পাথরে তারা হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর পায়ের তালু এবং আঙ্গুলের চিহ্ন দেখেছেন। হযরত সুদ্দী (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন- মাকামে ইবরাহীম হচ্ছে ঐ পাথর, যা হযরত ইসমাঈল (আ.)-এর স্ত্রী হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর কদমের নিচে রেখেছিলেন, যখন তিনি হযরত ইবরাহীম (আ.) এর মাথা ধুয়ে দিয়েছিলেন। তিনি আরোহী অবস্থায় এর উপর এক পা রেখেছিলেন, ইসমাঈল (আ.) এর স্ত্রী তাঁর মাথার একাংশ ধৌত করে দিলেন। অতপর তার পায়ের নিচের পাথরখানা উঠিয়ে নিয়ে অন্য পায়ের নিচে দিলেন। পাথরের উপর হযরত ইবরাহীম (আ.) এর পা অদৃশ্য হয়ে গিয়েছিল। অর্থাৎ পাথরের মধ্যে তাঁর পা গেঁথে গিয়েছিল। আল্লাহ তায়ালা এটাকে তার নিদর্শন স্বরূপ রেখে দিলেন। তিনি বলেন اتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى এ ব্যাপারে আমাদের নিকট সঠিক বক্তব্য হল মাকামে ইবরাহীম মসজিদে হারামের একটি প্রসিদ্ধ স্থান।

হযরত উমর বিন খত্তাব (রা.) হতে বর্ণিত, এবং তিনি হযরত জাবির (রা.) হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন- রাসূলুল্লাহ (স.) হজরে আসওয়াদে চুমু খেলেন। এরপর তওয়াফের তিন চক্করে রমল করলেন। চার বার দৌড়ে প্রদিক্ষণ করলেন। তারপর তিনি মাকামে ইবরাহীমে গেলেন, সেখানে দু রাকাত নামায আদায় করলেন। এ হাদীসেই সম্পষ্টতঃ বর্ণনা করা হয় মাকামে ইবরাহীম বায়তুল্লাহ শরীফের পাশেই অবস্থিত। এখন কথা হল- যে সকল বুজুর্গান মাকাম ইবরাহীম বলে আরাফাত, মুজদালিফা, মিনা বা হরম অর্থ নিয়েছেন তাঁরা এ ক্ষেত্রে مصلى দ্বারা দু'আ বোঝাতে সচেষ্ট হন। পক্ষান্তরে যাঁরা মাকাম বলে নির্ধারিত মাকামই বোঝাতে চেয়েছেন তারা নামাযের জায়গা বুঝিয়েছেন। শেষ পর্যন্ত এ অর্থই সঠিক ও যথার্থ।

وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَنْ طَهِّرَا بَيْتِيَ

আর আমি ইবরাহীম এবং ইসমাঈল (আ.)-এর কাছ থেকে প্রতিশ্রুতি নিলাম যেন আমার ঘরটিকে পবিত্র রাখেন। এ আয়াতের দুটি তাবীল রয়েছে। একটি হল বয়তুল্লাহ শরীফকে শিরক এবং সন্দেহ হতে পবিত্র করে তৈরী করা। দ্বিতীয়টি হল এ ঘর নির্মাণের পূর্বে এবং পরে যেন শিরিক হতে পবিত্র রাখেন, যেমন হযরত নূহ (আ.) এর সময় ছিল এবং নূহ (আ.) এর পূর্বে এখানে মূর্তি রাখা হত। যাতে পরবর্তীতে এ প্রথা চালু না হয়। কারণ আল্লাহ তায়ালা ইবরাহীম (আ.)-কে তার পরবর্তীদের জন্য অনুসৃত ইমাম নির্ধারণ করেছেন। প্রত্যেকেই প্রত্যেকের রায়ের অনুকূলে দলিল প্রদান করেন। তবে হযরত কাতাদাহ (রা.)-এর কথাই প্রণিধানযোগ্য। যেহেতু তিনি বলেছেন-এ আয়াতের অর্থ হচ্ছে শিরক, মূর্তিপূজা এবং

Scanned with CamScanner

মিথ্যা বলা থেকে এ ঘরকে পবিত্র রাখবে।

لِلطَّائِفِيْنَ وَالْعَاكِفِيْنَ وَالرُّكَّعِ السُّجُوْدِ

অর্থাৎ এ ঘরকে তোয়াফকারী অর্থাৎ হজ্জ আদায়কারী, ইতেকাফকারীদের জন্য রুকু এবং সিজদাকারীদের জন্য, অর্থাৎ নামায আদায়কারীর জন্য পবিত্র রাখবে এসব অর্থের অনুকূলে রেওয়ায়ত বিদ্যমান। اعتكاف শব্দের অর্থ হচ্ছে আল্লাহ্ তায়ালার সন্তুষ্টির জন্যে সবকিছু থেকে নিজেকে দূরে রাখা বা বন্দি করে রাখা।

وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيْمُ رَبِّ اجْعَلْ هٰذَا بَلَدًا اٰمِنًا۔

অর্থাৎ যখন হযরত ইব্রাহীম (আ.) নিজের রবকে সম্বোধন করে বলেন- হে রব! এ শহরকে নিরাপদ বানিয়ে দিন জাবাবিরাহ হতে এবং আকৃতি-বিকৃতিও আল্লাহর অসন্তুষ্টি হতে, যা অন্যান্য শহরের মানুষের উপর হয়ে থাকে। হযরত কাতাদাহ (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমাদেরকে বলা হয়েছে- হরমের সংযোগ আল্লাহ তায়ালার আরশের সাথে। হযরত আদম (আ.) যে জায়গায় অবতরণ করেছিলেন, তথায় ঘর করা হয়েছে। আর হযরত আদম (আ.)-যখন যমীনে অবতরণ করেছিলেন, তখন তাঁর সাথে বয়তুল্লাহ শরীফও নেমে এসেছিল। যেমন আল্লাহ বলেন তুমি অবতরণ কর, সাথে আমার ঘর নিয়ে। ইহাকে প্রদক্ষিণ করা হবে, যেমন আমার আরশকে প্রদক্ষিণ করা হয়। তখন হযরত আদম (আ.) ইহার চতুর্দিকে প্রদক্ষিণ করেন এবং হযরত আদম (আ.)-এর পর হতে যত মুমীন এসেছেন সকলেই তা প্রদক্ষিণ করেন। হযরত নূহ (আ.)-এর কাওম তুফানের পানিতে ডুবে মরার সময় আল্লাহ তা উঠিয়ে নিলেন। অতপর হযরত ইবরাহীম (আ.) এ পথ অনুসরণ করলেন এবং আগের নকশা অনুযায়ী সে ঘর পুনরায় নির্মাণ করলেন। কাবাগৃহ নির্মাণের ব্যাপারে ব্যাপক আলোচনা রয়েছে- منتخب السير المسمي بنور البصر নামক কিতাবে।

এর মধ্যে একটা প্রশ্ন উদিত হয়- তা হচ্ছে- হরম শরীফকে কী হযরত ইবরাহীম (আ.) নিরাপত্তার জন্য আবেদন করার পরেই নিরাপদ করা হয়েছে, না কী আসমান-জমিন সৃষ্টির পর হতেই নিরাপদ হয়ে চলে আসছে। একদল শেষোক্ত উক্তির সাথে একমত। যার প্রসংগে নিম্নোক্ত হাদীস দলিল হিসেবে উত্থাপন করা যায়।

হযরত আবু জাফর (রা.) বলেন- আবু কুরাইব (রা.) আমাদেরকে বলেন, তিনি বলেন, হযরত ইউনুস বিন বুকাইর আমাদেরকে বলেন। তিনি হযরত মুহাম্মদ বিন ইসহাক হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, আমাকে সাঈদ বিন আবু সাঈদ আল-মাকবরী (রা.) বলেন, তিনি বলেন, আমি আবু শুরাই খুজায়ী (রা.) হতে শ্রবণ করেছি। তিনি বলেন- যখন মক্কা বিজয় হল, তখন খুজা'আ সম্প্রদায়ের এক ব্যক্তি হুজাইল সম্প্রদায়ের একজন পুরুষ ব্যক্তিকে হত্যা করল। একথা শুনে রাসূলুল্লাহ্ (সা.) খুতবা দিলেন এবং সম্বোধন করে বলেন, হে লোকজন! আল্লাহ্ তায়ালা যে দিন হতে আসমান এবং জমিন সৃষ্টি করেছেন সে দিন হতেই মক্কাকে হরম সাব্যস্ত করেছেন। আল্লাহ তায়ালার সম্মানার্থে কিয়ামত পর্যন্ত কোন ব্যক্তির জন্যে এ এলাকায় রক্ত প্রবাহিত করা, গাছ কাটা, এ ধরনের কোন কাজ করা জায়িয নেই। এমনকি আমার জন্যে ও হালাল নয়, তবে এর অধিবাসীদের দুরাচারের কারণে কিছু সময়ের জন্য তা আমার জন্য হালাল করে দেয়া হয়েছিল। গতকাল থেকে তা আবার

পূর্বাবস্থায় গিয়েছে। এ কথা যেই শুনেছে সে যেন অন্যজনকে বলে। কেউ যদি বলে রাসূল্লাহ (স.) সেখানে হত্যা করেছিলেন, তখন তার জবাবে বলা যাবে, ইহা রাসূলুল্লাহর জন্য হালাল, তোমার জন্য হালাল নয়।

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন- রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছিলেন যেদিন হতেই আল্লাহ তায়ালা আসমান-যমীন সৃষ্টি করেছেন এবং যেদিন হতে চাঁদ-সূর্য সৃষ্টি করেছেন সেদিন হতেই মক্কাকে হরম সাব্যস্ত করেছেন।

অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সা.) বললেন, আমরা পূর্বে এবং পরে কারো জন্য-হালাল ছিল না আমার জন্য সামান্য সময় তা হালাল করে দেয়া হয়েছিল। তারা বলেন, মক্কা শরীফ সৃষ্টির শুরু থেকে পবিত্র। আল্লাহর শাস্তি থেকে পবিত্র। যালিমদের দৌরাত্ম থেকে মুক্ত। দিনের একাংশের জন্য তা আমার পক্ষে হালাল করে দেয়া হয়েছিল। কেউ কেউ বলেন- হযরত ইবরাহীম (আ.) আল্লাহ তায়ালার দরবারে মক্কা শরীফকে আল্লাহর শাস্তি ও জাব্বারীনদের দৌরাত্ম হতে মুক্তির জন্য দুআ করেননি। বরং হযরত ইবরাহীম (আ.) আল্লাহ তায়ালার দরবারে আবেদন করেছিলেন- হে আল্লাহ! মক্কার অধিবাসীকে আসমানী এবং জমিনী মুসিবত হতে রক্ষা করুন এবং এ এলাকার বাসিন্দাকে ফল-ফসল দিয়ে রিযক দান করুন। যেহেতু ইবরাহীম (আ.) তাঁর বংশধরদেরকে সেখানে রেখে গিয়েছিলেন, তাই তারা যেন ক্ষুধায় এবং তৃষ্ণায় কষ্ট না পায়, সেই জন্যে আল্লাহ তায়ালার দরবারে এই দুআ করেছিলেন। অন্য লোকেরা বলেন, একথা বলার বিন্দুমাত্র অবকাশ নেই যে, হযরত ইবরাহীম (আ.) হিরমকে হারাম বানিয়েছেন। বরং হযরত ইব্রাহীম তাঁর আহল এবং সন্তানকে ঐ জায়গায় ছেড়ে যাওয়ার সময় বলেছিলেন- رَبَّنَا إِنِّيْ أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِيْ بِوَادٍ غَيْرِ ذِيْ زَرْعٍ عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ

"হে আমাদের প্রতিপালক! আমি আমাদের বংশধরদের প্রত্যেককে বসবাস করালাম অনুর্বর উপত্যকায় তোমার পবিত্র ঘরের নিকট।" (সূরা ঃ ইবরাহীম-৩৭)

এ ভাষার আঙ্গিক থেকে স্পষ্টতঃ প্রতীয়মান হয় যে, এ জায়গা হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর আগে থেকেই হারাম ছিল। তা না হলে ইবরাহীম (আ.) নগরীতে প্রবেশ করেই بيت المحرم শব্দ বলতেন না।

অন্য একদল বলেন, হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর দুআর আগে অন্য শহরের মতো হারাম শরীফ ও হালাল ছিল। যখন হযরত ইবরাহীম (আ.) দু'আ করলেন তখন হরমকে হারাম করা হল- যেমন মদীনা মনোয়ারা হালাল ছিল কিন্তু রাসূলুল্লাহ (স.)-এর তাহরীমের কারণে হারাম হয়েছিল।

হযরত জাবির বিন আবদুল্লাহ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন- রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন- অবশ্যই হযরত ইবরাহীম বায়তুল্লাহকে হারাম করেছিলেন আর মদীনা মনোয়ারাকে আমি হারাম করেছিলাম। তা হল এসব জায়গায় শিকার করা এবং এর গাছ কর্তন করা থেকে বিরত থাকা। এটি হচ্ছে দ্বিতীয় দলের দলিল। দ্বিতীয় হাদীস হচ্ছে- হযরত আবু হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন- রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন, হযরত ইবরাহীম (আ.) আল্লাহ্ তায়ালার বান্দাহ এবং দোস্ত ছিলেন আর আমি আল্লাহ তায়ালার বান্দাহ এবং আল্লাহর রাসূল। আর ইবরাহীম মক্কার পরিসীমার ভিতর কোন কিছু শিকার করা, কর্তন করাকে হারাম করেছিলেন, কোন হাতিয়ার বহন করা, প্রাণী হত্যা করা এবং গাছ কাঁটাকে হারাম করেছিলেন আর আমি মদিনার পরিসীমায়

Scanned with CamScanner

এগুলো হারাম করেছিলাম। এধরনের আরো অনেক হাদিস আছে।

হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর কথা رَبِّ اجْعَلْ هٰذَا بَلَدًا اٰمِنًا কতেক জিনিষ সম্পর্কে নিরাপত্তার আবেদন করেছিলেন। এ ভাবার্থ নেয়া হলে সেই ক্ষেত্রে এমন কোন দলীল নেই, যা গ্রহণ করা অবশ্যই কর্তব্য।

উপরোক্ত হাদীসদ্বয়ের মধ্যে এ ভাবে সমন্বয় ঘটানো যায়- আল্লাহ্ তায়ালা এ সৃষ্টির আদি থেকেই মক্কাকে হারাম করেছিলেন, যদিও কোন নবী বা রাসূলের মুখ দিয়ে প্রকাশ করেননি। মক্কার বাসিন্দাকে শত্রুর হামলা হতে রক্ষা করতেন এবং শাস্তি হতে রক্ষা করতেন। এভাবে হযরত ইবরাহীম (আ.) বিবি হাজেরা এবং ছেলে ঈসমাইল (আ.)-কে সেখানে রাখা পর্যন্ত চলছিল। যখন হযরত ইবরাহীম (আ.) আল্লাহ তায়ালার কাছে প্রার্থনা করেছিলেন, তখন যেন আল্লাহ তাঁর মুখ দিয়ে এর প্রকাশ ঘটিয়েছিলেন এবং আল্লাহ্ তায়ালা তাঁর এ আবেদন কবুল করেছিলেন এবং তাহরীমে মক্কা বন্দাহদের উপর ফরয করে দিয়েছিলেন, যা এক সুন্নাতে পরিণত হল। আল্লাহ তায়ালা হযরত ইবরাহীম (আ.)-কে দোস্ত বানালেন এবং ইমাম বানালেন যার জন্য মানুষকে তাঁর অনুসরণ করতে হয়েছিল এবং বান্দাহদের জন্য তাহরীমে মক্কা ফরয করা হয়েছিল।

মক্কা প্রথম থেকেই মুহররম ছিল। পরবর্তীতে হযরত ইবরাহীম (আ.) -এর মুখ দিয়ে তাহরীম ফরয করা হয়। যার জন্যে এ হারামের সম্বন্ধটা হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর প্রতি করা হয়। তা ছাড়া তাহরীমে মক্কা প্রথম থেকেই ছিল কিন্তু হযরত ইব্রাহীম (আ.)-এর দুআর দ্বারা তাহরীমে মক্কাকে ইবাদত এর অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এভাবে হাদীসদ্বয়ের মধ্য সমন্বয় সাধন করা যায়।

وَارْزُقْ اَهْلَهٗ مِنَ الثَّمَرٰتِ مَنْ اٰمَنَ مِنْهُمْ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ

হে আল্লাহ! মক্কার বাসিন্দাকে রিযক দিন ফল-মূল দিয়ে এবং যে আল্লাহ এবং শেষ বিচারের দিনের উপর ঈমান এনেছে তাকে রক্ষা করুন। কারণ হযরত ইবরাহীম (আ.) অবগত ছিলেন যে, তাঁর সন্তানদের মধ্যে অত্যাচারী সৃষ্টি হবে-যে ইমাম হবার যোগ্য হবেনা। এখন আল্লাহ্ তায়ালা বলেন- انى قد اجبت دعائك وسارزق مع موسى اهل هذا البلد كافرهم فامتعه قليلا

অর্থাৎ আমি তোমার দু'আ কবুল করলাম এবং শীঘ্রই আমি হযরত মূসা (আ.) এর সাথে এশহরের বাসিন্দাকে রিযক দান করব, তবে কাফিররাও সাময়িকভাবে এ নিয়ামত ভোগ করবে।

হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর এ দু'আ কবুল করেই আল্লাহ্ তায়ালা তায়েফকে ফিলিস্তিন হতে তুলে এনে এখানে রেখেছিলেন। হযরত আবু জাফর (রা.) বলেন- আমাকে المثنى বলেন, তিনি বলেন- আমাকে হযরত ইসহাক বিন আল হাজ্জাজ বলেন- তিনি বলেন আমাকে হিশাম বলেন, তিনি বলেন, আমি মুহাম্মদ বিন মুসলিম এর নিকট পাঠ করেছি। যখন হযরত ইব্রাহীম (আ.) দুআ করেন হিরমের জন্যে, "এর আহলকে রিযিক প্রদানকরুন ফলমূল দ্বারা" তখন আল্লাহ তায়েফকে ফিলিস্তিন হতে উঠিয়ে এখানে নিয়ে আসেন।

قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَاُمَتِّعُهٗ قَلِيْلًا

আল্লাহ তায়ালা বলেন কাফির ও সাময়িকভাবে ক্ষণিকের জন্যে এ নিয়ামত ভোগ করবে।

ثُمَّ اَضْطَرُّهٗۤ اِلٰى عَذَابِ النَّارِ

এরপর টেনে টেনে দুযখের আগুনে নিক্ষেপ করা হবে। এখানে اضطره শব্দের অর্থ অপছন্দ হওয়া সত্ত্বেও তাদেরকে টেনে হেঁচড়ে নিয়ে যাওয়া হবে দুযখের আগুনে।

وَبِئْسَ الْمَصِيْرُ

এবং এটা খুবই মন্দ জায়গা।

وَاِذْ يَرْفَعُ اِبْرٰهِيْمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَاِسْمٰعِيْلُ ؕ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا ؕ اِنَّكَ اَنْتَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ﴿١٢٧﴾ رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا اُمَّةً مُّسْلِمَةً لَّكَ ۠ وَاَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا ۚ اِنَّكَ اَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ ﴿١٢٨﴾ رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيْهِمْ رَسُوْلًا مِّنْهُمْ يَتْلُوْا عَلَيْهِمْ اٰيٰتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيْهِمْ ؕ اِنَّكَ اَنْتَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ﴿١٢٩﴾

১২৭. স্মরণ কর, যখন ইবরাহীম ও ইসমাঈল কা'বাগৃহের প্রাচীর তুলেছিলেন তখন তারা বলেন, হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের এ কাজ গ্রহণ কর, নিশ্চয় তুমি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞাতা।'

১২৮. হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের উভয়কে তোমার একান্ত অনুগত কর এবং আমাদের বংশধর হতে তোমার এক অনুগত উম্মত কর। আমাদেরকে ইবাদতের নিয়ম পদ্ধতি দেখিয়ে দাও এবং আমাদের প্রতি ক্ষমাশীল হও। তুমি অত্যন্ত ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

১২৯. হে আমাদের প্রতিপালক! তাদের মধ্যে হতে তাদের নিকট এক রাসূল প্রেরণ কর যে তোমার আয়াতসমূহ তাদের নিকট তিলাওয়াত করবে, তাদেরকে কিতাব ও হিকমত শিক্ষা দেবে এবং তাদেরকে পবিত্র করবে। তুমি তো পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।

وَاِذْ يَرْفَعُ اِبْرٰهِيْمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَاِسْمٰعِيْلُ

আর যখন ইব্রাহীম এবং ইসমাইল (আ.) নির্মাণ করেন কাবাগৃহের প্রাচীর। এখানে একটা প্রশ্ন উঠে তা হল হযরত ইবরাহীম এবং ইসমাঈল (আ.) কাবা গৃহের যে প্রাচীর উঠিয়েছিলেন তা কি নতুন ছিল, না হযরত আদম (আ.) যে প্রাচীরের ভিত্তি স্থাপন করেছিলেন তা থেকে আরম্ভ করছিলেন? একদল বলেন, আদম (আ.) যে

Scanned with CamScanner

প্রাচীর উঠিয়েছিলেন তা মিটে গিয়েছিল এবং ওখান হতেই ইবরাহীম (আ.) নির্মাণ কাজ আরম্ভ করছিলেন।

হযরত আতা (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন- হযরত আদম (আ.) বলেন- হে আমার রব! আমি ফেরেশতাদের আওয়াজ শুনতে পাচ্ছিনা। আল্লাহ বলেন, এটা তোমার দোষের কারণেই, তুমি জমিনে অবতরণ কর এবং সেখানে আমার জন্যে একটা ঘর তৈরী কর, যেমনটি দেখেছ আসমানে ফেরেশতাদের ঘর। তখন তিনি পাঁচটি পাহাড় যেমন হেরা পাহাড়, জায়ত পাহাড়, সিনা পাহাড়, লেবানন পাহাড় এবং জুদী পাহাড় হতে মাটি নিয়ে এ ঘর নির্মাণ করেন। এরপর এ ঘরকে পুনঃনির্মাণ করেন হযরত ইবরাহীম (আ.)। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত, যখন হযরত ইবরাহীম (আ.) কাবাগৃহের প্রাচীর নির্মাণ করছিলেন, তখন তিনি বলেন- এ প্রাচীরগুলো আগে থেকেই ছিল।

কেউ কেউ বলেন- এ প্রাচীর হযরত আদম (আ.)-এর জন্য আল্লাহ তায়ালা আসমান হতে জমিনে পাঠিয়েছিলেন। যেইভাবে আসমানে আরশ প্রদক্ষিণ করা হয় সেইভাবে এ ঘরটিও প্রদক্ষিণ করা হয়। আল্লাহ্ তায়ালা তুফানের সময় এর প্রাচীরগুলো আসমানে উঠিয়ে নিয়েছিলেন। হযরত ইবরাহীম (আ.) এ ঘরের প্রাচীর পুনরায় নির্মাণ করেছিলেন। হযরত আবদুল্লাহ বিন উমর (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন- যখন হযরত আদম (আ.) বেহশত হতে যমীনে অবতরণ করেছিলেন, তখন তাঁর সাথে এ ঘরও অবতরণ করেছিল। আল্লাহ বলেন, ঘরের চতুর্দিকে প্রদক্ষিণ করা হবে, যেমন প্রদক্ষিণ করা হয় আমার আরশের চতুর্দিকে। এ ঘরের নিকট নামায আদায় করা হবে, যেমন নামায আদায় করা হয় আমার আরশের নিকট। যখন নূহ (আ.)-এর সময়কার তুফান সংগঠিত হয়, তখন তা উঠিয়ে নেয়া হয়। এ ঘরের অবস্থান কোথায় তা আল্লাহ তায়ালা হযরত ইবরাহীম (আ.)-কে ছাড়া অন্য কোন নবীকে জানাননি। সেই অনুসারে হযরত ইবরাহীম (আ.) হেরা সিনা, লেবানন, তূর, ও খামর এ পাঁচটি পাহাড়ের মাটি দিয়ে তা তৈরী করেন।

হযরত আতা বিন আবু রাবাহ (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন- যখন হযরত আদম (আ.) জান্নাত হতে অবতরন করেছিলেন, তখন তাঁর পা ছিল জমিনে এবং মাথা ছিল আকাশে। তিনি আসমানবাসীর কথাবার্তা ও আহবান তাদের সাথে মিশে শুনতেন। ফেরেশতাগণ এতে ভীত হয়ে গেলেন এবং তাদের দু'আ সালাতের মাধ্যমে আল্লাহর কাছে তাদের ভীতির কথা জানালেন। এর ফলে আল্লাহ তায়ালা তাঁকে ভূমি সংলগ্ন করে নিচু করে দিলেন। তখন তিনি যা শুনতেন তা হারিয়ে গেল। অর্থাৎ আর শুনতে পেলেন না, তিনি অধীর হয়ে দুআ ও সালাতের মাধ্যমে আল্লাহ তায়ালার নিকট অভিযোগ করলেন। অতঃপর তিনি মক্কার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলেন। তার পা রাখার স্থান ছিল একটি গ্রামের সমপরিমান এবং এরূপ দীর্ঘ পদক্ষেপে হাটলেন। অবশেষে মক্কা শরীফে পৌঁছলেন। আল্লাহ তায়ালা জান্নাতের ইয়াকুত হতে একটা ইয়াকুত জমিনে পাঠিয়েছিলেন এবং সেই ইয়াকুত বর্তমান কাবাগৃহের স্থানে স্থাপিত ছিল। ঐ জায়গায় প্রদক্ষিণ করা হতো। শেষ পর্যন্ত তুফান আসল এবং এ বেহশতী ইয়াকুত উঠিয়ে নেয়া হল। অবশেষে আল্লাহ হযরত ইব্রাহীম (আ.)-কে পাঠালেন এবং তিনি

ঐ ঘর বানালেন। যার প্রতি ইংগিত প্রদান করে আল্লাহ্ তায়ালা বলেন- وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ

"এবং স্মরণ কর, যখন আমি ইবরাহীমের জন্য নির্ধারণ করে দিয়েছিলাম সেই গৃহের স্থান।" (সূরা ঃ হজ্জ-২৬)

কেউ কেউ বলেন- কাবাগৃহের জায়গাটি ছিল গম্বুজাকৃতির লাল রংঙের একটি টিলাময় স্থান। আল্লাহ তায়ালা যখন পানির উপর জমিন সৃষ্টি করার ইচ্ছে করলেন, তখন তা লাল-সাদা ফেনার মত ছিল। ইহাই ছিল কাবা গৃহের জায়গা। এরপর জমিনের নীচ হতে ধূয়া বের হতে লাগল। এভাবে চলতে থাকে, শেষ পর্যন্ত আল্লাহ্ তায়ালা হযরত ইব্রাহীম (সা.)-কে এ ব্যাপারে অবগত করেন এবং সেই ভিত্তি অনুযায়ী তিনি গৃহ নির্মাণ করেন। অনেকে বলেন, কাবা শরীফের ভিত্তি চারটি খুটির উপর ছিল। যে খুটিগুলির ভিত্তি ছিল সপ্তম জমিনে। হযরত মুজাহিদ (রা.) থেকে বর্ণনা করা হয়, তিনি বলেন- কাবাগৃহ পানির উপর ছিল। আল্লাহ তায়ালা আসমানসমূহ এবং জমিন সৃষ্টি করার পূর্ব হতেই তা ছিল, যা এক টুকরা সাদা ফেনার মত দেখা যেত। তার নীচে যমীন ছিল।

হযরত মুজাহিদ এবং অন্যান্য আহলে ইলম হতে বর্ণিত আছে, যখন বায়তুল্লাহর জায়গা সম্পর্কে হযরত ইবরাহীম (আ.) অবগত হলেন, তখন শাম বা সিরিয়া হতে সে স্থানের উদ্দেশ্যে বের হলেন। তখন তার সাথে ছোট শিশু ইসমাঈলও ছিলেন। তারা বোরাকে সওয়ার হলেন। হযরত জিবরাইল (আ.) পথ প্রদর্শক হিসেবে কাবাগৃহের জায়গা কোন দিকে তা দেখাতে লাগলেন। পথিমধ্যে যে স্থান দিয়েই যেতেন হযরত ইব্রাহীম জিজ্ঞাসা করতেন- এজায়গা না কী? জিবরাইল বলেন একটু যাও। শেষ পর্যন্ত তাঁরা মক্কায় পৌঁছলেন। তখন মক্কা ও তার আশে পাশে ছোট বড় কাটাদার বৃক্ষ ও বাবলা বৃক্ষ ছিল, যেগুলো আমালিকা সম্প্রদায়ের লোকেরা রোপন করত। আর মক্কা শরীফ ছিল লাল রঙের একটি টিলার উপর। তখন হযরত ইবরাহীম (আ.) জিব্রাইল (আ.)-কে বললেন, আপনি কী আমাকে এখানে থাকতে বলছেন। জীব্রাইল বলেন হ্যাঁ। তখন ওরা দু'জনেই পাথরের উপর বসলেন এবং ইসমাঈল জননী হাজেরাকে ওখানে বিছানা পাতার জন্য নির্দেশ দেয়া হল। তখন হযরত ইবরাহীম (আ.) বলেন, رَبِّ إِنِّي أَسْكَنتُ مِن ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِندَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ থেকে لعلهم يشكرون পর্যন্ত। হযরত ইবনে ইসহাক (রা.) বলেন, তার ধারণা আল্লাহই সবচেয়ে ভাল জানেন- হযরত ইবরাহীম ও ইসমাঈল (আ.) কাবা শরীফের ভিত্তি তৈরীর পূর্বে যখন হাজেরা (আ.) ও হযরত ইসমাঈলকে মক্কায় নির্বাসন দেন, তখন হাজেরার কাছে একজন ফেরেশতা আসলেন। তিনি বয়তুল্লাহ শরীফের নির্ধারিত স্থানের প্রতি তাদেরকে ইঙ্গিত প্রদান করলেন। সে স্থানটি ছিল তখন লাল রংঙের একটি উঁচু টিলা। ফেরেশতা তাদের উভয়কে বললেন, এটি হচ্ছে পৃথিবীতে নির্মিত প্রথম ঘর। এটা আল্লাহর ঘর। সকল প্রকার অপবিত্রতা হতে মুক্ত। হে হাজেরা! জেনে রাখ ইবরাহীম ও ইসমাঈল (আ.) ইহার ভিত্তি পুনরায় উত্তোলন করবেন।

Scanned with CamScanner

আসল কথা হচ্ছে হযরত ইবরাহীম (আ.) এবং হযরত ইসমাঈল (আ.) কাবাগৃহ নির্মাণ করেছিলেন আল্লাহর নির্দেশেই। সম্ভবতঃ এ প্রাচীর হযরত আদম (আ.) অবতরণ করার সময় এনেছিলেন। হয়ত এ-গম্বুজের উঁচুস্থান পানির ফেনা হতে সৃষ্ট ছিল। হয়ত আসমানী ইয়াকুত বা মুক্তা নাযিল করা হয়েছিল। হয়ত হযরত আদম (আ.), এ ঘর বানিয়েছিল, পরে ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল-পরে ঐ প্রাচীরই হযরত ইব্রাহীম (আ.) এবং ইসমাঈল (আ.) নির্মাণ করেছিলেন।

এখানে অনেক বক্তব্য ও মন্তব্যের মধ্যে কোনটার অনুকূলে কোন অকাট্য প্রমাণ না থাকায় সবগুলো মেনে নেয়াই শ্রেয়।

رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا

এ সম্পর্কে হযরত সুদ্দী (রা.) বলেন, হযরত ইবরাহীম (আ.) ও ইসমাঈল (আ.) কাবাগৃহ নির্মাণ করেন এবং দু'জনেই আল্লাহ্ তায়ালার নিকট কতেক বিষয়ে দুআ করেন, যে সব বিষয় দ্বারা আল্লাহ তায়ালা হযরত ইবরাহীম (আ.)-কে পরীক্ষা করেন। তাদের দু'আ ছিল-

رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ -

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত, হযরত ইবরাহীম (আ.) কাবা গৃহের প্রাচীর নির্মাণ করেন এবং হযরত ইসমাঈলও। তারা নির্মাণ কালে আল্লাহর কাছে দুআ করে বলেন- رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

হযরত ইসমাঈল পাথর বহন করে করে আনতেন আর শেখ অর্থাৎ হযরত ইবরাহীম (আ.) নির্মাণ করতেন। এক্ষেত্রে আয়াতের অর্থ এ দাড়ায়, হযরত ইবরাহীম (আ.) এবং হযরত ইসমাঈল (আ.) প্রাচীর নির্মাণ কাজ চালানোর সময় এ দুআ করে করে উঠাতেন। এখন প্রশ্ন আসে প্রাচীর কে উঠালেন? হযরত ইবরাহীম (আ.) একাই উঠালেন না হযরত ইবরাহীম (আ.) এবং হযরত ইসমাঈল দু'জনেই উঠিয়েছিলেন?

ইজমা একথার উপর যে, প্রাচীর হযরত ইবরাহীম (আ.) একাই নির্মাণ করেছেন। এদের মধ্যে কেউ কেউ বলেন যে, হযরত ইবরাহীম (আ.) এবং হযরত ইসমাঈল (আ.) দু'জনেই উঠিয়েছিলেন। একথার অনুকূলে নিম্নের হাদীস পেশ করা হল ঃ-

হযরত সুদ্দী হতে বর্ণিত তিনি- وَعَهِدْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَنْ طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ আয়াত সম্পর্কে বলেন এরপর হযরত ইব্রাহীম (আ.) হাটতে আরম্ভ করলেন। শেষ অবধি মক্কায় পৌছলেন এবং ঐ জায়গায় তিনি এবং তাঁর ছেলে দাঁড়ালেন। তারা কা'বাগৃহ কোন জায়গায় তা চিনতে পারেননি।

তখন আল্লাহ্ তায়ালা বাতাস পাঠালেন। বাতাসের দুটি পাখা ছিল এবং সাপের মাথার ন্যায় একটি মাথা ছিল। বাতাস তাদেরকে নিয়ে কাবার চতুর্দিকে ঘুরাল। তারা প্রথম গৃহের ভিত্তি তালাশ করতে লাগলেন। এভাবে আল্লাহ্ তায়ালা হযরত ইবরাহীমকে প্রথম গৃহের সন্ধান দিলেন। যেমন আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন, "যখন আমি ইবরাহীম (আ.)-কে বায়তুল্লাহ শরীফের স্থান দেখিয়ে দিলাম।" (সূরা ঃ হজ্ব-২৬)

তারপর দু'জনেই প্রচীর নির্মাণ করতে লাগলেন। তারা দু'জনেই মুল ভিত্তি পর্যন্ত পৌছলেন। হযরত ইবরাহীম (আ.) হযরত ইসমাঈল (আ.)-কে বললেন হে আমার প্রিয় বৎস। এখানে রাখার জন্য একটা সুন্দর পাথর নিয়ে এস। হযরত ইসমাঈল (আ.) উত্তরে বলেন, হে শ্রদ্ধেয় পিতা! আমি খুবই ক্লান্ত। তা সত্ত্বেও তিনি পাথরের

খোঁজে চলে গেলেন এবং একটি পাথর আনলেন কিন্তু তাতে তিনি সন্তুষ্ট হলেন না। এর পর তিনি বললেন, এর চেয়ে সুন্দর একটা পাথর আমার জন্যে আন। হযরত ইসমাইল (আ.) পাথরের খোঁজে বের হলেন। এদিকে জিবরাইল (আ.) হিন্দুস্থান হতেহজরে আসওদ পাথর নিয়ে আসলেন। ইহা ثَغَامَة বৃক্ষের ন্যায় ধবধবে সাদা পাথর ছিল। এ পাথরখানা হযরত আদম (আ.) বেহ্শত হতে অবতরণ করার সময় সংগে এনেছিলেন। কিন্তু মানুষের গোনাহের কারণে তা কাল হয়ে গেছে। ইতিমধ্যে হযরত ইসমাঈল (আ.) একটা পাথর নিয়ে আসলেন। ভিত্তির কাছে হজরে আসওয়াদ দেখে হযরত ইসমাঈল (আ.) বললেন- 'হে প্রিয় আব্বাজান! এ পাথর কে এনেছে? তিনি বললেন, যে তোমার চেয়েও বেশী দ্রুতগামী। এরপর তারা দু'জনে কা'বা গৃহ নির্মাণ করলেন।

অন্য একদল বলেন- হযরত ইব্রাহীম প্রাচীর উঠাতেন এবং হযরত ইসমাঈল (আ.) প্রাচীরের সামগ্রী এনে দিতেন। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত, হযরত ইবরাহীম (আ.) যখন ইসমাঈলের খোঁজে আসলেন এবং তাঁকে জমজমের পিছনে পেলেন। তিনি তখন তীর সংশোধন করছিলেন। ইবরাহীম (আ.) হযরত ইসমাঈল (আ.)-কে বললেন, আল্লাহ্ তায়ালা আমাকে তাঁর জন্য একটা ঘর নির্মাণ করার নির্দেশ দিয়েছেন। তখন হযরত ইসমাঈল (আ.) বললেন, আপনার রবের আদেশ পালন করুন। হযরত ইবরাহীম (আ.) বললেন, তোমার প্রতিও আদেশ করেছেন। তা হলে তুমি আমাকে সাহায্য করবে? ইসমাঈল (আ.) বললেন, যদি তা হয় আমি প্রস্তুত আছি। এভাবে তারা দুজনে গৃহ নির্মানে লেগে গেলেন। ইবরাহীম (আ.) নির্মান কাজ করতেন এবং ইসমাঈল (আ.) পাথর এনে দিতেন। তারা দু'জনেই এ বলে আল্লাহ্ তায়ালার কাছে দুআ করতেন "رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

অন্য একদল বলেন, প্রাচীর হযরত ইবরাহীম (আ.) নিজে একাই নির্মাণ করেছেন। সে সময় হযরত ইসমাঈল (আ.) ছোট শিশু ছিলেন। হযরত আলী (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, যখন আল্লাহ্ তায়ালা হযরত ইবরাহীম (আ.)-কে কাবাঘর নির্মাণের নির্দেশ দিলেন, তখন তিনি বের হলেন। তার সাথে হযরত ইসমাঈল (আ.) ও হাজেরাও বের হলেন। হযরত আলী (রা.) বলেন, যখন তিনি মক্কায় আসলেন বায়তুল্লাহ শরীফের নির্ধারিত স্থানে মাথার উপর একখন্ড মেঘ দেখতে পেলেন। মেঘের অভ্যন্তরে মাথার মত কি যেন ছিল। তিনি এ ছায়ার সাথে কথা বললেন। আওয়াজ হল হে ইবরাহীম! এ ছায়াকে কেন্দ্রকরে তুমি গৃহ নির্মাণ কর। এর সামান্য এদিক সেদিক করনা। অতঃপর যখন কাবাগৃহ নির্মাণ কাজ শেষ হল। ইসমাঈল (আ.) ও হাজেরাকে সেখানে রেখে চলে গেলেন। হাজেরা বললেন, হে ইবরাহীম! আমাদেরকে কার দায়িত্বে রেখে যাচ্ছ? তিনি বললেন, আল্লাহর দায়িত্বে। হাজেরা বললেন, তা হলে চলুন। অবশ্যই তিনি (আল্লাহ) আমাদেরকে ধ্বংস করবেন না। বর্ণনাকারী বলেন, অতঃপর ইসমাঈল (আ.) খুবই পিসাসার্ত হলেন। ইতিমধ্যে হযরত হাজেরা এক দৌড়ে সাফা পাহাড়ে যান কিন্তু কোথাও পানি দেখেন না, এখান থেকে নেমে আবার 'মারওয়া' পাহাড়ে উঠে দেখেন পানি আছে কী না, কিন্তু পানি দেখেন না। এভাবে সাফা থেকে মারওয়া পাহাড়ে হযরত হাজেরা সাতবার দৌড়ালেন। হাজেরার ভয় হয় ইসমাইলের মৃত্যু ঘটে কিনা। তিনি ফিরে আসলেন স্বীয় পুত্র হযরত ইসমাইলের কাছে। তখন ইসমাইল পানির পিপাসায় কাতর হয়ে

Scanned with CamScanner

দু'পা মাটিতে মারছিলেন। হযরত জিব্রাইল (আ.) হাজেরাকে ডাক দিয়ে বললেন, তুমি কে? উত্তরে বিবি হাজেরা বলেন, আমি হাজেরা, ইসমাইলের মাতা। হযরত জিবরাইল বলেন, তোমরা সাথে কথা বলেছি। জিবরাইল (আ.) বলেন, তোমাদেরকে কার হাতে সোপর্দ করা হয়েছে? তিনি বললেন, আল্লাহর হাতে জিবরীল বললেন, তিনিই উপযুক্ত। এরপর তিনি তাঁর দুই আঙুল দিয়ে মাটিতে আঘাত করলেন। এর থেকে জমজম সৃষ্টি হল এবং হাজেরা পানির চারদিকে বাঁধ দিলেন। জিবরাঈল (আ.) বলেন, পানিকে ছেড়ে দিন পানি, সব দিকে বয়ে যাবে।

হযরত আবু জাফর (রা.) বলেন, এসব বক্তব্যের মধ্যে সঠিক বক্তব্য হল, হযরত ইব্রাহীম (আ.) এবং হযরত ইসমাঈল (আ.) দু'জনেই কাবা নির্মাণ করেছেন। দু'জনেই কাবা গৃহের প্রাচীর উঠিয়েছেন। কারণ যেসব রিওয়ায়েতে। واسمعيل رفعها ابراهيم بناوله উল্লেখ করা হয়েছে, তা থেকে একথা পরিষ্কার ভাবে বোঝা যায় না বা প্রকাশ পায়না যে, হযরত ইসমাঈল (আ.) গৃহ নির্মাণ কাজে এবং প্রাচীর নির্মাণ কাজে অংশ গ্রহণ করেন নি। কারণ কোন কিছুর বাস্তবায়নে যে ব্যক্তি বা যে বস্তু ——— বা কারণ হয়, আহলে আরব তার প্রতি বস্তুর সম্বন্ধ করে থাকে, সে হিসেবেই হযরত ইবরাহীম (আ.)-কে মূলতঃ কাবা শরীফ নির্মাণকারী বলে উল্লেখ করা হলেও হযরত ইসমাঈল (আ.) পাথর বহন করেছেন কা'বা নির্মাণকারী বলে তা স্বীকার করে নিতে কারো দ্বি-মত নেই। অধিকন্তু ناولـه الحجارة শব্দ উল্লেখ করা হয়েছে। যার অর্থ হচ্ছে হযরত ইসমাঈল (আ.) পাথর উঠিয়ে হযরত ইব্রাহীম (আ.) এ হাতে নিয়ে দিতেন। এ শব্দের ব্যবহার থেকে প্রাচীর নির্মানের কাজে হযরত ইসমাঈল (আ.) ও যে নিযুক্ত ছিলেন, তা যেমন মেনে নেয়া সঠিক, তেমনই গৃহ নির্মানের ব্যাপারেও হযরত ইসমাঈল যে শরীক ছিলেন, তা ও সততঃ সঠিক।

إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

অর্থাৎ তাঁরা আল্লাহ্ তায়ালার দরবারে দু'আ করে বলেন- হে আল্লাহ্! তুমিই আমাদের ডাক বা আহবান শ্রবণকারী এবং তুমিই অন্তর্যামী।

হযরত ইবনে আব্বস (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ এ আয়াতের মূল কথা হল, হে আল্লাহ্ আপনি কবুল করুন, অবশ্যই আপনি দু'আ শ্রবণ করেন।

رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ

হযরত ইব্রাহীম (আ.) এবং হযরত ইসমাঈল (আ.) আল্লাহ্ তায়ালার দরবারে আবেদন করতঃ বলেন, হে আমাদের রব বা পালনকর্তা! আমাদেরকে এমন তৌফিক দান করুন এবং এমন চরিত্রের অধিকারী করুন, যেন আমরা আমাদের পূর্ণ এখতিয়ার আপনার সন্তুষ্টি অর্জনে সমর্পণ করতে পারি এবং আমাদের বংশধরগণ তাদের নিজেদেরকে আপনার কাছে সমর্পন করতে সমর্থ হয়। অর্থাৎ হযরত ইব্রাহীম এবং ইসমাঈল (আ.) প্রাচীর নির্মাণ করার সময় আল্লাহ্ তায়ালার দরবারে এ প্রার্থনা করেন। رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ আয়াতে হযরত ইবরাহীম (আ.) এবং হযরত ইসমাঈল (আ.)-কে বুঝানো হয়েছে এবং ইসলাম অর্থ আল্লাহর আনুগত্যে নত হওয়া। আর من تبعيضية ব্যবহার করে বোঝানো হয়েছে যে, হযরত ইবরাহীম (আ.) এর বংশধরদের মধ্যে সকলেই আল্লাহ্ তায়ালার সন্তুষ্টি অর্জনে সক্ষম হবে না।

যেহেতু কিছু সংখ্যক সীমালঙ্ঘনকারী, ফিসক ও পাপকাজে লিপ্ত থাকবে। এজন্যে দুআর মধ্যে ——— হরফ ব্যবহার করে কিছু অংশ নির্দিষ্ট করা হয়েছে। বলা হয় এ خاص দ্বারা আরবদের বুঝানো হয়েছে।

হযরত সুদ্দী (রা.) বর্ণিত- وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ দ্বারা আরবদেরকেই উদ্দেশ্য করা হয়েছে।

কেউ কেউ বলেন, এই অর্থ গ্রহণ প্রকাশ্য অর্থের প্রতিকুল হয়। কারণ হযরত ইব্রাহীম (আ.) তাঁর সন্তানদের মধ্যে একটি দলের জন্যেই দু'আ করেন। আর তাঁর সন্তান আরব এবং অনারব সর্বক্ষেত্রে ছড়িয়ে ছিটিয়ে বিরাজমান আছে। সুতরাং এ ক্ষেত্রে আরবকে নির্দিষ্ট করার মানে দলিল বিহীন অহেতুক দাবী ছাড়া আর কিছুই নয়। বরং এখানে উম্মতের একটি জমাত এর কথাই উল্লেখ করেছেন, যা আম ভাবে সকলকে বুঝায়।

وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ

হে আমাদের রব! আমাদের কার্যাবলী অর্থাৎ হজ্জের কার্যাবলী প্রদর্শন করুন এবং আমাদের প্রতি করুনার দৃষ্টি দিন। একথা সত্য, আপনি তওবা গ্রহনকারী, দয়ালু। এখানে مَنَاسِكَ শব্দের অর্থ مَنَاسِكَ الحج অর্থাৎ হজ্জের আহকাম। হযরত কাতাদাহ (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন আল্লাহ তায়ালার বাণী- وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا এর মধ্যে مَنَاسِكَ বলতে ইশারা করা হয়েছে হজ্জের আহকামের প্রতি, যেমন কাবাগৃহের তওয়াফ, সাফা থেকে মারওয়া পর্যন্ত দৌড় বা সায়ী করা, পাথর নিক্ষেপ। আরাফা থেকে প্রত্যাবর্তন ইত্যাদি। এভাবে আল্লাহ্ তায়ালা তার দ্বীন পূরণ করেন।

হযরত সুদ্দী (রা.) হতে বর্ণিত, হযরত ইবরাহীম (আ.) এবং ঈসমাঈল (আ.) কাবা গৃহের কাজ সম্পন্ন করার পর আল্লাহ তায়ালা তাকে নির্দেশ দিলেন আহবান করার জন্যে অর্থাৎ মানুষকে মক্কায় হজ্জ করতে আসার জন্যে আহবান করার আদেশ দিলেন। ইবরাহীম (আ.) আহবান করলেন, হে মানব সম্প্রদায়! আল্লাহ্ তায়ালা তাঁর ঘরে হজ্জ করার জন্য তোমাদেরকে আদেশ করছেন। হযরত সুদ্দী (রা.) বলেন, ইবরাহীম (আ.)-এর এ বানী প্রত্যেক মুমীনের অন্তরে রেখাপাত করল। এমনকি পাহাড়, গাছপালা, চতুস্পদ জন্তু যারাই এ আওয়াজ শুনেছিল তারা لبيك لبيك বলে জবাব দিয়েছিল। তাঁর আহবান শুনে যারা আসার, তারা এসে হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর সাথে মিলিত হলেন। অতঃপর আল্লাহ তায়ালা তাকে আরাফাতের উদ্দেশ্যে বের হওয়ার নির্দেশ দিলেন এবং আরাফা পরিচয়ের জন্য কিছু বৈশিষ্ট্যও বর্ণনা করলেন। হযরত ইবরাহীম (আ.) বের হলেন। আকাবা নামক স্থানের গাছের নিচে যখন পৌঁছলেন, তখন শয়তান তাঁর সামনে আসল। তিনি শয়তানকে উদ্দেশ্য করে সাতটি পাথর নিক্ষেপ করলেন। প্রতিবারই তাকবীর পাঠ করতেন। শয়তান চলে গেল। দ্বিতীয় জামরায় ও শয়তান আসলে এখানেও তাকবীর পাঠ সহ পাথর নিক্ষেপ করলেন। আবারও শয়তান চলে গেল। তৃতীয় জামরায় আবার ফিরে আসল। তিনি আবার ও পাথর মারলেন ও তাকবীর উচ্চারণ করলেন। যখন শয়তান দেখল, ইবরাহীম (আ.) কে আর বিভ্রান্ত করতে পারবেনা তখন সে পশ্চাদপসারণ করল। এদিকে হযরত ইবরাহীম (আ.) গন্তব্য পরিচয় করতে না পেরে চলতেই থাকলেন। যুল মাজায অতিক্রম করে যখন আরাফায় পৌঁছলেন, তখন চতুর্দিক চেয়ে

Scanned with CamScanner

এর বৈশিষ্ট্যগুলো দেখে তা চিনে নিলেন। এবং বললেন عـرفـت কারনেই এ স্থানের নাম রাখা হয় আরাফাত। সন্ধ্যাবেলা হযরত ইবরাহীম (আ.) তথায় অন্য এক জামাতের সাথে মিললেন। যে জায়গায় জামাতের সাথে সাক্ষাৎ হল, তার নাম দেয়া হল مـزدلفة অতঃপর জামাত সহ ঐ জায়গায় অপেক্ষা করতে লাগলেন। কিছুক্ষণ পর ওখানে শয়তান আসল যেমনিভাবে পূর্বে এসেছিল। হযরত ইবরাহীম (আ.) তাকে সাত বার পাথর মারলেন, তারপর মিনায় গেলেন। এভাবে হজ্জের কার্যাবলী সম্পন্ন করলেন, যার প্রতি আল্লাহ্ তাঁর বানী- وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا এর মধ্যে ইশারা করেছেন।

অন্য একটি দল مناسك শব্দ দ্বারা مذابح অর্থ গ্রহণ করেন। সেই সময় এ'আয়াতের তফসীর এভাবে হয়- وارنا كيف نسلك لك يا ربنا نسائكنا فنذ بحها لك

"হে রব! আমাদের দেখান কিভাবে আমরা আপনার সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য জবেহ করব?" একথার উপর দলিল হিসেবে তারা নীচের হাদীস পেশ করে থাকেন।

"হযরত আতা (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا অর্থ জবেহ কীভাবে হবে তা শিক্ষা দিন।" অন্য বর্ণনায় আছে জবেহ করার জায়গা বলে দিন। এখানে ارنا শব্দের অর্থ হচ্ছে علمنا (শিক্ষা দিন) আর نسك শব্দের অর্থ আল্লাহ্ তায়ালার ইবাদত। কিন্তু এ শব্দটি হজ্জের আহকামের জন্য নির্দিষ্ট করা হয়েছে। مناسك বললেই আহকামে হজ্জ বোঝা যাবে। হযরত ইবরাহীম (আ.) প্রথমে নিজের ছেলে হযরত ইসমাঈল (আ.)-এর জন্যই দু'আ করেছিলেন কিন্তু শেষের দু'আয় ارنا مناسكنا হতে শেষ দু'আ পর্যন্ত নিজের বংশধরকে অর্ন্তভূক্ত করেন। হজ্জের আহকাম শিক্ষা দেয়ার পদ্ধতি ছিল এ রকম- আল্লাহ্ তায়ালা হযরত জিব্রাঈল (আ.)-কে সংগে দিয়ে হজ্জ করিয়ে ছিলেন। তখন আয়াতের অর্থ হবে এই- হে রব! আপনি আমাদেরকে আহকামে হজ্জ শিক্ষা দিন, আমাদের প্রতি কৃপার নজর দিন। এ কথা সত্য যে, আপনি তওবা কবুল করেন এবং দয়াবান।

رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ

হযরত ইবরাহীম (আ.) এবং হযরত ঈসমাঈল (আ.) আল্লাহ তায়ালার দরবারে দু'আ করে বলেন, হে আমাদের পরওয়ারদিগার! আপনি তাদের মধ্য হতে তাদের নিকট একজন রাসূল প্রেরণ করবেন, যিনি তাদের কাছে আপনার প্রেরিত আয়াত সমূহ পাঠ করবেন।

এ প্রার্থনা হযরত ইবরাহীম (আ.) এবং হযরত ইসমাঈল (আ.) আমাদের প্রিয়নবী হযরত মুহাম্মদ মোস্তাফা (সা.) এর অনুকূলে করেছিলেন, যে দু'আ সম্পর্কে রাসূল্লাহ্ (সা.) বলেন, আমি আমার পিতা ইবরাহীম (আ.)-এর দু'আর ফলে, ঈসা (আ.)-এর সুসংবাদ ও আমার মায়ের স্বপ্নের ফলে জন্ম নিয়েছি। যেমন হযরত ইরবায ইবনে সারিয়া সুলামা (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন- আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলতেন, আল্লাহ্ তায়ালা আমাকে তখনই শেষ নবী হিসেবে নির্ধারিত করে রেখেছেন, যখন হযরত আদম (আ.) মাটির সাথে মিশ্রিত ছিলেন। শীঘ্রই আমি তোমাদেরকে এর বিশ্লেষন জানাব। আমি ইবরাহীম (আ.) এর দু'আ ইসা (আ.) এর সুসংবাদ ও আমার আম্মার স্বপ্নের ফসল। এ হাদীস হযরত মুয়াবীয়া বিন সালেহ (রা.), কাতাদাহ, সুদ্দী ও হযরত রবী (রা.) বর্ণনা করেন। يـتـلـوا এর অর্থ, يـقـرا عـلـيـهـم كـتـابـك الـذي تـوحـه الـيـه তিনি তাদের নিকট আপনার প্রেরিত কিতাব পাঠ করবেন।

وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ

তাছাড়া তিনি তাঁদেরকে কুরআন এবং হিকমত শিক্ষা দেবেন। হযরত কাতাদাহ (রা.) বলেন حـكـمـة শব্দের অর্থ সুন্নত। আর হযরত ইমাম মালিক (র.) বলেন- الـحـكـمـة المعرفة بالدين والفقه في الدين والاتباع له হিকমত হচ্ছে ধর্মের পরিচয়, ধর্ম সম্পর্কে গভীর জ্ঞান লাভ এবং তার অনুসরণ করা। হযরত ইবনে যায়েদ (র.) বলেন, الـحـكـمـة الـعـقـل في الـديـن হিকমত মানুষের ধর্মীয় জ্ঞান। যা মানুষকে দ্বীন অনুযায়ী চলতে ইশারা করে। হিকমতের ব্যাপারে সঠিক বক্তব্য হচ্ছে - انـهـا الـعـلـم باحكام الله التي لا يدرك علمها الابيان الرسولؐ والمعرفة بها ومادل عليه ذلك في نظائره অর্থাৎ হিকমত হচ্ছে এমন ইলম বা শিক্ষা, যেই শিক্ষা রাসূলুল্লাহ্ এর বর্ণনা ছাড়া জানা যায় না।

ويـزكـيهـم অর্থাৎ এ রাসূল তাদেরকে আল্লাহ্ তায়ালার সাথে শিরক করা থেকে, মূর্তিপূজা করা থেকে পবিত্র করবেন, তাদেরকে (পরকালের ও ইহকালের শাস্তি হতে) পরিত্রান পাওয়ার পথ নির্দেশিকা দিবেন এবং আল্লাহ্ তায়ালার আনুগত্য করতে অধিক প্রেরনা দিবেন। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন زكـات শব্দের অর্থ আল্লাহ্ তায়ালার আনুগত্য এবং একনিষ্ঠতা অর্থাৎ যা কিছুই করা হয় না কেন, সবই আল্লাহ্র সন্তুষ্টি অর্জন ছাড়া অন্য কিছুর জন্য নয়।

إِنَّكَ أَنتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ

হে আল্লাহ্! আপনি নিঃসন্দেহে বিজয়ী এবং হেকমতের মালিক। অর্থাৎ আপনাকে কেউই অক্ষম করে দিতে পারে না এবং আপনার প্রচেষ্টায় কোন ত্রুটি সৃষ্টি হয় না।

وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ ۚ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ
فِي الدُّنْيَا ۖ وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ ﴿١٣٠﴾ إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ
أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿١٣١﴾ وَوَصَّىٰ بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ
وَيَعْقُوبُ ۚ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم
مُّسْلِمُونَ ﴿١٣٢﴾ أَمْ كُنتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ إِذْ قَالَ
لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِن بَعْدِي ۖ قَالُوا نَعْبُدُ إِلَٰهَكَ وَإِلَٰهَ آبَائِكَ
إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِلَٰهًا وَاحِدًا وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ﴿١٣٣﴾
تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ ۖ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُم مَّا كَسَبْتُمْ ۖ وَلَا
تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١٣٤﴾

Scanned with CamScanner

১৩০. যে নিজেকে নির্বোধ করেছে সে ব্যতীত ইবরাহীমের ধর্মাদর্শ হতে আর কে বিমুখ হবে। পৃথিবীতে তাকে আমি মনোনীত করেছি; আর আখিরাতেও তিনি অবশ্যই সৎকর্ম পরায়ণগণের অন্যতম।

১৩১. তার প্রতিপালক যখন তাকে বলেছিলেন, আত্মসমর্পণ কর, তিনি বলেন জগতসমূহের প্রতিপালকের নিকট আত্মসর্মপণ করলাম।

১৩২. এবং ইবরাহীম ও ইয়াকূব এ সম্বন্ধে তাদের পুত্রগণকে নির্দেশ দিয়ে বলেন, হে পুত্রগণ! আল্লাহ তোমাদের জন্য এই দ্বীনকে মনোনীত করেছেন। সুতরাং আত্মসমপর্ণকারী না হয়ে তোমরা কখনও মৃত্যুবরণ করো না।

১৩৩. ইয়াকুবের নিকট যখন মৃত্যু এসেছিল তোমরা কি তখন উপস্থিত ছিলে? তিনি যখন পুত্রগণকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, আমার পরে তোমরা কিসের ইবাদত করবে? তারা তখন বলেছিলেন, আমরা আপনার ইলাহ-এর এবং আপনার পিতৃপুরুষ ইবরাহীম, ইসমাঈল ও ইসহাকের ইলাহ-এর ইবাদত করব। তিনি একমাত্র ইলাহ এবং আমরা তার নিকট আত্মসমর্পণকারী।

১৩৪. সে ছিল এক উম্মত তা অতীত হয়েছে। তারা যা অর্জন করেছে তা তাদের। তোমরা যা অর্জন কর তা তোমাদের। তারা যা করত সে সম্বন্ধে তোমাদেরকে কোন প্রশ্ন করা হবে না।

وَمَنْ يَّرْغَبُ عَنْ مِّلَّةِ اِبْرَاهِيْمَ اِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهٗ

ইবরাহীমের মজহাব হতে কে মুখ ফিরাবে? হ্যাঁ সেই মুখ ফিরাতে পারে, যার নিজের ক্ষতি ও কষ্ট সম্পর্কে কোন জ্ঞান নেই। একথা দ্বারা ইহুদী এবং নাসারাকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে। কারণ তারা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ না করে ইহুদী এবং নাসারা ধর্ম গ্রহণ করে। অথচ মিল্লাতে ইব্রাহিমীই হচ্ছে খাঁটি ও সঠিক ধর্ম। যেইভাবে আল্লাহ্ তায়ালা বলেন- مَا كَانَ اِبْرَاهِيْمُ يَهُوْدِيًّا وَّلَا نَصْرَانِيًّا وَّلٰكِنْ كَانَ حَنِيْفًا مُّسْلِمًا

"হযরত ইবরাহীম (আ.) হহুদী ও ছিলেন না এবং নাসারা ও ছিলেন না বরং সঠিক মুসলিম ছিলেন।" (সূরা ঃ আলে-ইমরান-৬৭)

আল্লাহ্ তায়ালা তাদেরকে উদ্দেশ্য করে বলেন, একনিষ্ট সত্য সাধক ইবরাহীম এর মিল্লাত হতে একমাত্র নির্বোধ ছাড়া কেউ মুখ ফিরিয়ে থাকতে পারে না। হযরত কাতাদাহ (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি আল্লাহ্ তায়ালার বানী- مَنْ يَّرْغَبُ عَنْ مِّلَّةِ اِبْرَاهِيْمَ اِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهٗ আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেন, ইহুদী ও নাসারাগণ মিল্লাতে ইবরাহীমী থেকে মুখ ফিরিয়ে ইহুদীবাদ ও খ্রীষ্টবাদ গ্রহণ করেছে। এটা সম্পূর্ণ তাদের আবিস্কৃত। আল্লাহর পক্ষ থেকে এর কোন ভিত্তি নেই। এটা হল তাদের ইসলাম ধর্মকে ত্যাগ করার একটা বাহানা, যে ইসলাম ধর্ম হচ্ছে সঠিক ও সত্য। এ ভাবে আল্লাহ তায়ালা তাঁর নবী মুহাম্মদ (সা.)-কে ইবরাহীমের মিল্লাতের উপর প্রেরণ করেছেন।

وَلَقَدِ اصْطَفَيْنٰهُ فِى الدُّنْيَا وَاِنَّهٗ فِى الْاٰخِرَةِ لَمِنَ الصّٰلِحِيْنَ

অবশ্যই আমি তাঁকে অর্থাৎ হযরত ইব্রাহীম (আ.) কে (সৃষ্টি জীব এর ইমামতের জন্য) দুনিয়াতে নির্বাচিত করেছি। নিঃসন্দেহে তিনি আখিরাতে মহৎ লোকদের অন্তর্ভূক্ত হবেন। والصالح من بني ادم المودي حقوق الله عليه "বনী আদমের মধ্যে সেই ব্যক্তিই সালেহ বা নেককার, যে তার উপর আল্লাহর পক্ষ থেকে অর্পিত হক সমূহ আদায় করে।"

اِذْ قَالَ لَهٗ رَبُّهٗٓ اَسْلِمْ قَالَ اَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعٰلَمِيْنَ

অর্থাৎ যখন হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর পালনকর্তা বা রব বলেন, তোমরা আমার জন্যে ইবাদতকে বিশুদ্ধ বানিয়ে নাও। তখন হযরত ইবরাহীম (আ.) বলেন-আমি একনিষ্ট হয়েছি রাব্বুল আলামীনের সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষ্যে। হযরত আবু-জাফর (রা.) বলেন, এখানে একটা প্রশ্ন উদিত হয়। তাহল আসলে কী হযরত ইব্রাহীম (আ.)-কে ইসলামের দাওয়াত দেয়া হয়েছিল? এর উত্তর হচ্ছে- হযরত ইবরাহীম (আ.)-কে ইসলামের দাওয়াত দেয়া হয়েছিল। তবে সেই দাওয়াত দেয়া হয়েছিল-আল্লাহ্ তায়ালা তাঁহাকে সূর্য, চাঁদ ও তারার মধ্যমে পরীক্ষা নেয়ার পর। হযরত ইবরাহীম (আ.) নিজের কওমকে বললেন - يٰقَوْمِ اِنِّىْ بَرِىْٓءٌ مِّمَّا تُشْرِكُوْنَ - اِنِّىْ وَجَّهْتُ وَجْهِىَ لِلَّذِىْ فَطَرَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ حَنِيْفًا وَّمَآ اَنَا مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ- "হে কাওম! আমি দেখছি তোমরা শিরক করছ। আমি তোমাদের শিরকী আচরণ থেকে মুক্ত। আমি আমার মুখ ঐ জাতের দিকে করেছি যিনি সমস্ত আসমান, জমিন সৃষ্টি করেছেন। আমি মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত নই।" (সূরা ঃ আনআ'ম-৭৮-৭৯) সেই সময়ই তিনি তাঁর রবের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করেন, যা ইসলামের মূল কথা।

وَوَصّٰى بِهَآ اِبْرٰهٖمُ بَنِيْهِ وَيَعْقُوْبُ

হযরত ইব্রাহীম (আ.) এবং ইয়াকুব (আ.) উভয়ে তাদের নিজ নিজ সন্তানদেরকে ইসলামের নির্দেশ দেন এবং ইসলামের পথ দেখান। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) ও উক্ত আয়াতের অর্থ এরকম নিয়েছেন।

কেউ কেউ বলেন وَوَصّٰى بِهَآ اِبْرٰهٖمُ بَنِيْهِ পর্যন্ত বাক্য শেষ হয়েছে। এরপর থেকে দ্বিতীয় বাক্য আরম্ভ হয়েছে।

يٰبَنِىَّ اِنَّ اللّٰهَ اصْطَفٰى لَكُمُ الدِّيْنَ فَلَا تَمُوْتُنَّ اِلَّا وَاَنْتُمْ مُّسْلِمُوْنَ

হে আমার প্রিয় বৎস! আল্লাহ্ তায়ালা তোমাদের জন্যে ঐ দ্বীনই পছন্দ করেছেন, তাই তোমরা মুসলমান হয়েই মৃত্যু বরন কর।

اَمْ كُنْتُمْ شُهَدَآءَ اِذْ حَضَرَ يَعْقُوْبَ الْمَوْتُ

ام এখানে أ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। আরবরা প্রশ্ন করার সময় কখনও কখনও ام হরফ ব্যবহার করে। এধরনের ব্যবহার ব্যাকরণের দৃষ্টিতে সঠিক।

অর্থাৎ তোমরা কী উপস্থিত ছিলে যখন হযরত ইয়াকুব (আ.)-এর নিকট মৃত্যু উপস্থিত হয়েছিল? অর্থাৎ হে ইহুদ এবং নাসারাগণ! তোমরা যারা হযরত মুহাম্মদ (সা.) কে অস্বীকার করছ তারা তো হযরত ইয়াকুব (আ.)-এর মৃত্যুর সময় ছিলেনা। এ আয়াতে আল্লাহ্ তায়ালা আহলে কিতাবের দাবী (তারা বলত ইব্রাহীম (আ.) এবং তাঁর সন্তান ইয়াকুব (আ.) তাদেরই মযহাবের উপর ছিলেন) খন্ডন করছেন এবং

Scanned with CamScanner

প্রত্যাখান করছেন। একে আরবী ব্যাকরণে استفهام انكاري বলা হয়।

إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِي قَالُوا نَعْبُدُ إِلَٰهَكَ وَإِلَٰهَ آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِلَٰهًا وَاحِدًا وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ

অর্থাৎ যখন ইয়াকুব (আ.) নিজের সন্তানদেরকে বলেন, তোমরা আমার পরে কিসের ইবাদত করবে? তাঁরা উত্তর দিয়েছিলেন, আমরা আপনার মা'বুদের এবং আপনার পিতা ইবরাহীম (আ.)-এর মা'বুদের এবং ইসমাঈল ও ইসহাক (আ.)-এর মা'বুদের ইবাদত করব। সকলের একই মাবুদ। আমরা তাঁরই অনুগত।

تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ

ঐ জাতি অতিবাহিত হয়ে গেছেন। অবশ্যই তারা যা অর্জন করেছে তা তাদেরই জন্য। তোমরা যা অর্জন করেছ তা তোমাদের জন্য। তারা কি করেছে, না করেছে- তা তোমাদেরকে জিজ্ঞেস করা হবে না।

অর্থাৎ হে ইহুদী এবং নাসারাগণ! তোমরা ইবরাহীম, ইসমাঈল, ইসহাক, ইয়াকুব এবং তাদের মুসলমান সন্তানদের কথা ছেড়ে দাও। তারা যা আমল করছেন তা নিয়ে তারা এপৃথিবী হতে চলে গেছেন, এব্যাপারে তোমাদেরকে প্রশ্ন করা হবে না। তোমরা যা অর্জন করেছ, তার বিনিময় তোমাদেরকে প্রদান করা হবে।

وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تَهْتَدُوا ۗ قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا ۖ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿١٣٥﴾ قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَمَا أُوتِيَ النَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ ۚ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ﴿١٣٦﴾ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا ۖ وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ ۖ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ ۚ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿١٣٧﴾ صِبْغَةَ اللَّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ ﴿١٣٨﴾ قُلْ أَتُحَاجُّونَنَا فِي اللَّهِ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ ۖ وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ ۖ وَنَحْنُ لَهُ

مُخْلِصُونَ ﴿١٣٩﴾ أَمْ تَقُولُونَ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطَ كَانُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ ۗ قُلْ أَأَنْتُمْ أَعْلَمُ أَمِ اللَّهُ ۗ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللَّهِ ۗ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿١٤٠﴾ تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ ۖ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ ۖ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١٤١﴾

১৩৫. তারা বলে ইয়াহুদী বা খৃস্টান হও, ঠিক পথ পাবে। বল, বরং একনিষ্ঠ হয়ে আমরা ইবরাহীমের ধর্মাদর্শ অনুসরণ করব এবং সে মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত ছিল না।

১৩৬. তোমরা বল, আমরা আল্লাহর প্রতি ঈমান রাখি, এবং যা আমাদের প্রতি এবং ইবরাহীম, ইসমাঈল, ইসহাক, ইয়াকুব ও তার বংশধরগণের প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে, এবং যা তাদের প্রতিপালকের নিকট হতে মূসা, ঈসা ও অন্যান্য নবীগণকে দেয়া হয়েছে। আমরা তাদের মধ্যে কোন পার্থক্য করি না এবং আমরা তাঁরই নিকট আত্মসমর্পণকারী।

১৩৭. তোমরা যাতে ঈমান আয়ন করেছ তারা যদি সে রূপ ঈমান আনয়ন করে তবে নিশ্চয় তারা হিদায়াত পাবে। আর যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়, তবে তারা নিশ্চয়ই বিরুদ্ধভাবাপনন এবং তাদের বিরুদ্ধে তোমার জন্য আল্লাহ যথেষ্ট। আর তিনি সর্বশ্রোতা।

১৩৮. আমরা গ্রহণ করলাম আল্লাহর রং রঙে আল্লাহ অপেক্ষা কে অধিকতর সুন্দর? এবং আমরা তারই ইবাদতকারী।

১৩৯. বল, আল্লাহ সম্বন্ধে তোমরা কি আমাদের সঙ্গে বিতর্কে লিপ্ত হতে চাও? যখন তিনি আমাদের প্রতিপালক এবং তোমাদেরও প্রতিপালক! আমাদের কর্ম আমাদের এবং তোমাদের কর্ম তোমাদের এবং আমরা তাঁরা প্রতি একনিষ্ঠ।

১৪০. তোমরা কি বল, ইবরাহীম, ইসমাঈল, ইসহাক, ইয়াকুব ও তার বংশধরগণ অবশ্যই ইয়াহুদী কিংবা খৃস্টান ছিল? বল, তোমরা কি বেশী জান না আল্লা? আল্লাহর নিকট হতে তার কাছে যে প্রমাণ আছে তা যে গোপন করে তার অপেক্ষা অধিকতর যালিম আর কে হতে পারে? তোমরা যা কর আল্লাহ সে সম্বন্ধে অনবহিত নয়।

১৪১. সে ছিল এক উম্মত, তা অতীত হয়েছে। তারা যা অর্জন করেছে তা তাদের। তোমরা যা অর্জন কর তা তোমাদের। তারা যা করত সে সম্বন্ধে তোমাদেরকে কোন প্রশ্ন করা হবে না।

Scanned with CamScanner

وَقَالُوْا كُوْنُوْا هُوْدًا اَوْ نَصٰرٰى تَهْتَدُوْ

ইহুদী এবং নাসারাগণ হযরত মুহাম্মদ (সা.) এবং মুমীন সাহাবীদেরকে বলত, তোমরা ইহুদী অথবা নাসারা হয়ে যাও, তাহলে সত্য রাস্তা পাবে। এভাবে ইহুদীরা ইহুদী হওয়ার জন্যে বলত এবং নাসারাগণ নাসারা হওয়ার জন্য বলত।

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন- আবদুল্লাহ্ বিন সুরিয়া আল-আওয়ার রাসূলুল্লাহ্ (স.)-কে বলে, হে মুহাম্মদ! হিদায়ত কেবলমাত্র ঐ পথেই নিহিত যে মিল্লাতের উপর আমরা আছি। সুতরাং আমাদের অনুসরণ করুন।

নাসারাগণও এ রকম বলত। তাদের সম্পর্কে আল্লাহ্ তায়ালা وَقَالُوْا كُوْنُوْا هُوْدًا اَوْ نَصٰرٰى تَهْتَدُوْ আয়াত নাযিল করেন।

قُلْ بَلْ مِلَّةَ اِبْرٰهِيْمَ حَنِيْفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ

আল্লাহ্ তায়ালা আহলে কিতাবের নিকট সত্যায়িত দলিল পেশ করে বলেন, হে মুহাম্মদ (সা.), আপনি বলে দিন হে আহলে কিতাব! চলুন আমরা কর্ত বির্তক ত্যাগ করে গ্রহণযোগ্য ও সঠিকভাবে ইবরাহীম (আ.)-এর মিল্লাতের অনুসরন করি। চলুন আমরা সকলেই এ মিল্লাত গ্রহণ করে এক হয়ে যাই। ملة ابراهيم এখানে نصب নসব পাঠ করা হয় نتبع অথবা نكون ক্রিয়ার কর্ম বা مفعول হিসেবে। তখন مضاف ـ مضاف اليه এবং اصحاب ملة মিলে مفعول হবে। অথবা ملة ابراهيم اهل কর্ম বা مفعول হবে।

এখানে اصحاب এবং اهل শব্দ উহ্য করে ملة শব্দটি এদের স্থানে বসিয়েছেন।

ملة শব্দের অর্থ হচ্ছে সঠিক দ্বীন অর্থাৎ সর্ব ক্ষেত্রে সঠিক। এখানে حنيفا শব্দটি حال হয়েছে 'ابراهيم' ذوالحال হতে। সেই সময় অর্থ দাঁড়ায় قل يا محمد بل نتبع ملة ابراهيم مستقيما

বরং আমরা বিশুদ্ধ ইব্রাহীমী দ্বীনের অনুসরন করব। হযরত ইব্রাহীম (আ.) মুশরিক ছিলেন না।

কেউ কেউ বলে থাকেন حنيفا শব্দের অর্থ "হজ্জ আদায়কারী"। তখন অর্থ হবে, যেই ব্যক্তি হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর মিল্লাতের উপর থেকে হজ্জের আহকাম পূর্ণভাবে সম্পন্ন করতঃ হজ্জ আদায় করেছেন, সেই ব্যক্তি ইব্রাহীমী দ্বীনের উপর হয়ে সত্যিকার মুসলিম হিসেবে পরিগনিত হয়েছেন।

যেমন হযরত কাসীর আবু সহল (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি হযরত হাসান (রা.)-কে "হানিফ" শব্দ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বলেন, কাবা গৃহের হজ্জ করা। হযরত আতিয়া হতে বর্ণিত। তিনি حنيفا শব্দ সম্পর্কে বলেন, হানিফ শব্দের অর্থ হাজী।

হযরত সুদ্দী (রা.) হযরত মুজাহিদ (রা.) হতে বর্ণনা করেন, حنفاء শব্দের অর্থ হাজী সম্প্রদায়। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত। আল্লাহ তায়ালার বর্ণিত "حنيفا" শব্দের অর্থ হাজী।

হযরত আব্দুল্লাহ বিন আল-কাসিম হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, বনি মুদরের কতেক লোক জাহিলিয়তের যুগে-'কাবা ঘরের' হজ্জ করতেন- তাদেরকে حنفاء বলা হত। তখন আল্লাহ্ তায়ালা এ আয়াত নাযিল করেন حُنَفَاءَ لِلّٰهِ غَيْرَ مُشْرِكِيْنَ بِهٖ তাঁরা আল্লাহ্ তায়ালার সন্তুষ্টির জন্যেই হজ্জ করেন, আল্লাহ্ তায়ালার সাথে অন্য কিছু শরীক করেন না। (সূরা ঃ হজ্জ-৩১)

অপর এক দল তাবীলকারী বলেন, حنيف হানিফ শব্দের মুল অর্থ হল অনুসারী- যেমন হযরত মুজাহিদ (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, যার অনুসরণ করা হয় তাকে حنيف বলে। حنفاء হচ্ছে হানিফ শব্দের বহু বচন, আর متبعين হচ্ছে متبع এর বহুবচন।

অপর দল বলেন, হযরত ইবরাহীম (আ.)-কে حنيف শব্দ দ্বারা অভিহিত করা হয়েছে। কারণ তিনি সর্ব প্রথম খতনা প্রথা চালু করেন। পরবর্তীরা তার অনুসরণ করে। তারা বলত, যে কেউ ইবরাহীমী এ নীতিমালা অনুযায়ী খতনা প্রদান করবে, সেই ইবরাহীমের ইসলামের উপর আছে এবং সেই মিল্লাতে ইবরাহীমের অনুসারী। এ থেকে বোঝা যায় حنيف অর্থ হচ্ছে مِلَّةَ اِبْرَاهِيْمَ এর অনুসারী।

কেউ কেউ বলেন مِلَّةَ اِبْرَاهِيْمَ حَنِيْفًا এর অর্থ مخلصا। তাদের দৃষ্টি অনুযায়ী ইবরাহীমের মিল্লাত এর একনিষ্ঠ ধারকই হচ্ছেন হানিফ।

হযরত সুদ্দী (রা.) হতে বর্ণিত, وَاتَّبَعَ مِلَّةَ اِبْرَاهِيْمَ حَنِيْفًا আয়াতেحنيفا-এর অর্থ হল مخلصا অর্থাৎ বিশুদ্ধ ও খাঁটি।

কেউ কেউ বলেন حنيف বলে ইসলামকেই বুঝানো হয়েছে। সুতরাং যে কেউ মিল্লাতে ইবরাহীমীকে পূরণ করল এবং সে দ্বীনের উপর দৃঢ়ভাবে অবস্থান করল সেই হল حنيف হানিফ।

হযরত ইমাম আবূ জাফর (রা.) বলেন, حنيفا এর অর্থ হজ্ব হবেনা, কারণ হজ্জের দ্বারা মুসলিম এবং অমুসলিমের পার্থক্য বোঝা যায় না, কারণ মুশরিকরা ও হজ্জ করে। আর যদি হানিফ দ্বারা খতনা অর্থ নেয়া হয়, তা হলে ইহুদীও حنفاء এর অন্তর্ভূক্ত হবে। কারণ ইহুদীরাও খৎনা করে। বরং حنيف শব্দের মূল অর্থ হবে استقامة على ملة ابراهيم ইবরাহীমের মাযহাবের উপর দৃঢ়ভাবে থাকা। মাযহাবের মধ্যে হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর অনুসরন করা মানে তাঁর ইকতিদা করা। হযরত ইবরাহীম (আ.)- এর আগে কোন নবীকে حنيف শব্দ দ্বারা অভিহিত করা হয়নি। যেহেতু তাদেরকে তাদের পরবর্তীদের জন্যে ইমাম করা হয়নি। যেমন হযরত ইবরাহীম (আ.)-কে কিয়ামত পর্যন্ত পরবর্তীদের জন্য শরীয়তের বিভিন্ন বিধান যেমন আহকামে হজ্জ এবং খৎনার মুকতদা বানানো হয়েছে এবং হানিফ হওয়ার জন্য এর উপর দৃঢ় থাকার শর্তারোপ করা হয়েছে, কারণ যারা মুশরিক হয়েছে, তারা ইসলামী শরীয়ত এবং দ্বীনে হানিফের অন্তর্ভুক্ত হবে না।

قُوْلُوْا اٰمَنَّا بِاللّٰهِ وَمَا اُنْزِلَ اِلَيْنَا وَمَا اُنْزِلَ اِلٰى اِبْرٰهِيْمَ وَاِسْمٰعِيْلَ وَاِسْحٰقَ وَيَعْقُوْبَ وَالْاَسْبَاطِ وَمَا اُوْتِىَ مُوْسٰى وَعِيْسٰى وَمَا اُوْتِىَ النَّبِيُّوْنَ مِنْ رَّبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ اَحَدٍ مِّنْهُمْ وَنَحْنُ لَهٗ مُسْلِمُوْنَ

হে মুমীনগণ তোমরা বল আমরা ঈমান এনেছি আল্লাহ তায়ালার প্রতি, আমাদের কাছে যা অবতীর্ন হয়েছে তার প্রতি, যা কিছু অবতীর্ণ হয়েছে হযরত ইবরাহীম (আ.) -এর উপর, এবং যা কিছু নাযিল করা হয়েছে হযরত ঈসমাঈল এবং ইসহাক (আ.) এর উপর ঈমান এনেছি যা কিছু নাযিল করা হয়েছে হযরত ইয়াকুব (আ.)-এর সন্তানদের উপর। যা হযরত মুসা (আ.) ও হযরত ঈসা (আ.)-এর উপর নাযিল করা

Scanned with CamScanner

হয়েছে, এর উপরও ঈমান এনেছি। আরও ঈমান এনেছি ঐ সব কিতাবের উপর, যা অন্যান্য নবীদের উপর অবতীর্ন হয়েছে। আর আমরা কোন নবীদেরকে পৃথক করিনা। আমরা তারই আনুগত্যকারী।

সকল নবী-রাসূলদের উপর যে সকল কিতাব নাযিল হয়েছে, আমরা তার উপর ঈমান আনয়ন করি। এরকম নয়, যে কিছু নবীর উপর ঈমান আনলাম এবং কিছু নবীকে প্রত্যাখান করলাম। আমাদের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে আল্লাহ্ তায়ালার আদেশ নিষেধ যথাযথ পালন করা। এ আয়াতের শানে নুযুল নিম্নোক্ত হাদীস দ্বারা বর্ণনা করা হয়েছে।

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন ইহুদীদের এক দল লোক রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর খিদমতে হাজির হলো। যাদের মধ্যে আবূ ইয়াসির বিন আখতাব, রাফে বিন আবু রাফে, আযির, খালেদ, আযার বিন আবী আযার এবং আশবা ছিল। তারা রাসূলুল্লাহ (সা.)-কে জিজ্ঞেস করল, রাসূলদের মধ্য থেকে তিনি কাদের উপর ঈমান রাখেন। রাসূল্লাহ্ (সা.) উত্তর দিলেন- আমি আল্লাহর উপর ঈমান এনেছি, যা কিছু আমার প্রতি নাযিল হয়েছে তার উপর ইমান এনেছি, যা কিছু নাযিল হয়েছে হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর উপর তার উপর ঈমান এনেছি। এভাবে যা কিছু নাযিল হয়েছে ঈসমাইল (আ.), হযরত ইসহাক (আ.), ইয়াকুব (আ.)-এর আওলাদ এর উপর এবং যা কিছু হযরত মূসা (আ.), ইসা (আ.) এবং অন্যান্য নবীদেরকে তাদের পরওয়ার দেগারের পক্ষ হতে দেয়া হয়েছে তার উপর ঈমান এনেছি। তাদের মধ্যে কাউকেও আমরা পৃথক করিনা। আমরা তাঁরই অনুগত। যখন হযরত ঈসা (আ.)-এর উল্লেখ করা হয়, তখন তারা তার নবুয়তকে অস্বীকার করে। তারা বলে আমরা ঈসা (আ.)-এর উপর ঈমান আনিনা এবং ঔ লোককে বিশ্বাসও করি না, যে ঈসা (আ.) উপর ঈমান আনে। তখনই আল্লাহ্ তায়ালা এ আয়াত নাযিল করেন।

قُلْ يٰٓاَهْلَ الْكِتٰبِ هَلْ تَنْقِمُوْنَ مِنَّآ اِلَّآ اَنْ اٰمَنَّا بِاللّٰهِ وَمَآ اُنْزِلَ اِلَيْنَا وَمَآ اُنْزِلَ مِنْ قَبْلُ وَاَنَّ اَكْثَرَكُمْ فٰسِقُوْنَ۔

আপনি বলুন, হে আহ্লে কিতাবগণ কেবল মাত্র এ কারণেই আমাদের সাথে শত্রুতা পোষণ কর যে, আমরা আল্লাহ ও আমাদের প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে এবং যা পূর্বে অবতীর্ণ হয়েছে তাতেই ঈমান এনেছি। তোমাদের অধিকাংশইতো ফাসিক। (সূরা ঃ মায়িদা-৫৯)

اسباط আসবাত শব্দের বিশদ বিবরণ নিম্নে বর্ণিত হাদীসের মধ্যে উল্লেখ করা হয়েছে হযরত কাতাদাহ (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, এখানে الاسباط শব্দ দ্বারা বুঝানো হয়েছে- হযরত ইউসুফ (আ.) এবং তাঁর ভাইগণকে অর্থাৎ ইয়াকুব (আ.)-এর সন্তানদেরকে। তার বারজন সন্তান ছিলেন। তাদের প্রত্যেক থেকেই এক এক জাতির উদ্ভব ঘটেছিল। এজন্য তাদের নাম দেয়া হয়েছে اسباط।

হযরত মুহাম্মদ বিন ইসহাক (রা.) রিওয়ায়ত করেন, হযরত ইয়াকুব ইবনে ইসহাক (তার নাম ছিল ইসরাঈল) আপন চাচাত বোন লিয়া বিনতে লয়ান বিন তুবিল বিন ইলিয়াসকে বিবাহ করেছিলেন। তাঁর গর্ভ থেকে রুবিল বিন ইয়াকুব পয়দা নিয়েছিলেন। তিনি তাঁর সন্তানদের মধ্যে বড় ছিলেন। এরপর শামউন, লাওয়ী, ইহুজা, রিয়ালূ, ইসজর জন্মগ্রহণ করেন এবং কন্যা সন্তান দিনা বিনত ইয়াকুব জন্ম

গ্রহণ করেন। এরপর লিয়া বিনত লিয়ান মৃত্যু বরণ করেন। এরপর হযরত ইয়াকুব (আ.) লিয়ার বোন রাহিল বিনত্ লিয়ান বিন তুবিল বিন ইলিয়াসকে বিবাহ করনে। তাঁর গর্ভে হযরত ইউসুফ এবং বিন ইয়ামিন জন্মগ্রহণ করেন। বিন ইয়ামিন কে আরবী ভাষায় আসাদ (বাঘ) বলা হয়। তার আরো দু জন সঙ্গী হতে চার সন্তান লাভ করে। এ দুজন সঙ্গীর মধ্যে একজনের নাম হল- যুলফা এবং অপর জনের নাম হল বলহিয়া। তাদের চার ছেলের নাম হল দান, নকশালী, জাদ এবং আশরব বিন ইয়াকুব। এখানে দেখা যায়, হযরত ইয়াকুব (আ.)-এর ১২ জন ছেলে ও একজন মেয়ে মিলে তের জন সন্তান হয়েছে। এ তের জন সন্তান থেকে তেরটি সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হয়েছে। এদের থেকে কত সন্তান হয়েছে এবং বংশ বেড়েছে তাএকমাত্র আল্লাহ্ তায়ালা ছাড়া কেউই জানেন না। যেমন- আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন- وَقَطَّعْنٰهُمُ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ اَسْبَاطًا اُمَمًا "আমি তাদেরকে বারটি সম্প্রদায়ে বা গোত্রে বিভক্ত করেছি।" (সূরা ঃ আ'রাফ-১৬০)

فَاِنْ اٰمَنُوْا بِمِثْلِ مَآ اٰمَنْتُمْ بِهٖ فَقَدِ اهْتَدَوْا

অতঃপর এ ইহুদী এবং নাসারাগণ যদি তোমাদের মতো উল্লেখিত বিষয়ে ঈমান আনে, তাহলে তারা সঠিক পথ পেল। অর্থাৎ তোমরা যেমন সমস্ত নবী এবং কিতাব সমূহের উপর ঈমান এনেছ, তদ্রুপ তারা ও যদি ঐ সব কিছুর উপর ঈমান আনে তা হলে তারা সত্য পথের অনুসারী হল এবং মুসলিম ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ হল।

وَاِنْ تَوَلَّوْا فَاِنَّمَا هُمْ فِيْ شِقَاقٍ

তবে, তারা যদি ঈমান আনা হতে মুখ ঘুরিয়ে নেয়, তা হলে একথা জেনে রাখ তারা ইসলামী ভ্রাতৃত্বে এক নয়, বরং তারা হঠকারিতায় রয়েছে। সুতরাং তাদের জন্য আপনার পক্ষ হতে আল্লাহই যথেষ্ট। তিনি শ্রবণকারী এবং মহাজ্ঞানী।

فَسَيَكْفِيْكَهُمُ اللّٰهُ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ

যদি ইহুদী ও খ্রীষ্টানগণ আপনাদের ঈমানের মত ঈমান গ্রহণ না করে, তাহলে শিগ্রই আল্লাহ তাদেরকে হত্যার দ্বারা বা নির্বাসনের দ্বারা তোমাদের প্রতিবেশী হওয়া থেকে দূরে রাখবেন। কারণ আল্লাহ্ তায়ালা কুফরের প্রতি তাদের প্রকাশ্য দাওয়াত শ্রবণ করেন এবং তাদের অন্তরের গোপনীয় কথা জানেন, যেহেতু তারা অন্তরে শত্রুতা পোষণ করে। শীঘ্রই আল্লাহ্ তাদের মধ্যে কতেককে হত্যার মাধ্যমে, আর কতেক কে নির্বাসনের মাধ্যমে এবং আর কতেককে বে-ইজ্জতীর মাধ্যমে স্বীয় ওয়াদা পূরণ করবেন।

صِبْغَةَ اللّٰهِ وَمَنْ اَحْسَنُ مِنَ اللّٰهِ صِبْغَةً وَّنَحْنُ لَهٗ عٰبِدُوْنَ

এ আয়াতের শানে নযুল হল- ইহুদী এবং নাসারাগণ যখন তাদের বাচ্চাদেরকে নাসারা বানানোর ইচ্ছে করত, তখন এক প্রকার রঙিন পানিতে ডুবিয়ে রঙিন করে তুলত। এটাকে তারা পবিত্রতা মনে করত, যেমন মুসলমানগণ জানাবতের গোসল করে। তাদের দৃষ্টিতে নাসারাবাদের একটি রং রয়েছে। যখন ইহুদী এবং নাসারাগণ বলতে আরম্ভ করল, তোমরা ইহুদী বা নাসারা হলেই সঠিক রাস্তা পাবে। এদের এ অহেতুক কথার উত্তর দিতে গিয়ে আল্লাহ বলেন-

Scanned with CamScanner

قل لهم يا محمد ايها اليهود والنصاري بل اتبعوا ملة ابراهيم صبغة الله التي هي احسن الصبغ فانها هي الحنيفة المسلمة ـ

হে মুহাম্মদ (সা.), আপনি বলুন, হে ইহুদী এবং নাসারাগণ তোমরা বরং মিল্লাতে ইবরাহীমের অনুসরণ কর। তোমরা আল্লাহর রঙে রঙিন হও। আল্লাহর রঙের চেয়ে কোন রঙ বেশী সুন্দর নয়। আল্লাহর রঙ হচ্ছে- ইসলাম।

হযরত কাতাদাহ (রা.) আল্লাহর বাণী- صِبْغَةَ اللّٰهِ وَمَنْ اَحْسَنُ مِنَ اللّٰهِ صِبْغَةً সম্পর্কে বলেন, অবশ্যই ইহুদীরা তাদের সন্তানদেরকে রঙিন করে এবং রঙ লাগিয়ে নাসারা ও তাদের সন্তানকে রঙিন করে। অথচ ইসলামের চেয়ে সুন্দর রঙ নেই এবং ইসলামের চেয়ে পবিত্র কিছু নেই। তা হচ্ছে আল্লাহর দ্বীন যেই দ্বীন দিয়ে আল্লাহ্ তায়ালা হযরত নূহ (আ.) এবং তাঁর পরে অন্যান্য আম্বিয়াদেরকে প্রেরণ করেন। অতঃপর আহলে তাবীলগণ صِبْغَةَ اللّٰهِ শব্দের অর্থ নিয়ে তর্ক করেন। হযরত কাতাদাহ, আবূ-আলীয়া, রাবী, মুজাহিদ, আতিয়া এবং সুদ্দী (রা.) বলেন, صبغة الله অর্থ আল্লাহর দ্বীন। অপর দিকে হযরত মুজাহিদ থেকে অন্য এক রিওয়ায়তে বর্ণিত আছে- صِبْغَةَ اللّٰهِ অর্থ فِطْرَةَ اللّٰهِ যেমন আল্লাহ বলেন فِطْرَةَ اللّٰهِ الَّتِيْ فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا "যেই ফিতরতের উপর আল্লাহ্ তায়ালা মানুষ সৃষ্টি করেছেন সেই ফিতরত তোমরা গ্রহণ কর।" (সূরা ঃ রূম-৩০)

قُلْ اَتُحَاجُّوْنَنَا فِي اللّٰهِ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ ج وَلَنَا اَعْمَالُنَا وَلَكُمْ اَعْمَالُكُمْ ط وَنَحْنُ لَهٗ مُخْلِصُوْنَ

হে মুহাম্মদ (সা.) আপনি বলে দিন। (হে আহলে কিতাব) তোমরা কী আল্লাহ্ তায়ালার দ্বীনের ব্যাপারে আমাদের সাথে ঝগড়া করছ। অথচ সেই যাতে পাক আমাদের এবং তোমাদের রব। আমরা আমাদের কৃত কর্মের বিনিময় পাব। তোমরা তোমাদের কৃতকর্মের ফলাফল পাবে। আমরা তাঁর ইবাদতের প্রতি একনিষ্ঠ অর্থাৎ তোমরা বলছ তোমাদের নবী এবং কিতাব পুরাতন, যার জন্য আমাদের চেয়ে তোমাদের মর্যাদা বেশী, আমাদের উপর তোমাদের প্রাধান্য রয়েছে অথচ তোমাদের এবং আমাদের রব এক। তোমরা আরও দাবী করছ তোমরা আমাদের চেয়ে আল্লাহর বেশী প্রিয়।

اَمْ تَقُوْلُوْنَ اِنَّ اِبْرٰهِيْمَ وَاِسْمٰعِيْلَ وَاِسْحٰقَ وَيَعْقُوْبَ وَالْاَسْبَاطَ كَانُوْا هُوْدًا اَوْ نَصٰرٰى قُلْ ءَاَنْتُمْ اَعْلَمُ اَمِ اللّٰهُ

তোমরা কী একথা বলছে যে, অবশ্যই ইবরাহীম, ইসমাঈল, ইসহাক, ইয়াকুব এবং তাঁর সন্তানরা ইহুদী ছিলেন বা নাসারা ছিলেন? হে মুহাম্মদ (সা.)! আপনি তাদেরকে জিজ্ঞেস করুন, তারা এ ব্যাপারে বেশী জানে, না আল্লাহ বেশী জানেন? অর্থাৎ হে আহলে কিতাব! كُوْنُوْا هُوْدًا اَوْ نَصٰرٰى تَهْتَدُوْا এর প্রবক্তাগণ, তোমরা কি আমাদের কে বুঝাতে চাচ্ছ তোমরা পুরাতন দ্বীনের উপর; এজন্যে তোমরা সত্যের উপর আছ এবং আমরা গোমরাহীর মধ্যে আছি। যদি আমরা সত্যই সৎ পথ চাই, তা হলে উচিত আমাদের ইহুদী বা নসরানীয়ত গ্রহণ করা। এব্যাপারে তোমরা দলিল হিসেবে পেশ করছ যে, ইবরাহীম, ইসমাঈল, ইসহাক, ইয়াকুব (আ.) এবং তার সন্তানরা ইহুদী বা নাসারা ছিলেন।

আল্লাহ্ তায়ালা বলেন, হে মুহাম্মদ (সা.) আপনি তাদের এ নির্বোধ কথার উত্তরে বলে দিন, ঐ সব লোকেরা কোন দ্বীনের উপর ছিলেন তা কী তোমরা বেশী জান, না আল্লাহ্ তায়ালা বেশী জানেন?

وَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهٗ مِنَ اللّٰهِ

ঐ ব্যক্তির চেয়ে বেশী কে অত্যাচরী হতে পারে? যার কাছে আল্লাহ্ তায়ালার পক্ষ হতে সত্যের অনুকুলে সাক্ষ্য মওজুদ থাকার পর সত্যকে গোপন করে। হে মুহাম্মদ (সা.), ইহুদী এবং নাসারাগণের ধারনা যে, ইবরাহীম(আ.) ও অন্যান্য নবীগণ ইহুদী বা নাসারা ছিলেন। তা হলে তাদের চেয়ে যালিম আর কে হতে পারে? যেহেতু হযরত ইব্রাহীম (আ.) এবং অন্যরা যে মুসলমান ছিলেন সেই ব্যাপারে তাদের কিতাব তৌরাত এবং ইনজিলে স্পষ্ট সাক্ষ্য রয়েছে। তাদের কী দুর্দান্ত সাহস! তারা তা শুধু গোপন করে ক্ষান্ত হয়নি; বরং বলছে হযরত ইবরাহীম (আ.) ইহুদী এবং নাসারা ছিলেন।

হযরত মুজাহিদ হতে বর্ণিত, তিনি আল্লাহ তায়ালার বানী وَمَنْ اَظْلَمُ مِنَ اللّٰهِ সম্পর্কে বলেন, হযরত ইবরাহীম (আ.), হযরত ইসমাঈল (আ.) এবং তাদের সাথে যাদেরকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে তাদের সম্পর্কে ইহুদীদের কথা এই যে, তারা সকলেই ইহুদী বা নাসারা ছিলেন। তাই আল্লাহ্ তায়ালা বলেন, তোমরা আমার থেকে প্রমান গোপন করতে পারনা বরং আল্লাহ্ জানেন তোমরা বড়ই মিথ্যুক।

অন্য একদল বলেন, كتمان شهادة বলে উদ্দেশ্য করা হয়েছে হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর নবুয়ত, যা তাদের কিতাবে লিপিবদ্ধ আছে। যেমন হযরত কাতাদাহ (রা.) হতে বর্ণিত তিনি বলেন- اَمْ تَقُوْلُوْنَ اِنَّ اِبْرٰهِيْمَ وَاِسْمٰعِيْلَ وَاِسْحٰقَ وَيَعْقُوْبَ وَالْاَسْبَاطَ كَانُوْا هُوْدًا اَوْ نَصٰرٰى আয়াতে تقولون দ্বারা বুঝানো হয়েছে আহলে কিতাবকে। তারা জেনে শুনে ইসলামকে গোপন করত, অথচ এটাই হচ্ছে আল্লাহর দ্বীন। তারা ইহুদীয়ত এবং নাসারানীয়ত অবলম্বন করেছে এবং মুহাম্মদ (সা.)-এর কথা গোপন করেছে। অথচ তারা জানে যে, মুহাম্মদ আল্লাহর রসূল, যা তারা তাদের কিতাব তৌরাত এবং ইনজিলে অধ্যয়ন করেছে বা পেয়েছে।

كتمان شهادة সম্পর্কে গ্রহণ যোগ্য কথা হল, সাক্ষ্য গোপন করা মানে হযরত ইব্রাহীম (আ.) যে ইসলাম এর উপর ছিলেন সেই কথা তারা জানা সত্বেও গোপন করেছে। অথচ তারা হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর তরীকার অনুসরন এর প্রতি আদিষ্ট ছিল। কারন ইহুদীয়ত এবং নাসারানীয়তের আবিস্কার হয়েছে ইবরাহীম (আ.) এর পরে। তারা যে দাবী করছে হযরত ইবরাহীম (আ.) ইহুদী বা নাসারা ছিলেন এবং এদাবীর প্রেক্ষিতে তারা হযরত মুহাম্মদ (সা.) এবং সাহাবায়ে কেরামকে বলে, তোমরা ইহুদী বা খ্রীষ্টান হয়ে যাও তা হলে তোমরা সৎপথ পাবে। সুতরাং তারা যে মিথ্যা বলছে, সত্য গোপন করছে এবং যা বলছে তা নিজে সৃষ্টি করে বানিয়ে বলছে, তা প্রকাশ করার জন্যে আল্লাহ্ তায়ালা এ আয়াত নাযিল করেন।

وَمَا اللّٰهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُوْنَ

অর্থাৎ আল্লাহ্ তায়ালা তোমাদের কার্যকলাপ হতে অজ্ঞাত নন। তোমরা যে সত্যকে গোপন করছ এসব ব্যাপারে আল্লাহ্ তায়ালা সম্পূর্ন ওয়াকেফহাল।

Scanned with CamScanner

تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْئَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ

অর্থাৎ ওরা একটা জামাত ছিল যারা চলে গেছে। তারা যা অর্জন করেছে তার বিনিময় তারা পাবে এবং তোমরা যা অর্জন করেছ তারা বিনিময় ও তোমরা পাবে। তারা যা করেছে সেজন্য তোমরাদেরকে জিজ্ঞেস করা হবে না। অর্থাৎ হযরত ইবরাহীম (আ.) এবং ইয়াকুব (আ.)-এর সন্তানরা অতীত কালের উম্মতের মধ্যে গণ্য। তাঁরা যে সব কাজ করেছেন, সে জন্যে তোমরা দায়ী নও। কারণ তাদের কাজের পরিনাম তারা পাবে এবং তাদের কার্যকলাপ সম্পর্কে তোমাদেরকে জিজ্ঞেস করা হবে না। তোমরা কেবল তোমাদের কাজের ফল পাবে।

এখানে امت শব্দ বলে বোঝানো হয়েছে হযরত ইবরাহীম (আ.)-কে। যেমন হাদীস শরীফে উল্লেখ আছে- কাতাদাহ (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, এ আয়াতে امة বলতে বুঝানো হয়েছে ইব্রাহীম, ইসমাইল, ইসহাক, ইয়াকুব (আ.) এবং ইয়াকুবের আওলাদ।

হযরত রবী (রা.) হতে বর্ণিত, এখানে امة শব্দের অর্থ جماعة। এ ক্ষেত্রে আয়াতের অর্থ হয়- হে মুহাম্মদ (সা.) আপনি বলুন ঐ সকল লোকদেরকে, যারা আল্লাহ সম্পর্কে আপনার সাথে বিতর্ক করছে। আর তারা হল ইহুদী এবং নাসারা। ইবরাহীম (আ.) সম্পর্কে আল্লাহ্ তায়ালার পক্ষ হতে পাওয়া তাদের কাছে যে প্রমাণ আছে তা তারা গোপন করেছে। তারা ধারনা করছে ইবরাহীম এবং তার সাথের অন্যরা ইহুদী বা নাসারা ছিলেন। বস্তুতঃ তারা মিথ্যুক। অবশ্যই ইব্রাহীম, ইসমাঈল, ইসহাক, ইয়াকুব এবং তার সন্তানরা একটি জামাত। তারা তাদের পথেই চলে গেছেন। তারা তাদের রবের সাথে মিলে গেছেন এবং তাদের কৃত কর্মের ফল আল্লাহর কাছে। তাদের জীবনকালে ভাল কাজ করলে ভাল ফল পাবেন, আর মন্দ কাজ করলে মন্দ ফল পাবেন। হে ইহুদী এবং নাসারাগণ! তোমরা জেনে রাখ তোমরা যদি ঐ সব ব্যক্তি বর্গ হয়ে থাক যারা নিজে বানোয়াট কথা বলে এবং যদি ধারনা কর তোমাদের খারাপ কাজ করা সত্বেও আল্লাহ্ তায়ালার শাস্তি বা আযাব হতে রক্ষা পাবে, তবে তাতে কোন ফল হবে না। একথা জেনে রাখ, ইবরাহীম এবং তার সাথীদের ভাল কাজে তোমাদের কোন উপকারে আসবে না এবং তোমাদের খারাপ কাজ তাদের কোন ক্ষতি করতে পারবে না। তোমাদের যে ধারনা- তোমরা তাদের দলে একথা বললে তোমরা আল্লাহ্র কঠোর শাস্তি হতে রক্ষা পাবে- এ ধারনা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত।

[প্রথম পারা সমাপ্ত]

Scanned with CamScanner



পুস্তক বিপণি পাবলিকেশন্স

Scanned with CamScanner

Amran Hosan
01783587480
01850054403

Pdf Created by Amran Hosan

www.facebook.com/mdamran.hosan.9

www.amrangp.blogspot.com

Call/imo/whatsapp: 01783587480

www.facebook.com/mdamran.hosan.9

Scanned with CamScanner